প্রচ্ছদপট

অঙ্কন—ইন্দ্রনীল ঘোষ

মুদ্রণ—ন্যাশনাল হাফটোন

SERA LEKHIKADER SERA GALPA

A collection of short stories by thirty-seven best female writers of Bengali literature. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073

ISBN : 81-7293-552-8

শব্দগ্রহন : পাইকা ফটোসেটার্স, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ ১৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

মেয়েরা সাধারণত বিশুদ্ধ শিল্পী হন না—এমন ধারণা আজও বদলাবার তেমন কোনও কারণ ঘটে নি। তাঁরা চিত্রকর হন না, ভাস্কর হন না, লেখক হন না। হন না মানে সাধারণত হন না। একজন মীরা মুখোপাধ্যায়, কি একজন মহাশ্বেতা দেবী পাওয়া পুরুষদের মধ্যেও দুষ্কর। একথা মেনেও বলতে পারি পুরুষশিল্পী ও নারীশিল্পীদের সংখ্যার একটা সাদামাটা তুলনা করলেও কথাটা স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে যাবে। প্রমোদকলা এবং কারুকলাতেই মেয়েদের সিদ্ধি। সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি বিনোদনশিল্পে যথেষ্ট নারীশিল্পী পাওয়া যায়। এ ছাড়া আঁকলে তাঁরা আঁকেন আলপনা, গড়লে গড়েন পুতুল, লিখলে লেখেন—ছড়া, ডায়েরি, চিঠি। কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর সিমোন দ্য ব্যুভোয়ার দিয়েছেন। মেয়েদের দু'রকম প্রতিবন্ধক পেরোতে হয়। প্রথমত নারীপরিচয়ের হীনম্মন্যতা-সংকোচ-সংস্কারের প্রতিবন্ধক। দ্বিতীয়ত অনেক যুগের দৌড়ে স্বভাবতই এগিয়ে-থাকা পুরুষের সঙ্গে এক অসম প্রতিযোগিতার বাধা। প্রায় একশ বছরের লেখিকাদের গল্প সম্পাদনা করতে গিয়ে দেখছি বাঙালি নারীলেখকরা এই বাধা পেরিয়েছেন এক অতি সহজ উপায়ে। তাঁরা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের 'দর্পহরণ' গল্পের নির্ঝর বা নির্ঝরের মতো করে। নির্ঝর তার লেখকম্মন্য স্বামীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিতেছিল একটি ঘরোয়া বিষয়ে গল্প লিখে। আমাদের লেখিকারাও নিজেদের প্রতিবেশ, সামাজিক বাতাবরণ, সর্বোপরি নিজেদের দিবাস্বপ্ন দিয়ে লেখার জগৎ গড়ে নিয়েছেন। অভিজ্ঞতার বহির্বৃত্তের দিকে তেমন একটা তাকান নি। এটা ভালো কি মন্দ সে আলোচনা অর্থহীন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম নারী ঔপন্যাসিক জেন অস্টেনও তাঁর গ্রাম্য-মধ্যবিত্ত জমিমালিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-কার্যকলাপের পরিবেশ থেকে বেরোন নি, তার জন্য কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের মর্যাদা তাঁর হাতছাড়া হয়নি। বিষয় ছাড়াও তাঁর হাতে ছিল প্রসাদগুণ, ক্ষুরধার বিশ্লেষণ, রসবোধ, সামগ্রিক নির্মাণের সুষমামণ্ডিত কারুতা।

'সেরা লেখিকাদের সেরা গল্প' নাম দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু এই শীর্ষনাম এখানে কতটা সুপ্রযুক্ত সে বিষয়ে সংকলক ও সম্পাদক উভয়েরই যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। স্বর্ণকুমারী থেকে পূর্ণশশী—এঁদের লেখা এখন দুষ্প্রাপ্যর পর্যায়ে পড়ে। যথেষ্ট লেখা পাওয়া যাবে তবে তো নির্বাচনের প্রশ্ন! অন্যত্র এঁদের যেসব লেখা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়েছে তা ছাড়া অন্য লেখা মিলে যাওয়াটাই এখন সৌভাগ্যের বিষয়। তাদের স্থান দিতে পারলে আমরাই তৃপ্তি পাই, গৌরবান্বিত বোধ করি। অনেকের লেখা সময়াভাবে যোগাড় করা গেল না। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপালি দত্ত রায় এই কারণেই সংকলনভুক্ত হলেন না। তা সত্ত্বেও এ সংকলন মোটের ওপর প্রামাণ্য এবং প্রতিনিধিমূলক এমন দাবি করাই যায়।

অনেকে মনে করেন, নারী-লেখকদের আলাদা করে বিচার করা ঠিক নয়। ইতিহাসের পরামর্শ অন্যরকম। ইতিহাস মানে তো শুধু সাহিত্যের ইতিহাস নয়, সমাজেরও ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও ইতিহাস। সমাজের অন্দরমহল এবং অন্তরমহলের ঘনিষ্ঠ খবরাখবর

মেয়েদের ঝুলিতে যতটা ধরা থাকে, ততটা আর কোথাও থাকে না। বিশেষত এই দ্বিতীয় ইতিহাসের প্রয়োজনকে স্বীকার করেই এই সংকলন। এবং গল্প বাছার সময়ে যা সবচেয়ে বেশি বিবেচিত হয়েছে তা হল বিবর্তমান নারীমানস, তার মনোযোগবিন্দুর প্রতিসরণ।

এই সংকলনে মাত্র তিনটি গল্প আছে যেগুলি মেয়েদের সম্পর্কে নয়। শৈলবালা ঘোষজায়ার 'লাফো', সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদারের 'বি-পজিটিভ' এবং গৌরী ধর্মপালের 'ভুবনডাঙার জাত খেলুড়ে'।

'লাফো'তে খুন জখম প্রতিহিংসা স্বেচ্ছানির্বাসন সেই সঙ্গে গভীর সৌহার্দ্যের এক মিলমিশ দেখতে পাওয়া যায়। 'লাফো' মগ অর্থাৎ রেঙ্গুনের বর্মী কাঠের কারখানা মালিকের চরিত্র উপস্থিত করেই শৈলবালা আমাদের চমকে দিয়েছেন। তবে আপাতদৃষ্টিতে যতটা জটিল প্লট মনে হচ্ছে, গল্পের বিন্যাসে তেমন প্রত্যাশাপূরণ হয় নি। সবটাই স্মৃতিচারণের আকারে উপস্থাপিত হয়েছে, আখ্যানের আকারে পরিবেশিত হয়েছে।

'বি-পজিটিভ'-এ সুভদ্রা উর্মিলা একটি আত্মকেন্দ্রিক পুরুষচরিত্র নিয়ে লিখেছেন। আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর। সারাজীবন সূর্য নামে এই পুরুষটি ঘনিষ্ঠজনদের দাবিয়ে, নিজের অধিকার মর্যাদা এবং সুখসুবিধা আদায় করে নিয়েছে। কখনোই এর ব্যত্যয় হয় নি। জীবনে প্রথম এই নিয়ম ভঙ্গ হল ছেলের বেলায়। দুর্ঘটনায় মৃতপ্রায় ছেলেকে রক্ত দেবার জন্যে সূর্য যখন নার্সিং হোমে ছুটে এল, রক্তের গ্রুপ বি-পজিটিভ। এই প্রথম কি সূর্যের মধ্যে পজিটিভ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, যা তার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক?

তৃতীয় গল্পটি সম্পূর্ণই ভিন্ন জাতের। ছোটদের জন্য লেখা বলে মনে হয়। কিন্তু অস্কার ওয়াইল্ডের 'সেলফিশ জায়ান্ট' কিম্বা হানস ক্রিশ্চান অ্যান্ডারসেনের 'দি এম্পারার্স ক্লোদস' যেমন ছোটদের গল্প না হয়েও ছোটদের মন দোলায়, ভোলায়, কাঁদায়, হাসায়—এ-ও তেমনি, তবে এ গল্প কাঁদায়ও না, হাসায়ও না, স্বপ্ন দেখায়। 'ভুবনডাঙার জাত খেলুড়ে' রূপক গল্প। এই গল্পের পুতুল গড়া বুড়ো বোধহয় আদিশিল্পীর শাপভ্রষ্ট মর্ত্যরূপ। ফরমাশী পুতুল সে তো গড়েই, গড়ে আপন খেয়ালের পুতুলও। তা ছাড়াও গড়ে মায়াপুতুল আর ছায়াপুতুল। তবু তার মন খুঁতখুঁত করে, কেননা তার বাবা তার কানে মন্ত্র দিয়ে গেছেন ভুবনডাঙার পাবন মাটি না হলে সেই আসল পুতুলটি তার গড়া হবে না। ছোট্ট মেয়ের আবদার পূরণ করতে গিয়ে কেমন করে সে অতি সামান্য উপকরণ দিয়ে তার সেই প্রাণের পুতুলটি গড়ল, তাই নিয়েই এই গল্প বা কবিতা। শিল্পী যখন ফরমাশে নয়, খেয়ালে নয়, প্রাণের টানে শিল্প সৃষ্টি করেন তখন তাতে সৃষ্টিকর্তার হাতের ম্যাজিক এসে যুক্ত হয়। কবিতার মতো গদ্যে, গ্রাম্য কথ্যভাষার সহজ মিষ্টি দেশজ তদ্ভব টানে এ গল্প লেখা।

আরও তিনটি ব্যতিক্রমী বিষয়ের গল্প আছে সংকলনে—রাধারাণী দেবীর 'মূক সাথী' পশুপ্রেমের গল্প। নবনীতা দেবসেনের 'আবার এসেছে আষাঢ়' রসরচনা। এ গল্প একটি নির্মল হাসির ফোয়ারা যাতে বিদ্রূপ, বিরক্তি, কান্নাকে হাসির ছদ্মবেশ পরানো—এসব কিছুই নেই, আছে শুধুই দুর্যোগের দুর্ভোগকে হাসির মধ্য দিয়ে পার হয়ে যাওয়া। মীরা বালসুব্রামনিয়ন লিখেছেন একটি গোয়েন্দা গল্প।

এগুলি বাদে আর সব গল্পই সামাজিক সমস্যাবিষয়ক বা মনস্তাত্ত্বিক। এ গল্পগুলিতে প্রধান চরিত্র নারী। প্রধান বিষয় প্রেম। প্রায়শই ব্যর্থ। স্বর্ণকুমারী থেকে সীতা দেবী এই সুদীর্ঘ সময়যাত্রায় দেখি মর্ষকামী আবেগের চোরাগলি থেকে লেখিকামানস কিছুতেই বার হতে পারছে না। পুরুষনির্ভর সুখ, পুরুষকেন্দ্রিক জীবন ও পারিবারিক অবহেলার এক শোচনীয় চিত্র ফুটে উঠেছে এঁদের গল্পে। পুত্রকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলেত পাঠানোর ফলে

একমাত্র কন্যা বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে (গহনা—স্বর্ণকুমারী দেবী)। পতিতার শিশুকন্যাকে আপন নাতনির মতো স্নেহে আদরে মানুষ করছেন ঠাকুর্দা, কিন্তু নিজের নাতি তার প্রতি প্রণয়াসক্ত জেনেও মেয়েটির ওপর স্নেহকরুণ নিষেধ জারি করে যাচ্ছেন (সুনন্দ—শান্তা দেবী)। নবাবজাদার প্রণয় পাবার জন্যে এক তরুণী অসুন্দরী দাসীপুত্রী সেই নবাবজাদার চিত্র সেলাই করতে গিয়ে চোখ দুটোকেই অন্ধ করে ফেলছে (চোখের আলো—সীতা দেবী)।

আশ্চর্য লাগে দেখে গিরিবালা দেবীর 'জাগরণ' গল্পে শরৎচন্দ্রের 'দর্পচূর্ণ'র ছায়া। আরও আশ্চর্য লাগে সরলা দেবীর 'বাঁশী' গল্পে 'গৃহদাহ'র তুঙ্গীয় ঘটনার ছায়াপাত দেখে। অবশ্যই এটা পূর্বাভাস মাত্র, কেননা সরলাদেবী লিখেছেন 'গৃহদাহ'র আগে। সুহাসিনীকে তার ঠাকুরজামাই বাপেরবাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ছল করে ভুলপথে বিহারের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, অনেকটা যেভাবে সুরেশ অচলাকে ডিহরিতে নিয়ে গিয়েছিল। বিবাহিত প্রণয়েচ্ছু ভদ্রলোকেরাও তাহলে আত্মীয়বধূকে হরণ করবার মতো সাহস ধরতেন সে সময়ে! সমস্ত ব্যাপারটা একতরফা হলেও, সরলাদেবীর গল্প শেষ হয়েছে আত্মহত্যা, দুর্ঘটনাতে মৃত্যু ও অশ্রুজলের বন্যায়, শরৎচন্দ্রের গল্প শেষ হয়েছে নিরশ্রু এক ভয়ানক ট্র্যাজেডিতে। মনে হয়, নারীমানস তখনও পর্যন্ত এক কিশোরীমানস যার সামনেটা পর্দা ঢাকা, মাঝে মাঝে পর্দা উড়ে বাইরের জগৎ একটু-একটু দেখা দিচ্ছে বটে, কিন্তু একমাত্র সহায় তার পুরুষ, তাই এই পুরুষকে কেন্দ্র করেই তার যত অভিমান, যত অশ্রুজল, যত মৃত্যু।

লীলা মজুমদারের সময় থেকেই বাংলার লেখিকামানস পুরোপুরি সাবালক হয়েছে মনে হয়। ট্রিটমেন্টের যে জটিলতা ছোটগল্পকে শিল্প হিসেবে আমাদের কাছে বিশেষ প্রিয় করে তুলেছে সেই ঋদ্ধতা পাচ্ছি 'মন্দাকিনীর প্রেম'-এ। প্রেমের গল্প তো বটেই, কিন্তু এটি কৌতুকেরও গল্প। প্রেমের আবেগের চেয়ে পরিস্থিতির মৃদু মজাই লেখিকার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে। আশাপূর্ণা দেবীর 'পত্রাবরণ' তো একটি অসামান্য সাবালক গল্প। শিশুর চোখ দিয়ে বাবা-মার মধুর সম্পর্কের রাজৈশ্বর্য দেখিয়েছেন আশাপূর্ণা। লীলা মজুমদার যেমন ভারী ভারী শব্দ দিয়ে কৌতুক ফুটিয়েছেন, আশাপূর্ণা তেমনি ব্যবহার করেছেন শিশুর ভাষ্য। বাণী রায় আমাদের বেশ ভাবান। অতিরিক্ত নৈতিক শুদ্ধতা, পারিবারিক দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ততাকে তিনি দেখেছেন শ্লেষ ও বিদ্রূপের দৃষ্টিতে। এই দৃষ্টিভঙ্গি গল্পটিতে একটি অদ্ভুত কষায় স্বাদ দিয়েছে, কতটা—পাঠক তার বিচার করবেন।

ফর্মের দিক থেকে আরও একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'প্রার্থনা সাঁপুই'। এর আগে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর হাতে আমরা একটি 'কুলির অদৃষ্ট' নিয়ে গল্প পড়েছি, পূর্ণশশী দেবীর সঞ্চয় থেকে পেয়েছি 'যৌবনের মূল্য'—দেহাতি নিম্নবর্গীয় বউ জানকি ধনীপুত্রের লালসার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, স্বামীকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কাজটা সে করেছে সম্পূর্ণ তার কূটবুদ্ধি ব্যবহার করে, সরল স্বামীকে জানতেও দেয়নি তার বিপদের কথা। মহাশ্বেতার প্রার্থনা বা আন্না এমনই নিম্নবর্গীয়, সে কিন্তু তার প্রতি অবিচারের জন্য স্বামীকে খুন করে, তারপর ঘুঘুডাঙায় গিয়ে পরিচয়হীন চালবেচা মেয়েদের মধ্যে মিশে যায়। 'আন্না'দের মুখের ভাষা দিয়েই মহাশ্বেতা পুরো গল্পটি রচনা করেছেন, একেবারে শেষ তিন-চার পংক্তি ছাড়া লেখিকার নিজের ভাষা কোথাও নেই। আশ্চর্য কৌশলে শেষ সিদ্ধান্তের দিকে তিনি নিয়ে গিয়েছেন আন্নাকে। পাঠককে জানতেও দেন নি ঘরের বউ আন্না কী ভাবে দৃঢ়সংকল্প সাহসী আত্মনির্ভর প্রার্থনা সাঁপুই হয়ে উঠেছে।

স্বল্প কয়েকটি গল্প সম্পর্কে যৎসামান্য মন্তব্য করলাম। আশা করবো এতে পাঠকদের মতামতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হল না। অদীক্ষিত পাঠক গল্পের অরণ্যে প্রবেশ করবার

আগে হয়তো সামান্য দীপালোকের প্রয়োজন বোধ করবেন। তাঁদের সে প্রয়োজন একটুও মিটে থাকলে পরিশ্রম সার্থক মনে করবো। তবে সর্বাগ্রে ধন্যবাদ জানাতে হয় 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্থাকে এমন একটি উদ্যোগ নেবার জন্য। এই সংকলন তৈরি করার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করেছেন আমার স্নেহভাজন অরুণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগ সফল হোক—এই প্রার্থনা করি।

৩৪, ৩৫ শৈলেন্দ্র বসু রোড
হাওড়া-৭১১১০৬

বাণী বসু

প্রসঙ্গ কথা

বাংলা ছোটগল্প যাঁর হাতে শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সাধারণভাবে ঠাকুরবাড়ির দান বড় কম ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) এমিল জোলা, আলফাঁস দোদে, আলেকজান্দার দ্যুমা, বালজাক, মোপাসাঁ প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের গল্প একদিকে অনুবাদ করে বাংলার শিক্ষিত সমাজকে শ্রেষ্ঠ ফরাসি গল্পের স্বাদ পাইয়ে দিচ্ছিলেন। অন্যদিকে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), রবীন্দ্রনাথের ন' দিদি, বাংলাদেশের নারীমনকে অবলম্বন করে গল্প লিখতে শুরু করলেন। স্বর্ণকুমারী ছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার সুদীর্ঘকালের সম্পাদিকা। তাঁর একমাত্র ছোটগল্পের সংকলন 'নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্প' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। 'কাহিনী'র অভিনবত্ব ও 'ছোট ছোট' আকারের বৈশিষ্ট্য স্বর্ণকুমারী তাঁর গল্পে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর প্রথম বড় গল্প 'মালতী' প্রকাশ পেয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায়। 'যমুনা', 'কুমার ভীমসিংহ', 'সন্ন্যাসিনী', 'লজ্জাবতী', 'কেন', 'গহনা' ইত্যাদি গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি নারীর অনুভব, চেতনা প্রকাশ করেছেন এবং সমাজ, পরিবার ও জীবনকে দেখার এক নতুন শিল্পকর্ম গঠন করেছেন। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১২৯৮ সংখ্যা থেকে 'গহনা' গল্পটি গৃহীত। 'গহনা'র বিষয়বস্তু আজকের পাঠকের কাছে তেমন আকর্ষণীয় না হতে পারে তবু এর শিল্পগুণকে অস্বীকার করা যায় না। বিলেতফেরত ছেলের সঙ্গে ভাবিনী নামক এক কন্যার বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা—এমনকি বিলেত থেকে ছেলে বিয়ে করে এসেছে—এই নির্মম সংবাদ শুনে ভাবিনীর বিষণ্ণ বদনে চলে যাওয়ায় এক অদ্ভুত করুণ রস পরিবেশিত হয়। দুগাছি বালা হাতে নিয়ে প্রতীক্ষারত মা ভাবিনীকে খুঁজতে থাকে। এই অন্বেষণই গল্পের মূল সম্পদ।

স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা দেবী সহোদরা হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে বেশ কিছুকাল 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। অসুস্থতার কারণে স্বর্ণকুমারী 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে অবসর নেবার পর দুই কন্যাই এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পত্রিকা চালাতে থাকেন। সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫) কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন, সুর সংযোজনা করেছেন। তাঁর একটিমাত্র গল্প সংকলন 'নববর্ষের স্বপ্ন'। প্রকাশকাল ১৩২৫ বঙ্গাব্দ। সরলা দেবীর গল্প রহস্যময়তায় ভরা। টানটান উত্তেজনায় ভরপুর। নারীচিত্তের সহজ সারল্যে, স্পর্শময়তায় তাঁর শিল্পীসত্তা জেগে ওঠে। 'বাঁশী' গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। জীবনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা—নিষিদ্ধ সম্পর্কের বেড়া ভেঙে সুহাসিনীকে নিয়ে এগিয়ে চলার মধ্যে প্রস্ফুটিত। প্রভাষ ও শান্তির একাকিত্ব, ভাই বোনের জীবনের চরম পরিণতি বাঁশীর ধ্বনিতে বেজে বেজে ওঠে। 'বাঁশী' গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩০ সংখ্যা থেকে গৃহীত।

'ট্রিবিউন', 'প্রভাত' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বোন সরোজকুমারী দেবী সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও গল্প লেখায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'কাহিনী

বা ক্ষুদ্র গল্প', 'ফুলদানি' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'পূজার ছুটি' গল্পটি প্রবাসী পত্রিকার চৈত্র ১৩২১ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

'ভারতী' পত্রিকাগোষ্ঠীর গল্প লেখিকাদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী ও অনুরূপা দেবী—দুই সহোদরা বিশেষ স্মরণীয়। এঁরা ছিলেন সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী। জীবনের মূল আদর্শ ও বিশ্বাসের শিক্ষা তাঁরা পেয়েছিলেন পিতার পরিবার থেকে। অনুরূপা দেবী লিখেছিলেন, "নারী যেখানে নিজের মহত্ত্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেখানে সকল দেশের পুরুষই তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে; বিশেষ করে প্রাচীন ভারত নারীকে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি সম্মান দিয়েছিল, তার বহু প্রমাণ আছে।... নারীকে পুরুষই বড় করেছে তার যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে, পুরুষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে হিংসা বিদ্বেষ বাড়িয়ে নারী কোনদিন বড় হতে পারবে না; নিজের চরিত্রের মহত্ত্বে তাকে বড়ো হতে হবে; যোগ্যতার পরিচয় দিয়েই তাকে স্বাধিকার লাভ করতে হবে।"—এই আদর্শের শিক্ষা ইন্দিরা ও অনুরূপা দুই বোনই গ্রহণ করেছিলেন। ইন্দিরা দেবীর 'ফুলের তোড়া' গল্পটি 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩২২ সংখ্যা থেকে গৃহীত। অনুরূপা দেবীর 'অযাচিত' গল্পটি অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী থেকে গৃহীত। ইন্দিরা দেবী অধিকাংশ গল্পেই নারী প্রত্যয়ের স্বাভাবিক আবেগকে কবির আবেগে পরিবেশন করে সংক্ষিপ্ত অথচ অখণ্ডতার পরিবেশ রচনা করেছেন। "নারী-শিল্পীর গড়া মমতা-স্নিগ্ধ ছোট ছোট মাটির পুতুলের মত ইন্দিরা দেবীর কারু-পারিপাট্যহীন সহজ কথার বর্ণনাময় গল্পগুলি তাঁর গৃহিণীচিত্তের স্পর্শে ছোট ছোট আকারের অখণ্ড গল্পের রস-রূপ ধরে উঠেছে।" বলেছেন ভূদেব চৌধুরী। শুধু তাই নয়, অনুরূপার গল্প প্রসঙ্গে তাঁর মত—"সাসপেন্সকে যথোচিত রূপে বজায় রেখে, তার রস নিষ্কাসনের আর্ট-বর্ণনাশৈলীর সংযম এবং সুমিতি সাপেক্ষ।" তাঁর শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ছিল বর্ণনা। বর্ণনা গুণ তিনি খুব ভাল রপ্ত করেছিলেন।

নিরুপমা দেবীর শিল্প-প্রতিভা বিকাশের ইতিহাস শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর সাহিত্য সভার সঙ্গে জড়িত। নিরুপমার আসল নাম ছিল অনুপমা। তাঁর প্রথম জীবনের কিছু কিছু রচনা এই নামে প্রকাশিত হয়। পরে লেখিকা নতুন ছদ্মনাম 'নিরুপমা' গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় অতিশয় স্ফীতি নেই। আছে বর্ণন-পারিপাট্য। হিন্দুশাস্ত্রে লেখিকার নিগূঢ় অধিকার ছিল। ফলে তাঁর ছোটগল্পে গীতার শ্লোক, সংস্কৃত মন্ত্র কিংবা সুভাষিত কখনও কখনও যুক্ত হয়। তাঁর রচিত 'আলেয়া' গল্পটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার আশ্বিন ১৩২১ সংখ্যা থেকে গৃহীত। ইন্দিরা-অনুরূপা-নিরুপমা দেবীর গল্প অত্যন্ত পারিবারিক ও ভাবাবেগ সম্পন্ন।

পূর্ণশশী দেবী, গিরিবালা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী—এঁরা তিনজনেই তিন রকমের গল্প রচয়িত্রী। পূর্ণশশী দেবীর 'যৌবনের মূল্য' গল্পটি 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যা থেকে, গিরিবালা দেবীর 'জাগরণ' গল্পটি 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩২৭ সংখ্যা থেকে এবং জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'বিবাহ' গল্পটি 'প্রবাসী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩২৩ সংখ্যা থেকে সংকলিত। এঁদের গল্পে স্পষ্ট হয়েছে নারীত্বের ব্যথা, দুঃখ, যন্ত্রণা, হাহাকার। পরিবর্তনশীল সমাজ রক্ষণশীল নারীমনকে কীভাবে আঘাত দিচ্ছে তার বিচিত্র ছবি এঁদের গল্পে ছড়িয়ে আছে।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার বিশিষ্ট সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্যা দুই কন্যা শান্তা দেবী ও সীতা দেবী। 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠাতেই এঁদের বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। এঁদের গল্প উপন্যাসে নারীসমাজে আধুনিক মনোবৃত্তির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। নারীমনের গোপন কক্ষে প্রবেশাধিকার লাভের ক্ষমতা তাঁদের ছিল। চিঠির অবয়বে

গাঁথা শান্তা দেবীর 'সুনন্দা' গল্পটি 'প্রবাসী' পত্রিকার ভাদ্র ১৩২৪ সংখ্যা থেকে গৃহীত। এই গল্প যেন শিল্পীর তুলির টান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাব্যিক। সীতা দেবীর 'চোখের আলো' গল্পটি সব দিয়ে সব হারিয়ে বসে থাকার অথবা অনেক হারিয়ে অনেক কিছু পাওয়ার গল্প। এই প্রাপ্তির আনন্দ-সুখ-দুঃখ-বেদনার অন্তর্নিহিত রহস্য এখানে উদ্ভাসিত। গল্পটি নেওয়া হয়েছে 'প্রবাসী' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩২৪ সংখ্যা থেকে।

শৈলবালা ঘোষ জায়া 'প্রবাসী' গল্প প্রতিযোগিতায় ১৩২২ বঙ্গাব্দে পুরস্কৃত লেখিকা। তাঁর গল্পে রয়ে গেছে এক পুরুষালি মেজাজ। বৈপ্লবিক দুঃসাহস। এবং সহৃদয় মানবিকতা। তাঁর রচিত 'লাফো' গল্পটি 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার চৈত্র ১৩২২ সংখ্যা থেকে সংকলিত।

রাধারাণী দেবী যিনি অপরাজিতা দেবী নামেও পরিচিত, তাঁর 'মূক সাথী' গল্পটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কার্তিক ১৩৬৫ সংখ্যা থেকে মুদ্রিত। মানুষ ও পশুর মধ্যেও যে অবাধ ভালবাসা গড়ে উঠতে পারে, এই গল্পটি তার অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'কুলির অদৃষ্ট' 'পঞ্চ পুষ্প' পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩৫ সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে। তাঁর গল্পটি কাজী নজরুল ইসলামের 'কুলিমজুর' কবিতাকে স্মরণ করায়। প্রভাবতী দেবীর রচনায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের রূঢ়তা এবং লাঞ্ছনাই অত্যন্ত আবেগে ধরা পড়ে।

পরবর্তী সময়ের লেখিকাদের গল্প সম্পর্কে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত। সুনামী। তাঁদের গল্পে সময় প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ। সময় বয়ে যাচ্ছে। যুগ বদলে যাচ্ছে দ্রুত। পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। হাসি-কান্না, প্রেম-প্রেমহীনতা, হা-হা মরুভূমির মত শূন্য জীবন, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা তাঁদের গল্পে ধরা দিয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। বিভিন্ন সময়ের নানা গল্প, বিশেষত লেখিকাদের গল্প'র ধারা এখানে ঐতিহাসিক দলিল হয়ে রইল।

পুরনো পত্রপত্রিকা দেখতে দিয়ে ও গল্প 'কপি' করতে দিয়ে চন্দননগর পুস্তকাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী দিলা চট্টোপাধ্যায় অশেষ উপকার করেছেন। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে গ্রন্থাগারের দুই কর্মী অনুপমা পাল ও হোম বাহাদুরের কথা। তাঁদের ধন্যবাদ।

একশো বছরের পুরনো গল্প এবং বর্তমানের গল্প—উভয় ক্ষেত্রেই বানান পরিবর্তন করা হয়নি। পত্রিকায় প্রকাশের সময় যে বানান ব্যবহৃত হয়েছিল, সেই বানান-ই হুবহু রাখা হয়েছে। এমনকি আগেকার লেখিকারা নামের পূর্বে 'শ্রী' ব্যবহার করতেন, তা-ও হুবহু মুদ্রিত হয়েছে।

শেষে বলতে হয়, শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীমণীশ চক্রবর্তীর কথা। যাঁদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ এই গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা থেকেই জড়িয়ে আছে। আর বাণী বসুর পরামর্শ প্রতি ক্ষেত্রেই চলার পথে সাহায্য করেছে।

'সেরা' বা 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটি নিয়ে সব সময়েই বিতর্কের অবকাশ থাকে। অনেক সময়ে লেখকের বা লেখিকার বাছাই 'সেরা'য় পাঠকের মন ভরে না। সমালোচকের নির্বাচনও স্রষ্টার পছন্দ না হতে পারে। তবে এই সংকলনের গল্পগুলি নির্বাচনের সময় আমরা একটা দিকে লক্ষ্য রেখেছি, যে গল্প আগের এক বা একাধিক সংকলনে স্থান পেয়েছে আমরা সেগুলি না নিয়ে অন্য বহু আলোচিত গল্পকে বেছে নিয়েছি। কিন্তু সময়ের ধারা যেখানে বহমান, সেখানে ইতিহাসকে তো অস্বীকার করা যায় না!

চন্দননগর, হুগলি অরুণ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সেরা লেখিকাদের সেরা গল্প

গহনা ।। শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী

বিহারীলাল সেন বংশে সম্ভ্রান্ত, স্বভাবে গর্ব্বিত, কিন্তু অবস্থার দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে ব্যবসায় ধরিতে হইয়াছে কেরাণীগিরি অর্থাৎ খোসামুদি। এজন্য হাড়ে হাড়ে তিনি যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন; এবং ভবিষ্যতে তাঁহার একমাত্র পুত্রের যাহাতে এরূপ দুর্দ্দশা না ভোগ করিতে হয়, যাহাতে সে মানুষের মত মানুষ হইতে পারে, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গের সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা দিতে তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন। টাকা কড়ি যাহা কিছু জমাইয়াছিলেন, এই দায়ে সকলি নিঃশেষ হইয়াছে, অথচ এখনো পুত্রকে আরো হাজার টাকা না পাঠাইলে নয়; তাহার পর সে পাশ হয় ত সকল কষ্টের সার্থক, নহিলে ভগবান যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন! বিহারী বাবু কর্জ্জের আশায় কদিন ধরিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের বাড়ী হাঁটিতেছেন, ৫০০শ টাকা কোন রকমে জুটিয়াছে, আর ৫০০ কোথায় পান? পৈতৃক সম্পত্তি বসতবাড়ী তাহা পূর্ব্বেই বাঁধা পড়িয়াছে, গহনাপত্র যাহা ছিল তাহাও সব গিয়াছে, এ অবস্থায় ৫০০শ পাইয়াছেন এই ঢের, আর ৫০০শ এখন মেলে কি করিয়া? বিহারী বাবু নিরাশ হইয়া রাত্রি নয়টার সময় বাড়ী ফিরিয়াছেন, গৃহিণী বলিলেন—"ওগো হেমার জ্বর ত কই সারছে না; একবার ডাক্তার ডাকাও।"

কর্ত্তা বলিলেন—"একোনাইট দিয়েছিলে, সামান্য জ্বরে আর ডাক্তার ডেকে কি হবে? আরো দু চার দিন দেখা যাক।"

আসল কথা ডাক্তারের পয়সার অনটন; কিন্তু স্ত্রীর সাক্ষাতেও সে দুঃখের কথা ফুটিয়া বলিতে জিহ্বা সরে না। স্ত্রী মনে মনে ইহা বুঝিলেন—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একটু পরে বলিলেন—মাণিকের চিঠি পেয়েছি, ৫০০শ টাকা পাঠিয়েছে।" এই বলিয়া কাপড়ের খুঁট হইতে চিঠিখানি খুলিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন। বিহারী বাবু পড়িলেন।—

"বহব প্রণামা নিবেদনঞ্চ—

দিদি—বড় বয়সে দেখিতেছি তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। যদি টাকারি সঙ্গতি নাই, পরের ভিক্ষার উপর নির্ভর, তাহা হইলে ছেলেকে যে বিলাত পাঠান কেন তাহাত বুঝিতে পারি না! আমার নিজের স্ত্রী পুত্র আছে, নানারকম খরচপত্র আছে, তার উপর তোমাদের খরচও চালান আমার সাধ্য নহে, আমি বলিয়া খালাস। তবে সেন মহাশয় আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন—তাঁহার ঋণ আমার পরিশোধ করিতে হয়। এই সঙ্গে সেই জন্য ৫০০শ টাকা পাঠাইয়া দিতেছি। ইহার বেশি পাঠাইতে আমি বাধ্যও নহি, আমার ক্ষমতাও নাই, পারিবও না। অতএব আমাকে আর রোজ রোজ টাকার জন্য লিখিয়া বিরক্ত করিও না।

সেবক শ্রীমাণিকলাল দাস।"

মানিক গৃহিণীর ছোট ভাই, বিহারী বাবু তাহাকে সন্তানের ন্যায় নিজগৃহে লালন পালন করিয়াছেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, বিবাহ দিয়াছেন, এখন বৎসর কয়েক মাত্র সে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া কর্ম্মস্থলে গিয়াছে। বিহারী বাবুর এই কষ্টের অবস্থায়

আপনা হইতে সে সাহায্যের নামও করে নাই, তাঁহারাও ইহার আগে আর তাহাকে কিছু বলেন নাই। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া এবার গৃহিণী ভ্রাতার নিকট ১০০০ টাকা কর্জ্জ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

চিঠি পড়িয়া বিহারী বাবুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মর্ম্মে মর্ম্মে অপমানিত জ্ঞান করিলেন। এ কেবল তাঁহার অপমান নহে—তাঁহার স্ত্রীর অপমান, তাঁহাদের আজীবন স্নেহের অপমান। বিহারী বাবুর গর্ব্বের অনেক খর্ব্ব হইয়াছে, তিনি ঢের সহিয়াছেন, এখনো সহিতে প্রস্তুত, কিন্তু আত্মীয়তার স্থলে, ভালবাসার স্থলে এরূপ অবজ্ঞা, এরূপ অপমান এখনো তিনি অবাধে গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন "টাকা ফিরাইয়া দাও, আমি চাহি না।" গৃহিণী বলিলেন,—'সেও কি হয়? ছেলেকে এতদিন টাকা পাঠিয়ে আর একটুর জন্য সব মাটি করবে; না হয় দুট কথা বলেছে, অসময় হলে সব সইতে হয়। এ মেলে ত টাকা পাঠাতেই হবে।"

বিহারী বাবু বলিলেন, কথাটা ঠিক, এ অপমানও তাঁহার সহিয়া চলিতে হইবে, তিনি নিরুপায়। তিনি নীরবে এই বিষবড়ির উপাদেয়তা অনুভব করিতেলাগিলেন। গৃহিণী বলিলেন "যদি ভগবানের ইচ্ছায় পাশ হয় ত সকল দুঃখ ঘুচবে; দুদিন সয়ে যাও।"

বিহারী বাবুর নৈরাশ্যাভিভূত হৃদয় এই সুখের দিনের দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিল, কিন্তু অন্ধকার ছাড়া চারিদিকে আর কিছুই দেখিতে পাইল না। তথাপি মাতার আশীর্ব্বাদই ফলিল, অল্পদিনের মধ্যেই খবর আসিল, নলিন সিভিল সার্ভিসে পাশ হইয়াছে। সে দিন এ বাড়ীতে কি মহানন্দ! খবর পাইয়া বিহারী বাবু স্ফীত হৃদয়ে ধরাখানাকে সরার মত জ্ঞান করিতে করিতে আফিসে চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী সে পরমানন্দ নিজের মধ্যে রাখিবার স্থান না পাইয়া হাতা বেড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া তাঁহার পীড়িতা কন্যার নিকট আগমন করিলেন। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা হেমপ্রভা জ্বরের ঘোরে অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় শয্যালগ্ন হইয়াছিল, মা আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া নাড়িয়া বলিলেন,—"হেমা, হেমা তোর দাদা পাশ হয়েছে"। হেমা চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া বিস্ময় দৃষ্টিতে মাতার দিকে চাহিল; মা আবার বলিলেন,—"তেমার দাদা পাশ হয়েছে।" হেমপ্রভার মলিন বিবর্ণ মুখও এই কথায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে ক্ষীণ ক্লান্ত স্বরে বলিল,—"দাদা কবে আসবে"? মা বলিলেন,—"শিগ্‌গির"। হেমপ্রভা বলিল,—"আমিত দেখতে পাব?" আনন্দ-আগ্রহে গৃহিণী এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে হেমার অসুখ, এই কথায় আত্মস্থ হইয়া সোৎকণ্ঠস্বরে বলিলেন "বালাই, ও কি কথা; দেখতে পাবি বইকি।"

কিন্তু এবার মাতার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইল; হেমার সহিত তাহার দাদার দেখা হইল না। এ বাড়ীর নূতন সুসংবাদ পুরাতন না হইতে হইতে হেমার ক্ষুদ্র প্রাণ অবসিত হইল। পিতা মাতা আনন্দে নিরানন্দ হইয়া পড়িলেন।

গৃহিণী শোকে মুহ্যমান। বিধাতা তাঁহাকে দুইটি সন্তান দিয়াছিলেন, একটিকে আবার নিজের কাছে ডাকিয়া লইলেন, একটি মাত্র অবশিষ্ট। কন্যার শোকে বিহ্বল হইয়া পুত্রের পথের দিকে চাহিয়াই তিনি প্রাণ ধরিয়া আছেন; পুত্রই এখন তাঁহার ধ্যান জ্ঞান। নলিন কবে আসিবে, তাহার বিবাহ দিবেন, বৌ হইবে, নাতিপুতি হইবে, তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দের মধ্যে তিনি মরিতে পারিবেন, কন্যার শোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই সকল কথাই কহেন, ইহাই তাঁহার সান্ত্বনা বাক্য। একদিন ভাবিনীর মা ভাবিনীকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিল, ভাবিনী হেমপ্রভারই সমবয়সী, প্রায়ই তাহার সহিত খেলিতে আসিত। তাহাকে দেখিয়া গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন; মাতা কন্যা সজলনেত্রে যখন তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল, তিনি ভাবিনীকে কাছে টানিয়া বলিলেন,—"মাগো কাকে দেখতে এলি বাছা, সে যে আমাদের ফেলে পালিয়েছে"।

ভাবিনী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী সজলনেত্রে, সতৃষ্ণ আগ্রহে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিলেন,—"মা আমার, তুই আমার বুকে আয়, তোকে বুকে করে আমার প্রাণ জুড়োক। তুই আমার মেয়ে, আমার নলিনের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।"

গৃহিণী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুনঃ পুনঃ তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

যদিও অনেক দিন হইতে ভাবিনী ও নলিনীর মাতা পরস্পরকে বেয়ান বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এতদিন তাহা কেবল রঙ্গের সম্বোধন বা পাতান সম্পর্ক বলিয়াই গণ্য হইত। পুত্র কন্যার বিবাহের কথা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার পূর্ব্বে কেহই পাড়েন নাই। ভাবিনীর পিতামাতা নানা স্থানে পাত্র দেখিতেছিলেন, তবে এ পর্যন্ত একটিও মনের মত পান নাই, তাই ভাবিনী এখনও অবিবাহিতা রহিয়াছে। তাঁহারা কিছু ধনী নহেন, ইহার উপর এক বিলাত-ফেরত আত্মীয়কে দলে লইয়াছেন—এই জন্য তাঁহাদের পক্ষে সুপাত্র মেলা একটু কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং বিহারী বাবুর স্ত্রী যখন নিজে হইতে ভাবিনীকে পুত্রবধূ করিতে চাহিলেন তখন তাহার পিতামাতা সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন;—অমন সিবিলিয়ান জামাতা লাভ করা ত সৌভাগ্যের কথা।

বিবাহের পাকাপাকি সম্বন্ধ স্থির হইবার আগে বিহারী বাবু কেবল কুণ্ঠিতচিত্ত হইয়া একবাব গৃহিণীকে বলিলেন, "ছেলে আসিয়া যদি বলে বিবাহ করিবে না? আমি বলি সে আসা পর্যন্ত সবুর করা যাক্!" গৃহিণী একথা একবারেই অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন, তাঁহার অমন সোনার ছেলে সে নাকি কথার অবশ হয়! আর সবুর করিতে গেলে ওরা মেয়ে রাখিবে কেন? অমন সুন্দর মেয়ের ত আর বরের ভাবনা নাই, লাভে হতে শেষে অমন মেয়ে তাঁহাদেরি হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

যেমন হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে কর্ত্তাদেরই শেষে হার মানিতে হয়। বিশেষ এই শোকের সময় গৃহিণীর কথা অমান্য করিয়া তাঁহার ব্যথিত চিত্তে ব্যথা দিবার পরিবর্ত্তে নিজের আপত্তিটি অযুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া ত্যাগ করাই তিনি যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন। ভাবিনী বাক্‌দত্তা হইয়া রহিল, কেবল তাহাই নহে, বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই সে তাঁহাদের নিতান্ত আপনার হইয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী ভাবিনী ও তাহার মাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহারা আসিলে ভাবিনীকে আর দুই চারি দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরিতে দেন না। যে কয়দিন সে কাছে থাকে তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, তাহাকে আদর করিয়া পুত্রের বিরহ, কন্যার শোক ভুলিয়া থাকেন। আর সে কাছে না থাকিলে তাহার জন্য জিনিস পত্র কিনিয়া তাহাকে লইয়া সাধ আহ্লাদ করিবার আয়োজন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। চুড়িওয়ালা, খেলানাওয়ালা, তাঁতিনী ইহারা তাঁহার বাড়ী আসিয়া কেহ আর শূন্য-হস্তে ফেরে না। কোন একটী ভাল জিনিস দেখিলেই বউয়ের জন্য তিনি কিনিতে চান, কিনিতে না পারিলেই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। কাহারও কোনরূপ নূতন সাজ বা নূতন গহনা কি নূতন রকম সাড়ী জামা দেখিলে তখনি গৃহিণীর মনে হয় বৌমা এইরূপ সাজিলে তাহাকে কেমন মানাইত! নিত্য নতুন ফরমাস যোগাইয়া কর্ত্তা ত আর পারিয়া উঠেন না। কাজেই অন্য পাঁচ জনকেও গৃহিণীর ফরমাসের ভার বহিতে হয়।

একদিন নবীনের মা মেয়েকে সঙ্গে লইয়া গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ছিলেন, গৃহিণী বলিলেন, "ঠাকুরঝি, তোকে ভাই মেয়ে নিয়ে পরশু একবার আস্‌তেই হবে! পরশু ভাবিনী আসবে, তোর মেয়ে যেমন জাল দিয়ে চুল বেঁধেছে, অমনি করে তার চুল বেঁধে দিবি। বুঝলিনে ছেলে বিলেত থেকে আস্‌বে—আমাদের পুরোনো সাজ গোজ তো চলবে না, নূতন রকম শিখে রাখি, এলে তো বেঁধে দিতে হবে।"

ছেলের জন্যে তো পরে হইবে, আমরা বুঝি আপাততঃ গৃহিণীর নিজের পরিতৃপ্তির জন্যই ভাবিনীর এইরূপ নিত্য নূতন সাজের আবশ্যক।

নবীনের মা বলিলেন, "তা আসব এখন, তার আর কি?"

গৃহিণী বলিলেন, "একটা ঐ রকম জাল নিয়ে আসিস, বুঝলি ভুলিসনে! যাবার সময় অমনি দামটা দিয়ে দেব।"

ভাবিনী বাড়ী না থাকিলে পানে ছোট এলাচ বাদাম পড়ে না, বাড়ীতে রুই মাছের মুড়ো কি টাট্‌কা ইলিস মাছ আসে না। যদিবা দাসী তাঁহার কথা অমান্য করিয়া বাড়ীতে ভাল মাছ আনিয়া ফেলে তো অমনি তাড়াতাড়ি তাহাকে তখনি ভাবিনীদের বাড়ী দৌড়িতে হয়। "ওগো মা ঠাকরুণ, একবার আজ বৌমাকে না পাঠালে চল্‌বে না। মা রেঁদে বেড়ে বসে আছে, তাকে খাইয়ে তবে খাবে গো।" এ কথায় ভাবিনীর মা'ই বা কোন প্রাণে মেয়েকে না পাঠাইয়া থাকেন।

যত্নের বশ সকলেই—ভাবিনীও এখানে থাকিতে ভালবাসে—কেবল তাহাই নহে, সে জানে ইহাই তাহার আপনার ঘর। বউ না হইতেই গৃহিণী তাহাকে যেমন বউ ভাবেন, সেও তেমনি তাঁহাকে শাশুড়ি ভাবে। সে কিছু নিতান্ত অল্প-বয়স্কা নহে, তাহার বয়স এখন ১৩ বৎসর, তাহার সমবয়সী সখিদের সকলেরি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহারা তাহার নিকট যখন স্বামীর গল্প করে, আপনাপন ভালবাসার কথা জানায়, ভাবিনী তখন নলিনকে স্মরণ করে। উপন্যাসে যখন সে নায়ক নায়িকার কথা পড়ে, তখন তাহার মনে হয় সে যেন নিজের জীবনের কথাই পড়িতেছে। বইখানি শেষ হইলে সে পুরাতন কথা ভাবিতে থাকে। ছেলে বেলায় তাহার যখন নলিনের সহিত দেখা হইত, তখন নলিন তাহার সহিত কিরূপ সস্নেহ বাক্যালাপ করিত, কিরূপ যত্নে তাহাকে ছবি দেখাইত, একদিন একটি গোলাপ ফুল আনিয়া কেমন যত্নে তাহার খোঁপায় পরাইয়া দিয়াছিল, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আসিতে রাস্তায় যে সমারোহ হয়, তাহা দেখিতে যেদিন ভাবিনী নলিনদের বাড়ী আসিয়াছিল, সেদিন কিরূপ আগ্রহে নলিন তাহাকে সেই সমারোহ দেখাইয়াছিল, এই সব কথা মনে করে আর একটী অপরূপ আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে আধো বাধো করিয়া অতি সসঙ্কোচে আর একটী কথা তাহার এই মনে আসে যে সেই নলিনদা তাহার স্বামী। একথা মনে করিতে নিজে নিজেই সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। সে ভাবে তিনি যখন আসিবেন আমি কি করিয়া তাঁহার কাছে যাইব। আর যদি তিনি আগেকার মত আমাকে আদর করেন? ছিঃ সে আমার বড় লজ্জা করিবে।"

আপনার লজ্জায় সে আপনি মুখ ঢাকে অথচ অতি আগ্রহে নলিনের আসিবার দিন গণনা করে।

গণনা শেষ হইল, নলিনের পরীক্ষা শেষে দুই বৎসর কাটিল। নলিন আজ গৃহে ফিরিবে, বিহারী বাবু তাঁহাকে জাহাজ হইতে আনিতে গিয়াছেন। গৃহিণী ভাবিনীর সাজ সজ্জা করিয়া দিয়া রান্নাঘরে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে গিয়াছেন, আর ভাবিনী একখানি আয়নার সম্মুখে ঘাড়টি বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া চুল বাঁধা কেমন হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে কি ভাবিয়া কে জানে মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছে, আর মাঝে মাঝে যেন পায়ের শব্দ শুনিয়া তাহার বুকের মধ্যে গুরগুর করিয়া উঠিতেছে। সে সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে। একবার সে চমকিয়া উঠিয়া ত্রস্তে আয়নার পশ্চাতে জানালার ধারে সরিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া দেখিল তাহার ভয় বৃথা, কেহ কোথাও নাই। তখন নিশ্চিন্ত ভাবে জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল, জানালার সম্মুখেই মিত্রদের মাঠ, মাঠের গাছগুলি বৈকালিক সূর্য্য-কিরণে ঝক ঝক করিতেছিল, অল্প অল্প বাতাস বহিয়া ঘাস দুলিতেছিল, গাছে পাতা

দুলিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল এমন সুন্দর মধুর দৃশ্য যেন আর কখনো সে দেখে নাই, রবি কিরণের মধ্যে আজ যেন কেবল পুলক কম্পনই চলিতেছে। বায়ু যেন কেবল আনন্দেরি হিল্লোল। সহসা তাহার দাদা রমাপ্রসাদ ডাকিল, "ভাবিনি, এখানে কি করছিস? তোকে সবাই ডাকছেন, নলিন এসেছে আয়।" বালিকার ওষ্ঠাধরে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম শোভিত হইল, সে নড়িল না। রমাপ্রসাদ নিকটে আসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল, ভাবিনী লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার সাজগোজ দেখিয়া যে দাদা হাসিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। রমাপ্রসাদ হাসিয়া সলজ্জা ভগিনীর হাত ধরিয়া মজলিস গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই গৃহিণী বলিলেন, "চিনতে পারিস, নলিন? ছোট্টটি দেখে গিয়েছিলি এখন দেখ কত বড় হয়ে উঠেছে।" নলিন তাহার দিকে চাহিয়া সসঙ্কোচে বলিল, "কে?"

রমাপ্রসাদ বলিল, "চিনতে পার না? ভাবিনী!"

তখন নলিন অসঙ্কোচে নিকটে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "Hallo! এত বড় হয়েছে! How do you do, my pretty lass?

ভাবিনীর যে ইংরাজী বিদ্যা বেশি ছিল তাহা নহে। নলিনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হওয়া অবধি তাহার যদিও ইংরাজী শিখিতে চাড়ের অভাব ছিল না কিন্তু শেখায় কে? দাদাকে অনেক ধরা পাকড়া করিয়াও তাহাকে দিয়া ফার্ষ্টবুকের অর্দ্ধেকও এখনো ভাবিনী শেষ করিয়া লইতে পারে নাই। ইহা সত্ত্বেও সে নলিনের কথার অর্থ একরূপ বুঝিয়া লইল। How do you do চলিত কথা—pretty কথার অর্থও সে জানে, কিন্তু lass কথাটা সে ঠিক ধরিতে না পারিয়া ভাবিল নলিন pretty ass বলিয়াছেন। ভাবিনী ইংরাজী জানে না বলিয়াই যে এই উপহাস তাহা সে বুঝিল; বুঝিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেল এবং ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া দাদার উপরই তাহার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। তিনি যদি ইংরাজী শিখাইতেন তবে ত সে এত দিনে ইংরাজীতে পণ্ডিত হইতে পারিত! লজ্জায় সঙ্কোচে ভাবিনীর মুখে একটি অপরূপ সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিল। গৃহিণী বলিলেন, "বাছা, এমন সুন্দর মেয়ে বিলেতে দেখেছিস? বিয়ে করে তবে কাজের জায়গায় যাবি।"

ছেলে একটু হাসিয়া আস্তে আস্তে দুই একবার কাশিল। গৃহিণী বলিলেন, "বিয়ের সবি ঠিক, কেবল দিন স্থির করে নেমন্তন্ন করে পাঠালেই হয়, আমি বলি এই রবিবারেই গায়ে হলুদ হোক।" গৃহিণী যে প্রকৃত প্রস্তাবে এ কথা বলিতেছেন প্রথমবার নলিন তাহা বুঝে নাই। এবার বুঝিয়া সহসা কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িল। বিহারী বাবু ছেলের সঙ্কোচ বুঝিয়া বলিলেন, "তা এত তাড়াতাড়ি নাই হোল।" গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "তা বৈকি, সে হবে না। দেখ, বাবা, বিয়ে করেই কিন্তু নিয়ে যেতে পাবিনে। ছেলে পিলে হোক, তারা আমার কাছে থাকবে, তুই তখন বৌ নিয়ে যাস। তবে বাছা রবিবারেই গায়ে হলুদ হোক—কি বলিস?"

নলিন কোন কথা কহিল না, কি যেন বলিতে গিয়া শুষ্ক কণ্ঠে দুই একবার কাশিল মাত্র। গৃহিণী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে এই রবিবারেই গায়ে হলুদের সব আয়োজন করে ফেল।"

নলিন সহসা অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে কহিল, "না, মা কিন্তু—কিন্তু—এখন থাক!" নলিনের এই সঙ্কোচ দেখিয়া রমাপ্রসাদ উপহাসচ্ছলে বলিল, "এত না, এত কিন্তু, এত সঙ্কোচ কিসের, একটা বিয়ে করে এসেছ না কি নলিন দা!" নলিনের বিবর্ণ মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। গৃহিণী বলিলেন, "ও কি ঠাট্টা, বাছা, অমন কথা বলতে নেই! দেখ বাবা এবার তুই এলি এবার আমার গহনা পত্র তো সব খালাস হবে, পুরোণ সাটের গহনা তাহোলে আর বৌমার জন্যে কিছুই গড়াতে হবে না। তবে আজ কাল নতুন ফেসানের অনেক রকম গহনা হয়েছে, বাপেরা শুনচি তা সব দেবে। তবু আমারও তো দু'এক খানা তা না দিলে ভাল দেখায় না, আমি

তাই কাদির মার কাছে দুশো টাকা ধার করে পালন পাতার দু গাছা বালা গড়িয়ে রেখেছি। দিব্যি হয়েছে; আনচি তুই একবার দেখ!" গৃহিণী হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে গহনা আনিতে গেলেন, কিন্তু পুত্রের ভাব গতিক দেখিয়া বিহারী বাবু কিছু দমিয়া বলিলেন, "এখন তোমার কি বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই?"

নলিন দুই একবার কাশিয়া দুই একবার এদিক ওদিক চাহিয়া আধো বাধো করিয়া আস্তে আস্তে বলিল "না"।

রমাপ্রসাদ তখন হাসিয়া আবার আস্তে আস্তে বলিল, "নলিনদা সত্যই বিয়ে করে এসেছ নাকি?"

নলিন তাহার গা টিপিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "For Heaven's sake এখন থাম।" বিহারী বাবু একটু তফাতে কৌচে বসিয়াছিলেন সে কথা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু রমাপ্রসাদ যখন এই কথার উত্তরে না থামিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "তবে সত্য বিয়ে করেছ? কোথায়? কার সঙ্গে? ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে নাকি?"—তখন সহসা বিহারী বাবুর হৃৎপিণ্ডে রক্ত উছলিয়া উঠিল। তিনি নির্ব্বাক কম্পিত হৃদয়ে উত্তর অপেক্ষায় পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, স্তম্ভিত নীরব নলিনীমোহন কি করিতেছে না বুঝিয়া কলের পুত্তলির মত সহসা ঘাড় নাড়িল। বিহারী বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে দুই হস্তের উপর ঘূর্ণমান মস্তক রক্ষা করিলেন। আনন্দ গৃহ মুহূর্ত্তের মধ্যে শোক নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইল। গৃহিণী এই সময়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া সহাস্য মুখে আনন্দ-উথলিতচিত্তে বালা দুই গাছি ছেলের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি বাছা পছন্দ হয়? তুই আমার বৌয়ের হাতে পরিয়ে দে" বলিয়া ভাবিনীর উদ্দেশে চারিদিকে চাহিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

বাঁশী।। শ্রী সরলা দেবী

"ঠাকুরজামাই আমরা কোথায় যাচ্ছি? এ কি আমাদের গ্রামের পথ? না! এ যে রাজমহলের রাস্তা, ঐ সব পাহাড়, রাস্তার এক পাশে খদ,—এতদূরে কেন এসে পড়লুম?"

জীবন চুপ করিয়া রহিল। সুহাসিনী কুতূহলী নেত্রে মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, সেখানে গাঢ়বর্ণে কি লেখা লিখিত দেখিল, একটা ভয় ও সন্দেহে তাহার হৃদয় অকস্মাৎ আচ্ছন্ন হইল। ফাঁদে পড়া হরিণীর ন্যায় ত্রস্ত চঞ্চল লোচনে, কাতরস্বরে বলিল, "আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ জীবন, বাড়ী কোথা?"

জীবন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ওর তলায় গাড়ী থাম্‌বে, ঐ পাহাড়ের উপর যে ছোট্ট বাড়ীটি রয়েছে ঐ আমাদের বাড়ী।"

সুহাসিনী বিস্মিত হইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, "সে কি, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে।"

"তবে শোন"—জীবনের স্বর আবেগের আধিক্যপ্রযুক্ত ঘনশ্বাসজড়িত,—"সুহাসিনি, তুমি আমার হৃদয়ের রাণী, জীবনসর্ব্বস্ব, এতদিন অতি কষ্টে আমি নিজেকে সম্বরণ করে রেখেছিলুম; আর না, দৈব এতদিনে আমার সহায় হয়েছে। তোমার যখন পিতৃগৃহ থেকে ফিরে আসার সময় হয়ে এল, অথচ প্রভাষের হাতের কাজ ফুরোল না, তখন আমি গিয়ে তোমায় আন্‌বার প্রস্তাব করলেম। প্রভাষ অসন্দিগ্ধচিত্তে সম্মতি দিলে। আমি সেখানে যাত্রা করার পূর্ব্বে এখানে এসে এই বাড়ী ঠিক করে গিয়েছি, এস্থান আমার পূর্ব্ব পরিচিত। প্রিয়তমে এই গৃহে তুমি আমার গৃহ লক্ষ্মী হয়ে অধিষ্ঠান করবে।"

প্রিয় সম্বোধনটি এমন ভাবে উচ্চারণ করিল যেন বহুদিনের; অনশনপীড়িত ব্যক্তির রসনাগ্রে সহসা অতি সুস্বাদু বস্তুর আস্বাদন মিলিয়াছে।

সুহাসিনী স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ ব্যথিত হইয়া বলিল, "জীবন মুগ্ধ! তুমি কি বল্‌ছ! বাড়ী ফিরে চল, সেখানে শান্তি তোমার পথ চেয়ে রয়েছে।"

"আর না সুহাসিনি, সে বাড়ী আর না, এখন হতে এই আমাদের বাড়ী।"

সুহাসিনী কাঁদিয়া উঠিয়া তাহার পাদস্পর্শ করিয়া বলিল, "ফিরে চল, ফিরে চল ভাই, আমি তোমার শরণাপন্ন বোন, আমাকে তাঁর কাছে দিয়ে এস, তিনি বিশ্বাস করে তোমাকে পাঠিয়েছেন, আমাদের পথ চেয়ে রয়েছেন, বিলম্ব দেখে কত চিন্তিত হচ্ছেন, তাঁর বিশ্বাস রাখো রাখো।"

জীবন মৌন, তাঁহার সংকল্প অবিচলিত। গাড়ী ক্রমেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সুহাসিনী জীবনের পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল;—গাড়ি খদের পাশ দিয়া যাইতেছে, একবার এক দৃষ্টিপাতে খদের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া লইল, তারপরে আর ইতস্ততঃ মাত্র না করিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। জীবন তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া চকিতে

তাহার সহিত মাটিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া খদে গড়াইয়া পড়িল।

গাড়োয়ানের আহ্বানে গ্রামস্থ লোক জড় হইয়া তাহাদের উঠাইল, দুজনেই সংজ্ঞাহীন, আহত, রক্তাপ্লুতদেহ। দুই চারি দিন পরে সুহাসিনীর সংজ্ঞালাভ হইলে তাহার কথিত ঠিকানায় প্রভাষকে সংবাদ পাঠান হইল। জীবন বেশি আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার তখনও ভালরূপ চেতনা সঞ্চার হয় নাই। প্রভাষ তাহাদের সন্তর্পণে প'ল্কীতে উঠাইয়া বাড়ী লইয়া গেল। কিরূপে এই অস্থানে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল তাহা তখন জানিতে পারিল না। বাড়ী গিয়া জীবনের জ্ঞানসঞ্চার হইবামাত্র সে প্রভাষকে তাহার শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া পাঠাইয়া সব বলিল, কিছু গোপন করিল না।

বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রতি প্রভাষের মমতার উৎস রুদ্ধ হইল, সে শুষ্ক অন্তঃকরণে কঠিন হৃদয়ে সুহাসিনীর রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া গেল।

২

দীপালোকবর্জ্জিত অন্ধকার গৃহে জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে। শান্তি সুহাসিনীর শয্যার পাদতলে বসিয়া কাঁদিতেছে, শিয়রে প্রভাষ, স্থিরপুত্তলিকাপ্রতিম, তাহার চক্ষে অশ্রু নাই; যাহার জন্য তাহার সর্ব্বস্ব ধ্বংস হইতেছে তাহার প্রতি করুণার লেশহীন নীরস তীব্র ক্রোধে হৃদয় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।—কিন্তু তাহার ক্রোধের পারদ তখন নিম্নগৃহে মৃত্যুশয্যায় শয়ান।

সুহাসিনী একবার চক্ষু মেলিল, জ্যোৎস্নার আলোকে প্রভাষের মুখের দিকে চাহিল। তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিল, ''জীবনকে ক্ষমা কোরো।''

শান্তি এই করুণাবাক্যে কৃতজ্ঞতাভরে শয্যাপ্রান্ত হইতে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রভাষের কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না, শুধু সুহাসিনীর ক্লান্ত অধরের শেষ আহ্বান বুঝিল। তাহার অন্তিম চুম্বন লইয়া, দীর্ণহৃদয়ে তাহার বক্ষের উপর লুণ্ঠিত হইল।

কিছুক্ষণ পরে অনেক কষ্টে শান্তি প্রভাষকে সে গৃহ হইতে স্থানান্তরিত করিল।

গভীর রাত্রে, বহু কষ্টে আপনার অবশ দেহ ভার কোন মতে টানিয়া আনিয়া একজন হতভাগ্য চিরনিদ্রিতা সুহাসিনীর চরণকমল অশ্রুজলে ধৌত করিয়া, মনে মনে সেই দেবীর নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া, পুনর্ব্বার বহু আয়াসে ধীরে ধীরে আপনার গৃহে ফিরিয়া গেল।

৩

জীবনের মৃত্যু শয্যা। শুধু শান্তি তার পাশে বসিয়া রহিয়াছে, সে গৃহে আর কেহ নাই। বিষণ্ন, ক্ষীণকণ্ঠে জীবন বলিল, ''আর ত দেরী নেই শান্তি, একবার তোমার দাদাকে ডেকে নিয়ে এসো।''

জীবনের আহ্বানে প্রভাষ আসিল, আসিয়া শয্যা হইতে কিছু তফাতে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবন বলিল, ''শেষ বার তোমার কাছে মার্জ্জনা চাচ্ছি প্রভাষ, জন্মের মত বিদায়, এখনও কি একবার স্নেহালিঙ্গন দিবে না?''

প্রভাষ নিরুত্তর রহিল। জীবন ব্যথিত হৃদয়ে, শ্রান্তদেহ দেয়ালের দিকে ফিরাইয়া বলিল ''আমি মার্জ্জনার যোগ্য নহি ঠিক; অতি সহনাতীত অন্যায় করিয়াছি; তাই হউক; এ শাস্তি আমার বহনীয়।''

আর এক মুহূর্ত্তেই সব ফুরাইল। একটা গভীর বেদনা জীবনের মৃতমুখে ছাপ রাখিয়া গেল।

৪

শুক্লপক্ষ; আকাশ মেঘলা; প্রবল ঝোড়ো বাতাস বহিতেছে। দুঃখী হউক্, সুখী হউক্, এত বাতাস সকলের মনকেই একটু বিক্ষিপ্ত করে, তাহাদের স্ব স্ব চিন্তাভার হইতে ঈষৎ ইতস্ততঃ উড়াইয়া লইয়া যায়। আজ যদি প্রথম বসন্তের সুশোভন মধুরিমাময় জ্যোৎস্নারাত্রি হইত তাহা হইলে শান্তির হৃদয় এখনও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া থাকিত। কিন্তু আজিকার ঝোড়ো প্রকৃতির সঙ্গলাভে তাহার মন ঈষৎ শিথিল হইয়াছে। পীড়িত নিরাবলম্বন হৃদয়ের প্রকৃতির দুরন্তপনা উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কতকটা আশ্রয় সান্ত্বনা, অবলম্বন আছে। শান্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহ কোণ হইতে বহুদিনের অনাদৃত সেতারটা লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিল। তার তারের ঝঙ্কার উপরের গৃহে তাহার ভ্রাতার কাণে আসিয়া পঁহুছিল, এবং তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিল।

বৃহৎ পুরীর দুই বিভিন্ন তলার দুটি কক্ষে দুই ভাই বোনের বাস। ইহাদের পৃথিবীতে আর কেহ নাই; অথচ দুঃখের দিন ইহাদের পরস্পরকে পরস্পরের হৃদয়ের আরও একটু কাছাকাছি টানে নাই—বিস্তর তফাৎ করিয়া দিয়াছে। হৃদয়ের ব্রণস্থানে পরস্পরের সহানুভূতির স্পর্শ হইতে উভয়েই সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়ায়। যে গৃহে আগে প্রেমের রাজত্ব ছিল, যেখানে হাসি, গান, প্রীতি কারণে আকারণে নিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত আজ তাহা বিষণ্ণ, নিরানন্দ, চিরপ্রেমবিরহিত। ইহাদের অন্তরে অন্তরে মিল আছে দুজনের দুঃখে দুজনে মনে মনে ব্যথিত হয়, কিন্তু বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই।

প্রভাষ এক একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাঁশী বাজায়, তার বাঁশীর বিলাপ শান্তির হৃদয় স্পর্শ করে, ভ্রাতার দুঃখে তাহার শিরায় শিরায় দুঃখপ্রবাহ সঞ্চরণ করিতে থাকে, কিন্তু কোন সান্ত্বনার কথা কহিতে আসে না, কোন স্নেহ বাক্য বলে না, শুধু বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া প্রভাষের জন্য কাঁদে, বাঁশীর বিরামের জন্য কান পাতিয়া থাকে।

যখন আর বাঁশীর শব্দ কানে আসে না, তখন জানে সে রাত্রির মত প্রভাষ শান্ত হইল, সুহাসিনীর আবাহন সমাপ্ত হইল, দুঃখের তীব্রতা অনেকটা প্রশমিত হইল।—হায় কি ছিল আর কি হইয়াছে। তখনকার প্রত্যেক দিনটি কি মাধুরীপ্লুত, কি শোভাময়, কি মধুময়। কি সহজ আনন্দে চারিটী তরুণ হৃদয়ের জীবনপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল। মাঝে হইতে কুটিল লালসা কোথা হইতে আসিয়া সব ভণ্ডুল করিল, জীবনের মরণ কুবুদ্ধি কেন ঘটিল? শান্তি কি বুঝে না প্রভাষের প্রতি জীবন কতদূর অপরাধী? স্বামীর অপরাধে ভ্রাতাকে দুঃখী জানিয়াই ত দ্বিগুণ দুঃখে হৃদয় পূর্ণ হয়।

কিন্তু সেই সঙ্গে অন্তিমশয্যায় অনুতপ্ত, ক্ষমাভিখারী স্বামীর প্রতি ভ্রাতার কাঠিন্য যখন স্মরণ হয় সেই বেদনাক্লিষ্ট মৃতমুখখানি যখন মনে পড়ে তখন তাহারও হৃদয় বড় কাঠিন্যে পূর্ণ হয়, আর প্রভাষের নিকট স্বামীর অপরাধের জন্য, অতীত সুখদিবসের জন্য কাঁদা হয় না, নিজের দুঃখ সান্ত্বনা নিজের অন্তরে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

প্রভাষ শান্তির নিরানন্দ শূন্য হৃদয়ের কথা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হয়, কিন্তু তাহাকে জীবনের পক্ষপাতী জানে, মনে করে জীবনের যতখানি অপরাধ শান্তি তাহাকে তাহার অপেক্ষা অনেকটা কমাইয়া দেখে তাই প্রভাষের দুঃখের পরিমাণ সে ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে না। সে যে জীবনকে মার্জ্জনা করে নাই ইহাই শান্তি মনে রাখিয়াছে কত দুঃখে যে করিতে পারে নাই তাহা বুঝে নাই। তাই শান্তির কাছে আর হৃদয় খোলা হয় না। অভিমানে সঙ্কোচে দুজনে দূরে দূরে থাকে, কেহ কাহারো হৃদয়ের নাগাল পায় না।

কিন্তু প্রভাষেরই মনের আবেগ বাহিরে বাঁশীতে ছাড়া পায়, শান্তির ত কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, সব সময়ে তাহার নিঃসঙ্গ দুঃখবিলীন জীবনের কথা তাই মনেও হয় না। তাই আজ যখন প্রথম তার বীণার করুণ ঝঙ্কার প্রবল বায়ুপ্রবাহে প্রভাষের কানে ভাসিয়া

আসিয়া শান্তিকে স্মরণ করাইয়া দিল, তাহার চিত্ত বড় বড় চঞ্চল হইল। সুরের পরতে পরতে প্রভাষের মানসচক্ষে বড় শূন্যতার স্তর এক একে উন্মুক্ত হইতে লাগিল। এই তরুণ বয়সে এই দুঃখভারে অবনমিত ভূমিসাৎ হৃদয়ের সমস্ত কারুণ্যটা তাহার রক্তে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত্তে যত দুঃখ শান্তির না ছিল তাহার অপেক্ষা বেশি দুঃখে তাহাকে দুঃখী অনুমান করিল। ঘনীভূত দুঃখ তরলায়মান হইলেই হৃদয়ভার অশ্রু হইয়া গলিয়া আসে, আজিকার প্রকৃতির প্রভাবে শান্তির মনভার কিঞ্চিৎ লঘু হইয়াছিল বলিয়াই সে বীণার নিকট অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল; কিন্তু প্রভাষের উত্তেজিত কল্প নায় বোধ হইল শান্তির বীণাধারণ তাহার দুঃখের চূড়ান্ত অবস্থা ব্যক্ত করিতেছে। এই ম্লান চন্দ্র, এই প্রবল বাত্যা তারি মধ্যে নির্জ্জন গৃহে শান্তির দীনা ছবি প্রভাষের হৃদয়কে বড় নাড়া দিল। শান্তির নিকটে গিয়া একটী স্নেহ সম্ভাষণ তাহার ললাটে একটী সস্নেহ হস্তস্পর্শের জন্য হৃদয় বড় লোলুপ হইল—কিন্তু কিছুই করা হইল না। চট্ করিয়া একটা চিন্তা মনে বাধিল,—শান্তি যদি তাহাকে ঠিক না বোঝে? সে যে ভাবে আর্দ্র হইয়া তাহার নিকট যাইবে তাহার অপেক্ষা বেশি কিছু যদি শান্তি ধরিয়া লয়? যদি মনে করে জীবনের অপরাধের ন্যূনতা সম্বন্ধে সে এখন শান্তির সহিত একমত? তাহা নয়, তাহা নয়, জীবনের প্রতি সে কোমলতা দেখাইতে পারিবে না, জীবনকে সে মার্জ্জনা করিতে পারে না।—তাই শান্তির নিকট যাওয়া হইল না, তাই আর তাহাকে দুটি মিষ্ট কথা বলা হইল না। তাহার পর এমন মাঝে মাঝে কোন কোন সন্ধ্যায় শান্তির সেতার বাজিতে লাগিল, প্রভাষের চিত্তও ক্রমেই বেশি অস্থির হইতে লাগিল, শান্তির প্রতি স্নেহ ব্যবহারের লালসায় অবস্থা পীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু সে পীড়া শান্ত করিবার উপায় রুদ্ধ, দুজনের মধ্যে এমনি কঠিন সঙ্কোচের দেয়াল উঠিয়াছে। অবশেষে একদিন তাহার আবেগ আত্মশান্তির নূতন পথ খুঁজিয়া লইল। প্রভাষ কাগজ পাড়িয়া নাম ও স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া আপনাদের কাহিনী লিখিল, সহজ সুন্দর ভাষায় সমস্ত কারুণ্য ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিল, ক্রমে ইহা তাহার অভ্যাস হইয়া আসিল। শান্তির বীণার তান কানে আসিলেই সে যেন নেশাপ্রাপ্ত হইয়া কলম ধরিত। তার পরদিন সকাল বেলায় পড়িলে সেটা দাঁড়াইত একটা সুললিত মর্ম্মহারী সাহিত্যপ্রসূন।

৫

শান্তি কখন প্রভাষের গৃহে আসে না। একদিন দ্বিপ্রহরে প্রভাষ বাহিরে গিয়াছে; বহুকাল পরে শান্তির সেদিন তাহার গৃহে আসিতে সাধ হইল; সঙ্গীহীন, একক ভ্রাতার কি করিয়া সারাদিন কাটে, কত যে হৃদয় বেদনা গৃহতৈজসেরা তাহার যেন সাক্ষ্য দিবে, যে সকল অচেতন পদার্থ তাহার ভ্রাতাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকে তাহাদের কাছে আসিয়া একবার তাহার জন্য অশ্রুপাত করিতে সে প্রভাষের গৃহে আসিল। বহুদিন পরে সুহাসিনীর নিদর্শনপূর্ণ সে গৃহ দেখিয়া শান্তির হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না, টেবিলের সম্মুখে চৌকির উপর উপবেশন করিল, টেবিলের উপর একখানা বাঙ্গালা কাগজ দেখিয়া অন্যমনস্কভাবে তাহা হাতে লইয়া তাহার উপর চোখ বুলাইয়া গেল। হঠাৎ একটা লেখায় তাহার মনোযোগ আবদ্ধ হইল, ক্রমে সে অবহিতচিত্তে, উত্তেজিত মস্তিষ্কে তাহা পাঠ করিতে লাগিল। প্রভাষ গৃহে প্রবেশ করিল, দেখিল শান্তির হাতে কি কাগজ এবং তাহার মধ্যে কোন্ রচনায় সে নিবিষ্টচিত্ত। সে কিছু বলিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শান্তি, পড়া শেষ হইলে উঠিয়া ক্লিষ্টমূর্তিতে প্রভাষের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা একি তুমি আর আমি"? প্রভাষ বলিল "হ্যাঁ"।

শান্তি আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। নিজের গৃহে গিয়া একবার ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া

কাঁদিল, তাহার পর উঠিয়া চোখ মুছিয়া গৃহ কাজে গেল। প্রভাষের সহিত সম্পর্ক আরও বিরল হইয়া আসিল,—আর কখন তাহার গৃহে যায় না। প্রভাষের সঙ্গীতের ভাষা শান্তি বুঝে, চিরকাল তাহাতে অভ্যস্ত, কিন্তু আর কিছু শান্তির পক্ষে বিজাতীয়। তাহার লেখার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না, তাহা যে কতখানি দুঃখ, কতখানি সমবেদনার ফল তাহা বুঝিতে পারিল না, সে শুধু ভাবিল "দাদা হৃদয়হীন, আত্মীয় জনের মর্ম্মভেদী দুঃখকে যশের পণ্যদ্রব্য করিয়াছেন," শান্তির প্রতি ব্যবহারে যে স্নেহের ত্রুটী হইয়াছিল তাহার প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভাষ প্রতিনিয়ত এই সাহিত্যতীর্থে করিতেছে তাহা শান্তি বুঝিল না, তাহার প্রতিকারেচ্ছার ব্যাকুলতা কিছু ধরিতে পারিল না।

তাহার পর হইতে শান্তির সেতার একেবারে স্তব্ধ হইল; সজীবতার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত রুদ্ধ হইল। সে নূতন করিয়া হৃদয়ের চারি পাশে কঠিনতার প্রাচীর গাঁথিল। তখন প্রভাষের বাঁশী প্রতি রাত্রি বড় ক্রন্দন কাঁদিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে প্রাচীর ভেদ করিয়া বহু বিলম্বে হততেজে শান্তির হৃদয়ে পঁহুছিত। আর তাহা শান্তিকে শীঘ্র উতলা করে না, আর শান্তি প্রভাষের ব্যথায় ব্যথিত হয় না। কিন্তু কতদিন এভাব টিঁকিবে? ক্রন্দনের আঘাতে আঘাতে প্রাচীর জীর্ণ হইয়া আসিল, অল্পে অল্পে বিলম্বে তাহা খসিল, একদিন শান্তির অনাবৃত বক্ষে বাঁশী আবার বিঁধিল। এ সুহাসিনীর আবাহন নহে, প্রভাষের আত্মকরুণা নহে, এবার বাঁশী বার বার কাঁদিয়া কাঁদিয়া শান্তির নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছে, তাহার রুদ্ধ হৃদয়ে প্রবেশ পায় নাই,—শান্তি সব বুঝিল। আজ প্রভাষের লেখার মর্ম্ম ও যে বুঝিল, তাহা যে স্নেহবিরহিত হৃদয়ের ব্যাকুল মিলনাকাঙ্ক্ষার ভাষা তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিল। সে শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিল।

প্রভাষ ছাদের উপর এক হাতে মাথা ধরিয়া বসিয়া আছে, বাঁশী তার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। শান্তি নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া তাহার অন্য হাতটী নিজের হাতে লইয়া বলিল, "দাদা"।

প্রভাষ চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল।

"আমায় মাপ কর ভাই।"

অশ্রুবিজড়িত স্বরে প্রভাষ বলিয়া উঠিল, "তুই আমায় মাপ কর্ শান্তি, তোর এত দুঃখেও আমি তোর প্রতি কঠিন ছিলুম, আমি বড় নিষ্ঠুর বড় নিষ্ঠুর জীবনকে ক্ষমা কারিনি, তার অন্তিম ভিক্ষা অবহেলা করেছি, হায়, কে পাপী, জীবন না আমি?—ওহে জীবন, ভাই, একটিবার ফিরে এসো, এ হতভাগ্যকে তোমার শেষ আলিঙ্গন দিয়ে যাও।"

*　*　*　*　*　*

তারপরে? তারপরে সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল, শুধু এই ক্লেশতাপিত ধরণীর দুটি প্রাণীর জীবনভার অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া আসিল।

পূজার-ছুটি ॥ শ্রী সরোজকুমারী দেবী

হরিহরপুরের জমীদারদের ছোট তরফের গৃহিণী নৃত্যকালী যখন পালিতা কন্যার বিবাহের পাত্রানুসন্ধানে বৎসরাবধি বিবিধ চেষ্টার পরও বার বার নিরাশ হইয়া দিন দিন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, সেই সময় একদিন প্রভাতে সহসা বাড়ীর পুরোহিত হীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া সহাস্যমুখে সংবাদ দিলেন "মা! একটা সুসংবাদ আছে। কিরণের জন্যে একটি সুপাত্রের সন্ধান পেয়েছি।"

গৃহিণী আশাপূর্ণহৃদয়ে উৎসুকনেত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথার অবশিষ্ট অংশ শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন সবিস্তারে যাহা বলিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

গতকল্য তাঁহার কোন প্রয়োজনে তিনি গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসিত হইয়া পুষ্কবিণীতটে গিয়া একটি অচেনা যুবককে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতে দেখেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানিতে পারেন যে উক্ত গ্রামের বাঁড়ুয্যেরা তাহাদের মেয়ের সহিত বিবাহ দিবার জন্য ছেলেটিকে কলিকাতা হইতে আনিয়াছে। কিন্তু ইহাদের মেয়েটি কালো বলিয়া যুবকের বিবাহে ইচ্ছা নাই। শীঘ্রই সে ফিরিয়া যাইবে। তখন তিনি কিরণের কথা তাহাকে বলায় সে মেয়েটিকে আগে দেখিতে চাহিয়াছে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—ছেলেটি দেখতে কেমন? কত বয়স হবে?

ভট্টাচার্য্য অতি উৎসাহের সহিত বলিলেন—মা! আমি আজ বিকালে তাকে এখানে আনব। তুমি মেয়ে দেখাবার জোগাড় করে রাখ। সে এলেই দেখতে পাবে, আমি তোমার কেমন জামাই আনছি।

গৃহিণী বলিলেন—কিন্তু বাঁড়ুয্যেরা তাকে ঘরজামাই করে রাখতে এনেছিল। আমাদের এখন যে-রকম অবস্থা তাতে আমি তার সকল ভার ত নিতে পারব না সেটা ত ভেবেছেন?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার শিখাসমেত মস্তকটি আন্দোলিত করিতে করিতে বলিলেন—মা! তুমি আমাকে কি এতই বোকা ঠাওরেছ নাকি? আমি সে-সব বিষয় না ঠিক করে কি মেয়ে দেখাবার কথা দিয়েছি? আমি তাকে স্পষ্ট বলেছি যে আমরা ঘরজামাই রাখতে পারব না। নিজেকে নিজের উপায় করে নিতে হবে। তবে তুমি যেমন পিতৃমাতৃহীন—তেমনি এখানেই চিরকাল থাকবে, আমরাই তোমাদের দেখাশোনা করব এবং পরে সুবিধামত তোমায় বাড়ীঘর করে দেবো এই পর্য্যন্ত। সে তাতে রাজী আছে।

এইবার গৃহিণীর মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথামত ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

২

যেদিন একমাত্র নরেন্দ্রকে লইয়া ১৭ বৎসর বয়সে নৃত্যকালী বিধবা হইয়াছিলেন সে আজ

আঠার বৎসর পূর্ব্বের কথা। নরেন তখন এক বৎসরের। তখন তাঁহাদের একান্নবর্ত্তী সংসার ছিল। কিরণের পিতাই সংসারের ও সম্পত্তির সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন ও পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে পরমস্নেহে প্রতিপালন করিতেছিলেন। নরেনের জন্মের ৫ বৎসর পরে কিরণের জন্ম। তাহাকে ১০ দিনের রাখিয়া সূতিকাগৃহেই তাহার মাতার মৃত্যু হয়। তদবধি কিরণ কাকিমার স্নেহের ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছে, তাঁহাকেই মা বলিয়া ডাকে। বড়বাবু দ্বিতীয়বার কলিকাতায় বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের পর হইতেই তাঁহার বিবিধ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এখন তিনি প্রায়ই কলিকাতাতেই থাকেন, মধ্যে মধ্যে ২/৪ দিনের জন্য গ্রামে আসেন। ক্রমশ তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের সন্তানাদি হইতে লাগিল। নরেন ও কিরণের প্রতি স্নেহের মাত্রা দিন দিন কমিতে লাগিল। বড়বাবু দুএক বার তাঁহার স্ত্রীকে স্বীয় গ্রামে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নী কিছুতেই আসেন নাই। তিনি বলিলেন—বাবা! ঐ বনজঙ্গল—ওখানে বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে, ও জায়গায় কি কোন ভদ্রলোকে থাকতে পারে? আমি বিয়ের আটদিনেই শ্বশুরবাড়ী র যে পরিচয় পেয়েছি তাতে আর জীবনে সে-মুখো হব না। তার উপর আবার ম্যালেরিয়া আছে! আমার এই কচি বাছাদের সেইখানে নিয়ে গিয়ে যমের মুখে তুলে দি আর কি!"

যত দিন যাইতে লাগিল গ্রামের লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল বড়বাবু নরেনকে পথে বসাইবার মতলবে আছেন। বিষয়ের আয় সমস্ত লইয়া কলিকাতায় স্ত্রীর গহনা ও কোম্পানীর কাগজ হইতেছে, আর-সমুদয় খরচের জন্য চারিদিকে দেনা করিতেছেন। নৃত্যকালীও এসব কথা শুনিতেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এক বৎসরের পিতৃহীন শিশুকে যিনি বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন তিনি কি কখন তার এমন সর্ব্বনাশ করিতে পারেন? কিন্তু তিনি স্পষ্টই দেখিতেন যে বাড়ীর প্রত্যেক ক্রিয়াকাণ্ড প্রত্যেক অনুষ্ঠান আগে যেমন সমারোহে সম্পন্ন হইত এখন ক্রমশ কমিতে কমিতে তাহা নামমাত্র রীতিরক্ষার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দোল দুর্গোৎসব অতিথিশালা ইত্যাদি প্রত্যেক অনুষ্ঠানের এমন শোচনীয় দশা দেখিয়া নরেন একদিন জেঠামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি গম্ভীরমুখে বলিয়াছিলেন—'এখন আমাদের সময় বড় মন্দ যাইতেছে।' নরেন ইহার উপর আর একটি কথা বলিতে সাহস করে নাই। কিরণের বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছিল, নৃত্যকালী বারবার এ বিষয়ে তাহার পিতার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাহা বিফল হইত। কিরণ দিন দিন তাহার পিতার মন হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতেছিল।

এইরূপে যখন সকলেরই মনে বড়বাবুর প্রতি অসন্তোষের মাত্রা বাড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদিন সহসা কলিকাতায় বড়বাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন। শোকের তীব্রতা মন্দীভূত হইলে যখন গ্রামের ভদ্রলোকগণ ও উভয় পক্ষের উকীল মোক্তার বিষয়ের অবস্থা দেখিতে গেলেন, তখন দেখা গেল সমস্ত সম্পত্তি ঋণে জড়িত—নগদ টাকা কিছুই নাই, ভাল ভাল পরগণাগুলি সব বন্ধক পড়িয়া আছে, অবস্থা অতি শোচনীয়। কলিকাতা হইতে বড়বাবুর শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয় যে উকীল আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—বিষয়ের যখন এরূপ অবস্থা, তখন উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে উপস্থিত কিছুদিনের জন্য সমস্ত বিষয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকুক, তিনি বিষয়ের আয় হইতে নির্দ্দিষ্ট যে বৃত্তি দিবেন তাহাতেই এই দুই পক্ষের সংসার চলিবে। আয়ের অবশিষ্ট অংশ হইতে ঋণ পরিশোধ হইবে। পরে যখন বিষয় ঋণমুক্ত হইবে, তখন বড়বাবুর পুত্রগণ ও নরেন্দ্র বিষয় ভাগ করিয়া লইবেন।

নৃত্যকালী এ ব্যবস্থায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন আমি এতদিন নরেন্দ্রকে লইয়া অতি সামান্যভাবে দিন কাটাইয়াছি। আমার অংশের যে আয়—আমাদের উভয়ের সমস্ত খরচপত্র সম্পন্ন হইতে তাহার অর্দ্ধেকও লাগে নাই। আমার একমাত্র সন্তানের ভাত

পৈতা পর্যন্ত ভাশুর বাড়ীতে দেন নাই, খরচ বেশি হইবে বলিয়া। বিষয়ের উপর এত দেনা হইবার কোন কারণ ছিল না। আমার শ্বশুরের এত নগদ টাকা ছিল তাহার কিছুই দেখিতেছি না। অথচ বিনা কারণে বিষয় দেনায় ডুবিয়া আছে। আমি এ দেনার অংশ লইতে পারিব না। আমার বিষয় হয় ভাগ করিয়া দেওয়া হোক—বড়বাবুর অংশ হইতে দেনা শোধ হইবে, নতুবা যাঁহারা এখন মধ্যস্থ হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারা আদালতে আমায় বুঝাইয়া দিবেন কেন এত দেনা হইল।

মধ্যস্থগণ আর একবার তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। নৃত্যকালী বলিলেন, আমি ত মরিতে বসিয়াছি কিন্তু তবু এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া মরিব। আমার ধনবল নাই, লোকবল নাই; আমার সন্তান বালক, কিছুই জানে না—আমার যে পরিণাম কি হইবে তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছি। তবু আমি ইহা নীরবে সহ্য করিব না। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে।

যথাসময়ে উভয়পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। কিন্তু কিরণকে লইয়া নৃত্যকালীর বিপদ হইল। তাহার বয়স ১৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে যায়, বিবাহের কোন সুবিধা হইল না। এ বংশের মেয়েদের কখন বিবাহ দিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দেওয়া রীতি নাই, অথচ বড়বাবু কিরণের জন্য টাকাকড়ি কিছুই রাখিয়া যান নাই, নৃত্যকালীর নিজের অবস্থাও এখন মন্দ। এ অবস্থায় কিরূপে পূর্ব্ব প্রথামত সকল ভার লইয়া নিজে কিরণের বিবাহ দেন, ইহাই মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। শেষে তিনি এমন একটি পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন, যে চিরকাল তাঁহাদেরই নিকট থাকিবে অথচ একবারে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের উপর নির্ভর না করিয়া নিজে উপার্জ্জন করিতে পারিবে। তাহা হইলে বংশের মানও থাকে অর্থাৎ কিরণ চিরদিন পিতৃগৃহেই থাকে, এবং এখন কিরণের ও তাহার স্বামীর ভার তাঁহাদের বহিতে হয় না। তারপর তাহাদের মোকদ্দমা চুকিয়া গেলে কিরণ তাহার পিতার অংশ হইতে ন্যায়ানুসারে কিছু ত পাইবেই, আর তখন তিনিও সাধ্যানুসারে তাহাকে সাহায্য করিবেন। বৎসরাবধি এরূপ পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে যখন তিনি কিরণের বিবাহের আশা ত্যাগ করিবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময় হীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বকথিত সুপাত্রের সন্ধান আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

৩

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিশোরী কিরণের লজ্জারক্ত সুন্দর মুখখানি দেখিয়া ললিত একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। কন্যাপক্ষ বিবাহের যে যে সর্ত্ত করিলেন সে নির্ব্বিবাদে সমস্ত মানিয়া লইল। এই তরুণ যুবকের অনিন্দ্য সুকুমার রূপ দেখিয়া গৃহিণীর অন্তরেও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হইল। সুতরাং উভয় পক্ষেই বিবাহের আর কোন বাধা রহিল না। হীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য শুভদিন দেখিয়া ললিতের সহিত কিরণের বিবাহ দিলেন। গৃহিণী স্নেহে গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া সকলকে বলিলেন—আমাদের যেমন মেয়ে তেমনি জামাই হয়েছে!

বস্তুতঃ এই যুবকটি অল্পদিনের মধ্যেই এই অপরিচিত স্থানের সকলেরই একান্ত প্রিয় হইয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও নৃত্যকালী তাহার বিনয়নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ। নরেন ত তার সঙ্গ একতিল ছাড়িতে চায় না, স্নান আহার বিশ্রাম ভ্রমণ মাছধরা সকল সময়েই ললিতকে সঙ্গে না রাখিলে কিছুতেই তার চলে না। গ্রামের যুবকবৃন্দ এই কলিকাতার ছেলেটির অসাধারণ বাক্‌পটুতায় ও মধুর গানে আকৃষ্ট হইয়া নির্ব্বিবাদে আপনাদের পরাভব মানিয়া লইয়া তাহার একান্ত অনুগত ও ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

একদিন মধ্যাহ্নে আহারের সময় নৃত্যকালী ললিতের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আপনাদের বৈষয়িক দুর্দ্দশার কথা তুলিয়া বলিলেন—বাবা! আমার দরিদ্রের ধন কিরণকে তোমার হাতে

দিয়েছি। ওর সুখদুঃখের সকল ভার তোমাব। আমি ত তার কিছুই করতে পারলাম না। নিজেই অকূলে ভাসছি। কখনো কূল পাব, কি ছেলেটার হাত ধরে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে, কিছুই ঠিক নেই। যা হবার আমাদের হবে, কিরণকে তুমি দেখো। বাছার মুখ চাইতে সংসারে আর কেউ নেই।

ললিত বলিল—মা! আপনি কিছু ভাববেন না। আমি অল্পবয়সে মা বাপ হারিয়েছি। ভগ্নী ও ভগ্নীপতি এতদিন আমায় মানুষ করেছেন। আমি সংসারী হয়ে আপনাদের সহায় পেয়েছি, আশ্রয় পেয়েছি, এই আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমরা পুরুষমানুষ—নিজের সংসার প্রতিপালনের জন্যে পরমুখাপেক্ষী হতে যাব কেন? আমি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরে যাব, আর একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখব। আদালত হতে আপনাদের ন্যায্য সম্পত্তি ফিরে পান ত ভালই, না হয় ত আমরা দুই ভাইয়ে উপার্জ্জন করব, আপনার কিসের ভাবনা? আপনি মিছে ভেবে শরীর মন খারাপ করবেন না। আপনি আশীর্ব্বাদ করলে নরেন ও আমি নিজেরাই নিজের উপায় করে নিতে পারব।

জামাতার কথা শুনিয়া নৃত্যকালীর দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় খোলা জানালার ধারে বসিযা ললিত একখানি বই লইয়া অন্যমনস্কভাবে পড়িতেছিল ও কিরণ কাছে বসিয়া পান সাজিতেছিল ও মাঝে মাঝে একদৃষ্টে ললিতের মুখেব দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি স্বামীর প্রতি প্রেমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার কাছে ললিত সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সার, তার মুগ্ধদৃষ্টির সমক্ষে ললিত সর্ব্বগুণের আদর্শ। বাড়ীর লোকে যখন শতমুখে ললিতের প্রশংসা করে তখন সেকথা যেন তার কানে অমৃতবর্ষণ করিতে থাকে আর স্বামীর মুখ দেখিয়া দেখিয়া তাহার যেন তৃপ্তি হয় না। যাহাকে দেখিতে এত সাধ, লজ্জার দায়ে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবারও উপায় নাই। যখন সে সামনে থাকে তখন চক্ষু আপনা হইতেই নত হইয়া পড়ে। যখন সে ঘুমাইয়া থাকে বা অন্যদিকে চাহিয়া থাকে সেই অবসরে কিরণ লুকাইয়া লুকাইয়া তাহাকে দেখিয়া লয়। আজ পাঠনিরত স্বামীর মুখের দিকে যখন সে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে তখন সহসা বই বন্ধ করিয়া ললিত তাহার দিকে চাহিল। চারিচক্ষু মিলিত হইবামাত্র কিরণ লজ্জায় মুখ নত করিল। ললিত হাসিয়া ডাকিল—কিরণ!

সে উত্তর দিল না। ললিত আবার বলিল—কি দেখছিলে বল ত?

কিরণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ললিত বলিল—আঃ! এ সময় পড়তে মোটেই ভাল লাগছে না। কিরণ! কাছে এস।

কিরণ পানসাজা শেষ করিয়া ধীরে ধীরে ডিবাটি লইয়া স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ললিত তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া মৃদু মৃদু গাহিল—

হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর আয় লো কাছে আয়!

খোলা জানালা হইতে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ কিরণ ঘরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নীচের বাগান হইতে নানাফুলের মিশ্র সুবাস বাতাসে মিশিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছিল। ললিত কতক্ষণ কিরণের মুখখানি উভয়হস্তে তুলিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—কিরণ! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ঠিক উত্তর দেবে ত?

কিরণ একটু বিস্মিতদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, বলিল—কি কথা?

ললিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—কিরণ! তুমি ত জান আমি নিঃস্ব দরিদ্র, আমার কিছুই নেই। আমি অবশ্য তোমায় সুখী করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করব, কিন্তু মনে কর এখানে তোমরা যে ভাবে আছ যদি এমন ভাবে তোমায় না রাখতে পারি, তা হলে

তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবে না ত? আজ আমার প্রতি তোমার যে ভাব তখনও ঠিক তেমনি থাকবে ত?

কিরণের প্রফুল্ল মুখখানি তৎক্ষণাৎ ম্লান হইয়া গেল, সে সহসা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

ললিত তাহার হাতদুটি ধরিয়া সস্নেহে বলিল—বল কিরণ! তোমায় যা জিজ্ঞাসা করলাম তার উত্তর দাও।

কিরণ তখন উত্তেজিতস্বরে বলিল—তুমি কি আমাকে এতই নীচ মনে করেছ? তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সে কি টাকার জন্য? তুমি আমার স্বামী বলেই তোমাকে ভালবাসি। তুমি ধনবানই হও আর দরিদ্রই হও আমি চিরদিন তোমায় এই ভাবেই পূজা করব। তুমি আমায় যে ভাবে রাখবে আমি তাতেই সুখী হব। কিন্তু যদি—যদি কখনও—এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর সে কিছুই বলিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ললিত ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল—এ কি কিরণ! এ কি ছেলেমানুষী তোমার! আমি একটা কথার কথা জিজ্ঞাসা করেছি বই ত নয়? ছি! চুপ কর! তোমার চোখে জল দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। চুপ কর।

কিরণ স্বামীর বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি আমায় যত দুঃখেই রাখ না তাতে আমার কোন কষ্ট হবে না, কিন্তু যদি কখনও তোমার স্নেহ হারাই তা হলে আমি আর বাঁচতে পারব না।

আবার সে ললিতের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ললিত সেই সরলা বালিকার এই অকৃত্রিম প্রেমের উচ্ছ্বাসে স্তব্ধ হইয়া গিয়া আপনাকে শত ধিক্কার দিল। ইহাকেই সে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিল? তাহার মুখে কোন সান্ত্বনার কথা আসিল না। সে কেবল গভীর স্নেহের সহিত তাহার বালিকা পত্নীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ রোদনের পর কিরণ একটু শান্ত হইলে ললিত অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে বলিল—কিরণ! রাণী আমার! আমায় মাপ কর! আমি নিষ্ঠুরের মত তোমায় কষ্ট দিয়ে কাঁদিয়েছি। বল আমায় মাপ করলে?

কিরণ উত্তরে কিছু না বলিয়া দুই মৃণাল কোমল বাহুতে ললিতের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার মুখের উপর নিজের অশ্রুসজল মুখখানি রাখিল; তখনও তাহার কচি ওষ্ঠাধর দুটি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

৪

যদি এইভাবেই চিরকাল কাটিতে পারিত তাহা হইলে কোন পক্ষেই কিছু অশান্তির কারণ ঘটিত না। কিন্তু জগতে সব বিষয়েরই দুইটা দিক আছে এবং বিপরীত দিকটা সকলের সমান রুচিকর হয় না। ললিতেরও তাহাই হইল। সে সকলকে আশা দিয়াছিল বিস্তর—আর নিজেও মনে করিয়াছিল যে সে অনেক কিছুই করিবে। কিন্তু মানবের চিত্তের কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন। কার্য্যকালে তাহার দ্বারা কিছুই হইল না। সে কলিকাতার একটি উচ্ছৃঙ্খল যুবক, ধনী আত্মীয়ের বাড়ীতে দশটা আশ্রিতের মধ্যে থাকিয়া অযত্নে উপেক্ষায় কোনরূপে মানুষ হইয়াছে। বিশেষ ভাবে কাহারও নিকট হইতে যত্ন বা আদর পাওয়া তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। এখানে আসিয়া সকলের নিকট হইতে এত অধিক স্নেহ যত্ন পাইয়া ক্রমে তাহার চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। বাড়ীতে যাহাকে কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত না এখানে সে ইতর ভদ্র সর্ব্বসাধারণের নিকট রাজসম্মান পাইতেছে—সে কি যে-সে লোক, জমীদারের জামাতা। দিন দিন সে এত সুখী ও বিলাসী হইয়া পড়িতে লাগিল যে খানসামায় তেল মাখাইয়া স্নান

করাইয়া না দিলে তার স্নান হয় না। আঁচাইবার সময় গাড়ু গামছা লইয়া চাকর না দাঁড়াইয়া থাকিলে সে বিরক্ত হয়।

প্রথম প্রথম কলিকাতায় গিয়া চাকরী করার কথা ঘন ঘন তার মনে উঠিত। কিন্তু সেখানে আবার দিদির বাড়ীতে সেই পূর্ব্বমত ভাবে থাকা ও পথে পথে কাজ খুঁজিয়া বেড়ানোর দৃশ্যটি মনে উদিত হইলেই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত ও ভাবিত সেই ত যাইতেই হইবে—তা আর দুই চারিদিন যাক তখন যাওয়া যাইবে। কিন্তু এমনি তার আলস্যপ্রিয় প্রকৃতি যে এ দুই চারিদিন শেষ হইতে হইতে ক্রমশ ছয় মাস হইয়া গেল কিন্তু তাহার বাহির হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এদিকে নরেনের যে মামলা চলিতেছিল তাহাতে প্রতিপক্ষের কথাই ন্যায্য বলিয়া প্রমাণ হইতেছিল। উপর্য্যুপরি দুই তিনটি মামলায় নরেন হারিল। গ্রামের অনেকেই বিপক্ষদলে যোগ দিয়াছিল। কেবল ২/৪ জন প্রাচীন ধর্ম্মভীরু কর্ম্মচারীর সাহায্যে ও নিজ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে নৃত্যকালী মোকর্দ্দমা করিতেছিলেন। সুতরাং দিন দিন তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছিল। নানা দুঃখে দুশ্চিন্তায় অভাবে নৃত্যকালী চতুর্দ্দিক হইতে জড়াইয়া পড়িয়া দিন দিন উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। নরেন ত পথে দাঁড়াইয়াছে বলিলেই হয়, তার উপর ললিতের আচরণ দেখিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। জামাই মানুষ—জোর করিয়া কিছু বলাও যায় না। সে ত সব দেখিয়া শুনিয়াও বেশ আরামে দিন কাটাইতে পারিতেছে! একে ত পিতৃমাতৃহীন নিঃস্ব দেখিয়াই বিবাহ দিয়াছেন, তাহার উপর নিজের সাহায্য করিবার ক্ষমতাও গেল, ইহার উপর জামাতা যদি বাক্‌সর্ব্বস্ব অলস ও অকর্ম্মণ্য হয় তবে কিরণের দশা কি হইবে।

বিকালে রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া নৃত্যকালী তরকারী কুটিতেছিলেন, কাছে বসিয়া তাঁহার চিরদিনের সুহৃৎ বিনুঠাকুরঝি গল্প করিতেছিলেন।

বিন্দু পল্লীর মজুমদার-বাড়ীর কন্যা, অল্পবয়সে বিধবা হইয়া পিত্রালয়েই বাস করিতেন। যখন নৃত্যকালী একাদশ বর্ষ বয়সে কাঁদিতে কাঁদিতে এই অপরিচিত বৃহৎ পুরীতে নববধূরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে বিন্দুর সহিত তাঁহার সখীত্ববন্ধন দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল। সেই হইতে সুদিনে দুর্দ্দিনে অন্ততঃপক্ষে দিনান্তে একবারও দেখা না হইলে দুইজনেই হাঁফাইয়া উঠিতেন।

বিন্দু বলিতেছিলেন—যেদিন বড়কর্ত্তা দেশের এত মেয়ে থাকতে কলকাতায় বিয়ে করলেন আমরা ত তখন হতেই জানি যে এইবার গাঙ্গুলীদের এতদিনের বনেদী ঘর উচ্ছন্ন যাবার পথ করা হল। যে মেয়ে এতকালের মধ্যে শ্বশুরের ভিটায় একদিনের জন্যে পা দিল না, সে কি কখন শ্বশুরবাড়ীর কদর বোঝে? আমরা ত ছোটবেলা হতে দেখে আসছি বড়কর্ত্তা কি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন? সেই মানুষকে কি মন্ত্র দিয়ে কি করেই ফেললে। একদিনের জন্যে মেয়েটার মুখ চাইতে দিলে না, ছেলেটাকে পথে বসালে? ছি! ছি! ছি! একি কম ঘেন্নার কথা?

নৃত্যকালী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—আমি আর কার দোষ দেবো বল ঠাকুরঝি? সবই আমার অদৃষ্টের দোষ। সংসারে এসে একদিনের জন্যে সুখী হতে পারলাম না। ভাশুর মরেও গেলেন, আমাকেও মেরে গেলেন। আমার দুধের বাছা নরু, ভাল মন্দ কিছু জানে না। এই কচি বয়সে তার মাথায় কি ভাবনার বোঝা-ই পড়ল বল দেখি? আজ ৬/৭ মাস সহরে ছোটাছুটি আর উকীল মোক্তারের বাড়ী ঘুরে ঘুরে আর ভাবনা চিন্তায় সে একেবারে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছে। একটা একটা মামলায় হার হচ্ছে আর তার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। বাছার আমার খাওয়ায় রুচি নেই, কোন সাধ আহ্লাদ নেই, অষ্টপ্রহর ভাবনায় কালি হয়ে গেল। ঘোরে ফেরে আর এসে কচি ছেলের মত আমার গলা জড়িয়ে বলে, মা! জেঠামণি আমার কি করে গেলেন? তার মুখ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।

বিন্দুও কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—এ বয়সে লোকের ছেলে নেচে খেলে বেড়ায়, দুঃখের বার্ত্তা জানে না—এই কচি বয়সে বাছার এত দুর্দ্দশা—সবই তোমার কপালের দোষ, তা ছাড়া আর কি বলব?

নৃত্যকালী আবার বলিলেন—আরও দেখ, বিয়ে দিয়ে একটা পরের ছেলে ঘরে নিয়ে এলাম সেও কপালগুণে এমন হল? এই ত আমাদের অবস্থা দেখছে। এখন কোথায় নিজের চেষ্টাচরিত্র নিজে করবে, তা না বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আমাদেরই গলগ্রহ হয়ে বসে আছে। দু পাঁচ দিন কথায় কথায় বলেও দেখেছি, কথায় যেমনটি, কাজে তা কিছুই নয়। মেয়ের ভাগ্যে যে এর পর কি হবে তাও জানি নে।

বিন্দু বলিলেন—দেখ ছোটবৌ! তুমি রাগই কর আর যা কর এ কথাটি আমি তোমার মেনে নিতে পারি নে। তুমি এ বিয়ে দিয়েই অন্যায় করেছ। ও জামাই যদি নিজে রোজগার করে ঘরকন্না করবে মনে করত তা হলে কি কখন বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী ঘরজামাই হয়ে থাকতে আসত? এটা ত তোমরা বুঝলে না? ভাল করে দেখা না, শোনা না, পাঁচজনের পরামর্শ নিলে না, হঠাৎ একটা কাজ করে বসলে। সে এখন দিব্য আরামে আছে, কেন কষ্ট করতে যাবে? জানে, মেয়ের জন্যে আমার সকল উৎপাতই এরা সহ্য করবে।

কিরণ এতক্ষণ নীরবে বসিয়া শাক বাছিতেছিল। পিসিমার এই তীব্র সমালোচনা শুনিয়া তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। দুঃখে অভিমানে তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। সে আপনাকে সামলাইবার জন্য শাক বাছা ফেলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

পিসিমা তাহার রকম দেখিয়া অবাক হইয়া গালে হাত দিলেন। গৃহিণীও বিরক্ত হইয়া বলিলেন—মেয়ের রকম দেখছ একবার? আমিই কেবল ওর ভাবনা ভেবে মরছি, ও কি তা বোঝে? ও এখন আর সে কিরণ নেই। জামাইকে একটি কথা বললে মেয়ে একেবারে কেঁদে কেটে অনর্থ করবে।

তাহার পর একটু থামিয়া আবার বলিলেন—আর না হবেই বা কেন? এখন ত আর সে ছেলেমানুষটি নেই—বড় হয়েছে, স্বামী চিনেছে, এখন ওর সামনে তার স্বামীর নিন্দা করলে ত তার কষ্ট হবেই। আমাদেরই এটা অন্যায়।

গৃহিণী মুখে এ কথা বলিলেন বটে কিন্তু কার্য্যতঃ সকল সময় তাহা ঘটিয়া উঠিত না। তিনি মনে মনে জামাতার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন সুতরাং এখন তাহার ছোট বড় সকল ত্রুটিই তাঁহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহা তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, এখন সেইসকল সামান্য বিষয় লইয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ গজগজ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিরণের প্রফুল্ল মুখখানি ক্রমেই মলিন হইতে লাগিল। তবু সে প্রাণপণে ললিতকে এসকল অশান্তির বিষয় জানিতে দিত না। দুই একবার কথাপ্রসঙ্গে সে স্বামীকে কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, ললিত তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করে নাই।

সেদিন প্রভাত হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে ও মাঝে মাঝে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। নরেন কলিকাতায় গিয়াছে। জেলাকোর্টে তাহার মোকর্দ্দমা হার হওয়ায় সে তাহার পক্ষীয় উকীলের পরামর্শে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে। এইখানেই তাহার ভাগ্যপরীক্ষা শেষ হইবে।

নৃত্যকালী রন্ধনশালায় রন্ধন করিতেছেন ও কিরণ তাহার সাহায্য করিতেছে। অর্থাভাবে একে একে দাস-দাসীদের বিদায় দিতে হইয়াছে। ঝি দুইজন আগেই গিয়াছিল; আজ পুরাতন ভৃত্য রামচরণকে প্রভাতে জবাব দিয়াছেন। তাহার ছয় মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছিল। নৃত্যকালী বহু কষ্টে টাকাগুলি শোধ করিয়া সাশ্রুনেত্রে তাহাকে বলিলেন—"বাবা! এখন আমার সময় বড় মন্দ—তুমি এখন যাও—যদি কখনও দিন আসে তবে আবার তোমায়

ডেকে পাঠাব।" ভৃত্যও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছে। ঘোর দারিদ্র্য ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। অভাবের এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া নৃত্যকালীর অন্তর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল। দুইজনের কাহারও মুখে কথা নাই। দুজনে চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে নীরবে আপন আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছিলেন।

ললিত সকালে বেড়াইতে গিয়াছিল। বেলা বারোটার পর সে ফিরিয়া আসিল। প্রতিদিন তাহার ও নরেনের স্নানের যোগাড় করিয়া রাখা ও উভয়কে স্নান করান রামচরণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল। আজ যে সে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে ললিত তাহা জানিত না। সে স্নান করিতে গিয়া কিছু প্রস্তুত দেখিতে না পাইয়া বিরক্ত হইয়া রামাকে ডাকিতে লাগিল ও তাহার গাফিলতির জন্য অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল। গৃহিণী আজ সকাল হইতেই উত্তপ্ত হইয়া ছিলেন, সহসা তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি রন্ধনশালা হইতেই রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন—তেল মেখে পুকুরে গিয়ে দুটো ডুব দিয়ে এলেই ত হয়! এখানে আর রামা না হলে চান্ হয় না। বোনের বাড়ী কটা চাকর রাতদিন হামেহাল হাজির থাকত?

কিরণ ললিতের সাড়া পাইয়াই তাড়াতাড়ি উপরে যাইতেছিল; এই কথা তাহার কানে যাইবামাত্র সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ললিত যদি দ্বিতলের বারান্দা হইতে মার কথা শুনিতে পাইয়া থাকে তাহা হইলে সে কিরূপে আর তার কাছে মুখ দেখাইবে।

ললিত শাশুড়ীর কথা শুনিতে পাইয়াছিল। পূর্ব্বে সে কখনও কখনও ভাবভঙ্গীতে তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছে বটে কিন্তু অদ্যকার এ কঠোর আঘাতের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নৃত্যকালী নীচে আরও অনেক কথাই অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু আর কিছুই তাহার কানে যাইতেছিল না, কেবল তাহার কানে বাজিতেছিল—বোনের বাড়ী কটা চাকর হামেহাল হাজির থাকত? সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে যে অতি দীন হীন অপরের গলগ্রহমাত্র একথা এতদিন তাহার স্মরণে ছিল না। কি দারুণ মোহেই আচ্ছন্ন হইয়া ছিল! অপরে কৃপা করিয়া একমুঠি অন্ন তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে আর সে তাহাই আহার করিয়া এই ঘৃণিত জীবন ধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছে—জগতের সমক্ষে তাহার পরিচয় এই! ভাবিতে ভাবিতে তাহার মস্তক হইতে অগ্নি ছুটিতে লাগিল! যে এত ঘৃণিত, এত হীন, সে আবার পরের ভৃত্যের সেবা পাইতে বিলম্ব হইলে তাহাকে শাসন করিতে যায়! এ অপমান তাহার উপযুক্তই হইয়াছে! কাহারও দোষ নাই, তাহার নিজেরই সব দোষ। তাহার মধ্যে যে পুরুষত্বের অভিমান সুপ্তভাবে ছিল তাহা এই কষাঘাতে আজ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে! ললিত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যদি কখনও নিজের স্থান করিয়া স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারি তবেই আবার এ মুখ দেখাইব, নতুবা এই পর্য্যন্তই শেষ! এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র ললিত তীরবেগে ছুটিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে কিরণ দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া পথ আগলাইয়া পড়িল ও কাঁদিয়া বলিল—আমার মাথা খাও, রাগ কোরো না! মায়ের কি মাথার ঠিক আছে? মা যেন দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছেন! মাপ কর, রাগ কোরো না! রামা নেই; আমি তোমার নাইবার জল তুলে এনে দিচ্ছি, লক্ষ্মীটি নাইবে চল।

কিন্তু ললিতের তখন ঘোর অপমানের উত্তেজনায় মাথার স্থিরতা ছিল না। সে পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—কিরণ! যদি কখন মানুষ হতে পারি ত আবার দেখা হবে, নয় ত এই পর্য্যন্তই শেষ হল। তোমার অযোগ্য স্বামীকে ভুলে যাও!

কথা শেষ হইতে-না-হইতে ললিত চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

৫

দিন কাহারও জন্য আটকাইয়া থাকে না। নৃত্যকালীর সংসার ললিত চলিয়া যাওয়ার পরও চলিতেছে বটে কিন্তু কিরণ বুঝি থাকে না। সেদিন দ্বিপ্রহরে সেই অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় ললিত

চলিয়া গিয়াছে সেই হইতে সে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; কেহ ডাকিলে কথা কয় না, স্নানাহারের রুচি নাই, লক্ষ্যহীন উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে এক একবার চাহে আর স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া থাকে। সেদিন যখন ললিতের রাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, নৃত্যকালী তাহার ৪/৫ জন প্রজাকে দিকে দিকে জামাতাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ছুটাইয়া পাঠাইয়া দিলেন ও উপরে গিয়া মূর্চ্ছিত কিরণকে বহু যত্নে সুস্থ করিলেন; সেই দিন কেবল সে একবার কথা কহিয়াছিল। যখন সকলে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল কোথাও জামাই বাবুকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, সেই সময় সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া নৃত্যকালীর গলা জড়াইয়া বলিয়াছিল—তিনি রাগ করে চলে গেছেন, মা! আর ফিরে আসবেন না। মা! কি হবে?

নৃত্যকালী তখন তাহাকে সান্ত্বনা করিবেন কি, আপনি উচ্চস্বরে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তাহার 'পর হইতে কিরণ একবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কি সে মনে মনে ভাবে কাহাকেও কিছু বলে না, দিন দিন যেন ছায়ার মত বিছানায় মিশাইয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে ত্রিতলের ছাদে গিয়া দূর পথের শেষের দিকে চাহিয়া আপন মনে দাঁড়াইয়া থাকে। সে যদিও কাহাকে কিছু বলে না, তবু নৃত্যকালী বুঝিতে পারেন যে প্রতিদিনে প্রতিমুহূর্ত্তে সে যেন কাহার একটি কথার বা একটু সংবাদের জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ হইয়া আছে। তিনি তাহার অবস্থা দেখেন আর আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদেন—আহা বাছারে! তোকে কিনা অবশেষে আমি হাতে করে মেরে ফেললাম। আহা সে যে তাঁর কত যত্নের কত আদরের ধন! সে যে বড় দুঃখী! অজ্ঞানে মা হারাইয়াছে, বাপ থাকিতেও কখন একদিনের জন্য বাপের স্নেহ জানে না, কখন কাহারও কাছে আদর যত্ন পায় নাই, স্বামীর স্নেহ ও ভালবাসায় সে দুই দিনের জন্য সুখী হইয়াছিল, ক্রোধের বশে তিনি তাহার একি সর্ব্বনাশ করিলেন? আবার ললিতের উদ্দেশ্যেও তিনি প্রতিসন্ধ্যায় দেবমন্দিরে মাথা কুটিয়া আসেন—ওরে নিষ্ঠুর! ওরে পাষাণ! যে তোর জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছে একবার আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যা! আমার উপরে না হয় তুই রাগ করিতে পারিস, কিন্তু এমুখ কি করিয়া ভুলিলি?

চারিদিকে ললিতের অনেক অনুসন্ধান হইল; কলিকাতায় চারিদিকে, তাহার ভগ্নীর বাড়ীতে, কোথাও তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না। গ্রামের যে প্রবীণ কবিরাজ কিরণের চিকিৎসা করিতেছিলেন তিনি নৃত্যকালীকে বলিলেন—মা! আমি ঔষধ দিতেছি বটে কিন্তু ইহা মানসিক ব্যাধি, ঔষধে কিছু হইবে না। যদি শীঘ্র আপনার জামাতার সন্ধান না পাওয়া যায় তবে ইহার জীবনসংশয়। ইহার জীবনশক্তি ক্ষয় হইয়া আসিতেছে।

নৃত্যকালীর সংসার বিন্দুঠাকুরঝি দেখিতেন, নৃত্যকালী কিরণকে লইয়া উপরে পড়িয়া থাকিতেন। তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দিন দিন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। এই পরিবার যখন এইরূপে চুতর্দ্দিক হইতে রোগ শোক অভাব দুঃখের ভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তখন একদিন সহসা দেবতার আশীর্ব্বাদের মত সুসংবাদ লইয়া হাসিমুখে নরেন আসিয়া বলিল—মা! হাইকোর্টের মামলায় আমাদের জিৎ হয়েছে! জজসাহেব বলেছেন—বলিতে বলিতে কিরণের শীর্ণ ম্লানমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে অবাক হইয়া বলিল—একি মা? বোনটির কি হয়েছে?

যে মামলার ফলাফলের উপর তাঁহাদের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছিল তাহাতে জয়ী হইয়াছেন শুনিয়া আজ নৃত্যকালীর আহ্লাদ হইল না। তিনি কাঁদিয়া বলিলেন—ওরে নরেন, তোর যা কিছু আছে সব ললিতকে লিখে দেবো, তুই তাকে ফিরে আন্! তার জন্যে আমার সব যেতে বসেছে!

নরেন যখন একে একে সব কথা শুনিল, তখন তার চোখ দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে কিরণের কাছে আসিয়া ডাকিল—বোনটি!

কিরণ মুখ তুলিয়া চাহিল—তার মাথাটি ঘুরিয়া গিয়া নরেনের বুকে পড়িল। দাদার স্নেহের কোলে মুখ লুকাইয়া কিরণ বহুদিন পরে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। নরেন নিজের চোখ মুছিতে মুছিতে তাহাকে বলিল—তুই কিছু ভাবিসনে বোনটি! আমি যখন এসেছি তখন তোর কোন ভাবনা নেই। আমি আবার শীঘ্র কলিকাতায় যাব। যেখানেই থাকুক তাকে খুঁজে বের করে সঙ্গে নিয়ে তবে বাড়ী আসব। সে কতদিন লুকিয়ে থাকবে?

তিনচার দিন পরে একদিন বিকালে কিরণ নিজের ঘরে জানালার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় হাসিতে হাসিতে নরেন আসিয়া বলিল—বল দেখি বোনটি! আজ কি এনেছি?

কিরণ কিছু না বলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে দাদার বদ্ধমুষ্টির দিকে চাহিয়া রহিল। কোন বিষয় জানিতে বা কথা কহিতে তাহার কোন কৌতূহল বা উৎসাহ ছিল না। তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া নরেন হাসিয়া বলিল—বলতে পারলিনে? আচ্ছা আমি বলছি—বলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিল—ললিত খবর দিয়েছে—তোকে চিঠি লিখেছে। আমি ত বলেছিলাম কতদিন সে লুকিয়ে থাকবে? কিন্তু তুই এমনি ছেলেমানুষ, দেখ দেখি ভেবে কি হয়ে গেছিস?—বলিয়া গভীর স্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া কোলের উপর চিঠিখানা ফেলিয়া দিয়া নরেন বাহির হইয়া গেল।

কিরণের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া গেল। কতক্ষণ সে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় জানালা ধরিয়া ঝুঁকিয়া রহিল। এও কি আবার সম্ভব? যাহার আজ ছয় মাসের মধ্যে কোন সংবাদ না পাইয়া সে একেবারে আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল, আজ তাহারই সংবাদ আসিয়াছে! তবে ত তিনি কিরণকে একদিনের জন্যও ভোলেন নাই? মৃদু মৃদু বাতাসে তাহার অবসন্ন দেহ একটু প্রকৃতিস্থ হইলে সে কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠিখানা খুলিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

মির্জ্জাপুর

আমার কিরণ! আজ কতদিন পরে তোমায় চিঠি লিখছি। যেদিন দুর্জ্জয় অভিমানের বশে তোমায় ফেলে চলে এসেছিলাম তার পরে কতদিন কেটে গেছে। আমি কিন্তু একদিনের জন্য তোমার সেই কাতর মুখখানি ভুলতে পারিনি। জানি আমি আমার সংবাদ না পেয়ে তুমিও যে কি কষ্টে দিন কাটাচ্ছ। কিন্তু আজ সেসব কথার দিন নয়। যেদিন আবার আমরা দুজনে মিলব সেই দিন দুজনেই পরস্পরের কথা বলব ও শুনব। আর সে দিনটির যে বেশি দেরি নেই সে কথা মনে করেও আমার অন্তর আনন্দে নৃত্য করছে।

সেদিন আমি অকূলে ভেসেছিলাম; ভগবানের কৃপায় কূল পেয়েছি। যাত্রাকালে তোমার মুখ দেখেছিলাম তাই যাত্রা শুভ হয়েছিল। আমার কোন কষ্ট হয়নি। আমি প্রথমে কলিকাতাতেই আসছিলাম। ঘটনাক্রমে গাড়ীতে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। কথায় কথায় তিনি বললেন, মির্জ্জাপুরে তাঁর বৃহৎ কারবার; কলিকাতাতে ও অন্যান্য স্থানে শাখা আছে। তিনি নিজে মির্জ্জাপুরে থাকেন ও মাঝে মাঝে আর সব স্থানে গিয়ে তত্ত্বাবধান করে আসেন। মির্জ্জাপুরে তাঁর একটি ইংরেজী-জানা লোকের দরকার। সাহেব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা ও ইংরেজীতে চিঠিপত্র লেখা, এইসব কাজের জন্য তিনি উপস্থিত ১৫০৲ টাকা বেতন দিতে ও বাড়ী দিতে সম্মত আছেন। আমায় তিনি বললেন যে এই কাজটি করতে পারে এমন কোন লোক আপনার সন্ধানে আছে কি? আমি বললাম লোক নেই বটে, তবে আমি নিজে করতে প্রস্তুত আছি। তারপরে তার সঙ্গে এই সুদূর পশ্চিমে চলে এসেছি।

তুমি হয়ত এইবার রাগ করে বলবে তবে এতদিন কেন সংবাদ দাওনি? কেন দিইনি তা লিখছি। তোমার বোধ হয় মনে আছে একদিন সন্ধ্যার সময় মা বিন্দুপিসিমার কাছে দুঃখ

করছিলেন যে এমন দুঃসময়ে বিবাহ দিলাম যে আমার কিরণকে একখানি গহনা দিতে পারলাম না। সেই কথা মনে পড়ায় আমি এ ছয় মাস অপেক্ষা করে বেতনের টাকা জমিয়ে দিদিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি সেখান থেকে নূতন ফ্যাসানের গহনা গড়িয়ে তোমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের হাতে এবারে গিয়ে তোমায় সাজাব সাধ আছে। এই সাধটুকুর জন্যে এতদিন এত কষ্ট সহ্য করেছি। এক এক সময় মনে হত আমি কি নিষ্ঠুর—যে আমাগতপ্রাণা সরলা আমি ভিন্ন জানে না, তাকে আমি বিনাদোষে কি যাতনাই দিচ্ছি। কতদিন তোমার মুখ মনে পড়ে নির্জ্জন ছাতে একলা বসে কত যে কেঁদেছি তা আর কি বলব। আমার কিরণ! এইবার আমাদের সব দুঃখের অবসান হয়েছে। বৈশাখ মাসে এসেছি—আজ আশ্বিন মাস পড়ল। আর ১৫দিন পরে আমার পূজার ছুটি পড়বে। এই ছুটিতে গিয়ে তোমাকে এখানে নিয়ে আসব। তার পর থেকে আমাদের বাধাহীন মিলনের পথে আর কোন অন্তরায় থাকবে না।

এখানে আমি যে বাড়ী টি পেয়েছি যদিও ছোট কিন্তু বড় সুন্দর; চারিদিকে বাগান, মাঝে লতাপাতা-ঘেরা ছবিটির মত বাড়ীখানি। আমি মনের মত করে বাড়ীখানি সাজিয়েছি। আর আমাদের নূতন সংসারের সব গুছিয়ে রেখেছি। এখন কেবল দিন গুণছি কবে আমার হৃদয়ের রাণীকে আমার এ গৃহস্থালীর মধ্যে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করতে দেখব। আমার জীবনের ধ্রুবতারা তুমি—তোমার বিহনে আমার এসব সজ্জা অঙ্গহীন অশোভন হয়ে রয়েছে—এস আমার লক্ষ্মী—তোমার মঙ্গল চরণস্পর্শে আমার এ শূন্য গৃহ পূর্ণ হয়ে যাক!

মাকে আমার প্রণাম জানিও। তাঁর আশীর্ব্বাদেই আমি আমার কল্যাণের পথ খুঁজে পেয়েছি। নরেনের কি খবর? তার মোকর্দ্দমার কি হল? তুমি আমার অন্তরের ভালবাসা জানবে। আজ তবে আসি। আর ১৫ দিন পরে আবার আমাদের দেখা হবে। ইতি—

তোমার ললিত।

দেখিতে দেখিতে এ শুভসংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। গৃহিণী হাসিয়া কাঁদিয়া গ্রামের প্রত্যেক দেবমন্দিরে নানা উপচারে পূজা পাঠাইয়া দিলেন। গ্রামের লোক এ খবর ভাল করিয়া জানিবার জন্য জমীদার বাড়ীতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু কিরণের রুগ্ন শরীরে অপ্রত্যাশিত আনন্দের কোপ সহ্য হইল না। রাত্রি হইতে তাহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। শেষ রাত্রে অতিশয় কম্প দিয়া প্রবল জ্বরে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কবিরাজ নাড়ী দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন, বলিলেন, এ জ্বরত্যাগের সময় কি হয় বলা যায় না। নরেনকে বলিলেন—তুমি ত ললিতের ঠিকানা পাইয়াছ, তাহাকে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দাও, যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তবে যেন সংবাদ পাইবামাত্র চলিয়া আসে। নরেন বালকমাত্র—পূর্ব্বদিন ললিতের চিঠি দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে ভাবিয়াছিল এইবার তাহাদের সমস্ত কষ্ট ও উদ্বেগ দূর হইল, আজ এই নির্ঘাত কথা শুনিয়া সে একবারে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল, পরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল—কবিরাজ মশায়! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি ও কথা বলবেন না, আমার বোনটিকে বাঁচান।

দুইদিন অচেতন থাকিবার পর তৃতীয় দিনে কিরণের জ্ঞান হইল। সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নরেন ও কবিরাজ মহাশয় তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। নৃত্যকালীর উচ্চক্রন্দন ও নানাছন্দের বিলাপ কোনমতে নিরস্ত করিতে না পারিয়া বিন্দু তাঁহাকে কিরণের ঘর হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়াছিলেন। কিরণ কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া নরেনকে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল—দাদা!

নরেন কাছে আসিয়া বলিল—কেন বোনটি?

"দাদা! পূজোর ছুটি হয়েছে কি?"

নরেন চোখ মুছিয়া বলিল—হয়েছে বই কি বোনটি! ললিত এল বলে!

কিরণ আর কথা বলিল না। শান্তির গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

এই সময় উদ্দাম ঝড়ের মত ছুটিয়া ললিত ঘরে প্রবেশ করিল। বারাণ্ডায় তাহাকে দেখিয়া গৃহিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—ওরে! এমনি করেই কি মেরে ফেল্‌তে হয়রে? আমার সোনার প্রতিমা কিরণ—

বিন্দু তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

ললিত কোনদিকে না চাহিয়া পাগলের মত ডাকিল—কিরণ! কিরণ!

তাহার উদ্‌ভ্রান্ত বিকৃত কণ্ঠস্বর কক্ষময় প্রতিধ্বনিত হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। কিরণের তখন পূজার ছুটি হইয়া গেছে।

ফুলের তোড়া ।। শ্রী ইন্দিরা দেবী

পূজার ছুটি উপলক্ষে কোর্ট বন্ধ হইল। চোগা চাপকান ফেলিয়া বাঁচিলাম। এইবার একবার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ শরীরটাকে মেরামত করিয়া লইতে হইবে।

অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল বাঁকীপুরে চিঠি লিখিয়া জানিতে হইবে সেখানে যাওয়া চলিবে কি না। প্লেগের জন্যই কাকা মহাশয়ের ভয়। যামিনী আমার বন্ধু, সে এখন বাঁকীপুরে ডেপুটী। প্রায় আট বৎসর সে ঐখানেই অচল হইয়া বসিয়া আছে। তাহাকেই চিঠি লিখিলাম—জল বায়ুর কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম—সেটা যদি নিরাপদ হয়, তবে আমার জন্য সুবিধামত একটি ব্াসা সে খুঁজিয়া দিতে পারে কি না তাহাও জানাইতে কহিলাম। পত্রের উত্তর আসিল। যামিনী আমার বাসা খুঁজিয়া দিবার অনুরোধে অভিমান করিয়াছে। লিখিয়াছে, শীতের আরম্ভে প্লেগের প্রকোপ সেখানে কমই থাকে, এখন শরীর ।রিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। তাহার বাটীতে যতদিন ইচ্ছা আতিথ্য গ্রহণের জন্য সাদর নিমন্ত্রণে পত্রের উপসংহার করিয়াছে।

দেবীপক্ষে যাত্রার দিনক্ষণ দেখিবার প্রয়োজন হয় না। টিকিটের কন্‌সেসনও আরম্ভ হইয়াছিল। জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া দুইদিন পরেই যাত্রা করিলাম।

বাঁকীপুর স্টেশনে যামিনীর পুত্রদ্বয় শ্রীমান মৌলিভূষণ ও ময়ূখভূষণ আমায় অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য পিতার আর্দ্দালীর সহিত প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া ছিল। ডেপুটী যামিনী বাবুর বাড়ী আমি যাইব শুনিয়া ছেলে দুটি আমায় প্রণাম করিয়া "কাকা বাবু" বলিয়া দুইদিক হইতে দুইখানা হাত দখল করিয়া ফেলিল। আর্দ্দালী, কুলী ডাকাইয়া জিনিষপত্র নামাইয়া লইল। প্রণাম ও সম্বোধন সম্বন্ধে বোধকরি পূর্ব্বাহ্ণেই ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া ছিল, কারণ তাহারা আমায় আর কখনও দেখে নাই। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি আর একবার এখানে যামিনীর বাসায় আসিয়াছিলাম, তখন ময়ূখ ওরফে মণ্টু জন্মগ্রহণ করে নাই; মুলী তখন মাস কতকের শিশুমাত্র! ছেলেদুটিকে আদর করিয়া চুম্বন করিলাম—যেন দুটি ননীর পুঁতুল! যামিনীর সন্তান-ভাগ্য ভাল। একটা উচ্ছ্বসিত বেদনার নিঃশ্বাস রোধ করিতে পারিলাম না। সেইটি—যামিনীর সেই প্রথমকারটি—সে আজ কোথায়? সে আমায় ভাল করিয়াই চিনিত; যদি বাঁচিয়া থাকিত, সেও কি স্টেশনে আসিত না? তেমন রং, তেমন গঠন হাজারে একটা চোখে পড়ে না। মুখখানিও ছিল নিখুঁত সুন্দর! কি মিষ্টই ছিল তার হাসিটুকু আর কথাগুলি! মনে হয় যেন সেদিনের কথা—কিন্তু তাহা পাঁচ বৎসর হইয়া গিয়াছে।

গাড়ী স্টেশনের পথ ছাড়াইয়া বাড়ি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শ্রীমান্ মুলী ও মণ্টুর সহিত আমার সখ্য গাঢ় হইয়া উঠিল। তাহাদের কয়টি পায়রা, কতগুলি বিড়াল ছানা, খাঁচায় বদ্ধ মনুয়া নীলকণ্ঠ পাখীর অদ্ভুত ইতিহাস—কিছুই আর আমার অজ্ঞাত রহিল না। মণ্টু যখন আধ-আধ বাধ-বাধ ভাষায় তাহার নাম বলিল—অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া মুলী তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিল, "ভাইটি ছেলেমানুছ কি না তাই ময়ূখ বলতে পারে না, ময়ূছ বলে!" মৌলির বয়স এখন ছয়, সুতরাং তাহার নাম বলিতে বাধিল না—ছিযুক্ত বাবু মৌলিভূষণ।

আমি যখন বাড়ি আসিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাহাদের জন্য আনীত-টিনের মোটরকার, রবারের বল, কাঠের ঘোড়া বাহির করিয়া দিলাম, তখন কাকাবাবুর প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার আর অন্ত রহিল না।

২

যামিনীর বাসাটি হাল ফ্যাসানের বাংলা। দেয়ালগুলি পাকা ইঁটের গাঁথনি, সাদা চূণকাম করা, ছাদ রাঙ্গাটালীর ছাওয়া। বাড়ীর চারিধারে বাগান, মাঝেমাঝে চলন পথ, কোথাও চাকরদের ঘর। পশ্চাদ্দেশে আস্তাবল। বাগানের বাহিরে সরকারী রাস্তা। রাস্তার অপর পারে দুইচারিখানা খোলার ঘর। তাহার পশ্চাতে প্রকাণ্ড আম বাগান। গ্রীষ্মকালে বানর তাড়াইয়া ফল রক্ষা করিবার জন্য ঝুপড়ি বাঁধিয়া মালী বাগানে আসিয়া বাস করে, এখন মাটির দেওয়াল ফুসের চাউনি ছোট ছোট ঝুপড়িগুলা খালি পড়িয়া আছে। খোলার ঘর কয়খানার মধ্যে একখানা মুদীর দোকান, একখানা পাণওয়ালার দোকান, বাকী দুইখানা লইয়া যামিনীর বাগানের মালীর বাড়ী। মালী বুড়া মানুষ, তাহার উপর বাতে পঙ্গু—কাজ কর্ম্ম কিছুই করিতে পারে না। বাগানে ঘাস গজাইয়া জঙ্গল হইয়া উঠিলে একবার নগ্‌দা মজুর লাগাইয়া বাগান সাফ করাইয়া লওয়া হয়। ফুলগাছগুলা জলাভাবে অনেক সময় শুকাইয়া যায়—ধরিত্রীর স্নেহে তাহারা যতটুকু জীবনরস সঞ্চয় করিতে পারে, সেইটুকু মাত্র তাহাদের খোরাক। সে বার যখন আসিয়াছিলাম, যামিনীর তখন বাগানের ভারি সখ ছিল। তেমন গোলাপ আর কাহারও বাগানে ফুটিত না, ততবড় মল্লিকা বেহারে আর কোথাও ছিল না।—এখন তাল পুকুরের নামের মত "ডেব্‌টি সাহেবের" বাগানের নামই আছে—সে সব অতীতের চিহ্ন আর কিছুই নাই।

এবার আসিয়া অবধি যামিনীর একটু পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম। পূর্ব্বের সে হাসিখুসী তাহার আর নাই—যেন কিছু গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। আমি যখন মুলী মন্টুর সহিত সমবয়সী সাজিয়া পূরা উৎসাহে খেলায় যোগ দিতাম—যামিনী গম্ভীরমুখে উদাসীনের মত বসিয়া দেখিত, উৎসাহ দেখাইত না যোগও দিত না। মণ্টু আধ আধ সুরে—"লাম লহিম না জুদা কলো দিল্‌কো সাচ্চা লাখো জী—দেছেল কথা ভাব ভাইলে দেছ আমাদেল মাতা জী" গাহিয়া শুনাইত, মুলী তাহার উচ্চারণ ভ্রম সংশোধন চেষ্টায় বিপন্ন হইয়া পড়িত। আমি হাসি খেলায় যোগ দিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতাম। শেষে চাহিয়া দেখিতাম যামিনী তাহার দুই উদাসনেত্র রাস্তার ধারের তেঁতুল গাছটার উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া আছে; এ সব আনন্দের কল্লোল কোলাহল তাহার অন্তরে কোন উচ্ছ্বাস জাগাইতে পারে নাই। হয়ত তখন আর একখানি মধুর মুখের করুণস্মৃতি তাহার মনের মাঝে ফুটিয়া থাকিত। চারুর কথা সে একদিনও তুলে নাই, তাহার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই সে করিত না। সে যখন দুপুর বেলা কাছারীতে আবদ্ধ থাকিত, তখন কোন কোন দিন অন্তঃপুর হইতে চারুর মার করুণ ক্রন্দনের মৃদুধ্বনি আসিয়া আমার বুকেও একটা অস্ফুট ব্যথা জাগাইয়া তুলিত। কিন্তু যামিনীর বাক্যালাপে তাহার এতটুকুও আভাস কোন দিন শুনিলাম না। তাহার হৃদয়ের ক্ষত যে কতখানি গভীর—তাহার অন্তরলীন উচ্ছ্বাসহীন শোকই তাহার পরিচায়ক।

কিছুদিন হইতে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম। প্রতি সন্ধ্যায় যখন দিকচক্রবালে সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখাটুকুও মিলাইয়া গিয়া, ধরণীর বক্ষে ছায়া ফেলিয়া অন্ধকার নামিয়া আসিত, "ভীখণ দাসের" ঠাকুরবাড়ীতে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘন্টা বাজিয়া উঠিত, ঘরে ঘরে দীপ জ্বালিয়া দিত, তখন সহস্র কার্য্য ফেলিয়াও, যামিনী তাহার রাস্তার ধারের বারান্দাটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। তাহার দৃষ্টির অনুসরণে আমিও কত দিন সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি। মালীর ঘরের ঠিক সম্মুখে রেলিংঘেরা একটুখানি জমির ভিতর

গাঁদাফুলের কেয়ারি করা গাছের মধ্যে ছোট একটি পাথরের ঢিবি। কতদিন সেটির দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি, হিন্দিতে কোন মৃতের নামও সে স্মারকস্তম্ভে লেখা আছে। গাঁদাফুলের প্রাচুর্য্য বশতঃ সহজেই সেদিকে লোকের চক্ষু আকৃষ্ট হয়। প্রতি সন্ধ্যায় হলুদ রঙের কাপড় পরা, ফাঁদি নথ নাকে একটি ছোট মেয়ে তার ভূষণবিহীন হাতখানিতে একটি মৃৎ-প্রদীপ জ্বালিয়া ঢিবির উপর আলো রাখিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত। কোথায় যাইত তাহাও দেখিতে পাইতাম। দৃশ্যটি করুণ। হয়ত ঐ স্তম্ভটি উহারই কোন প্রিয়জনের পুণ্যস্মৃতির তীর্থভূমি। কিন্তু যামিনী ইহাতে এমন কি রস পায় বুঝিতে পারিতাম না। প্রতিদিন দেখিয়াও তাহার আশা মেটে না!

একদিন যামিনীকে ধরিয়া বসিলাম, "ব্যাপার কি বল দেখি? মেয়েটি রোজ ওখানে আলো দেয় কেন? ও মালীর নাত্নী না?"

যামিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ওর বাপের স্মৃতি ওরই ভিতর ঘুমিয়ে আছে, যমুনা তাই রোজ আলো দিয়ে যায়।"

আমি কহিলাম, "আহা। বড় দুঃখেব বিষয় ত! যমুনা বল্লে বুঝি মেয়েটির নাম? তা যমুনা ছাড়া বুড়োর আর কেউ নেই?"

ঘটির গলায় দড়ি বাঁধিয়া ঐ ছোট মেয়েটিকেই কূপ হইতে জল তুলিতে দেখি, পথের ধারে পোড়া বগনো লইয়া মাজিতে দেখি, আর কাহাকেও কখনও দেখি নাই—তাই একটুখানি বিস্ময় বোধও করিয়াছিলাম।

যামিনী মুখ ফিরাইয়া কহিল, "না ওদের আর কেউ নেই। ওরাই দুজনে পরস্পরের অবলম্বন।"

মনে হইল আমার প্রশ্নে যামিনী যেন ব্যথা পাইয়াছে, কিন্তু কারণ বুঝিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওদের কি হয়েছিল?"

যামিনী বলিল, "সে শুনে কি কর্‌বে? সে বড় দুঃখের কাহিনী।"

মনের কৌতূহল আমি দমন করিতে পারিলাম না। সে কাহিনী শুনিবার জন্য আগ্রহ জানাইলাম।

যামিনী উঠিয়া লম্বা দালানটা বার দুই এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিক্রমণ করিয়া আসিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিল। কহিল, "শোন তবে"—

৩

যামিনী বলিতে লাগিল—

আট বৎসর পূর্ব্বে বক্‌সার হইতে বদলী হইয়া আমি যখন এখানে আসিলাম, তখন সঙ্গে ছিল আমার স্ত্রী আর আমার মেয়ে চারু। এই বাড়িতেই আমি প্রথম আসিয়া উঠি; আর তখন হইতেই ঐ বুড়া গোকুল আমার বাগানের মালী। তখন সে একা নয়—তাহার স্ত্রী ও পুত্র সীতারাম তাহার সঙ্গে ছিল। সীতারামেরও বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু তাহার স্ত্রী তখন পিত্রালয়ে—আসন্নপ্রসবা।

গোকুল তখন পূর্ণ উৎসাহে যুবকের ন্যায় কাজ করিত। সীতারাম বাপের সাহায্য করিত। তাহাদের কাজের পরিচয় আমার বাগান দেখিয়াই লোকে বুঝিতে পারিত। ছেলেটি যেমন কর্ম্মদক্ষ তেমনি বুদ্ধিমান ও বিনয়ী। আমরা সকলেই তাহাকে স্নেহ করিতাম। আমার চারুকে সে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছিল। সীতারাম নহিলে তাহার দুধ খাওয়া হইত না, পোষাক পরা চলিত না, বেড়াইতে যাইবার সময়ও তাহাকে প্রয়োজন হইত। রাত্রে গল্প বলিবার জন্য, ঘুমাইবার সময়ও "সীতারাম ভাইয়া"র তলব পড়িত।

ক্রমে চারুকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য আমরা খুব মনোযোগী হইয়া উঠিলাম। বালিকা বিদ্যালয়ে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। সন্ধ্যায় মাস্টার আসিয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিল। "সীতারাম ভাইয়া" তাহাকে স্কুলে পৌঁছিয়া দিয়া আসিত, সঙ্গে করিয়া বাড়ি আনিত। এইরূপ কিছুদিন যায়। একদিন সীতারামের মার কান্না শুনিয়া খবর লইয়া জানিলাম, সীতারামের 'নক্‌রী' হইয়াছে, সে মুঙ্গের যাইবে। ভারী নাকি মান্যের কাজ, সে জমাদারের পদ পাইয়াছে। খবর শুনিয়া খুসী হইলাম। ছেলেটি ভাল, ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। চারুর জন্য ভাবনাও হইল। বুঝি মনে মনে একটুখানি আনন্দও হইয়াছিল—খেলা গল্পের লোভ কমিলে লেখাপড়ায় তাহার চাড় হইবে।

একদিন সকাল বেলা, নূতন জামা টুপী ও ময়লা কাপড়ে সাজিয়া আমার পায়ের কাছে দীর্ঘচ্ছন্দে এক প্রণাম করিয়া, "খোকীদিদির" কাছে বিদায় লইয়া সীতারাম মুঙ্গের চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, চারু জানালার উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া তাহাকে দেখিতেছিল। যখন গাছের ঝোপে, মোড়ের বাঁকে আড়াল পড়িয়া আর "ভাইয়া"কে দেখা গেল না, তখন সে ছল ছল নেত্রে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

তার পর কিছুদিন ধরিয়া চারুর অকারণ বিদ্রোহ থামাইতে দাসী চাকরদের কষ্টের শেষ রহিল না। দিনরাত নানা ছুতায় কান্না বাহানায় বিরক্ত হইয়া চারুর মা আমার কাছে নালিশ করিতেন, "মেয়েকে কিছু বল্‌বে না—এর পর সামলাবে কেমন করে?" আমি জানিতাম কেন সে কাঁদে। স্ত্রীকে প্রবোধ দিতাম, "ভয় নেই বড় হলে আপ্‌নিই সেরে যাবে—এক আধ বার কাঁদ্‌তে না পেলে ছেলেমানুষ পারবে কেন?"

সময়ে সীতারামের অভাব দুঃখ চারুর মন হইতে কমিয়া আসিল। লেখাপড়ার নূতন উৎসাহে মাতিয়া মালীর বাড়ী যাতায়াতও সে প্রায় বন্ধ করিল। আমরাও হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেই সময়ই বোধ হয় তুমি তোমার কাকার মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধানে এখানে আসিয়াছিলে। আমি তখন অন্তরে বাহিরে পুরাদস্তুর "সাহেব"। সাহেবী ধরণে পা ফাঁক করিয়া চুরুট খাওয়া হইতে হাঁচি কাসিটির অনুকরণেও ভুল করি না। তাই চারুর উজ্জ্বলবর্ণ ও বিশেষ তাহার কটাচুল আমার গর্ব্বের বিষয় ছিল। চারুর মা অনেক বিখ্যাত ও অখ্যাত কেশ তৈলে তার কটা চুলের দোষ ক্রটি সংশোধন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলে তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলিতাম, "চারুকে তোমার শিক্ষা থেকে রেহাই দাও। তোমার নিজের উপর যত ইচ্ছে অত্যাচার কর কেউ বাধা দেবে না, ওকে আমার পছন্দ মত করে মানুষ করে তুল্‌তে দাও।" স্ত্রী রাগ করিয়া বলিতেন, "এর পর যখন কটাচুলো বলে কেউ পছন্দ কর্‌বে না তখন মেয়েকে বিবি করবার মজা টের পাবে।" আমি তাঁহার শাসনে ভয় না পাইয়া হাসিতাম।

স্ত্রীকে নিভৃতে একদিন কহিলাম, "চারুকে আমি সাহেব সুবার কাছে বার্ করবার মতো করে গড়ে তুল্‌ব,—দোহাই তোমার, তুমি ওর উপর শত্রুতা সাধ্‌তে এস না।" স্ত্রী শুনিয়া প্রথমে অবাক হইয়া গেলেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন রাগ করিতেন—অবশেষে হাল ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ফলে আমার ইচ্ছাই জয়ী হইল।

চারুকে আমি আমার আদর্শের মত করিয়াই গড়িয়া তুলিতেছিলাম। ছয় বৎসরের মেয়ে, তেমন ইংরাজী সুরে কথা বলিতে বাঙ্গালীর ঘরে খুব কমই পারে। তবু আমি জানিতাম, সে তাহার মায়ের নীতি পদ্ধতিই পছন্দ করে। সে পা ঢাকিয়া শাড়ী পরিতেই ভালবাসিত, কিন্তু আমায় খুসী করিবার জন্য খাটো ফ্রক, জুতা মোজা পরিয়া থাকিত।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যামিনী হঠাৎ চুপ করিল। তাহার মুখ পানে চাহিয়া দেখিলাম—চক্ষু দুটিতে জল ভরিয়া আসিয়াছে। তাহা দেখিয়া আমারও চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

এই সময় এক চাপরাসী কি কতকগুলা কাগজপত্র আনিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যামিনী সেগুলা পড়িয়া, হুকুম লিখিয়া দিল। এই কার্য্যে পাঁচ সাত মিনিট অতিবাহিত হইল।

৪

চাপরাসীটা চলিয়া গেলে দেখিলাম, যামিনী অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। আবার সে বলিতে আরম্ভ করিল—

একদিন খবরের কাগজে পড়িলাম, মুঙ্গেরে এক ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে নৌকায় জল বিহারকালে ঘূর্ণি জলে পড়িয়া যায়। সেখানটায় নাকি প্রকাণ্ড এক দহ ছিল, আর সে দহের সম্বন্ধে অনেক ভৌতিক প্রবাদও প্রচলিত ছিল, তাই মাঝি মাল্লা কেহ তাহাকে তুলিতে জলে নামে নাই! জমাদার সীতারাম নদী তীরে সেই সময় সরকারী কাজে নৌকা ডাকিতে আসিয়া, সেই অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সাহসে ঘূর্ণি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বালককে উদ্ধার করে। সেই সাহসী পরোপকারী যুবাকে গবর্ণমেন্ট "সম্মানের মেডেল" পুরস্কার দিয়াছেন। সংবাদটা আমি তৎক্ষণাৎ চারুকে ডাকিয়া শুনাইলাম।—তাহার চক্ষু দুইটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তখন বড়লাট সাহেবের বাঁকীপুরে আসিবার দিন সন্নিকট। সারা সহরটা সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। মিউনিসিপালিটি দীর্ঘকালের নিদ্রা ভঙ্গের পর বহুদিনের কর্ত্তব্যের ক্রটি দুই দিনে সারিয়া ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মেরামত করার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। চিরদিনের সঞ্চিত ধূলা, চন্দনের ছড়ার পরিবর্ত্তে তৈল জলে সিঞ্চিত হইয়া গেল। বড় বড় বাড়ী চূণকামের নূতন পোষাক পরিয়া লইল। স্টেশন হইতে পথের উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক বাড়ী ও দরজার মাথায় দেবদারু পাতার মালা টাঙ্গান হইল। কেহ কেহ দরজার দুই ধারে কলাগাছ দিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন। "লাইনের মাঠে" আলো দিবার ও বাজী পোড়াইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। দেশের ছেলেমেয়েদের বাজী দেখিবার আনন্দে অনিদ্রা রোগ জন্মাইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। লাট সাহেবের গমন পথের দুই ধারে পুলিশ অফিসাররা কোথাও ছদ্মবেশে কোথাও স্ব-মূর্ত্তিতে সতর্ক হইয়া রহিলেন।

এই উপলক্ষে পোষাকের দোকানের দর্জ্জি মিঞা সাহেবদের কদর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। বাবু সাহেবদের ফরমাসী পোষাক তৈয়ারি করিয়া, তাহারা আর আহার নিদ্রার অবসর পায় না। কলিকাতা হইতে আমিও চারুর জন্য এক প্রস্থ পোযাক আনাইলাম। চারুর মা সঞ্চয়-নীতির চিরন্তন নিয়মানুসারে পোষাক দেখিয়াই অপছন্দ করিলেন। "এত খাটো—এ ত দুমাসও পর্‌তে পাবে না! মেয়ে ত দিন দিন তালগাছই হচ্চে—আর কি ঐ ঠ্যাং বেরকরা ফ্রকে মানায়? কি যে তোমার পছন্দের শ্রী! নীলাম্বরী শাড়ীখানি পরে জ্যাকেট গায়ে দিলে খাসা মানাত। খামখা কতকগুলো পয়সা জলে ফেলা—যেন খোলামকুচি!" অবুঝকে বুঝাইবার বৃথা পরিশ্রম না করিয়া কহিলাম, "হোক, একটা মেয়ে বইত নয়! কতই আর ওর জন্যে খরচ কর? না হয় এবারটা কিছু লোক্‌সানই করলে।"—স্ত্রী অবশ্য বুঝিলেন না।

চারুকে কহিলাম, "ফুলঝরিয়ার কাছে গিয়ে পোষাকটা পরে আয় ত চারু, কেমন দেখায় আমি আগে দেখি।" মেয়ে তার সাজ সজ্জা লইয়া চলিয়া গেল। ফিরিতে তাহার বিলম্ব দেখিয়া নিজেই খোঁজে গেলাম।

সেখানে গিয়া শুনিলাম, মুদি তামাসা করিয়া সীতারামের মাকে বলিয়াছে, "তোমার সীতারাম আস্‌চে যে। তাই এ সব হচ্চে। কোম্পানী বাহাদুর তাকে বিলেত থেকে নিজের হাতে তক্তি পাঠিয়ে দিয়েচে—আর দেশের লোকে আলো দেবে না—ধূম ধাম কর্‌বে না? কত বড় বীর তোমার ছেলে!"—বুড়ী সেই কথা সত্য মনে করিয়া সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহা শুনাইতেছে।

সীতারাম যে কাল দেশে আসিবে, এ খবর আমিও চারুর কাছে খুব কম পঞ্চাশ বার শুনিয়াছি। সীতারামের মা তাহার জন্য কত রকম পিঠা, কত প্রকার ব্যঞ্জন আর কি যে সব তৈয়ারী করিতেছে—সে কথাও আমার আর অজ্ঞাত নাই। কিন্তু আমার তখন সীতারামের ভাবনার চেয়ে অনেক বেশী ভাবনা রহিয়াছে, চারু কেমন করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট অভিনয়টুকু সম্পন্ন করিবে। হাজার বার পরীক্ষা দিয়া দিয়া চারুও ক্রমে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল।

৫

পরদিন সস্ত্রীক লাটসাহেব বিহারবাসীর অতিথির বেশে আসিয়া দেখা দিলেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজের প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ীখানা তাঁহার বাসের জন্য সাজান হইয়াছিল। দেশে উৎসব উৎসাহের অন্ত ছিল না। হজুগপ্রিয়েরা হুজুগ খুঁজিয়া, আর আমরা সরকারী কর্ম্মচারীরা সেলাম দিবার শুভ মুহূর্ত খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম।

পাটনার নবাব সম্প্রদায় লাটসাহেবকে সেখানকার খোদাবক্স লাইব্রেরী দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। আমাদের কমিটিতে স্থির হইল, সেইদিন চারু লাটপত্নীর হাতে ফুলের তোড়া দিয়া স্বাগত বন্দনা শুনাইবে।

সেদিন প্রাতে বাগানের বাছাবাছা ফুলপাতায় একটা প্রকাণ্ড তোড়া তৈয়ারি করিয়া গোকুল যখন আমায় দিয়া গেল, তখন জানাইয়া গেল, সেইদিনই তাহার সীতারাম বাড়ী আসিবে। চারু আমার কাছেই ছিল, আনন্দে তাহার কালো চোখে যেন আলো চমকিয়া উঠিল। অন্তরে বাহিরে সে যেন ছাড়া পাইবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছিল। কিন্তু আমার তখন তাহার উপর সহানুভূতি ছিল না। সে যে কেমন করিয়া নির্ভুল ভাবে নিজ ভূমিকাটুকু অভিনয় করিবে, সেই চিন্তাতেই আমি বিমনা ছিলাম। তাহার চুলে সাবান পাউডার দিয়া মাজিয়া ঘষিয়া, তাহার স্বাভাবিক শ্রীকে আরও উজ্জ্বল করিয়া পোষাক পরাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম। সে একবার কেবল বলিল, ''আজ সীতারাম ভাইয়া আস্‌বে বাবা।''

আমি বলিলাম ''জানি। ততক্ষণে তুমিও ফিরে আস্‌বে?''

চারু প্রকাণ্ড ফুলের তোড়াটির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গাড়ী খোদাবক্স লাইব্রেরিতে গিয়া পৌঁছিল।

পত্র-পুষ্প-ভূষিত তোরণদ্বারে ফুলের তোড়া হাতে লইয়া চারু দাঁড়াইয়া রহিল।

যথাসময়ে পত্নীসহ লাটসাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা গাড়ি হইতে নামিবামাত্র, চারু অভিবাদন করিয়া লাটপত্নীর হস্তে ফুলের তোড়াটি দিয়া বন্দনা আবৃত্তি করিল। কথাগুলি সুস্পষ্ট ও যথাযথ ভাবে উচ্চারণ করিতে পারায় শুধু আমার নয়—সমাগত সকল সম্ভ্রান্ত লোকের চোখেই সাফল্যের গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিল। লাটপত্নী মধুর হাসি হাসিয়া, চারুকে ধন্যবাদ দিয়া ফুলের তোড়াটি লইলেন। দুই তিনবার হাসিমুখে চারুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

লাটপত্নী লাইব্রেরি দেখিতে গিয়াছেন, লাটসাহেব নবাব রাজা মহারাজাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, আমরা বাগানে চারুর কৃতকার্য্যতার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলাম। হঠাৎ হুঁস হইল চারু নাই! গোলমালে সে কখন যে নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছে, তাহা জানিতেও পারি নাই। ভয় ডরের সে বড় ধার ধারে না—হয়ত লাটপত্নীর সমক্ষে গিয়াই সে হাজির হইবে! না জানি কি বিভ্রাটই বাধাইয়া বসে!

ব্যস্তভাবে খোঁজ করিতেছি, এমন সময় মৌলবী-সাহেব আসিয়া খবর দিলেন যে লাইব্রেরী-ঘরে লাটপত্নীরই সহিত চারু কথা কহিতেছে, তিনি দূর হইতে দেখিয়াছেন।

দ্রুতপদে লাইব্রেরী-গৃহের দিকে আমি অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূর গিয়া দেখি, চারু ফিরিয়া আসিতেছে। সর্ব্বনাশ! সেই ফুলের তোড়া, তাহার হাতে!

দেখিয়া আমার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিয়া গেল। সবলে তাহার কোমল হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া, টানিয়া তাহাকে বাহিরে আনিলাম।

সে প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। "উঃ, বাবা যে জোরে ধরেছ, এমন লাগচে!" বলিয়া হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়াই সে নীরব হইল। আমার মনের দানবটা মুখেও বোধ হয় নিজ প্রতিবিম্ব বিস্তার করিয়াছিল, তাই সে ভয় পাইল। পরের সাহায্যে গাড়িতে উঠিতে নামিতে সে বরাবরই নারাজ ছিল। আমি গাড়ীর কাছে আসিয়াই সহিসকে হুকুম দিলাম, "উঠা দেও।"

চারু কোনও আপত্তি জানাইল না। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে কঠোর স্বরে তাহাকে বলিলাম, "তোড়া কোথা পেলি?"

সে ভয়ে ভয়ে কহিল, "মেম্ সাহেব দিলেন?"

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "মিথ্যেবাদী! তোকে ডেকে দিলেন?"

সে বলিল, "না বাবা আমি চেয়েছিলুম।"

"কেন চাইলি? ভিকিরি! ছোট লোক! বুড়ো মেয়ে!"—বলিয়া সবলে তাহার গালে একটা প্রকাণ্ড চড় বসাইয়া দিলাম।

সেই কচি গালটিতে আমার অঙ্গুলির দাগ রক্তবর্ণ হইয়া দেখা দিল। ভয়ে সে কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু কাঁদিল না। তাহার জীবনে আমার কাছে সে আর কখনও প্রহার খায় নাই। সেই প্রথম এবং সেই শেষ।

যামিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া অন্ধকার পথের পানে চাহিয়া রহিল। আকাশ জুড়িয়া অন্ধকার, নক্ষত্র ফুটিয়াছে, চাঁদ তখনও উঠে নাই। মণ্টু মুলী বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, বাড়ীর ভিতর হইতে তাহাদের উদ্দাম হাসির লহর বাহির হইয়া আসিতেছিল। বাগানের গেটের ধারে শিউলী গাছটায় গোটাকতক কুঁড়ি সবে মাত্র প্রস্ফুটিত দল মেলিয়া মৃদুগন্ধ ছড়াইবার উপক্রম করিয়াছে। চানাচুর-ওয়ালা প্রকাণ্ড ছড়া কাটিয়া "চানা জোর গরম" হাঁকিয়া গেল।—যামিনী নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় তাহার অসমাপ্ত কাহিনী বলিতে লাগিল।—

সারাপথটা তাহাকে তাড়না তিরস্কারে এমনই অভিভূত করিয়া তুলিলাম যে সে কোন কথাই ভাল করিয়া আমায় বুঝাইতে পারিল না। শুধু এইটুকুই বুঝিলাম যে, ফুলের তোড়াটি সে সীতারামের জন্য চাহিয়া আনিয়াছে। ইচ্ছা হইতেছিল, তোড়াটা ছিঁড়িয়া শত খণ্ড করিয়া পথের ধূলায় ছড়াইয়া দিই; কেবল তাহার মাকে মেয়ের কীর্ত্তি দেখাইবার জন্যই সে প্রলোভন সম্বরণ করিলাম।

স্ত্রী আমাদের পথ চাহিয়াই পথের ধারে পর্দ্দার পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমার মূর্ত্তি আর মেয়ের অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

আমি চারুকে ধাক্কা দিয়া তাহার মার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম, "যেমন নিজে, তেমনি ত মেয়ে হবে! ওকে আবার আমি মানুষ কর্ত্তে চাই!"

সহিস তোড়াটা আমার ঘরে টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। আমি সেটা স্ত্রীর গায়ে ছুড়িয়া দিয়া বলিলাম, "মেয়ে ভিক্ষে করে এনেচে, যত্ন করে তুলে রাখ।"

এতক্ষণের পর বোধ হয় চারুর মা ব্যাপারটা কতক বুঝিতে পারিলেন। মেয়েকে কাছে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে সব বল্ ত চারু। তোড়াটা চাইলি কেন? বড্ড নিতে ইচ্ছে কচ্ছিল?"

চারু তাহার মার বুকে মাথা রাখিয়া হাঁফাইতেছিল। কহিল, "আমি শুধু রাঙ্গা গোলাপটা সীতারামের জন্য দিতে বলেছিলুম, আর কিচ্ছু না?"

চারুর মা একটি একটি করিয়া সব কথা জানিয়া লইলেন। তখন প্রকাশ হইল, চারু লাইব্রেরী ঘরের দরজার কাছে ঘুরিতেছিল, লাটপত্নী তাহাকে কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করেন সে কিছু চাহে কিনা। চারু বলে, সীতারামের জন্য ঐ লাল গোলাপফুলটি পাইলে সে খুসী হয়। তাহাতে লাটপত্নী জিজ্ঞাসা করেন, সীতারাম কে? সীতারাম যে কে, কত বড় মহৎ কাজই যে সে করিয়াছে, বিলাত হইতে রাজা যে তাহাকে মেডেল পাঠাইয়াছেন, সে যে অদ্যই মুঙ্গের হইতে বাড়ী আসিতেছে, মা তার জন্য কত রকম পিঠা ও ব্যঞ্জন রাঁধিয়া রাখিয়াছে, বাপ্ কি রকম তুলার কুর্ত্তা কিনিয়াছে—লাটপত্নীর অবশ্য-জ্ঞাতব্য এই সমস্ত তত্ত্বই সে তাঁহার গোচর করিয়াছে। সীতারামের বীরত্বের কাহিনী নাকি পূর্ব্বেই তিনি শুনিয়াছিলেন। শুধু একটি ফুল নয়, খুসী হইয়া সমস্ত তোড়াটাই তিনি সীতারামের জন্য দিলেন এবং বলিয়াছেন কল্য প্রভাতে সীতারাম যেন তাঁহার বাড়িতে লাট সাহেবকে সেলাম করিবার জন্য যায়।

মেয়ের কথা শুনিয়া তাহার মা হাসিয়া লুটাইতে লাগিলেন। আমিও রাগ ভুলিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। এতক্ষণের পর সে আমার বুকে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

সারাদিন কোনও গাড়ীতে সীতারাম আসিয়া পৌঁছিল না। রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে চারু বলিল—"বাবা, রাত একটার সময় মুঙ্গের থেকে আবার গাড়ী আস্‌বে, সীতারাম ভাইয়া নিশ্চয়ই সে গাড়ীতে আসছে।"

সে রাত্রে সে ঘুমাইয়াছিল কি না জানি না। আমি কিন্তু ঘুমাইতে পারি নাই। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসিলে সে আমায় ডাকিয়া বলিল, "বাবা সীতারাম ভাইয়া বোধ হয় রাত্রে এসেছে। লাট-সাহেবেব বাড়ী তাকে যেতে বলে আস্‌ব কি?"

আমি উঠিয়া বসিয়া কহিলাম, "চল্ আমিও যাই, এসেছে কিনা দেখি। আমারও ত তাকে কিছু দেওয়া হয়নি। কি দেওয়া যায়?"

স্ত্রী লেপের ভিতর হইতেই কহিলেন,"টাকা দাও। গরীব মানুষের টাকায় উপকার হবে।"

চারু বলিল, "বাবা, সীতারাম ভাইয়ার ঘড়ি নেই।"

আমি খুসী হইয়া কহিলাম, "চারু, টেবিলের উপর থেকে আমার ঘড়িটা নিয়ে আয়, ঐটেই তাকে দেব।"

কন্যাব সহিত বাহিরে আসিলাম। ঐ ত তাদের বাড়ী। বুড়া বুড়ী দুইজনেই উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল। সীতারাম রাত্রেও আসিয়া পৌঁছে নাই। কি অসহ্য উদ্বেগে তাহাদের রাত কাটিয়াছে, বুড়ী সালঙ্কারে চারুকে তাহাই বলিতে লাগিল। আমি রাস্তাটা বার কতক এপার ওপার পায়চারি করিলাম। দূরের যাহা কিছু, কুয়াশার ধোঁয়ায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। রাস্তার ধারের গাছগুলা বাতাসের নাড়া পাইয়া টপ্‌টপ্ করিয়া বৃষ্টির জলের মত হিম জল ফেলিতেছিল।

লাটপত্নী সীতারামের জন্য ফুলের তোড়া দিয়াছেন, তাহাকে যাইতে বলিয়াছেন, একথা বুড়া গোকুল গতকল্যই চারুর নিকট শুনিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া কহিল, "বুড়ী বলে তার লেড়কার জন্যেই সহরে এত ধুমধাম হচ্চে, আমি তাকে ধমকে থামাতে পাচ্ছিলাম না। কোম্পানী বাহাদুরের যে গরীবের উপর এত দয়া তা ত জানতুম না হুজুর!"

এমন সময় ভোরের কুয়াসা ভেদ করিয়া টেলিগ্রাফ পিয়ন তাহার সাইকেল হইতে নামিয়া আমায় সেলাম করিয়া গোকুলের হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিল। নিশ্চয়ই সীতারামের খবর। আমি সহি দিয়া, টেলিগ্রামখানি গোকুলের হাত হইতে লইলাম। তিনটি দর্শকই আমার মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

টেলিগ্রাম পড়িবামাত্র আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, হাত কাঁপিতে লাগিল।—"হা ঈশ্বর!"—বলিয়া আমি মাথাটি নত করিয়া, টেলিগ্রামখানা মাটীতে ফেলিয়া লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইলাম। বোধ করি আমার চক্ষু দিয়া তখন জলও পড়িতেছিল। আমার অবস্থা দেখিয়া, কিছুই তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না। "ওরে আমার বাপরে"—বলিয়া সীতারামের মা, চীৎকার করিয়া মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল।

গোকুল স্থিরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর—বাছা আমার কি করে গেল? সে যে আমার জুয়ান ছেলে!"

আমি কহিলাম "প্লেগে।"

চাকর বাকর পথের লোক অনেকে সেখানে জড় হইয়া গেল। আমি আমার লোকেদের উপর বুড়া বুড়ীর ভার দিয়া তাড়াতাড়ি মেয়ে কোলে করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। চারু যেন নেতাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মা তখন তরকারী-ওয়ালীর সঙ্গে দরদস্তুর করিয়া সওদা করিতেছিলেন। আমাদের অবস্থা দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া মেয়ে কোলে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল, মেয়ে আমার এমন হয়ে গেল কেন?"

সংক্ষেপে জানাইয়া দিলাম, "সীতারাম নেই!"

সীতারামের মা পুত্রশোক সহিতে না পারিয়া এক মাসের ভিতর মরিয়া গেল। সীতারামের স্ত্রী, বুড়া শ্বশুরের সেবা করিবার জন্য আসিল। তখন মুলী হইয়াছে। চারুর মা ছেলে লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। চারু সীতারামের মেয়ে যমুনার তদ্বিরেই দিন কাটাইত, তাহারই ইচ্ছানুসারে সীতারামের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ দিয়া ঐ প্রস্তর বেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলাম। উহার ভিতর কি আছে জান? সেই রাজসম্মান ফুলের তোড়া। রোজ সন্ধ্যাবেলা চারু নিজ হস্তে একটি করিয়া লাল বাতী ঐ সমাধির উপর জ্বালিয়া দিত। আমার যাদু যখন চলিয়া গেল, তাহার নিত্য কাজের ভার দিয়া গেল সীতারামের কন্যা যমুনাকে। যমুনা তাহার পিতার স্মৃতির আলোটি তেমনি করিয়াই জ্বালিয়া রাখিয়াছে।

চাহিয়া দেখিলাম যামিনীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। এ শোকের সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। সংসারের অনিত্যতা অথবা বিশ্বব্যাপী দৃষ্টান্তের নিরর্থক প্রসঙ্গ না তুলিয়া, নীরবে দুইটি অশ্রুবিন্দু মুছিয়া ফেলিলাম।

অযাচিত ।। অনুরূপা দেবী

"শুধু সেই জন্য তুমি আমাকে বিয়ে কর্‌তে চাও না, না আর কিছু কারণ আছে?" জমীদার হৃদয়নাথ একটু উত্তেজিতভাবে এই প্রশ্ন করিয়া ব্যগ্রভাবে অদূরবর্ত্তিনী প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ স্থির রমণীর পানে চাহিলেন। পার্শ্বস্থ ঝোপওয়ালা ঝাঁটী-গাছটির উপর সে বাম-হস্তের ফুলের সাজিটি রাখিয়া লজ্জা ও বিষাদে চক্ষু নত করিল, উত্তর দিল না। হৃদয়নাথ নিকটবর্ত্তী একটা মাধবীলতার ফুল ছিঁড়িয়া আবার প্রশ্ন করিলেন, "ভয় কর্‌বার দরকার নাই, সুমিত্রা, আমাদের মধ্যকার অবস্থার ব্যবধান ভুলে যাও। আমি জোর করে তোমায় আমার স্ত্রী কর্‌তে চাই না, তা তুমি দেখতেই পাচ্ছ। সে ইচ্ছা থাকলে তোমার বাবাকে বল্‌তে পার্‌তুম। আমি জানি, আমি দেখিতে সুন্দর নই,—শুধু তাই নয়, বরং দেখিতে কুৎসিতই। কোন সুন্দরী স্ত্রীলোকের পক্ষে আমায় পছন্দ করা সম্ভব নয়। সেই জন্য এত দিন সে চেষ্টা করিওনি। কে জানে, যাহাকে বিয়ে কর্‌ব, সে আমায় পছন্দ করিবে কি না; কিন্তু এখন যেন এ নিঃসঙ্গ জীবন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

সুমিত্রা ঈষৎ ভীতভাবে মুখ নত করিয়াই ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু সে ব্যবধান যে ভোলবার নয়। আমি আপনার এক জন গরীব প্রজার মেয়ে, লোকে আপনাকে কি বল্‌বে?"

হৃদয়নাথ ঈষৎ হাসিয়া প্রসন্নমুখে বলিয়া উঠিলেন, "শুধু এই যদি তোমার আপত্তির কারণ হয়, তা' হ'লে তুমি সে ভয় করো না, লোকে হৃদয়নাথকে চেনে। এখন আমায় বল, সুমিত্রা, আমি তোমায় আমার ভাবী পত্নী বলে আশা কর্‌তে পারি কি না? 'না' বলো না সুমিত্রা, আমার আশা ভঙ্গ করো না।"

সুমিত্রা কম্পিত-হস্তে সাজিটা তুলিয়া লইয়া একবার চকিতমাত্র প্রস্তাবকারীর মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আচ্ছা"।

জমীদার হৃদয়নাথ একবার গ্রীষ্মের সময় তাঁহার পল্লীভবনে আসিয়া অবধি এই যুবতী কুমারীটিকে প্রত্যহ তাঁহাদের বাটীর সহিত সংলগ্ন নবসংস্থাপিত ক্ষুদ্র স্কুলগৃহের বাতায়নের পাশ দিয়া গমনাগমন করিতে দেখিতেছিলেন। প্রথম দুই চারি দিন তিনি নব-প্রণালীতে পরা মোটা শাড়ীর লম্বিত অঞ্চলখানি দূর হইতে দেখিতে পাইলেই সসম্ভ্রমে সরিয়া যাইতেন—একটি ক্ষণিক দৃষ্টি দ্বারাও ছায়াপাত করিতে শঙ্কা ও লজ্জা বোধ করিতেন। তথাপি এই দূর পল্লীগ্রামের মধ্যে এইরূপ সঙ্কোচহীন আত্মনির্ভরতার একটা মহৎ দৃষ্টান্ত তাঁহাকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিতেছিল।

ক্রমে কৌতূহল লজ্জাকে জয় করিতে লাগিল। হৃদয়নাথ এক দিন স্কুল-পরিদর্শনে গিয়া বর্ষীয়সী প্রধান শিক্ষয়িত্রীর অন্তর্বর্ত্তিনী দ্বিতীয়া শিক্ষয়িত্রী বিশ্বাসকুমারীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া আসিলেন। সে পরিচয়ে সুমিত্রা তাঁহার সহৃদয়তা ও হৃদয়নাথ বিশ্বাসকুমারীর ভক্তি ও সম্ভ্রম লাভ করিলেন।

ইহার পর হৃদয়নাথ স্কুলটির উন্নতি-বিধানে অত্যন্ত মনোযোগী হইলেন। সর্ব্বদাই তিনি

স্কুলগৃহে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন ও অবশেষে এক দিন স্কুলের ফেরত, সুমিত্রা যখন তাঁহার নির্জ্জন বাগানে সাজি ভরিয়া ফুল তুলিতেছিল, সেই সময় সহসা সে তাহাদের জমীদারের আকস্মিক আগমনে লজ্জিত ও ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিতে গিয়া বাধা প্রাপ্ত হইল। হৃদয়নাথ দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ''আমার বাগানের ফুল যদি তাদের সৌভাগ্যক্রমে তোমার হাতের স্পর্শলাভে গর্ব্বিত হয়েছিল, সেটুকু থেকে কি আমার দোষে তারা বঞ্চিত হবে?'' তার পর লজ্জাকুণ্ঠিতা সুমিত্রা আকাশ-কুসুমের মত অসম্ভব প্রস্তাব শুনিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল।

দরিদ্র হরিহর বিশ্বাস যখন তাহার বৃদ্ধা জননীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এক দরিদ্রতর ভদ্রলোকের কন্যাকে তাহার পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার পরোপকারিতার পরিচয় দান করে, তখন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, সেই বিবাহবন্ধন তাহার গলবন্ধন-রজ্জু হইয়া শীঘ্রই তাহার কণ্ঠকে নির্দ্দয়রূপে চাপিয়া ধরিবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ হতভাগ্যের মত সেও ভবিষ্যৎ আশার কুহকে ভুলিয়া দারিদ্র্য-পীড়িত গৃহে গৃহলক্ষ্মী বরণ করিয়া তুলিবার পরিবর্ত্তে অলক্ষ্মীরূপিণী দারিদ্র্যকেই আবাহন করিয়া বসিল। জমীদারের স্কুলে থার্ডক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনটাকে রাজধানীর কোন এক অপরিচিত ক্ষুদ্র মেসের মধ্য দিয়া সাধারণের প্রশংসা-দৃষ্টির সম্মুখে পরিচিত করিয়া তুলিবার যে সুদূর কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এই গলরজ্জু বন্ধনের প্রথম ফল ফলিতেই ঘুরিয়া গেল। চারিটি প্রাণীর আহার যোগাইয়া কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। অনেক চেষ্টার পর হরিহর জমীদার সেরেস্তায় একটি ২০্ টাকা মাহিনাব কাজ পাইল। তাহার উন্নতি ও উৎসাহের এইখানেই সমাধি হইয়াছিল।

২

ইহার পর প্রতি বৎসর একটি প্রাণীকে তাহাদের হ্রাসমান আহার্য্যের অংশ-প্রদান এবং দুর্ব্বল ও রুগ্ন বালকবালিকাগুলির রোগশয্যা-পার্শ্বে বিনিদ্র রাত্রি যাপনান্তে ভোরের আলোয় দুখানি বাসি রুটী দ্বারা রোগজীর্ণ পাকযন্ত্রের অত্যল্প অভাব ঘুচাইয়া ছিন্ন পাদুকাযুগলের মধ্যে ভারবহনে অসম্মত পদদ্বয় জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া, তালি-দেওয়া পুরানকালের ছাতাখানি ঘাড়ে করিয়া—শ্লথগতিতে জমীদারী কাছারী উদ্দেশে গমন ভিন্ন তাহার জীবনে স্মরণীয় কিছুই ঘটে নাই। কেবলমাত্র একবার কলেরায় ও একবার ম্যালেরিয়ায় তাহাদের দুঃখ-জীবনের অংশ, দুইটি সন্তানকে পথ্য ও চিকিৎসার অভাবে হারাইয়া তাহার অকালপক্ব কেশ ও শ্মশ্রু অধিক পরিমাণে শুভ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার ম্যালেরিয়াক্রান্ত পত্নী সেই সময় হইতে তীব্র শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রায় শয্যাগত হইয়াছেন।

হরিহরের অনেকগুলি পুত্রকন্যার মধ্যে সুমিত্রা ও কল্যাণী সকলের বড়। সুমিত্রা ও কল্যাণী এত দিন কলিকাতায় তাহাদের মাসীর বাড়িতেই থাকিত। মাসীর অবস্থা তাদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল এবং তিনি বোনের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সুস্থ ও সুন্দর বলিয়া এই দুইটিকেই বেশী ভালবাসিতেন। মাসীর মেয়েদের সহিত স্কুলে গিয়া তাহারা কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছিল। মাসী সুমিত্রার জন্য একটি মেডিকেল কলেজের ছাত্রকে পাত্র স্থির করিয়াছিল। প্রভাস সুমিত্রার মাসীর বাড়িতে থাকিয়া কলেজে পড়িত। তাহার অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না, কিন্তু তাহার উদ্যমপূর্ণ হৃদয়ে ভবিষ্যতের যে আশা সঞ্চিত ছিল, কলেজের অধ্যক্ষগণ তাহার পোষকতাই করিতেন। মাসী তাহার শেষ পরীক্ষার দিন গণিতেছিল, সুমিত্রা তাহার শান্ত হৃদয়ের মধ্যে একটি উজ্জ্বল সুখের চিত্র নীরবে অঙ্কিত করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় তাহাদের সংসারে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

সুমিত্রার স্নেহময়ী মাসীমা হঠাৎ এক দিন প্লেগে মারা গেলেন। ও দিকে তাহার মা শয্যাগত, সংসারের সমুদয় ভার ঘাড়ে লইয়া পিতা হাবুডুবু খাইতেছেন। সুমিত্রা ও কল্যাণী বাড়ি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সংসার এ দিকে অচলপ্রায়। বৃদ্ধ পিতার জীবনের বিন্দু বিন্দু ক্ষয়করা ঐ কুড়িটি টাকা ঘরের দ্বার হইতেই পাওনাদারের বাড়ী চলিয়া যায়; সমুদয় মাসটা বুভুক্ষা ও অভাব মুখব্যাদান করিয়া প্রত্যেক প্রাণীটিকে গ্রাস করিতে আইসে। সকলের নিন্দা-ভর্ৎসনা অগ্রাহ্য করিয়া সুমিত্রা নূতন স্থাপিত বালিকা-পাঠশালায় শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করিল। প্রথম লোকনিন্দায় উত্ত্যক্ত হইয়া হরিহর সুমিত্রার এই স্বাবলম্বনবৃত্তি গ্রহণে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু শেষে মাসিক পনেরো টাকার লোভ ত্যাগ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ কল্যাণী যখন তাহার প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ললাট কুঞ্চিত করিয়া উজ্জ্বল চক্ষে তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল,"যারা নিন্দে কর্‌ছিল, তারা কি আমাদের বিপদের দিনে এতটুকু সাহায্য করেছিল, বাবা?" তখন হরিহর চক্ষু পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তোরাই আমার ছেলে। মা, ধর্ম্ম আর এই বৃদ্ধ পিতাকে সর্ব্বদা স্মরণ রেখে কর্ত্তব্য করে যাও, ভগবানের অভিশাপ আমার সঙ্গেই থাকবে, তোমাদের স্পর্শ করবে না, তিনি কর্ত্তব্যের পুরস্কার দিতে জানেন।" একে আইবুড়া হাতীর মত মেয়ে দেখিয়াই গ্রামের লোক আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর সেই ধেড়ে মেয়ে যখন গুরুমা সাজিত, তখন আর তাহারা বিস্ময় ও লজ্জা রাখিবার স্থান পাইল না।

৩

সে দিন আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্ত্তনে বিস্ময়াভিভূতা সুমিত্রা ঘরে ফিরিয়াই তাহার সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী কল্যাণীকে সকল কথা বলিল। কল্যাণী আরব্য উপন্যাসের গল্প যেমন বিস্ময়ের সহিত দিদির কাছে শুনিত, তেমনই বিস্ময়ের সহিত সকল কথা শুনিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কোন মতামতই সে তখন প্রকাশ করিল না। সুমিত্রা বিস্মিতা হইল। সে আশা করিতেছিল, আশাতিরিক্ত সুসংবাদ-দানে চঞ্চলা কল্যাণীকে কিরূপ আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত করিয়া তুলিবে। সে হয় ত এই মুহূর্ত্তেই তাহার ভগ্নহৃদয় পিতা-মাতাকে এই অপূর্ব্ব সুসংবাদ দিতে ছুটিয়া যাইবে ও মুহূর্ত্তে নিরানন্দ গৃহে আনন্দের উৎস প্রবাহিত করিয়া তাহাকে তাহার কর্ত্তব্যের পুরস্কার দান করিবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। সুমিত্রা ছেঁড়া জামা সেলাই করিতে করিতে দুই একবার বোনের সহসা গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কল্যাণীর গম্ভীর মুখকে সকলেই একটু ভয় করিত। তাই সেও একটু আশ্চর্য্য হইল।

সহসা কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তা হলে হৃদয়বাবুকে বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়েছ?"

সুমিত্রা ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া নতমুখে উত্তর দিল, "হ্যাঁ। না হয়েই বা কি করি?"

"কেন?"

কল্যাণীর গম্ভীর প্রশ্নে সুমিত্রা একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কেন, তা আর জিজ্ঞেস্ করো না। মা'র এই এত বড় রোগের চিকিৎসা নাই, বাবার এই অবস্থা, ভাইবোনগুলির এই দুর্দ্দশা, এই মুহূর্ত্তেই সে সব ঘুচে যাবে জান, তবু জিজ্ঞাসা কর্‌চো কেন?"—কল্যাণী একটু বেদনার সহিত কাপড়ের রিপু করা বন্ধ করিয়া বলিল, "সব সত্যি, কিন্তু তুমি কি সুখী হবে? সেই কথাটা ভাবো।"

সুমিত্রা জোর করিয়া যে ব্যথাটা মন হইতে সরাইয়া ফেলিতেছিল, সেই বেদনাটার উপরই আঘাত পড়িল। তাই বোধ করি, সে কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তার পর জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার আবার সুখ কি? সবাই সুখী হলেই সেই সুখে আমি সুখী হব।"

তথাপি তাহার কণ্ঠে বিষাদের সুর বাজিয়া উঠিল। চোখেব জলের আভাসে সম্মুখের কাজ

বাধা পাইতে লাগিল। কল্যাণী সেলাইটা ফেলিয়া দিয়া উদ্ধতভাবে বলিয়া উঠিল, "আমাদের আসবার দিনও প্রভাসবাবু কত আশা করে বলেছেন, "আর এই কটা মাস তোমরা অপেক্ষা করো। আমি আমার যথাশক্তি তোমাদের জন্য কর্‌বো।" তাঁকে তুমি কি অপরাধে ত্যাগ করবে দিদি? এতে যে মহাপাতক হবে। আজ দু তিন বৎসর ধ'রে মাসীমা তাঁকে কথা দিয়ে রেখেচেন, তিনি তোমার জন্য নিজের প্রাণোৎসর্গ ক'রে মানুষ হবার চেষ্টা কর্‌ছেন। এখন হঠাৎ এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌লে সে কি ধর্ম্মেই সইবে?" সুমিত্রা হঠাৎ সেলাইটা ফেলিয়া দিয়া বোনের কাঁধে মুখ লুকাইল। "কলী, চুপ কর ভাই! তাঁকে বলিস, দিদি তার বাপ-মাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য আত্মবলি দিয়েছে। জীবনে যে নরক-যন্ত্রণা সইতে যাচ্ছে, তার মরণের পরে নরকের ভয় কোথা?" কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল।

রাত্রে ছোট ভাইবোনগুলিকে ঘুম পাড়াইয়া, রুগ্ন মাতার পায় হাত বুলাইয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া কল্যাণী রান্নাঘরে গিয়া দেখিল, হাঁড়ি-হেঁসেল তুলিয়া সুমিত্রা কল্যাণীর ভাত একখানি পাথরে বাড়িয়া লইয়া বসিয়া আছে। কেরোসিনের ডিবের আলো অনর্গল ধূম বাহির করিতে করিতে মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, আর সেই দিনের আলোরও অপ্রবেশ্য ক্ষুদ্র ঘরে দারুণ অন্ধকার ঈষৎ মাত্র দূর ও ঝুলের প্রচুরতা বৃদ্ধি করিতেছে। কল্যাণী মাটির কলসী হইতে দুইটি ছোট চুম্‌কি ঘটিতে জল গড়াইয়া আনিল। দুইখানি দেবদুরুকাঠের পিঁড়ী আঁচল দিয়া মুছিয়া ঘরের বাহিরে রোয়াকের উপর পাতিল এবং জল-হাত দিয়া স্থানটি মুছিয়া হাত ধুইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দিদি এসো, ও মা! এতকটি ভাত কেন? কুলয়নি বুঝি?" সুমিত্রা বাড়াভাতের পাথরখানা হাতে করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, তা কেন, আমার আজ ক্ষিধে নেই, তুই খেতে বস্।" কল্যাণীর মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। সে দ্বারে পিঠ দিয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। গম্ভীরমুখে বলিল, "আজ তিন দিন হ'ল, রোজই তোমার রাত্রে ক্ষিধে থাকে না, সকালেও রোজ কম পড়ে। আজ সকালে তো খাওয়াই হয়নি। এমন করে না খেয়ে ক'দিন বাঁচবে, দিদি? তুমি খাও, আমি আজ খাব না, আমি ত ওবেলা পেট ভরে খেয়েছি।" সুমিত্রা ম্লানমুখে কষ্টে হাসি আনিয়া বলিল, "কি বলিস্, তার ঠিক নেই; সত্যি বল্‌ছি, আমার ক্ষিধে নেই, না হলে দুটি আর রেঁধে নিতে পার্‌তুম না?"

"চাল কোথায় যে, রাঁধবে? রোজ রোজ চাল কিনে কি চলে? একেবারে কিন্‌লেই হয়।"

সুমিত্রা বাধা দিয়া বেদনার স্বরে কহিল, 'টাকা কোথায়, একবারে কিন্‌বো বল? ধারেই তো সব চল্‌চে। কলী, বস্ ভাই, খেয়ে নে, মাথাটা বড্ড ধরেছে, আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে।"

কল্যাণী একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে এস, দুজনেই এই ভাতকটা ভাগ করে খাই, তা না হ'লে আমিও আজ কিছুতেই খাব না।"

সে রাত্রে কল্যাণী কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। ভাবনার পর ভাবনা আসিয়া তাহার চিত্তকে একেবারে পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া পাশের ঘুমন্ত ভাইটিকে নিজের বিছানায় তুলিয়া শোয়াইয়া দিয়া সে তাহার দিদির কাছে গিয়া শুইল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার দিদিও আজ তাহারই মত ঘুমাইতে পারে নাই। কল্যাণী কাছে আসিয়া শোয়াতে সুমিত্রা সহসা চমকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে কলী, এখনও ঘুমুসনি যে?"

কল্যাণী সুমিত্রার কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিল যে, সে এতক্ষণ কাঁদিতেছিল। ধীরস্বরে উত্তর দিল, "ঘুম হচ্ছে না, ভারি গরম, তুমিও ত জেগে আছ।"

"হাঁ, মাথাটা ধরেছে, জানালাটা না হয় খুলে দে না।"

"না, থাক্, ছেলেদের আবার ঠাণ্ডা লাগবে। এস, তোমার মাথাটা একটু টিপে দি; তা

হ'লে ছেড়ে যাবে এখন।" সুমিত্রার আপত্তি না মানিয়া কল্যাণী তাহার মাথার কাছে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। সুমিত্রা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল, "সকালেই সেই খাটনি আছে। শুয়ে ঘুমো, কলী।" কল্যাণী আপনার জিদ্ কখনও ছাড়ে না, কাজেই শেষে সে নিজেই থামিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কল্যাণী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দিদি, হৃদয়বাবু দেশবিদেশে এত মেয়ে থাক্‌তে তোমাকেই যে হঠাৎ বিয়ে কর্‌তে চাইলেন, এর মানে কি? তিনি কি তোমায় ভালবাসেন?" সুমিত্রা এ সম্বন্ধে কোন কথাই ভাবিয়া দেখে নাই। সে ভাবিয়াছে, তাহাদের দারিদ্র্য ভয়ানক অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিবাহে সে দরিদ্রতা ঘুচাইয়া সচ্ছলতা লাভ করিতে পারিবে। সে ভাবিয়াছিল, তাহার চিরদুঃখিনী মা ঔষধ-পথ্যের অভাবে এই চিরদুঃখের জীবন সাঙ্গ করিয়া তাহাদের জন্মের মত ছাড়িতে উদ্যত। এইবার বুঝি তবে সে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার পথ পাইল। একটু বিস্ময়ের সহিত উত্তর দিল, "তা তো জানিনে; হয় তো তাই বা, না হ'লে হঠাৎ বিয়ে কর্‌তে চাইবেন কেন?"

উত্তরটা কল্যাণীর মতের সহিত মিলিল না। সে সেই অন্ধকারে দিদির মুখের উপর বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ তীব্রভাবে বলিয়া উঠিল, "তা বই কি? বড়লোকের আবার ভালবাসা! বোধ হয়, তোমার সুন্দর রূপ দেখেই বিয়ে করতে চেয়েছেন।" সুমিত্রা ধীরভাবে কহিল, "তাও হ'তে পারে, তবে সুন্দর এমন কি দেখলেন!" কল্যাণীর মুখ গভীর চিন্তায় গম্ভীর হইয়া আসিল। সে শুইয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে চিন্তাযুক্তভাবে বলিল, "তাই বোধ হয় হবে।"

পরদিন সকালে উঠিয়া সুমিত্রা প্রতিদিনকার মত ঘরের কাজ-কর্ম্ম সারিতে গিয়া দেখিল, কল্যাণী তাহার আগে উঠিয়া বাসিকাজ সারিয়া ফেলিয়া উনানে আগুন দিতেছে। সুমিত্রার সাড়া পাইয়া সে ধোঁয়ায় অদৃশ্যপ্রায় মুখ তুলিয়া বলিল, "দিদি, আজ আর তুমি স্কুলে যেয়ো না, লোক যদি শুনে থাকে, তবে কি বল্‌বে? আমি তোমার বদলে যাচ্ছি।" জেলখানার খোলা দরজার সম্মুখে মুক্তির পরওয়ানা শুনিলে কয়েদের আসামী যেমন গভীর আনন্দের সহিত নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া থাকে, সুমিত্রা তেমন করিয়া কতক্ষণ বোনের পানে চাহিয়া, স্নান করিতে চলিয়া গেল।

কল্যাণী কলিকাতা হইতে আসিয়া অবধি নিজে অঙ্গের দিকে চাহিয়া দেখিতে অবসর পায় নাই। আজ সে এক পয়সার বেশম আনাইয়া আধঘন্টা ধরিয়া গায়ের কালী তুলিতে বসিল। গরম তৈলের ছিটায় হাতে কতকগুলা ফোস্কা উঠিয়াছিল। ঘর্ষণে তাহা ছিঁড়িয়া গিয়া জ্বালা করিতে লাগিল। তথাপি সে অঙ্গ-মার্জ্জনা বন্ধ করিল না। কাপড় ছাড়িয়া যখন রান্না-ঘরে আসিয়া ভাত চাহিল, তখন অকস্মাৎ মুখ তুলিয়াই সুমিত্রা সবিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। এ কি তাহারই বোন্ কল্যাণী? ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ভিতরে ভিতরে কি সৌন্দর্য্যই লুকান ছিল! সুমিত্রা বুকের কাছে কুণ্ডলি নিশ্বাসটা টানিয়া লইল। সে স্বার্থপরের মত এখনও দ্বিধা করিতেছে। না, সবার সুখের জন্য সে নিজের সকল স্বার্থ ভুলিবে। নহিলে এই সব স্নেহের পুতুলের কি হইবে?

কল্যাণী আহারে বসিয়া স্কুল সম্বন্ধে দিদিকে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিতেছিল। কিন্তু তাহার চিত্ত ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উদ্বেগ-ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, তাহা তাহার মুখের চক্ষের ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। সুমিত্রা মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "কিছুই যে খেতে পার্‌লিনা, কল্যাণি।" কল্যাণী অন্যমনস্কভাবে জলের গ্লাস তুলিতেছিল, হাত কাঁপিয়া জল শুদ্ধ গ্লাসটা থালার উপর পড়িয়া গেল। লজ্জায় ও বিরক্তিতে ঈষৎ লাল হইয়া সে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "সকালে খাওয়া ত আর আমার অভ্যাস নেই।"

৪

সে দিন হৃদয়নাথ অন্য দিনের অপেক্ষা সকাল সকাল আহার সারিয়া খিড়কির বাগানে সেই লোহার বেঞ্চের উপর কামিনীগাছের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটা ভরিয়া আজ একটি নবীনত্বের হিল্লোল উঠিতেছিল। বসন্ত আসিতে দেখিলে যেমন মলয়ানিল তাহার আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই ঘোষণা করিতে থাকে, তেমনই বোধ হয়, আগতপ্রায় মিলনে একটি মধুর উচ্ছ্বাসে বিগতপ্রায় যৌবন-সীমার প্রান্তবর্ত্তী গম্ভীর-প্রকৃতি প্রৌঢ়কে ঈষৎ উচ্ছ্বসিত করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারই হৃদয় ডালির আহরিত অর্ঘ্যে প্রেমও চারিপাশে পুষ্পসৌরভরূপে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। বাতাসে আকাশে পত্রে পুষ্পে সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিতেছে। সে সঙ্গীতের প্রতি চরণই তাহাদের গৃহলক্ষ্মীর বন্দনাগানে অমৃতময়।

হৃদয়নাথ কোলের উপর একখানা বাঁধান বই রাখিয়া পুনঃ পুনঃ গ্রাম্য পথের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। একবার হঠাৎ তাঁহার মুখখানা আনন্দে জ্যোতিতে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাতাসে স্থানভ্রষ্ট কেশ কয়গাছি সাবধানে স্বস্থানে স্থাপিত করিয়া রুমালে মুখখানা মুছিয়া ফেলিয়া সংযতভাবে তিনি পুস্তকপাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে বেড়ার পাশে কাহার পায়ের মৃদু শব্দ হইল। হাতের চুড়ি কয়গাছি ঠুন ঠুন করিয়া একটা কি যেন অস্ফুট সন্দেহের কথা বলিতে চাহিতেছিল। হৃদয়নাথ স্তম্ভিতবক্ষে বসিয়া রহিলেন। ইচ্ছাসত্ত্বেও চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না। প্রথম দিনটা মনে যে কবিত্বের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, আজ তাহা মিলাইয়া আসিয়াছে। বাগ্‌দত্তা স্ত্রীকে কি বলা যাইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখা হয় নাই। যখন সঙ্কোচ কাটাইয়া তিনি মুখ তুলিলেন, তখন স্কুলগৃহের দ্বারের মধ্যে একখানি শুভ্র হস্তের একটি অংশ ও একরাশি কাল চুল মাত্র চোখে পড়িল।

কল্যাণী পরদিনও স্কুলে গেল। হৃদয়নাথ দৃঢ়সংকল্প হইয়া বেলা তিনটার সময় হইতেই বাগানে রৌদ্র মাথায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গোলাপগাছের কলম তৈয়ার করিবার জন্য মালীকেও হঠাৎ তাঁহার খুব দরকার হইয়া দাঁড়াইল, দু'একটা গাছের কলম করা সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়াই হৃদয়নাথ তাহাকে ফরমাইস্ করিলেন, "খুব ভাল করে একটা গোলাপের তোড়া তৈয়ার কর্ দেখি।" মালী আজ্ঞা পালন করিল। তোড়াটা হাতে লইয়া কিন্তু হৃদয়নাথের একটু লজ্জা করিতে লাগিল, মালীটা কিছু বুঝিতে পারে নাই ত?

সকলেই এতাবৎকাল তাঁহাকে নির্হৃদয় কৌমার্য্য-ব্রতধারী বলিয়া জানে। সহসা নিজের সেই পরিচয়টুকু নষ্ট করিতে হৃদয়নাথের মনের মধ্যে আনন্দের সঙ্গেও তাই একটা ব্যথাও যেন বাজিতেছিল।

ঘড়ীটা চারিটা বাজাইয়া চুপ হইল। কিন্তু হৃদয়নাথের বুকের মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া একটা সুর তালে তালে বাজিয়াই চলিল,—বিশেষতঃ যখন স্কুলের আলকাতরা-মাখা ছোট দরজাটির ভিতর দিয়া নিপুণভাবে ঝুলান একটি শুভ্র বস্ত্রের আঁচলখানি দক্ষিণের উদ্দাম বাতাসে চঞ্চল হইয়া দর্শন দিল।

সে দিন জোর করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া হৃদয়নাথ দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কল্যাণীর এই সময়ের ভিতর উদ্যানের সীমানা ছাড়াইয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে তাহার মৃগশিশুর মত অবাধ চঞ্চল গতিকে এমনই অকস্মাৎ গজেন্দ্রগমনে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাহার নাগাল পাইতে হৃদয়নাথকে বাগানের দরজা পার হইতে হইল না। হৃদয়নাথ মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "সুমিত্রা!" কল্যাণী ফিরিয়া দাঁড়াইল। হৃদয়নাথ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সুমিত্রা নয়। কিন্তু রং গঠন অনেকটা একরকম বলিয়াই তাঁহার এ সন্দেহ জন্মে নাই। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" কল্যাণী তাঁহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া উত্তর দিল, "আমি কল্যাণী, সুমিত্রার বোন্।"

হৃদয়নাথ আরও আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। ঐ দরিদ্র-গৃহখানি রত্নের আকর নাকি? তার চেয়ে বিস্মিত হইলেন মেয়েটির ধরণে লজ্জা নাই, দ্বিধা নাই। অথচ এতটুকু নির্লজ্জতাও নাই। শান্ত নির্ভীক চক্ষু বুদ্ধি ও জ্ঞানের জ্যোতিতে আশ্চর্য্য উজ্জ্বল! বলিলেন, "সুমিত্রা কি আসেনি?"

কল্যাণী ঈষৎ চোখ নামাইয়া কহিল, "না, কাল থেকে আমিই আস্‌ছি।" তার পর আবার দুই চোখ তুলিয়া হৃদয়নাথের চোখের উপর স্থাপন করিল, বলিল, "কেন? তাতে কি কিছু আপনার আপত্তির কারণ আছে?"

একটু সঙ্কুচিত হইয়া হৃদয়নাথ কহিলেন, "না, তা কেন?"

"তবে এখন আমি যেতে পারি?"

"হ্যাঁ, পার—না, একটা কথা আছে, সুমিত্রা কেন আসে না? সে কি কিছু এর কারণ বলেছে?"

কল্যাণী একবার প্রশ্নকর্ত্তার মুখে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরমুহূর্ত্তে অন্যদিকে চাহিয়া অন্যমনস্কতার ভাণ করিয়া আঙ্গুলে নিজের আঁচল জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "বলেছে বই কি, আপনি তাকে বিয়ে করবেন বলেছেন না?"

হৃদয়নাথের মুখ আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল, তিনি মাথা একটু নীচু করিলেন, "তা সে জন্য তিনি আর আসেন না কেন?"

কল্যাণী আঁচলখানা ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া ফেলিল, "বাঃ, বিয়ের কথা হচ্ছে, সে কেমন করে আস্‌বে? তা ছাড়া তার মন আর শরীরও তেমন ভাল নেই।" শেষের কথা কয়টা বলিয়া কল্যাণী গম্ভীর হইয়া পড়িল এবং যাইবার জন্য উদ্যোগী হইল। ব্যগ্র হইয়া হৃদয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন ভাল নেই কেন? না, না, তুমি কথা বদ্‌লাচ্ছ। আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি। কল্যাণী বুঝি তুমি?—না, কল্যাণি, আমায় বল, কেন তার মন ভাল নাই?"

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল। দ্বিধা আসিয়া দুএকবার বাধা না দিতেছিল, এমন নহে, কোন্‌টা উচিত, কোন্‌টা শুভ, সে সন্দেহও দুই একবার মনে উঠিয়া তাহার স্থির দৃষ্টি চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল। সহসা কথা জোগাইল না। হৃদয়নাথ একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া মিনতিপূর্ণ আগ্রহের সহিত আবার বলিলেন, "তুমি আমায় কিছু লুকিও না। বল কল্যাণি, বল, সে কি আমার প্রস্তাবে মনে কোন আঘাত পেয়েছে, আমি কি তার কাছে অযোগ্য আবেদন করেছি?"

"হ্যাঁ" বলিয়া কল্যাণী তাঁহার পানে স্থির চোখে চাহিয়া রহিল।

হৃদয়নাথ চমকিয়া উঠিয়া দুই পা পিছাইয়া গেলেন। বিস্ময়ের সহিত বেদনার সুস্পষ্ট চিহ্ন তাঁহার শ্রীহীন মুখে ফুটিয়া উঠিল। একটু নীরবে থাকিয়া আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে অস্ফুটকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি আমায় বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছুক নয়?"

বাতাসে কতকগুলা চুলের গোছা কল্যাণীর মুখে চোখে উড়িয়া পড়িতেছিল, হাত দিয়া সেগুলাকে সরাইয়া দিতে দিতে সে উত্তর দিল, "কতকটা তাই বটে। প্রভাসবাবুর সঙ্গে দিদির বিয়ের সব ঠিক ছিল, হঠাৎ মাসীমা মারা গেলেন বলেই শুধু হলো না। সেই জন্য আর কোথাও বিয়ে হয়, সেটা আমাদের কারু তেমন ইচ্ছা ছিল না।"

হৃদয়নাথ উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে সে আমাকে কিছু বলিল না কেন? আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিল কেন?"

"কেন? তুমি তার কি জান্‌বে যে কেন? আমাদের মা-বাপের অবস্থা খুবই খারাপ, মার জীবনের আশা নাই, চিকিৎসা-পথ্যের অভাবে মা মারা যাবেন, ভাইবোনদের একবেলা আহার জোটে তো একবেলা জোটে না। সে সম্মত না হয়ে কি করে? সে তো নভেলের নায়িকা নয়?"

হৃদয়নাথ আহত-হৃদয়ে চৌকাঠের উপরে বসিয়া পড়িলেন। হাত হইতে গোলাপ ফুলের তোড়াটা মাটীতে পড়িয়া গেল। জীবনের নব-সঞ্চিত কাব্যরস নিম্বপত্রের মত তিক্তাস্বাদ হইয়া

উঠিল। কল্যাণী একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তার পর একটু নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে আমি এবার যাই?"

হৃদয়নাথ চমকাইয়া চাহিয়া দেখিলেন। কল্যাণী দেখিল, তাঁহার মুখ অত্যধিক ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্য তাহার একটু দুঃখ, একটা সন্দেহও জন্মিল, একটু বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আপনাকে কষ্ট দিলাম—না? হয় ত এ কথা আপনাকে বলা আমার উচিত হয়নি।"

"না, উচিত হয়েছে বই কি? না হ'লে আমার দ্বারা তোমার দিদির কত বড় ক্ষতি হ'ত বল দেখি? আমার কষ্ট, ঈশ্বর জানেন। এখন যেটা আঘাত মনে হচ্চে, পরে সেটাই পুরস্কার মনে হবে। কি ভাল, শুধু তিনিই জানেন।"

একটা অনিবার্য্য কৌতূহলের সহিত কল্যাণী বলিয়া উঠিল, "আপনারা—বড়লোকেরা কি তবে গরীবের মেয়েদের সৌন্দর্য্যের মূল্যেই শুধু তাদের গ্রহণ করিতে চান, না? তা হ'লে আরও তো অনেক সুন্দর মেয়ে আছে।"

হৃদয়নাথ ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটী করিলেন। কল্যাণী ঈষৎ নম্রতার সহিত মাথা নীচু করিল। তখন হৃদয়নাথ সহসা দাঁড়াইলেন। কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমার দিদিকে গিয়ে বলো কল্যাণি, আমি তাকে মুক্তি দিলুম, তার মহৎ হৃদয় বিক্রী কর্‌বার জিনিস নয়। এর দাম দেবার সাধ্য আমার নাই, যে ভাগ্যবান্ তা জয় করেছেন, তিনি ইহা লাভ করুন। তোমাদের দারিদ্র্য আর থাক্‌বে না। আমার যথাসাধ্য তোমাদের জন্য আমি কর্‌বো। সে জন্য আজ হ'তে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। আর আমার জন্য—ভগবান্ যা ভাগ্যে লেখেননি, তার জন্যে দুঃখ ক'রে কি হবে? আমার এই নিঃসঙ্গ নিষ্ফল জীবন এমনই কেটে যাক্। এ একটা আমার শিক্ষা হলো।"

লজ্জায় অনুতাপে মরিয়া গিয়া কল্যাণী ভাবিল, সে ইঁহার প্রতি বড় অবিচারই করিতেছিল। তাঁহার রুদ্ধ স্বরের ভিতর যে অশ্রুজল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, সহসা তাহা কল্যাণীর চক্ষুকে বশীভূত করিল না কি? তাহার চোখও সমবেদনার অশ্রুতে ভরিয়া টল টল করিতে লাগিল। কি বলা উচিত ভাবিয়া না পাইয়া সে নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হৃদয়নাথ ক্ষণকাল নীরবে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর ত্বরিতহস্তে ফুলের তোড়াটা মাটী হইতে কুড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "যা তাকে দেবার জন্য রেখেছিলুম, তা আবার ফিরিয়ে রাখলুম। পূর্ব্বেই আমার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যদি কখনও কেউ যেচে নেয়, তবেই তাকে এ হৃদয়-মন দান করবো, তা' না হ'লে অযোগ্যের দান দীনের উপহার চিরদিনের মত নিজের কাছে থেকেই শুকিয়ে যাবে—সে প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গেচে, হাতে হাতেই তার ফলও ফলেচে। যাক্—এবার যেতে পার কল্যাণি, আর কিছু বল্‌বার নাই। বলো, আমি মনের সঙ্গে তাকে আশীর্ব্বাদ করচি, তারা দু'জনে চিরসুখী হোক্। আমি তাদের সুখের জন্য যেটুকু সাধ্য, তা চেষ্টা কর্‌বো—কুণ্ঠিত হবো না—যাও।"

কল্যাণী শক্ত করিয়া পা দিয়া মাটী চাপিয়া দাঁড়াইল, নিম্নদৃষ্টি জোর করিয়া উন্নীত করিয়া তাঁহার চোখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ম্লান হাসির সহিত কহিল, "ব্যস্ত হবেন না, যাচ্ছি, কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন তো বলি—আপনার অনাবৃত ফুলের তোড়াটা দয়া করে দেবেন কি? অমন ভাল ফুল আমি আর কখনও দেখিনি।"

"নেবে তুমি? যথার্থই সাধ করে, আদর করে নিতে পারবে? না, এ শুধু করুণ চিত্তের করুণার ক্ষণিক ইচ্ছা মাত্র কল্যাণি?"

কল্যাণী নতমুখে কহিল, "আমার চিত্ত খুব যে করুণ নয়—তারও প্রমাণ আপনি পেয়েছেন, আর আমি যা একবার স্থির করি—তার কখন বদল হয় না। এখন আপনার তোড়া দেওয়া না দেওয়া সে আপনার ইচ্ছা।"

আলেয়া ॥ নিরুপমা দেবী

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। নব-নির্ম্মিত বম্পাস টাউনে, একটি অসমতল মাঠের মধ্যস্থ একখানি "কুটীরের" ছাতে ত্রিকূট দর্শন-ক্লান্ত আমরা জন কয়েকে মাদুর পাড়িয়া গড়াইতেছিলাম। আজিকালিকার এই মাত্রাধিক্য বিনয়ের ফ্যাসানে দেওঘরকে কেহ জিতিতে পারিবে না। আবাস—'ভিলা', বা 'লজ'—দুই একখানা দেখা দিলেও অনেক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাও এখানে 'কুটীর' নামে অভিহিত। বৈদ্যনাথ-ধামে গৃহবাসী হইতে বোধ হয়, কাহারও কাহারও লজ্জা-বোধ হয়, তাই অনেকে এখানে ঐরূপ এক একখানি "কুটীর"ই বাঁধিয়াছেন এবং সেই "কুটীরের" অভ্যাগতবর্গও সুবেশা সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে শ্মশানেমশানে বিচরণ করিয়া, কুটীর বাসের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। বঙ্গের গৃহকোণাবদ্ধারাও বাঙ্গালা হইতে দুই পা মাত্র অগ্রসর হইয়া, এখানের রাস্তামাঠে এমন ভাবে বিচরণ করেন যে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা কোন কালেও যে অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন, এমন যেন বোধই হয় না।

সেকথা যাউক। পূর্ব্বে ত্রিকূট, পশ্চিমে দিগ্‌ড়ীয়া এবং দক্ষিণে অজ্ঞাতনামা একটা পাহাড়, দেওঘরকে বেষ্টন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। (নন্দন পাহাড় বা তপোবন-শিখর ইহাদের নিকটে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে!) আকাশ নক্ষত্রবিরল, ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন। গৃহবিরল বম্‌পাস টাউনের কয়েকটি গৃহ হইতে আলোক-শিখা সেই অন্ধকারময় প্রান্তরের জমাট অন্ধকারকে স্থানে স্থানে যেন দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমণকারী নরনারীর দল তখন নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়াছেন। কোথাও কোনও গৃহ হইতে গ্রামোফনের নানারসসমন্বিত সঙ্গীত উঠিয়া উদ্দাম বায়ুপথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

দুই দিন হইতে পশ্চিমের দিগ্‌ড়ীয়া পাহাড়ে আগুন ধরিয়াছিল। সেরাত্রে অগ্নি পাহাড়ের শিখরদেশ হইতে নামিয়া তাহার বিস্তীর্ণ কণ্ঠদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া একগাছি উজ্জ্বল মালার ন্যায় জ্বলিতেছিল। আমরা মুগ্ধনেত্রে পর্ব্বতের এই অপূর্ব্ব দীপালি দেখিতে দেখিতে, সেই অগ্নি মনুষ্যহস্ত দত্ত অথবা দাবানল হইতে পারে কিনা, তাহারই বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা কাষ্টেয়ার্স এবং বম্‌পাস টাউনের মধ্যস্থিতা বালুতলবাহী সঙ্কীর্ণা শুষ্কশরীরা "যম্‌না-জোড়" নদীর তীরে একটা আলোক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের সহিত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠায় সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। আলোকটি কয়েক মুহূর্ত্ত একভাবে জ্বলিয়া সহসা দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং খানিক অগ্রসর হইয়াই দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। ক্ষণপরেই আবার দেখা গেল সেই আলোক বামদিকে চলিয়া আসিয়াছে এবং জ্বলিতে জ্বলিতে বিশৃঙ্খলভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল, 'আলেয়া'-'আলেয়া'। আমরা আগ্রহের সহিত সেই আলোকের নির্ব্বাণ-প্রজ্বলন এবং ইতস্ততঃ-সঞ্চরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আলোক জ্বলিতে

জ্বলিতে, যম্‌না-জোড়ের তীরে তীরে পূর্ব্বাভিমুখে চলিল এবং বহুদূর গিয়া আবার নিবিয়া গেল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেখা গেল বম্পাস টাউনের দক্ষিণস্থ "কান্‌হাইয়া জোড়" নামে 'যম্‌নাজোড়' অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ একটি পর্ব্বতপথবাহিনী নদীর তীরে তেমনই একটি আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সেইরূপ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। উত্তরের যম্‌না-জোড়-তীরের আলোক তখন নির্ব্বাপিত। সকলেই মৃদুমন্দ বিস্ময় গুঞ্জন আরম্ভ করিতেই পল্লীবাসী একজন বন্ধু বলিলেন, "ও তো ভুলোয় আলো! ও তো মাঠে মাঠে অমনি একদিক থেকে আর একদিকে ছুটোছুটি করেই বেড়ায়। 'রাত-বিরাত' বা রাস্তাঘাটে ওদের নাম ক'রলেও বিপদ ঘটে! যেমন অপদেবতার নাম কর্‌লেই তাঁরা সেখানে অধিষ্ঠান হন, তেমনি রাস্তায় ভুলোর নাম করলে, বা ঐ আলো ধরে চল্‌লে মরণ ত' নিশ্চিত! তাছাড়া আবার ঘরে বসে রাত্রে ওর নাম কর্‌লে কোন না কোন পথিক সে রাতে ওর খপ্পরে পড়বেই!"—তাঁহার কথায় তখন আর আমাদের কান দিবার অবসর ছিল না। এখন শিক্ষিত বন্ধু কয়টির মধ্যে বিষম তর্ক বাধিয়া গিয়াছে! হাত-পা গুটাইয়া বয়োজ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ বন্ধুর কোল ঘেঁসিয়া শুইয়া থিয়জফিষ্ট-'চাঁই' তাঁহাকে ধমকের উপর ধমক দিয়া নির্ব্বাক করিয়া দিতেছেন। একই সময়ে দুই ধারের দুইটি নদীর তীরে উক্ত আলোক জ্বলিয়া উঠার অপরাধে তিনি আর তাহাকে কিছুতেই "আলেয়া" বলিতে দিবেন না,—এই তাঁহার পণ। অভিজ্ঞের তাহাতে আপত্তি দেখিয়া, তাঁহার রোখ আরও চড়িয়া উঠিতেছিল। অভিজ্ঞ বলিতেছিলেন, "নিসর্গের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার অনেক সময়ই ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না! কে বল্‌তে পারে যে, দুটো নদীর মুখে যোগ নেই! মাঝের মাঠটা ত খুব বেশি বড় নয়।" তাহার কথা তখন কে শোনে! ঐ আলোকটি যে ভৌতিক, ইহারই প্রমাণের জন্য সকলেই প্রায় একযোগে এবিষয়ে যাহার যত অভিজ্ঞতা আছে, তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। "চাই" তো পরম বৈজ্ঞানিক ক্রুক্‌স্ ও মহামান্য ওয়ালাস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষীরোদ বাবু, মণিলাল বাবুর "অলৌকিক রহস্য" এবং ভূতুড়েকাণ্ডের গল্প পর্য্যন্ত সে সভায় উপস্থিত করিলেন। আমাদের অভিজ্ঞ এইবার শ্রোতাদের জন্য একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "এ গল্পগুলো কালকের জন্য রাখ্‌লে হত না?" শ্রোতৃবর্গের একস্থানে তাল-পাকানোর গতিক দেখিয়া তিনি সকলের রাত্রে অনিদ্রা এবং দুঃস্বপ্নের আশঙ্কা করিতেছিলেন। 'চাঁই' নিকটে আলোক আনাইয়াছিলেন; এক্ষণে ব্যূহিত বন্ধুবর্গের মধ্যে আপনাকে সুরক্ষিত দেখিয়া, অভিজ্ঞের বাহুতে মাথাটিও তুলিয়া দিয়া বলিলেন—"কিসের ভয়!" তাঁহাকে আঁটিতে না পারিয়া, অভিজ্ঞ বিনীত ভাবে বলিলেন, "না ভয় আর কিসের? তবে এই গল্প-বলার উত্তেজনা ফুরিয়ে গেলে হয়ত সিঁড়িতে পা বাড়াতেও কষ্ট হবে, তার চেয়ে চল নীচে যাওয়া যাক।" তখন একথার সারবত্তা বুঝিয়া সকলে উঠিতে চাহিতেছিল, এমন সময়ে নীচে হইতে এক ব্যক্তি সংবাদ লইয়া আসিল, আমাদের ত্রিকূট দর্শনের সঙ্গী কাষ্টেয়ার্স টাউনস্থিত বন্ধুবর্গ সম্প্রতি বৈকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া হারাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চাকরেবা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের খুঁজিতে বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের ভীতিসমাচ্ছন্ন মুখে এতত্ত্বও প্রকাশ পাইল যে, তাহারাও সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে গিয়া পথ হারাইয়াছিল এবং অতিকষ্টে রাত্রি নয়টার সময় বাসা খুঁজিয়া পাইয়াছে বটে কিন্তু মনিবদের এখনও ফিরিতে না দেখিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধেও সেই আশঙ্কা করিতেছে। পল্লীবাসী বন্ধু সগর্ব্বে বলিলেন, "রাত্রে 'ভুলো'র নাম করার ফল হাতে হাতে দেখ্‌লে ত'? তোমরা মাননা কিন্তু আমরা এম্‌নি কতশত প্রত্যক্ষ ফল ফল্‌তে দেখেছি।"

এতক্ষণ হয়ত তাঁরা বাসায় ফিরেছেন। কাল সকালে অতি অবশ্য তাঁদের পৌঁছানো খবর

আমাদের দিয়ে যেও।—* তাঁহাদের চাকরদের এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল এবং ঘটনাচক্রে পল্লীবাসী বন্ধুর কথিত "ভুলোর আলো"র নাম-মাহাত্ম্য এইরূপে সদ্যপ্রমাণিত হওয়ায় অগত্যা বিরুদ্ধবাদীদের মস্তক নত করিতে হইল। তাহার আর গর্ব্বের সীমা রহিল না।

আমাদের কবিবন্ধুটি এতক্ষণ ঝিমাইতেছিলেন। ডাকা ডাকিতে তিনি চক্ষু চাহিয়া হস্তের ইঙ্গিতে সকলকে নিকটে বসিতে বলিলেন। তাঁহার রকমসকমে আবার কি ব্যাপার না জানি ভাবিয়া সকলেই তাঁহার নিকটে নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলাম। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ও আলোর তথ্য আবিষ্কার হয়েছে! যদি কেউ এখন সাহস করে ঐ আলোটার সন্ধানে যেতে পার, তা'হলে দেখ্তে পাও, যম্‌না-জোড়ের ধারে একজন সন্ন্যাসী একটা ধূনী জ্বেলে বসে আছে, এবং মাঝে মাঝে সেই জ্বলন্ত ধূনীর কাটটা দপ্ দপ্ করে জ্বালিয়ে নদীর ধারে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে।"

বিস্ময়ে আতঙ্কে শ্রোতৃবর্গ আমরা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া পড়িলাম! অভিজ্ঞ ঈষৎ মাত্র হাসিলেন—তাঁহার সেই হাসিটুকুতেই আমরা তাঁহার উপর চটিয়া উঠিলাম! এমন সময় হাসি!—বলিলেন, "তাতো এখন আমরা কেউ যেতে পারছি না, অতএব"—

থিয়জফিষ্ট্ ইহারই মধ্যে আবার তাঁহার ক্রোড়ের নিকটস্থ স্থানটি দখল করিয়া লইয়াছিলেন! মত ও বিশ্বাস লইয়া সর্ব্বদা অভিজ্ঞের সহিত থিয়জফিষ্টের বিবাদ চলিলেও ভয় পাইলেই 'চাঁই'—অভিজ্ঞতা, বয়স ও সাহসে শ্রেষ্ঠ বন্ধুটির ক্রোড়-দেশটি সর্ব্বাগ্রে অধিকার করিতেন। এক্ষণে তাঁহার মুখ হইতে কথাটি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—

"তাতে কাজ নেই, তুমিই কি বল্‌তে চাও বল, বল!" ভয় পাইতে এবং গল্প শুনিতে, উভয়েই তিনি অগ্রগণ্য।

সকলের আতঙ্কে এবং আগ্রহে অচল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অগত্যা অভিজ্ঞ বলিলেন "যতক্ষণ নীচের লোকেরা এসে আমাদের টেনে নীচে নিয়ে না যায়, ততক্ষণ তবে তোমার ধূনীর গল্পই চলুক!"

কবি চক্ষু মুদিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সে বহুদিনের কথা! দেওঘরের অধিকাংশ স্থানই তখন শাল-পলাশ-মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষে এবং ঘনবৃহৎ কণ্টকময় গুল্মে একেবারে গভীর বনের পর্য্যায়ভুক্ত। এই অসমতল কঙ্করময় কঠিন ভূমির স্থানে স্থানের উচ্চতা-রেখা তখন ঐ নন্দনপাহাড়ের বক্ষ স্পর্শ করিত। সেই গভীর বনমধ্যে এবং বৃক্ষবিরল অসমতল রুক্ষ প্রান্তরে ঐ যথাতথা উদ্ভূত সুকৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতের ক্ষুদ্র সংস্করণগুলা অথবা তাহাদের বহুদূরবিস্তৃত শিকড়গুলা—বন্য মহিষ, হস্তী বা বনচর কোন বিকট পশুর ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষী যাত্রিগণের ভীতি উৎপাদন করিত। প্রাচীন 'পুরন্দহ'ই তখন কেবল মাত্র দেওঘরের জনপদ। উইলিয়ামস্ সাহেব তখনও

---

* তাঁহারা সত্যই সেদিন সদলে পথ ভুলিয়াছিলেন এবং বহুকষ্টে রাত্রি দশটার সময় বাসায় উপস্থিত হন! কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয় পুরুষ অভিভাবকটি (সেই পর্ব্বতে আছাড় খাওয়া মান্যবর ব্যক্তিটি)-ই সর্ব্বাপেক্ষা মজা করিয়াছিলেন! তিনিও কোনও কার্য্যানুরোধে একাই সে রাত্রে একদিকে যান এবং পথ ভুলিয়া একেবারে উইলিয়ম্‌স্ টাউনে গিয়া হাজির হন! শেষে সে স্থান হইতে গাড়ি করিয়া রাত্রি বারোটার সময় গৃহে ফিরিয়া এই "প্রহসন ভ্রান্তিকে" তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য করিয়া তুলেন।—কিন্তু তাঁহারা কেহই 'আলেয়া'র আলো দেখেন নাই, এটুকু এখানে বলা উচিত।

বন কাটাইয়া উইলিয়ামস্ টাউনের পত্তন করেন নাই; কাষ্টেয়ার্স বা বম্পাস্ টাউনের কল্পনাও তখন দেওঘর-অধিবাসীরা স্বপ্নে দেখে নাই।

গভীর বনমধ্যবাহিনী 'যমুনা-জোড়' ও 'কান্হাইয়া-জোড়' ও তখন এইরূপ বালুকাবশিষ্ট-শরীরা ছিল না। তাহারা 'দিগ্ড়ীয়া' পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া সেই শ্যামল শালবনের নিম্নে অতি খর বেগেই বহিয়া যাইত। খাত এইরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল বটে কিন্তু জল অগভীর ছিল না। বিশেষ বর্ষায় যখন পাহাড়ের 'ঢল' নামিয়া নদীতে 'বুহা' আসিত, সে দিন সেই সঙ্কীর্ণা অখ্যাতনাম্নী পার্ব্বতীদ্বয়ের স্রোতোবেগে পড়িলে, বোধ হয়, মত্তহস্তীও ভাসিয়া যাইত।

এই দেবঘরের পাঁচক্রোশ পূর্ব্বে গভীর বনের মধ্যে ঐ ত্রিকূট পর্ব্বতের গুহায় একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সাধুরা তীর্থে বাস করিয়াও যেমন লোকচক্ষুর অগোচরেই থাকিতে ভালবাসেন, সন্ন্যাসীও সেই উদ্দেশ্যে সেই নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহায় থাকিতেন। তখন দেওঘরের বাঙ্গালী বাবুদের এত হুড়াহুড়ি পড়ে নাই! যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের এত দুরন্ত সখ ছিল না যে, সেই বন ভাঙ্গিয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকের পড়িবার জন্য পাহাড়ে উঠিতে আসিবেন। দূর গ্রামস্থ অধিবাসীরা সেই পাহাড়ে "দেও" ছাড়া অন্য কেহ যে বাস করিতে পারে, এ বিশ্বাস করিত না। সেই লোকচক্ষুর অগোচর সন্ন্যাসী কতদিন হইতে যে সেখানে বাসস্থান করিতেছেন, তাহাও কেহ জানিত না; কেবল কয়েক বৎসর হইতে শিবচতুর্দ্দশী কিংবা ঐরূপ কোন কোন দিবসে একজন সন্ন্যাসীকে বৈদ্যনাথের পূজকেরা বনফুল হস্তে শিবমন্দিরে পূজার্থে উপস্থিত দেখিতে পাইত।

সেদিনও সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথের পূজান্তে সেই বনপথ ধরিয়া নিজ বাসস্থান অভিমুখে ফিরিতেছিলেন। হস্তে একটি লোহিত বর্ণের অর্দ্ধস্ফুট শতদল! শ্যামল শালপত্রের ঠোঙ্গায় কতকগুলি পলাশআকন্দ প্রভৃতি বনফুল তুলিয়া লইয়া গিয়া তিনি বৈদ্যনাথের পূজা করিয়াছিলেন; কিন্তু পূজান্তে উঠিবার সময় একজন পাণ্ডা শিবনির্ম্মাল্য ও প্রসাদ-স্বরূপ "ত্যাগী বাবা"র হস্তে শিবসাগর-উদ্ভূত একটি ক্ষুদ্র শতদল ও কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ তুলিয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসী মন্দিরের বাহিরে আসিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় সেই প্রসাদের কণামাত্র ধারণ করিয়া, বাকিটুকু কোন ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকের হস্তে দিয়াছেন। তখন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন বৈদ্যনাথে এখনকার মত ভিক্ষুকের পাল ছিল না। কিন্তু কি জানি কেন, তিনি ফুলটি সেদিন হস্তে লইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। গিরিতলস্থ বনভূমি সেদিন বসন্তের পূর্ণতা-বিহ্বল। সতেজ সরল শ্যামবর্ণ শালশাল্মলী পলাশ-মধূক প্রভৃতি বৃক্ষগুলি আপ্রান্ত নবপল্লবপুষ্পে ভূষিত; চ্যুতমুকুল, মধূক ও বনপুষ্পের গন্ধে পবন সুরভিত। পাখীর গানে যেন বনদেবীদেরই কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত বলিয়া কর্ণের ভ্রম জন্মিতেছে। তাহাদের মঞ্জীররবে এবং অঞ্চল গন্ধে মাঝে মাঝে বন যেন শিহরিয়া উঠিতেছে। কোথাও কীচক-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট বায়ু কিন্নরের ওষ্ঠস্পর্শী বংশীস্বরের অনুকরণ করিতেছে। বন্য মহিষ, চমরী গাভী কোথাও বা হরিণদল অদ্য যেন অধিকতর নির্ভয়ে অধিকতর নির্ব্বিরোধ-ভাবে—যুগ্মে যুগ্মে চরিয়া বেড়াইতেছে। পরস্পর পরস্পরকে নানারূপে স্নেহ জানাইতেছে। সন্ন্যাসী দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। সেই তরুণ যৌবনের পঠিত কুমার-সম্ভবের শ্লোকগুলা সহসা অদ্য তাহার মনের মধ্যে আপনা হইতেই যেন বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। বনস্থলীর এই বসন্ত-সমাগমকে যেন অদ্য তাঁহার সেই অকাল-বসন্তোদয়ের দিনের মতই বোধ হইল। ঠিক যেন সেই দৃশ্য।

"কাষ্ঠাগত স্নেহ রসানুবিদ্ধং দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ ।।
মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ।।
দদৌ বসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ।।"

সন্ন্যাসী ক্রমশঃই অধিকতর বিমনা হইতেছিলেন। সহসা ত্রিকূটের উন্নত শৃঙ্গে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি মনের এই দুর্ব্বলতায় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, এ কি! এখনো কি তাহার অন্তরে কাব্যের প্রতি এতখানি মোহ আছে? প্রকৃতির এই ঋতুবিপর্য্যয়ে সেই কাব্য-কথাই কেন তাঁহার মনে পড়িতেছে। তাঁহার অন্তর কি এখনও যে কোন ভোগসুখের উপরেই সম্পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হয় নাই! তরুণ যৌবনের সুখলালসার লেশ এখনও কি তাঁহার অন্তরের কোন কোণে লুকাইয়া আছে। অথবা এ কাহারও ছলনা? সেই "অকালিকী মধু-প্রবৃত্তি"র দিনে মহাদেবের তপোবনবাসী তপস্বীদের মনও বুঝি অকারণে এইরূপই সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এইবার গর্ব্বের হাসি হাসিয়া সন্ন্যাসী মনে মনে উচ্চারণ করিলেন—"কাহার ধ্যান ভাঙ্গিতে তোমার এ আয়োজন বসন্ত? এ আশ্রমের রক্ষী ত্রিকূটের উন্নত শিখর ঐ যে নন্দীর মতই মুখে দক্ষিণ অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। এ চাপল্য সম্বরণ কর—নহিলে মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া যাইবে। তোমার এ মায়ার ওখানে প্রবেশাধিকার নিষেধ!"

সহসা সন্ন্যাসীর গতি-রোধ হইল। দক্ষিণের ডালপালাগুলা বড় জোরে নড়িয়া উঠায় কোনও হিংস্র জন্তু ভাবিয়া সন্ন্যাসী চকিতদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অচিন্ত্যপূর্ব্ব! দুইহস্তে সেই কণ্টকময় ঘনবনের শাখাপ্রশাখা ঠেলিয়া একটি কিশোর বালকমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কণ্টকগুল্ম ও বনলতার শ্যাম বাহুতে বালকের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত, অর্ধমলিন হরিদ্রাভ উত্তরীয়খানি এবং বাহু ও পৃষ্ঠদেশ-লম্বিত গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত কেশগুলি পর্য্যন্ত জড়াইয়া ধরিয়াছে তাহারা। সস্পৃহভাবে অধিকার করিবার চেষ্টায়। প্রভাত-প্রস্ফুটিত তরুণ পদ্মের ন্যায় অনবদ্য সুন্দর মুখের উপর হরিণের ন্যায় তরল চক্ষু দুইটি ভয়চকিত, ঈষৎ আর্ত্তভাবযুক্ত। নবনীত অপেক্ষা সুকুমার বাহুলতা দুইখানির দ্বারা বন ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টায় বালক সরল মৃগের মত বনলতায় অধিকতর জড়িত হইয়া পড়িতেছিল।

সন্ন্যাসী তখনও স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সেই বনের মধ্যে সহসা এই কিশোর বালককে দেখিয়া তাঁহার কেমন মোহ আসিয়াছিল। ভাবিতেছিলেন, "এই মূর্ত্তিমান বসন্তের ন্যায় কে এ বালক? এ যে কোন দেবতা তাহাতে সন্দেহই নাই, নতুবা দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ের সঙ্গে এমন অহেতুকী আনন্দ—অননুভূতপূর্ব্ব সুখ—অন্তরে কেন জাগিতেছে? দেবতা, কিন্তু কোন্ দেবতা তুমি? হে কিশোর! যার আগমনে বনস্থলীর এই উতরোল ভাব, এই চাঞ্চল্য, সেই কি তুমি! তোমায় কোন্ মন্ত্রে আবাহন করিয়া পাদ্যঅর্ঘ্য দিতে হইবে? কি কথা বলিতে হইবে?— কোন্ মন্ত্র সে?"

সহসা একটা স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সন্ন্যাসী আবার চকিত ভাবে চাহিলেন। স্বরটিও অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রুতিসুখকর। বীণাবেণুর মত নহে তথাপি অধিকতর মোহময়। সেই স্বরের উৎপত্তি-স্থান-নির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যেন বায়ুবেগে সেই প্রভাতপদ্মের আরক্তিম পর্ণ দুইখানি কাঁপিতেছে এবং সেই তরল চক্ষে প্রশ্নভরা চকিত দৃষ্টি! সেই দৃষ্টি সন্ন্যাসীর উপরই নিবদ্ধ!—"ইয়ে পাহাড়মে ক্যা মহারাজ কে ডেরা হায়?"

বালককে তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টায় অধিকতর বিপন্ন দেখিয়া, এইবার সন্ন্যাসীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, বাধা দিয়া বলিলেন—"আর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিও না, কষ্ট পাইবে। স্থির হইয়া দাঁড়াও। তোমায় কেহ সাহায্য না করিলে এ কণ্টক-লতা-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে না!" সন্ন্যাসীর দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া বালক নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী বালকের নিকটস্থ হইয়া অপর দিক হইতে সুকৌশলে বালককে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই লতা-পাশ-বেষ্টিত উত্তরীয়-জড়িত কিশোর কমনীয় দেহখানি, এবং কণ্টকাঘাতে আরক্ত মৃণালনিন্দিত বাহু দুইটি স্পর্শ করিতে তখনও যেন সন্ন্যাসীর বিভ্রম উপস্থিত হইতেছিল!

তাহার সেই ঘনকৃষ্ণলম্বিত কেশগুলি, যাহার মধ্যে সেই সুন্দর মুখখানি পদ্মের মতই ফুটিয়া আছে, বনলতার অত্যাচারে সেই বিপর্য্যস্ত কেশগুলির আকুঞ্চনের মধ্যে লতাচ্যুত যে ফুল কয়টি বাধিয়া গিয়া বালকের প্রতি বনের প্রীতি ও পূজার সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর এখনও তাহাকে বিপন্ন বনদেব বলিয়াই মনে হইতেছিল!

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বালক মুক্ত হইল। অগ্রসর হইয়া শির নত করিয়া যুক্তকরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। "ঠাকুরজি! পাঁও লগে' আপ ইয়ে পাহাড় পর ডেরা রাখিন হেঁ?" —কি সুধাময় মধুর স্বর! সন্ন্যাসীর মনে হইতেছি', কর্ণ যেন এমন সুখ আর কখনও পায় নাই। মনের সে ভাব দমন করিয়া সন্ন্যাসী বালককে প্রতি-প্রশ্ন করিলেন—"এই পাহাড়ে যে কাহারও আবাস থাকিতে পারে, তাহা বালক কি রূপে জানিল! সেই বা কে? এ জঙ্গলে কোথা হইতে সে আসিল?" বালক তাহার চক্ষু দুইটি সন্ন্যাসীর দিকে স্থির করিয়া ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ হিন্দীতে বলিতে লাগিল, কিছু দূর হইতে তাহারা পর্ব্বতের গাত্রে একটা ধূম-রেখা লক্ষ্য করিয়া সেখানে কোন সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমের আশা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে তাহার রুগ্ন দুর্ব্বল পিতা। তাহারা 'হরদোয়ার' (হরিদ্বার) হইতে পুরুষোত্তম দর্শনে যাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া অদ্য কয়েক মাস হইতে পথ চলিতেছিল। পথে পিতা রুগ্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি এখন বৈদ্যনাথ জীর ধামে পৌঁছিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন,—কিন্তু আর তাঁহার পথ চলিবার ক্ষমতা নাই, তিনি প্রায় মুমূর্ষু! আশ্রয়প্রাপ্তির জন্য উভয়ে এই ধূম লক্ষ্য করিয়া পর্ব্বতের নিকটে অগ্রসর হইতেছিল, এক্ষণে পিতার আর চলিবার শক্তি না থাকায় তাঁহাকে একস্থানে শোয়াইয়া বালকই আশ্রয়ানুসন্ধানে চলিয়াছে, পথমধ্যে ঠাকুরজীর সহিত সাক্ষাৎ!

সন্ন্যাসী একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "অবোধ বালক! লোকালয়ের অনুসন্ধান না করিয়া এই ধূম লক্ষ্য করিয়া গভীর বনের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছ। ও ধূম তো পর্ব্বতের দাবাগ্নিও হইতে পারিত? বালক বলিল,—"তাহাদের মনে এক একবার সে আশঙ্কা হইলেও ইহা ভিন্ন তাহাদের আর অন্য গতি ছিল না, কেননা কয়েক দণ্ড বেলা থাকিতেই তাহারা এই বনে পথ হারাইয়াছে; এক্ষণে দির্বা অবসান-প্রায়! লোকালয়-প্রাপ্তির কোন পথ না পাইয়া অগত্যা তাহারা অনিশ্চিত আশায় এই দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া, অন্য কোন উপায় দেখিতে পায় নাই। তাহার পিতাও বলিয়াছিল যে, পাহাড়ে সাধুমহাত্মারা বাস করিয়া থাকেন, হৃষীকেশ পাহাড়ে এরূপ অনেক সাধু আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে পাহাড়ে কেহ না থাকিলেও আর দুঃখ নাই, কেননা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, সেই ধূম লক্ষ্য করিয়াই সে ঠাকুরজীর নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঠাকুরজী নিশ্চয়ই তাহার রুগ্ন মুমূর্ষু পিতাকে রাত্রির মত একটু আশ্রয় দিবেন।" সন্ন্যাসী সস্নেহে বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার পিতা কোথায়?" বালকের সুমধুর কথাগুলি এবং নিঃসংকোচ সাহায্য প্রার্থনার সারল্যে বিপন্ন আর্ত্তভাবের মধ্যেও তাহার এই সরলতায়, সন্ন্যাসী বালকের উপর কেমন একটা স্নেহ অনুভব করিলেন। তাহার অনন্যসাধারণ কিশোরকান্তি তো পূর্ব্বেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল; এক্ষণে সে আকর্ষণে যেন অধিকতর শক্তি-সংযোগ হইল; বালকের সাহায্য করিতে আগ্রহ ও ইচ্ছা হইতে লাগিল।

বালকের সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসী এক রুগ্নকে বনমধ্যে শায়িত দেখিলেন। রুগ্ন মাঝে মাঝে যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছিল; এক্ষণে নিকটে মনুষ্য পদশব্দ বুঝিয়া ডাকিল, "পার্‌বতি!" বালক ছুটিয়া গিয়া পিতার মস্তক হস্তে তুলিয়া ধরিল এবং বলিতে লাগিল "বাবা! আব্ কুছ্ ডর্ নেহি হ্যায়! ঠাকুরজী সে মূলাকাৎ হুয়া, উন্‌নে আভি তুমকো দেখ্‌নে আতে হেঁ! তুম আচ্ছা হো যাওগে পুরুষোত্তম কো দরশন করোগে, আব কুছ ডর নেই, ঠাকুরজী আগিহিন্।"

বালকের অকৃত্রিম সারল্যে এবং নির্ভরযুক্ত বাক্যে সন্ন্যাসীর চক্ষু দ্বিগুণ স্নেহে সজল হইয়া উঠিল। তিনি রুগ্নের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র রুগ্ন বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া অতিকষ্টে হস্ত দুইটি বদ্ধাঞ্জলি করিল, যুগ্মহস্তে ললাট স্পর্শ করিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল "বৈজু বাবা, মেরে জনম সফল হো গয়ি বাবা! পার্‌বতী তুম্‌কো বহুৎ ফুকারা। অব্‌ হামারে আরজ্‌ ইয়া যোঁকি হামারা পার্‌বতীকো তেরি চরণ পর উঠা লেও! হামারে লিয়ে মেরা কুছ হরজ নেই! মেরি জনম মোগারৎ হো গিয়া বাবা,—লেকিন্‌ পার্‌বতী কো লিয়ে—"

সন্ন্যাসী সজল চক্ষে বালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আর বিলম্ব করা উচিত নয়—সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অন্ধকারে বনে পথ পাওয়া এবং পর্ব্বতারোহণ উভয়ই দুরূহ। তাঁহার ঐ পর্ব্বতেই ডেরা বটে কিন্তু পথ দুর্গম বা আশ্রম অত্যন্ত দূরে নয়! এই বেলা তিনি তাহার পিতাকে আশ্রমে লইয়া যাইতে চান।" বালক ম্লানমুখে তাহার পিতা পর্ব্বতে উঠিতে পারিবেন কি না সন্দেহ প্রকাশ করায় সন্ন্যাসী বলিলেন, "সে উপায় আমি করিতেছি, তুমি তোমাদের তল্পী যাহা কিছু আছে, লইয়া আমার সঙ্গে চল।" দীর্ঘোন্নত দেহ, বলশালী, অনতিক্রান্ত যৌবন সন্ন্যাসী, সেই রুগ্নকে অল্প আয়াসেই স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইলেন। রুগ্ন নিজমনে মৃদু মৃদু আপত্তি ও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া ডাকিলেন, "এস পার্ব্বতীপ্রসাদ!"—বালক স্কন্ধে তল্পী তুলিয়া লইয়া সহসা মৃত্তিকার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনার পদ্ম ফুলটি!" রুগ্নকে স্কন্ধে লইবার সময় সন্ন্যাসী সেই শতদল ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে বালককে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া বলিলেন, "উহার কোন প্রয়োজন নাই, নিষ্প্রয়োজনীয় ভার পড়িয়া থাকুক!" "না। বৈদ্‌নাথজীর নির্ম্মাল্য নয় কি এটি?" সন্ন্যাসী সম্মতি-সূচক মস্তক হেলাইবা মাত্র বালক তল্পী রাখিয়া ফুলটি উঠাইয়া লইয়া মস্তকে ঠেকাইল, তৎপরে ত্রস্তে একবার তাহার গন্ধ আঘ্রাণের সঙ্গে 'আঃ' শব্দ করিয়া ফুলটি কানের উপরে চুলের গুচ্ছের মধ্যে গুঁজিয়া দিল এবং তল্পী উঠাইয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাদনুসরণ করিল। বালকের ফুলের উপর লোভ ও এই শিশুর মত ব্যবহার দেখিয়া, সন্ন্যাসী প্রথমে হাসিলেন; কিন্তু যখন সেই ঈষৎ মুদিতদল পদ্মপুষ্পটি বালকের কেশের উপর স্থান পাইল, তখন আর তিনি হাসিলেন না। স্নেহপূর্ণ নয়নে ফুলটির এই নূতন শোভা একবার দেখিয়া লইয়া, ভারস্কন্ধে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

২

কয়েক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। রুগ্ন লছ্‌মীপ্রসাদ সন্ন্যাসীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় আরোগ্য হইয়াছেন এবং পার্ব্বত্য নির্ঝরের জল ও স্বাস্থ্যকর বায়ু-সেবনে ক্রমে সবল হইয়া উঠিতেছেন। সন্ন্যাসীকে ইহাদিগকে লইয়া অনেকটা ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে। নিকটে লোকালয় নাই, রুগ্নের বলকর পথ্যের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই গ্রামাভিমুখে যাইতে হয়। লছমীপ্রসাদের অর্থের অভাব নাই। সন্ন্যাসীকে তাহাদের জন্য ভিক্ষা করিতে হয় না, তথাপি অতদূর হইতে প্রাত্যহিক খাদ্যসংগ্রহই এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সন্ন্যাসী কিন্তু অবিরক্ত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। ইহারা যে চিরদিন এখানে থাকিবে না, তাহা তিনি জানেন এবং তাহাদের জন্য এই শ্রম-স্বীকার তাঁহার কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ বলিয়া তিনি মনে করেন। কিছুকাল হইল, তাঁহার একা গ্রাম হইতে খাদ্য বহিয়া আনার কষ্টের লাঘব হইয়াছে। পিতা একটু সুস্থ হওয়ার পর পার্ব্বতীও তাঁহার সঙ্গে যায়; উভয়ে একেবারে কিছুদিনের মত আহার্য্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসে। সে জন্য সর্ব্বদা আর তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে হয় না।

একদিন বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া আসার পর লছমীপ্রসাদের পুরুষোত্তম-দর্শনের সাধ আবার প্রবল হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বুঝাইলেন যে, এই সঙ্কল্প তাঁহাকে পুনরায় মৃত্যুমুখে

ফেলিবে কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে দমিল না। বলিল, মরিতে তো একদিন অবশ্যই হইবে, সে জন্য পুরুষোত্তম দর্শনের ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত নয়। যে প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, কে জানিত যে, তাহার কপালে তাঁহার ন্যায় সাধুর আশ্রয় লাভ এবং বৈদ্যনাথ-দর্শন ঘটিবে। বাবা বৈদ্যনাথ যখন মনুষ্য দেহ ধরিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন কে জানে হয়ত পুরুষোত্তম-দর্শনও তাহার ললাটে লেখা আছে। তাহাদের তো একদিকে যাইতে হইবে ঃ ঠাকুরজীর তাহাদের জন্য বহুত তক্‌লিব হইয়াছে, যদিও বাবার ইহা নিত্যকার্য্য তথাপি তাঁহার সাধনার বিঘ্ন করিয়া আর তাহাদের থাকা উচিত নয়! সন্ন্যাসী সে বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া অন্য কথা তুলিলেন, "সম্মুখে ঘোর বর্ষা। যদি তাঁহার পুরুষোত্তম যাইতে একান্তই ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই দুইমাস কাটাইয়া শরতের প্রারম্ভে যাত্রা করাই উচিত; নহিলে তিনি সে দুরন্ত পথের কতটুকু যাইতে পারিবেন বলা কঠিন! বৃদ্ধ, সন্ন্যাসীর কথার সারবত্তা বুঝিয়া অগত্যা আরও দুইমাস সেই পর্ব্বতেই অতিবাহিত করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সন্ন্যাসীর বালকের প্রতি সেই প্রথম দর্শনের অকারণ উদ্ভূত স্নেহ এই কয় মাসের অবিরত সাহচর্য্যে সুদৃঢ় বন্ধনেই পরিণত হইয়াছিল। বালকেরও তাঁহার উপর অগাধ নির্ভরতা এবং স্নেহাকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া সেই স্নেহপাশে সন্ন্যাসীকে যেন অধিকতর জড়িত করিয়া তুলিতেছিল। বালকের পিতা তাহার পার্ব্বতীর প্রতি এই স্নেহভাব লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিল—"ঠাকুরজীর নিকটে যদি পার্ব্বতীকে রাখিয়া যাইতে পাইতাম, তাহা হইলে বুঝি নিশ্চিন্ত হইয়া পুরুষোত্তমের চরণে গিয়া পড়িতে পারিতাম। আমিও বুঝিতেছি, সেখান হইতে আমি আর ফিরিতে পারিব না। ঠাকুরজী পার্ব্বতীকে 'চেলা' করিয়া চিরদিন কাছে কাছে রাখিলে, তাহার জন্য আর ভাবিতে হইত না। কিন্তু তাহা আমাদের ভাগ্যে ঘটিবার উপায় নাই। ঠাকুরজী-বিরাগী সন্ন্যাসী—তাহাকে লইয়া কি করিবেন!" বৃদ্ধের নিঃশ্বাসটি যেন অন্তঃস্থল হইতেই পড়িল। সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন,—তাঁহার আবার চেলা? তাহাও আবার এই ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশবর্ষীয় বাল-কার্ত্তিকেয়-তুল্য কিশোর কুমার! তাঁহার এই বনবাসী নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হওয়া কি ঐ বালকের সাধ্য? কি সুখে কি জন্য সে চিরকালের নিমিত্ত এই পর্ব্বতগুহায় কাটাইতে চাহিবে? তিনিই বা কোন প্রাণে তাহাকে রাখিতে চাহিবেন? বৃদ্ধ ও বালক যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এই সঙ্কল্প করিত, তাহা হইলেও ইহাতে তাঁহার বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই নবজাত সুকোমল কাণ্ডচ্যুত বৃক্ষটি এই ত্রিকূটের নীরস কঠিন প্রস্তরের মধ্যে আনিয়া বসাইয়া দিলে তাহাতে বৃক্ষ বা এই প্রস্তর কাহার কোন্ সার্থকতা লাভ হইবে? তিনি জনসঙ্গত্যাগী সন্ন্যাসী, এ বালকের সঙ্গে তাঁহারই বা কি প্রয়োজন?

তাঁহার আবাস-গুহাটি বালক ও বৃদ্ধ কর্ত্তৃক অধিকৃত; তাই তিনি পর্ব্বতের আরও একটু উচ্চতর স্থানে অন্য একটি গুহায় রাত্রি যাপন করিতেন বা ধ্যানাদি কার্য্যে নিঃসঙ্গ হইবার জন্য দিবসেও মাঝে মাঝে সেই স্থানে উঠিয়া আসিতেন। সেদিনও সন্ন্যাসী উপরে উঠিয়া আসিয়া সেই গুহা সম্মুখস্থ শিলাখণ্ডে বসিয়া এই কথাই ভাবিতেছিলেন। এই বালককে নিকটে রাখিতে কেন এমন ইচ্ছা আসিতেছে? কেন মনে হইতেছে—সে চলিয়া গেলে আর তাঁহার কিছুই থাকিবে না। সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন। স্নেহের মোহ এখনও তাঁহার অন্তরে এত অদম্য? ভগবান শঙ্কর এই মমতাকে এই জন্যই "পাশ" বলিয়াছেন। সেই মমতা এখনও তাঁহার অন্তরে এত প্রবল? আর না,—এ পাশ শীঘ্র ছিন্ন হওয়াই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের।

সেই প্রস্তরখণ্ড ঘেরিয়া ত্রিকূটের কঠিন নীরস হৃদয়োত্থিতা স্নিগ্ধ স্নেহধারা, প্রস্তর হইতে প্রস্তরে কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ শব্দে বহিয়া যাইতেছিল। উপলব্যথিত গতি নির্ঝরিণী সন্ন্যাসীর পায়ের গোড়ায় ঝুরুঝুরু রবে, করুণ সুরে যেন কাঁদিয়া নামিতেছিল। সন্ন্যাসী আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন, স্তরে স্তরে মেঘ সেখানে পুঞ্জীকৃত হইয়া পর্ব্বতের অঙ্গে তাহার ছায়া

ফেলিতেছে। আলোকস্নাত লতা-পাদপ সহসা কজ্জলাভা ধারণ করিয়াছে, উজ্জ্বল লৌহফলকের মত নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ অঙ্গও দলিতাঞ্জন আভা হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলেন, এখনি শ্রাবণ গগন ভাসাইয়া বৃষ্টি নামিবে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন সেই বৃহৎ শিলাখণ্ডের নিম্নে নির্ঝরের জলে পা ডুবাইয়া পার্ব্বতী উর্দ্ধমুখে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার সেই নির্ঝর-নীর-ধারার ন্যায় স্বচ্ছ তরল বিশাল চক্ষেও মেঘের কৃষ্ণছায়া যেন কাজল পরাইয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি মিলিবামাত্র পার্ব্বতী একটুখানি হাসিল, সে হাসিতেও পূর্ব্বের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য বা কলতান নাই; সে হাসিতেও যেন আজ সেই মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। পার্ব্বতী আজ অন্য দিনের ন্যায় হরিণের মত চপল গতিতে তাঁহার নিকটে ছুটিয়াও আসিল না দেখিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। ধীরমন্থর গতিতে বালক উঠিয়া আসিয়া শিলার এক পার্শ্বে পা ঝুলাইয়া বসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "ওখানে এতক্ষণ একা বসিয়াছিলে কেন? আমার নিকটে কেন এস নাই?" বালক নতনেত্রে বলিল, "আপনি তো ডাকেন নাই!"

"প্রত্যহ কি আমি ডাকিয়া থাকি?"

"না, কিন্তু আজ আসিতে কেমন ভয় করিতেছিল!"

"কেন পার্ব্বতী?"

বালক একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার নত দৃষ্টি হইয়া বলিল, "আপনি আজ সারাদিনই আমার সঙ্গে কথা কহেন নাই, আর—"

"আর কি পার্ব্বতী?"

"আর কয়দিন হইতেই আপনি যেন আমার উপর 'গোস্মা' হইয়াছেন, আর কাছে ডাকেন্ না, ভাল করিয়া কথা"—বলিতে বলিতে অভিমানে বালকের স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল। সন্ন্যাসী বেদনা পাইলেন,—বালকের নিকট সরিয়া গিয়া তাহার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "না পার্ব্বতী। তোমার উপর তো রাগ করি নাই। মন ভাল ছিল না, একটু অন্যমনা ছিলাম, তাই তোমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারি নাই।" পার্ব্বতীর অভিমান পড়িল না,—দ্বিগুণ গম্ভীর মুখে বলিল,—"কিন্তু আমরা আর বেশীদিন এখানে থাকিব না—তাহা তো জানেন। তখন আপনার আর কাহারও সহিত কথা কহিতে হইবে না, একা একা বেশ অন্যমনেই তো থাকিতে পারিবেন।" অত্যন্ত বেদনার স্থান স্পর্শ করিলে যেমন লোকের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া যায়, সন্ন্যাসীর মুখ সহসা তেমনি ম্লান হইয়া গেল, বালক ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার কোন্ বেদনার স্থান যে স্পর্শ করিয়াছে তাহা সে বালক, সে কি বুঝিবে! সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন "হ্যাঁ—তাহা জানি পার্ব্বতী!" সন্ন্যাসীর হস্ত ধীরে ধীরে বালকের মস্তক হইতে কখন যে স্খলিত হইয়া পড়িল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। তিনি অন্যমনে সেই অন্ধকারময় বনের দিকে চাহিয়া ছিলেন। পার্ব্বতী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ঈষৎ হাসিয়া ফেলিল। অন্ধকার গগন-বক্ষে সহসা বিদ্যুৎ-স্ফুরণে সন্ন্যাসী দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। দুষ্ট বালক তাহার সন্ধান যে অব্যর্থলক্ষ্য হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। এইবার সে তাহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে বলিল—"ঠাকুরজী! এখান হইতে পুরুষোত্তম যাইতে কত দিন লাগে?"

সন্ন্যাসী একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন,—"তাহা তো ঠিক্ বলা যায় না। তবে তোমার পিতার যেরূপ শরীর তাহাতে অন্য যাত্রী অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে কিছু বেশি সময় লাগিবারই সম্ভাবনা।"

"ছয় মাস?—ইহা অপেক্ষাও কি বেশী দিন লাগিবে?"

"না, উনি যদি সুস্থ থাকেন—শীতের প্রথমেও সেখানে পৌঁছিতে পার।"

"ধরুন ঐ দুই মাস, তাহার পরে ফিরিতেও না হয় ছয় মাস। বাবা হয় ত দিনকতক সেখানে থাকিতেও চাহিবেন। এই আগামী শীতের পরবৎসরের শীতের মধ্যেই আমরা নিশ্চয় এখানে পৌঁছিতে পারি, নয় কি ঠাকুরজী?"

সন্ন্যাসী এইবার একটু ক্ষোভের হাসি হাসিলেন। সরল বালক কাল ও ঘটনা-স্রোতকে এখন হইতেই ইচ্ছার বন্ধনে বাঁধিতে চায়। জানে না যে মানুষ তাহার দাস মাত্র। তথাপি বালকের এই অযৌক্তিক অসম্ভাবিত ইচ্ছাতেও তাঁহার অন্তর কেমন যেন ঈষৎ সুখানুভব করিল। সেও তাহা হইলে এখানে অসুখে অনিচ্ছায় অ'স্থার গতিতে মাত্র পড়িয়া নাই, এখানে থাকিতে তাহার ভাল লাগিতেছে, নইলে কেন ফিরিতে 'াহিবে? কিন্তু বালক সে, বোঝে না যে, তাহা হইবার নয়! চিন্তাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "এখানে আসিয়া কি হইবে পার্ব্বতী?"

"কেন, আমি আপনার 'চেলা' হইব।"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এইবার গম্ভীর মুখে বলিলেন "তোমার পিতা বলিয়াছেন তাহা সম্ভব নয়। তোমার এই তরুণ জীবন। অধ্যয়ন আদি এখনও কিছু হয় নাই, তোমার পিতা কোন উপযুক্ত গুরুর হস্তে হয়ত তোমায় সমর্পণ করিবেন। বিদ্যাশিক্ষার পর তোমায় হয়ত বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হইবে। এ পর্ব্বতবাসে তোমার তো কোন উপকার নাই পার্ব্বতী? এখানে আর কিছু দিন থাকিতে হইলেই হয়ত তোমার আর এস্থান ভাল লাগিত না। তোমাদের ন্যায় নবউন্মেষিত জীবনের বাসের উপযুক্ত স্থান এ তো নয়।" পার্ব্বতী সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"কেন নয়? আমি এইখানেই থাকিব। পুরুষোত্তম হইতে আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিব। আপনি আমার গুরু হইবেন, আপনার কাছেই আমি অধ্যয়ন করিব।" সন্ন্যাসী হাসিলেন। "হাসিলেন যে! 'চেলা'কে গুরুই ত পাঠ দিয়া থাকেন! আমি হরদোয়ারে কত গুরু ও চেলা দেখিয়াছি।"

"তুমি আমার চেলা হইবে পার্ব্বতী?"

"তাহাই ত বলিতেছি।"

"তুমি যাঁহাদের কথা বলিতেছ, তাঁহারা মহান্ত বা পরমহংস। আমি নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী! নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর 'চেলা' থাকিতে নাই।"

বালক যেন সেকথা কানেই লইল না। বলিল, "বৃষ্টি আসিতেছে, নিচে চলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি এইখানেই থাকিব। অন্ধকার বাড়িতেছে, তুমি এই বেলা শীঘ্র যাও।" তখন হুহু শব্দে বায়ু আসিয়া বন্য পাদপদিগকে পর্ব্বতের অঙ্গে আছ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া নির্ঝরিণীর জলকে ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে, মেঘ ত্রিকূটের সর্ব্বোন্নতশিখরে যেন লগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টিও আসিয়া পড়িল। বালক সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মনে করিবেন না যে, বৃষ্টি বা ঝড়ের ভয়ে আপনার গুহার মধ্যে আশ্রয় চাহিব। আমি ইহাব মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারি।"—সেই বৃষ্টিধারা-প্লাবিত শিলাময় পথে বায়ুবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত পাদপ ও লতার শাখা ধরিয়া বালক বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে পর্ব্বত অঙ্গে অবতরণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ডাকিলেন "পার্ব্বতী—পার্ব্বতী! ফিরিয়া এসো।" বালক ফিরিল না, কিংবা বায়ুর শব্দে সে কথা তাহার কর্ণেই প্রবেশ করিল না! সন্ন্যাসী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধৃত করিলেন "অবাধ্য বালক! বিপদের ভয় নাই?" প্রকৃতির সেই তুমুল বিপ্লবের মধ্যে তড়িৎপ্রভার মত হাসি দুরন্ত বালকের ওষ্ঠে খেলিয়া গেল—"আমরা যে আর বেশি দিন এখানে থাকিব না, তাহা কেন আপনার মনে থাকে না?"—বালক ফিরিল না, পর্ব্বত বাহিয়া নামিতে লাগিল, অগত্যা সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গেই চলিলেন। মুহুর্ম্মুহুঃ তিনি

তাহার পতনশঙ্কায় হস্তপ্রসারিত করিয়া বালককে ধরিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সে গর্ব্ব ও জয়ের হাসি হাসিয়া তাঁহার সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতেছিল।

নিম্নস্তরে গুহার নিকটে পৌঁছিয়া বালক ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে সন্ন্যাসী একটা শিলার নিম্নে অশ্রয় লইয়া দাঁড়াইলেন। পর্ব্বতের সর্ব্ব অঙ্গ বাহিয়া তখন নির্ঝরিণীর আকারে মেঘ-গলিত জলস্রোত কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ শব্দে নিম্নাভিমুখে ছুটিতেছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতে বায়ুর প্রকোপ তখন কমিয়া গিয়াছে, বৃক্ষ লতা সব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘন মেঘ পাহাড়ের উপরে ধূমের আকারে নামিয়া তাহার শিখরদেশে অনবরত জল ঢালিতেছে। সন্ন্যাসী সম্মুখস্থিত গুহা-দ্বারে চাহিয়া দেখিলেন বালক বোধ হয়, তাহার পিতার তিরস্কারে দ্বিগুণ অভিমানে মুখ অন্ধকার করিয়া, সেইখানে বসিয়া সিক্ত কেশগুলা লইয়া অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে এক একবার অভিমানভরা দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিতেছে। অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত তাহার কৃষ্ণ কেশের মধ্যে চলন্ত অঙ্গুলী প্রভা এবং সেই দৃষ্টি, অন্ধকার গুহার মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতেছে: দেখিতে দেখিতে বালকের সেই অভিমানও যেন সেই বৃষ্টিধারার সঙ্গে গলিয়া মিশিয়া জল হইয়া গেল! হাসি-মুখে তখন সে গুহার ভিতরে পিতার নিকটে সরিয়া গেল। ধারা কমিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সন্ন্যাসীও আবার নিজ নির্দ্দিষ্ট গুহায় উঠিয়া গেলেন।

শরতের প্রারম্ভেই লছমীপ্রসাদ পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির বিমল অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকটে বিদায় লইলেন কিন্তু পার্ব্বতীর একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। উত্তেজনার একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি তাহার মুখে চোখে যেন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। যাত্রার জন্য সে পিতাকে পুনঃ পুনঃ সত্ত্বর হইতে বলিতেছিল। বিদায়কালোচিত কৃতজ্ঞতাসূচক অভিভাষণের বয়স যদিও তাহার হয় নাই, কিন্তু এজন্য একটু বিষণ্ণ ভাব কিংবা একফোঁটা অশ্রুও তাহার চক্ষে দেখিতে না পাইয়া, তাহার পিতা যেন সন্ন্যাসীর কাছে লজ্জিত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী যে বালককে অনেকখানিই ভালবাসিয়াছেন তাহা বৃদ্ধ বেশ জানিত; এক্ষণে পুত্রের এই বিসদৃশ ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ ও ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে সহসা কি যেন বলি-বলি করিয়া বলিল—উহাদের জাতই এইরূপ, উহারা বড় চঞ্চল; স্নেহের প্রকৃত সম্মান জানে না!"—সন্ন্যাসী বৃদ্ধকে বাধা দিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "বালক ও পাহাড়িয়া হরিণে কোন প্রভেদ নাই। উভয়কেই ভাল না বাসিয়া উপায় নাই; উভয়েই স্নেহের পাত্র, কিন্তু উভয়েই বন্ধন মানে না। সেজন্য দুঃখের কোন কারণ নাই, উহাই উহাদের প্রকৃতি।" বালক এইবারে পিতাকে যেন ঠেলিয়া লইয়া চলিল। সন্ন্যাসী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে বহুবার নিম্নে গমনাগমন করিয়া পার্ব্বতী বনপথ বেশ ভালরূপেই চিনিত। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মত চপল গতিতে পার্ব্বতী বৃদ্ধের অগ্রে অগ্রে পোঁট্‌লা স্কন্ধে ছুটিয়া চলিল। তাহার চঞ্চল কেশগুচ্ছযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক এবং বৃহৎ "মুরাঠা"-বাঁধা বৃদ্ধের শির শীঘ্রই সন্ন্যাসীর দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল, বৃদ্ধ পুনঃপুনঃ ফিরিয়া চাহিতে গিয়া, শিলাখণ্ডে 'ওঁচোট' খাইয়াছিলেন; কিন্তু বালক একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল না।

তাহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সন্ন্যাসী তাঁহার নবনির্দ্দিষ্ট গুহায় উঠিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে পুনর্ব্বার পদশব্দ হইল। পদশব্দ অদ্য ছয়মাস যে তাঁহার অত্যন্ত পরিচিত। সন্ন্যাসীর দ্রুতবাহিত বক্ষস্পন্দনের সমতালেই সেই পদশব্দের তাল ও লয় হইতেছে। ঊর্দ্ধগতি হরিণীর মত সে-ই ছুটিয়া আসিতেছে।

সন্ন্যাসী চেষ্টার সহিত একটু হাসিয়া বলিলেন, "ফিরিলে যে?" একটি জিনিষ ভুলিয়া ছিলাম!" পার্ব্বতী তেমনি দ্রুতপদে গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তখনি আবার বাহিরে আসিল। হস্তে শুষ্কপত্রের মত কি একটা দ্রব্য মুঠায় বাঁধা! সন্ন্যাসী বলিলেন, "কি জিনিষ?" সে কথার উত্তর না দিয়া পার্ব্বতী গুহার সম্মুখে যেন [illegible]কিয়া দাঁড়াইল! একপার্শ্বে একটি অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠ

ধীরে ধীরে ধুমাইতেছিল, পার্ব্বতী নিকটস্থ একখানা বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া সেই অগ্নিতে সংযোগ করিয়া দিতে দিতে অবিকৃত হাসিমুখে বলিল "এই ধূম লক্ষ্য করিয়াই ত আমরা এইদিকে আশ্রমের খোঁজে আসিয়াছিলাম। আপনার এই ধূনীতে তো সর্ব্বদাই আগুন থাকে, দেখিবেন যেন ইহার অগ্নি না নিবে! এক বৎসর কি দেড় বৎসর পরে যখন আসিব, তখন 'ডেরা' খুঁজিতে তাহা হইলে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। এই ধূম দেখিতে পাইলেই পাহাড়ের পথ খুঁজিয়া পাইব। কেমন? এ কথাটি মনে রাখিবেন ত?"—ইহার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে শত উত্তর সন্ন্যাসীর মনে উদয় হইলেও তিনি নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িলেন, পার্ব্বতী আর বাক্যব্যয় না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, মুহূর্ত্ত সময়ও যেন তাহার নষ্ট করিলে চলিবে না।

ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে সন্ন্যাসী সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। পার্ব্বতের উপরে উঠিয়া তাহাদের গতিপথ লক্ষ্য করিবার যে ইচ্ছা কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মনে জাগিয়াছিল, সে ইচ্ছা মুহূর্ত্তে যেন স্পন্দনশক্তিহীন হইয়া তাঁহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া দিল। সমস্ত শরীরে একটা কম্প, ভয়ানক শীত করিতেছে, অথচ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া যে গুহামধ্যে প্রবেশ করিবেন, এমন ক্ষমতা নাই।

প্রদোষে যখন সন্ন্যাসী তাঁহার উপরের গুহায় যাইতেছিলেন, তখন একবার নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন, ছয়মাস পূর্ব্বে এই পার্ব্বত্যভূমি যেমন নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে অটল মহিমায় দণ্ডায়মান থাকিত, আজ আর তেমন নাই! আজ তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন কাহার কলহাস্য বাজিতেছে, নির্ঝরিণীর কলস্বরে কাহার অবাধপ্রবাহিত কলকণ্ঠধ্বনি! বনের শাখাপ্রশাখার অন্তরালে ঐ যেন কাহার কুঞ্চিত কেশযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক, শুভ্রসুকুমার করলতা চকিতে খেলিয়া আবার তখনই বনান্তরালে অদৃশ্য হইতেছে। সমস্ত পর্ব্বত অঙ্গেই সে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। অথচ ঐ যে পর্ব্বত বক্ষে তাহার আবাসস্থলটি, কয়েক খণ্ড শিলায় আবদ্ধা ঐ যে নির্ঝরিণী ধারা ও তাহার শিলাময় ঘাট, গুহাদ্বারের ঐ যে সোপানসমন্বিত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, ঐ যে বালঅশ্বত্থটি যাহার সঙ্গে তাহার হস্তের শতচিহ্ন রহিয়াছে, উহারই অঙ্গে তাহার হরিদ্রাভ বস্ত্রখানি শুকাইত—শূন্য—সব শূন্য। নাই—সেখানে সে নাই, তবু কেন এমন ভ্রম হইতেছে? কেন মনে হইতেছে সে যায় নাই। বনের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া আছে, এখনি তাঁহার বক্ষস্পন্দনের সমতালে পা ফেলিতে ফেলিতে ছুটিয়া আসিবে! একি এ—ভ্রান্তি?

গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী পর্ব্বতনিম্নস্থ বনতলের প্রতি চাহিলেন। বনাচ্ছাদনে পথ দৃষ্ট হইবার উপায় নাই, তথাপি বহুদিনের গতায়াতের অনুভবে সন্ন্যাসী বনতল দিয়া সেই পথ যেখানে দূর প্রান্তরে মিশিয়াছে, সেই দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। কেহ নাই, কিছু নাই,—প্রান্তর মনুষ্য-চিহ্ন-বর্জ্জিত।

প্রভাতে তাহারা যাত্রা করিয়াছে, এখন প্রদোষ! যাত্রার প্রথম উত্তেজনা ও উৎসাহে তাহারা এখন কতদূরই চলিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পর্ব্বতের অন্তরালে ধীরে ধীরে তিনি মুখ লুকাইতেছেন। তাঁহার আরক্তিম বর্ণেও অদ্য এ কি বিবর্ণতা!

তারাচন্দ্রসজ্জিতা রজনী সেই শিলাতলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর মস্তকের উপর দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। আবার প্রভাত অরুণ ত্রিকূটের অঙ্গে আলোক-ধারা মাখাইয়া উদিত হইলেন। নির্ঝরস্নাত সন্ন্যাসী উঠিয়া সূর্য্যের আবাহন করিলেন; মনে হইল, বনের মধ্যেও কে যেন লুকাইয়া লুকাইয়া অন্য দিনের মত সূর্য্যের বন্দনা গায়িতেছে। দুখানি কোমল বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া আরক্তিম করতল পাতিয়া "এহি সূর্য্য" বলিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতেছে! সে কোথায়? নিম্নস্থ গুহাদ্বার হইতে তাহারই করসংযুক্ত বহ্নির অস্পষ্ট ধূম এখনও একটু একটু উঠিতেছে। সন্ন্যাসী ধ্যান করিতে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

যখন নামিয়া আসিলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। শূন্য হতশ্রী গুহার দ্বারে বৃহৎ

কাষ্ঠখণ্ডের ধ্বংসাবশিষ্ট ভস্মস্তূপ মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, ধূম-রেখা নাই! সন্ন্যাসীর অন্তরটি সহসা ধক্ করিয়া একটা গুরুস্পন্দন জানাইল!—তবে কি অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে? সে যে বলিয়া গিয়াছে—সেই বালকোচিত প্রার্থনা মন আর উচ্চারণ করিতে অগ্রসর হইল না; কিন্তু অন্যমনে সন্ন্যাসী সেই ভস্মরাশি নাড়িয়া দেখিলেন, সামান্য একটু কাষ্ঠ খণ্ডে ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় অগ্নি তখনও জাগিয়া রহিয়াছে। অন্যমনেই সন্ন্যাসী আর একখানা শুষ্ক গুঁড়ি-কাষ্ঠ টানিয়া লইয়া, সেই অগ্নিতে সংযোগ করিয়া দিলেন।

তাহার পরে শরৎ—হেমন্ত—শীত—অতীত হইয়া আবার সেই বসন্ত পার্ব্বত্য বনভূমিতে উপস্থিত হইল; কিন্তু কোথায় এবার তাহার সেই রূপ! তাহার পত্রপুষ্পে কোথায় সে রাগ! কোথায় সে সুগন্ধ!

নিদাঘ কাটিয়া বর্ষা আসিয়া আবার পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী সেই সদ্য প্রজ্বলিত ধূনীটি গুহার ঈষৎ অভ্যন্তরে টানিয়া লইলেন, জলধারায় তাহার অগ্নি না নিবিয়া যায়।

বর্ষচক্র ঘুরাইয়া শরৎ—হেমন্ত ক্রমে শীত আসিল, উদ্বেগে এবং মানসিক উত্তেজনার চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসী ক্রমে যেন শীর্ণ হইতেছিলেন। প্রভাতে প্রদোষে দ্বিপ্রহরে সর্ব্বক্ষণই তিনি নিজগুহা-সম্মুখস্থ শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া প্রান্তর পানে চাহিয়া থাকিতেন, আর নিম্নস্থ গুহা হইতে সেই দেড় বৎসরের অনির্ব্বাণ-অগ্নি ধূমরাশি দ্বিগুণতর করিয়া শূন্যপথে প্রেরণ করিতে থাকিত। হায়, একি বাসনার ইন্ধন সে তাহাতে সংযোগ করিয়া দিয়া গিয়াছে, যাহার প্রভাব সংক্রামক রোগের মত সন্ন্যাসীর অন্তরের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন জোর করিয়া নিত্য তাঁহাকে সেই অগ্নির পোষণবস্তু যোগাইতে বাধ্য করিয়াছে! সে আসিবে মনে করিতেও সন্ন্যাসীর অন্তরে যেন একটা কম্পন অনুভব করিতেন কিন্তু সে কম্পন আনন্দ কিংবা ভয়ের তাহা যেন তিনি সব সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার নিঃসঙ্গ অনাসক্ত জীবনের উপরে সেই বালকেব এই প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এক্ষণে তিনি যেন তাহাকে একটু ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক একবার যেন মনে হয়, সে আর না আসিলেই মঙ্গল। শীত যতই বাড়িতে লাগিল, সন্ন্যাসীর ততই মনে হইতে লাগিল, এইবার সে নিশ্চয়ই আসিতেছে, আজ কালই সে আসিবে, ততই তাঁহার মনে এই ভয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাতাস একটু জোরে বহিলে কিংবা কোন শব্দ হইলেই মনে হইত, ঐ বুঝি সে আসিল, ঐ তাহার পায়ের শব্দ, ঐ তাহার নিঃশ্বাস। উত্তেজনার অশান্তিতে সন্ন্যাসী দিন দিন শীর্ণ ও অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এক একটি শান্ত প্রভাতে ধ্যানভঙ্গের পর তিনি আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করিতেন—আর যেন সে না আসে, বালক যেন তাহার সে ইচ্ছা ভুলিয়া যায়, কিন্তু সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ডের পানে চাহিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, আসিবে—সে নিশ্চয় আসিবে। তাহার সেই অদম্য ইচ্ছার ধূনীতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার গত্যন্তর নাই।

শীত অতীত হইয়া আবার বসন্ত আসিল, সে আসিল না। বুঝি সন্ন্যাসীর প্রার্থনা সফল হইয়াছে, বালক তাহার সে ইচ্ছাকে ভুলিয়া গিয়াছে। এতদিন সে আব একটু বড়ও হইয়াছে। বুঝিয়াছে যে, সে সংকল্পটা নিতান্তই বালকোচিত। তাহাতে উভয় পক্ষেরই সম্পূর্ণ ক্ষতি। হয়ত ত্রিকূটের কথা তাহার তরুণ তরল মনে এখন আর উদয়ই হয় না! সন্ন্যাসী স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেটা যেন বুকে আটকাইয়া রহিল,—নাসা পথে অগ্রসর হইল না।

বসন্তের পরে গ্রীষ্ম আসিল। সন্ন্যাসী দেখিলেন, বসন্তের নবীন সাজকে শুষ্ক, দগ্ধ এবং ভস্মসাৎ করিয়া নিদাঘ রুদ্র প্রতাপে নেত্রানল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির শ্যামল আবরণ ও সেই পাষাণহৃদয়োত্থিত স্নেহধারা শুষ্ক বিদীর্ণ লুপ্তকায় হইয়া পড়িতেছে।

আবার বর্ষা। দগ্ধ দেহের কালিমাও ভস্ম, নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া দিয়া আবার বনতল শ্যামশোভায় ভরিয়া গেল;—গিরি নির্ঝরিণী নবজীবন লাভ করিল। দগ্ধ তাম্রবন দিগন্তের ঘন মেঘ তাহার স্নেহধারা-সঞ্চিত স্নিগ্ধ শ্যাম সজল আভায় নিখিলের তপ্ত রুক্ষ হৃদয়-নয়নকে শীতল করিয়া দিল। দেবতার করুণা-ধারার মত ধারায় আশীর্ব্বাদ-বারি জগতের মস্তক ও বুকের উপর পড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী সংশয়াপন্ন হইলেন। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির এ কি বিরোধী ভাব! এই যেন সে অনুতাপে, ক্ষোভে হৃদয়স্থ সমস্ত কোমল প্রবৃত্তিকে দগ্ধভস্ম করিয়াই ফেলিয়াছিল—আবার তাহার এ কি রূপান্তর! যাহাকে পুড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাহাকেই আবার বাঁচাইতে একি অজস্র স্নেহাশ্রু-নিষেক! কই—এত অগ্নিতেও তাহার বক্ষে উপ্ত সেই মায়ার বীজকে সে তো ধ্বংস করিতে পারে নাই! সে তো আবার নবজীবন পাইয়া তেমনি ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিতেছে,—উঠিবে। তবে এ সবই তাহার ক্রীড়া মাত্র! হায় প্রকৃতি! তোমার যাহা ক্রীড়া, দুর্ব্বল মানবের পক্ষে তাহা সে একেবারেই প্রাণান্তকর। তাহারও অন্তরের ফলফুল, স্নেহ, আশা—সব একদিন নিঃশেষ হইয়া যায়—অমনি করিয়া পোড়ে,—কিন্তু কই, তোমার মত তো আর তাহারা বাঁচিয়া উঠে না। তাহার শেষ যে একেবারেই নিঃশেষ হওয়া।

বহুদিনের নির্মেঘ আকাশে সহসা সে দিন প্রবল মেঘ করিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর শুষ্ক চক্ষু ও শীর্ণ দেহ ভাসাইয়া দিয়া, তাঁহাকেও যেন প্রকৃতির মত শীতল করিল। শীর্ণতা ও অসুস্থতা গিয়া ক্রমে তিনি একটু সবল হইতে লাগিলেন।

৩

কালরাত্রি খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসী নিজ গুহা হইতে নামিয়া নিম্নস্থ গুহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার বোধ হইল, রাত্রির প্রবল বৃষ্টিপাতে পূর্ব্বদিন দত্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলি পুড়িয়া নিঃশেষ ভস্মরাশি ধুইয়া বহিয়া গিয়াছে। ধূনীর অগ্নি অদ্য একেবারে নির্ব্বাপিত!

নিবিয়াছে?—অদ্য দুই বৎসর যাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে সন্ন্যাসী নিজের অনিচ্ছায়ও সাগ্নিকের ন্যায় সেই অগ্নি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন,—তাহার সমিধ্ যোগাইয়া আসিয়াছেন, অদ্য দুই বৎসরের সেই বাসনার সন্ধুক্ষিত অগ্নিহোত্র আজ নিবিয়াছে? তাঁহাকে স্বেচ্ছায় নিষ্কৃতি দিয়াছে! কেহ জোর করিয়া নিবায় নাই। আর এ মিথ্যা স্তোকের প্রয়োজন নাই বুঝিয়া প্রকৃতিই অদ্য তাহার প্রতি এই দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মুক্তির গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সন্ন্যাসী অবশিষ্ট ভস্মগুলি একদিকে নিক্ষেপ করিলেন ও নির্ঝর হইতে কলসে করিয়া জল আনিয়া গুহাতল সম্পূর্ণরূপে ধৌত করিলেন। যেন তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত পর্ব্বতগাত্র হইতে অদ্য তিনি ধুইয়া মুছিয়া দিলেন। তাঁহার মনে হইল, পর্ব্বত অদ্য ভরত রাজার মত মৃগস্নেহান্ধতার ফলভোগ-স্বরূপ কালব্যাপী জড়ত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিল। তাহার পাপই যদি হইয়া থাকে তো অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্তও শেষ হইয়াছে; ঐ ধূনীর আপনা হইতে নির্ব্বাণই তাহার প্রমাণ! সন্ন্যাসী আজ বহু দিন পরে পূর্ব্বের মত নিজের আশা-তৃষ্ণা, স্মৃতি-চিন্তালীন, মায়াবন্ধহীন, নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসিত্বকেও যেন অনুভব করিলেন!—এতদিন ভয়ে তিনি সে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।—মনে হইত, এখনি সে কোন্ নিভৃত স্থান হইতে "ঠাকুরজী" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া ধরিবে। অদ্য আর সে কথা মনে হইল না। সন্ন্যাসী নিজের আসন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সেই গুহায় বহিয়া আনিয়া পূর্ব্বের মত স্থাপিত করিলেন এবং স্নানান্তে ধ্যানে বসিলেন।

ধ্যানভঙ্গের পর যখন উঠিলেন, তখন সূর্য্য পশ্চিম আকাশে গিরি-অন্তরালে অস্তমিত। গুহামধ্যে প্রায় অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে—বাহিরে প্রদোষের স্তিমিত আলোক। বহুদিন তিনি

এমন গভীর ভাবে ধ্যানমগ্ন হইতে পারেন নাই। শান্তিতৃপ্ত অন্তরে সন্ন্যাসী গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই কোমল মৃদু আলোকে শিলাপট্টে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ও কে! রুক্ষ কেশের রাশি তাহার অঙ্গস্থ গৈরিক বসনের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সায়াহ্নে আকাশতলে মেঘাসনে যেন মূর্ত্তিমতী জ্যোতির্ম্ময়ী প্রাবৃট্-সন্ধ্যা।. সন্ন্যাসীর পদশব্দে সে মুখ ফিরাইতেই সন্ন্যাসীর বোধ হইল, সেই সন্ধ্যার ললাটে দুইটি অতি উজ্জ্বল, বিশাল জ্যোতিষ্ক ফুটিয়া উঠিয়া, তাহার মধুরোজ্জ্বল রশ্মি-প্রভায় তাঁহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া তুলিল। বিস্ময়ে, একটা অজানিত পুলকে তাঁহার সমস্ত শরীর যেন স্তব্ধ ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কি এ! কে এ! সান্ধ্য-রবিকরোজ্জ্বল চলন্ত সুবর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় সে সন্ন্যাসীর নিকটে আসিবামাত্র তাহার অধরোষ্ঠ হইতে একটা "প্রভা-তরল জ্যোতিঃর" ছটা ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর চক্ষে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী সমস্ত দেহমনে চমকিয়া উঠিলেন "কে এ! কার এ হাসির বিদ্যুৎ বিভ্রম?"

"ঠাকুরজী!"

"কে তুমি? কে? তুমি কে?"

উত্তর না দিয়া সে সন্ন্যাসীর চরণতলে নত হইল, তাহার পরে সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতেই সন্ন্যাসী চিনিলেন, হাঁ—সেই মুখই বটে! কিন্তু তবু এ তো সে নয়! এই দুই বৎসরে তাহার একি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! সন্ন্যাসী স্খলিতকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, "পার্ব্বতী?—না, —তবে কে তুমি? পার্ব্বতীরই মত, অথচ সে নও।—কে তুমি—তবে?" সে কথারও কোন উত্তর না দিয়া—সেই গৈরিকবসনা সন্ন্যাসীর পানে পুনর্ব্বার দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল—"কই আপনি ত ধূনী জ্বালিয়া রাখেন নাই? আজ সমস্ত দিন আমি এই পাহাড়তলীতে পথ খুঁজিয়া কত কষ্ট পাইয়াছি।"

হাঁ সেইই বটে! ঐ যে পর্ব্বত-অঙ্গে তাহার আগমনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতি, স্থির ভাবে অদ্য দুই বৎসর পরে সেই স্বরসুধা পান করিতেছে। পূর্ব্বের তরলতা লুপ্ত হইয়া একটি মধুর স্নিগ্ধভাবে সে স্বর যেন এখন অধিকতর মোহময় হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যানিলসম্বলিত বনের ব্যগ্র বাহু তাহার হারান ধনটিকে বক্ষে চাপিয়া লইবার জন্যই যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। পর্ব্বতের অঙ্গেও এক শ্যাম-স্নিগ্ধ- বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তাহার প্রাপ্ত নিধিকে যেন অঞ্চলে ঢাকিয়া লইতে চাহিল। হায়,—কাহাকে ধরিতে তাহাদের এই স্নেহ-ব্যগ্র বাহু প্রসারণ, এই বক্ষ বিস্তার!—"আসিয়াছে, সে আসিয়াছে!" কাহার আগমনে নির্ঝরিণীর এই আনন্দোচ্ছল কলধ্বনি। যাহার আগমন-প্রত্যাশায় তাহারা অদ্য দুই বৎসর অন্তরে বাহিরে পথ চাহিয়া আছে, সে আজ আসিয়াছে বটে, কিন্তু তবু এ বুঝি সে নয়! সে যে বুকে ধরিবার বস্তু—স্পর্শক্ষম রত্ন, আর এ কি? এ যে প্রজ্বলিত অনল শিখা। তাহার স্বর, তাহার মুখ, তাহার হাসি, তাহার নাম লইয়া আসিল? কেন আসিল? এই ব্যগ্রবুকে তাহাকে একবার টানিয়া শিরোঘ্রাণ লইবারও যে উপায় নাই, এ যে স্পর্শেরও অতীত! সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সেই শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলেন। পার্ব্বতীর অতীত দৃষ্ট বালক মূর্ত্তির স্মৃতি এখনকার এই তরুণীর সঙ্গে মিলিয়া সন্ন্যাসীর মনের মধ্যে উভয়ের সামঞ্জস্য বোধের একটা আলোক জ্বালিয়া দিল।

পার্ব্বতী ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপনা হইতেই নিঃশব্দে সন্ন্যাসীর পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী সহসা সচকিত হইয়া বসিলেন, মৃদু স্বরে প্রশ্ন করিলেন,—"তোমার পিতা?"—পার্ব্বতী নতমুখে উত্তর দিল "আজ ছয় মাস হইল পুরীসমুদ্রের স্বর্গদ্বার সৈকতে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।" সন্ন্যাসী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "পার্ব্বতী?—তাহার কি

হইল?'' তরুণী আবার তাঁহার পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল, ''আপনি কি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না, ঠাকুরজী!''

''না, কারণ, তুমিত সে পার্ব্বতী নও। তুমি ধূনী জ্বালাইয়া না রাখার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে,—দুই বৎসরের দিবারাত্রি-প্রজ্বলিত ধূনী এই পর্ব্বত আজই নিবাইয়া দিয়াছে। তুমি বোধ হয়, তখন এই বনতলেই ঘুরিতেছিলে। সেই পার্ব্বতীর দেহ লইয়া অন্য একজন তাহার নিকটে আসিতেছে দেখিয়াই সে এ অগ্নিহোত্র নিবাইয়াছে। এ পার্ব্বতীকে তাহারা কেহই চিনে না।'' সন্ন্যাসীর এই প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে পার্ব্বতী মস্তক নত করিল, কিন্তু উত্তর দিতে বিরত হইল না। ''আমি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছি দেখিয়াও ত সে অনাবশ্যক অগ্নিটা নিবাইয়া দিতে পারে!'' পার্ব্বতীর এ উত্তরে সন্ন্যাসী চমকিত হইয়া উঠিলেন। ''তাই কি ? তাই কি তাঁহার অন্তরও আজ এত শান্ত স্নিগ্ধ শুদ্ধবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল? আকর্ষণকারী অথবা আকৃষ্ট বস্তু আসিয়াছে বলিয়াই কি এই নিশ্চিন্ত ভাব?''

পার্ব্বতী বলিয়া যাইতেছিল,—''পিতা আমার জ্ঞানোন্মেষ হইতেই আমায় বালক সাজাইয়া রাখিতেন, আমিও চিরদিন ঐ ভাবেই কাটাইয়া আসিয়াছি। তিনি প্রথমেই এ কথা আপনাকে জানান নাই বলিয়া, পরে পাছে আপনি কিছু মনে করেন এই আশঙ্কায় আর সে কথা আপনাকে বলিতে পারেন নাই। বিশেষ পথে বালিকা সঙ্গে লইয়া চলা অপেক্ষা আমায় বালক-বেশে রাখিতেই তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি এমন অন্যায় হইয়াছে? আমি তখনও পার্ব্বতী ছিলাম, এখনও তাহাই আছি। কেবল পিতা শেষে এ জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার সম্মুখে আর ছদ্মবেশে আসি নাই। আপনি ছদ্মবেশ মনে করিতেছেন বলিয়াই একথা বলিতেছি, নইলে আমি জানি, সেইই আমার চিরদিনের বেশ! সারাপথ আমি বালক সাজিয়াই আসিয়াছি। পিতা পুরুষোত্তমের পথে অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই পুনর্ব্বার রুগ্ন হইয়া পড়িল। সেখানে পৌঁছিতে আমাদের প্রায় এক বৎসর লাগে। ছয়মাস হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।''

''তাহার পরে?''

''তাহার পরে আর কি ? শ্রাদ্ধ সারিয়াই আমি বাহির হইয়া পড়ি।''

''কেন বাহির হইলে?''

''কেন বাহির হইলাম?'' বিকশিত পদ্মনেত্রে যেন ব্যথার তড়িৎ স্পর্শ করিল!—''কেন? আপনার কাছে না আসিয়া তবে কোথায় যাইব?''

সন্ন্যাসী মস্তক নত করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, ''তোমার পিতা কি তোমার কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই? সেখানে ত তোমরা প্রায় ছয় মাস ছিলে, সেখানে কাহারও সহিত কি তোমাদের পরিচয় হয় নাই? কাহারও আশ্রয়ে কি তোমাকে রাখিয়া যান নাই?''

''রাখিয়া গিয়াছিলেন।''

''তবে? তাহারা কি তোমায় যত্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই ?''

''কেন করিবে না? আমি সেখানে থাকিব কেন? আমি না থাকিলে তাহারা কি আমায় জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে?''

''কেন এমন কাজ করিলে?''

কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া পার্ব্বতী উত্তর দিল, ''বেশ করিয়াছি।'' তাহার ব্যথিত ক্রোধপূর্ণ স্বর শুনিয়া সন্ন্যাসী পার্ব্বতীর পানে চাহিলেন, সন্ধ্যার অন্ধকার বৃক্ষতলে ঘনতর হইতেছিল, মুখ দেখা গেল না! সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ''তোমাকে আমার নিকট রাখিবার যে উপায় নাই, তাহা ত' তোমার পিতার মুখেই শুনিয়াছ।''

"আমি সে কথা মানি না। আমি আপনার 'চেলা' হইব, তাহা তো আপনাকে বলিয়া গিয়াছিলাম।"

"তুমি স্ত্রীলোক!"

"হইলাম বা। কত সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী শিষ্যা থাকে।"

"কাজ বড়ই অন্যায় করিয়াছ! তোমাকে আবার হয় পুরুষোত্তমে, নয় পূর্ব্ব-বাসস্থান হরিদ্বারে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

"এই সুদীর্ঘ পথ ভাঙ্গিয়া আবার আমি ততদূরে ফিরিয়া যাইব!"

"হাঁ!"

"যাইতে পারিব কেন?"

"তা তুমি পারিবে।"

"যদি না যাই?—তাড়াইয়া দিবেন,—কেমন?"

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "হাঁ।"

"আজই ? এখনই কি? দেন্ তবে—"

বলিতে বলিতে পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী বোধ হইল, যেন সেই কঠিন পর্ব্বতপৃষ্ঠ দ্বিগুণ কঠিন ও স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে, নির্ঝরিণীর কলধ্বনি একেবারে নিঃশব্দ—বায়ুস্পন্দহীন!—পূর্ব্ব-আকাশে অর্দ্ধোদিত চন্দ্র এবং গগনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারকাপুঞ্জও স্থির চক্ষে যেন এই ব্যাপারের শেষ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। সন্ন্যাসী কথা কহিলেন, যেন বহুদূর হইতে রোদনধ্বনি ভাসিয়া আসার মত সে শব্দ,—"তুমি বোধ হয় সমস্ত দিন কিছু খাও নাই?"

"তাহাতে কি! আমার এমন কতদিন যায়।"

"আজ তাহা উচিত নয়, কেন না এ আশ্রমে তুমি আজ অতিথি! পার্ব্বতী! তুমি ঝরণার জলে স্নান করিয়া এস।"

"আপনি ব্যস্ত হইবেন না! আমার তেমন ক্ষুধা-বোধ হয় নাই।"

"আমার কিন্তু হইয়াছে, পার্ব্বতি! আমিও সমস্ত দিন কিছু খাই নাই। আজ ফলাহরণ করিতে পারি নাই কিন্তু আজ খাদ্য আছে। আমি আলোক জ্বালি, তুমি স্নান সারিয়া লও।"

সন্ন্যাসী গুহার মধ্যে গিয়া কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে বহু চেষ্টায় অগ্নি জ্বালিলেন! এ দুই বৎসর আর এ শ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই। আজ দুই বৎসর যাহার হস্ত-প্রজ্বলিত-অগ্নি এই গুহার বুকে তাহার স্মৃতির সঙ্গে দিবারাত্র ধুমাইয়াছে, আজ তাহারই এখানে স্থান নাই, বুঝি তাহাকে এখানে প্রবেশ করিতে দিলেও প্রত্যবায় আছে। হায় প্রভু শঙ্করাচার্য্য! যে নারীজাতির দোষের কথা বলিতে তুমি "অচতুর্বদনো ব্রহ্মা" হইয়াছ, পার্ব্বতী সেই জাতি! প্রাণিগণের শৃঙ্খলস্বরূপা, নরকের দ্বারকথিতা হেয় নারী! সন্ন্যাসীর পক্ষে বুঝি দয়ারও অযোগ্যা সে!

সন্ন্যাসী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পার্ব্বতী সেই এক ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে নাই—সরে নাই। বুঝিলেন, বালিকার পক্ষে আঘাতটা অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে। তাহার এই দারুণ অধ্যবসায় ও পথকষ্টের প্রথম সাফল্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে এতটা আঘাত দেওয়া উচিত হয় নাই। আজই তাহাকে ফিরিবার কথা বলায় অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হইয়াছে। এ কার্য্যটি তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্মের উপযোগী হইলেও যে মহান ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া একদিন তিনি তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন, বহুদিন স্নেহযত্ন দেখাইয়াছিলেন, সেই মানব-ধর্ম্মের উপযুক্ত হয় নাই। সে ধর্ম্ম অদ্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইতেছে। আর আজ যদি সেই বালক পার্ব্বতী এমনি করিয়া ছুটিয়া আসিত, তাহা হইলে কি তিনি তাহাকে এমন কঠিন কথা বলিতে পারিতেন বা দূরে ঠেলিয়া দিতে পারিতেন! হায় কেন তাহা হইল না? কেন তাঁহার সেই

সুখস্পর্শ কিশোর চন্দ্রটি এমন জ্বলিত হুতাশন রূপ ধারণ করিল? যাক সে খেদ, সে স্নেহবন্ধও যে এইরূপে কাটিয়া গেল, সে ভালই হইল। কিন্তু তথাপি এ ত সেই পার্ব্বতী, যাহার জন্য আজ দুই বৎসর—না, তাহাকে নিকটে রাখা হইবে না, তবে মিষ্ট কথায় অন্ততঃ আগামী কল্য ইহা বুঝাইয়া দিলেও চলিত! আজ তাহার দুরন্ত পথ শ্রমাপনোদনের জন্য আতিথ্য স্বীকার করাই—সস্নেহ ব্যবহার প্রদর্শনই—কর্ত্তব্য ছিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "পার্ব্বতি! স্নানে যাও।" —পার্ব্বতী নড়িল না—উত্তর দিল না! তখন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আদর মাখা কোমল কণ্ঠে সন্ন্যাসী ডাকিলেন, "পারবতিয়া! কথা শুনিবে না?"

মুহূর্ত্তে পতনশীলা পার্ব্বত্য প্রবাহিনীর ন্যায় তীব্র বেগে পার্ব্বতী তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিল। দুই বৎসর পূর্ব্বের ন্যায় অসঙ্কোচ ক্ষিপ্রহস্তে সন্ন্যাসীর দুই হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে এবং নিজেও পশ্চাতে হেলিয়া পড়িয়া পাছু হটিতে হটিতে বলিল, "বলুন—আমায় এই পাহাড়ে থাকিতে দিবেন? বলুন তাড়াইয়া দিবেন না? বলুন, নহিলে আমি কিছুই খাইব না। যাইব ত নাই, কিন্তু এইখানে ধর্‌না দিয়া পড়িয়া থাকিব, আপনার কিছু খাইব না। দেখিব আপনি কিরূপে অতিথি সৎকার করেন! বলুন শীঘ্র বলুন!"—হস্ত-মুক্ত করিয়া লইয়া সন্ন্যাসী গুহাদ্বারে সরিয়া আসিলেন। বুঝিলেন, এ বালিকার বাক্যে ও কার্য্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বলিলেন, "এই সত্যে বদ্ধ না হইলে তুমি সত্যই আহার করিবে না?"

"না।"

"আচ্ছা, তাহাই হউক! তুমি এই পর্ব্বতেই থাক।"

আবার মুখের হাস্য-বিজলী খেলাইয়া পার্ব্বতী ঝরণার দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল;—স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—সন্ন্যাসী তখনও এক ভাবে গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। হাসিয়া বলিল "এই বুঝি আপনার অতিথি সৎকার? সরুন, আমি সব যোগাড় করিয়া লইতেছি।" সন্ন্যাসী ত্রস্তে পথ ছাড়িয়া দিলেন। গুহায় আলোকও নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল, এইবার ইন্ধন পাইয়া সে সতেজে জ্বলিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতীর আহ্বানে সংজ্ঞালাভ করিয়া সন্ন্যাসী গুহা মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন, আহার্য্য প্রস্তুত। অপ্রতিভ ভাবে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আমায় সাহায্যের জন্য ডাকিলে না কেন পার্ব্বতী? এই পথশ্রম ও অনাহারের উপর তোমায় বড় কষ্ট দিলাম।" পার্ব্বতী হাসিমুখে উত্তর দিল, "সারাদিন পথ-হাঁটার পর এরকম পরিশ্রম কি আমায় প্রায় প্রত্যহই করিতে হইত না! এখন আহারে বসুন; সমস্ত দিন খান নাই কেন? পাহাড়ে ত ফলজল ছিল!"—সে কথার উত্তর না দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "পার্‌বতিয়া! আমায় বাকি আতিথ্যটুকুও অন্ততঃ করিতে দাও;—তুমি অগ্রে খাও, বিশ্রাম কর, পরে আমি খাইব।" পার্ব্বতী এবার দুই বৎসর পূর্ব্বের মত উচ্চ হাস্যের কলধ্বনি তুলিয়া বলিল, "আপনার অতিথি-সৎকার প্রথম হইতেই তো খুব চমৎকার রকমের হইয়াছে, এখন এটুকুতে আর দোষ স্পর্শিবে না। এ তো আমার গুহায় আমার গৃহস্থালীতেই আপনি আজ আসিয়াছেন। এটিতে তো আমার গৃহস্থালীই ছিল!"

"না, আজ একদণ্ডের মধ্যে তুমি যতখানি গৃহিণীপণা প্রকাশ করিতেছ, দুই বৎসর পূর্ব্বের পার্ব্বতী এতখানি জানিত না! কথাবার্ত্তায় ও অন্যান্য বিষয়ে তুমি এখনও সেই বালক পার্ব্বতীই আছ বটে কিন্তু কার্যতঃ"—বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী থামিলেন। পার্ব্বতীও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া মুখ নিচু করিল। সেই নারীত্বের নবীন আভামণ্ডিত মুখের উপরে গুহার দীপ্ত আলোক পড়িয়া যে অপূর্ব্বশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বুঝিলেন, এই নারী যেখানে চরণপাত করিবে সেইখানেই গৃহ আপনি

গড়িয়া উঠিবে! হায় রমা! নিজ শ্রী-ভাণ্ডার শূন্য করিয়া এই অপূর্ব্ব সম্পদকে কোথায় পাঠাইলে? এই সন্ন্যাসীর গুহায়? এ কি বিদ্রূপ তোমার? সন্ন্যাসীকে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, পার্ব্বতী বলিল,—"কই বসুন!" "তুমি?"—আবার সেইরূপ সলজ্জ সহাস্যে মুখ নত করিয়া পার্ব্বতী বলিল,—"এর পরে।" সন্ন্যাসী আর বাক্যব্যয় করিলেন না। নিঃশব্দে দেবতাকে আহার্য্য নিবেদন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মানস চক্ষে তখন বাল্য-যৌবনের স্মৃতিময় গৃহের চিত্র নিঃশব্দে ফুটিয়া উঠিতেছিল! সেই গৃহে স্বজনসেবারতা স্নেহশীলা মাতা ও ভগিনীর প্রীতি! তাঁহাদের সেই অক্লান্ত কর্ত্তব্য ও স্নেহসেবায় পূর্ণ কল্যাণ-হস্তঘেরা গৃহস্থালী! বাল্যের সেই স্মৃতি, তাহার পরে যৌবনের সেই কাব্যসাহিত্য অধ্যয়ন হইতে ক্রমে বেদশাস্ত্রাদি পাঠ, গৃহবাসে অনিচ্ছা, দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, পরে এই সন্ন্যাস, সেও আজি চারি পাঁচ বৎসরের কথা। হায় এত দিনের এই গৃহত্যাগের পর সেই "গৃহ", অদ্য কোথা হইতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল!—

পার্ব্বতী গুহার চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল,—নিজ মনে বলিল, "আপনার আসন-কমণ্ডলু আবার এই গুহাতেই আনিয়াছেন, দেখিতেছি! উপরের গুহায় লইয়া যান্—নহিলে আমি কোথায় থাকিব?" সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিলেন না। আহারান্তে তিনি গুহার বাহিরে আসিয়া শিলাতলে বসিলেন। বৃক্ষশাখার ব্যবচ্ছেদ-পথে শুভ্র জ্যোৎস্না আসিয়া শিলার কৃষ্ণ কর্কশ গাত্রে মায়ার অপূর্ব্ব মোহজাল বিস্তার করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতী ভোজনান্তে বাহিরে আসিয়া বলিল, "তবে আমি এই গুহার মধ্যেই থাকি? আপনি উপরের গুহায় যান।"

"যাইতেছি। তুমি শ্রান্ত আছ, শোও গিয়া। কোন ভয় নাই!"—"ভয়?"—অবজ্ঞার হাসির সহিত মস্তক নাড়িয়া পার্ব্বতী গুহার মধ্যে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, তাহাকে ভয়ের কথা বলাই নির্বুদ্ধিতা। যে বালিকা সেই সুদূর উড়িষ্যার শেষ প্রান্ত হইতে একা অসহায় অবস্থায় এতদূরে আসিতে পারিয়াছে, সেই বালিকার অসাধারণ শক্তির কথা মনে করিতে গিয়াই সন্ন্যাসী যেন শিহরিয়া উঠিলেন! এই অসামান্যা নারীর অদম্য প্রভাব রোধ করা বুঝি সাধারণ শক্তির কার্য্য নয়। তাঁহার সেই বিংশবর্ষ হইতে অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মচর্য্য এই ষোড়শবর্ষে কি এতখানি শক্তিলাভ করিয়াছে, যাহাতে এই সৌন্দর্য্যাগ্নিতেজ-মধ্যস্থা শক্তিময়ী ষোড়শীর প্রভাব খর্ব্ব করিতে পারে? সেই ছদ্মবেশী কিশোরের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ আকর্ষণেই তাহার তো পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আজ যেন সেই অকারণ-উদ্ভূত অদ্ভুত স্নেহের তিনি প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাহার এই দুর্দ্দম প্রতাপের কারণও বুঝিতে পারিলেন।

পলাইতেই হইবে। না পলাইয়া উপায় নাই। কিন্তু বালিকার কি গতি হইবে? সে হয়ত তাহার সম্ভাবিত সুখাশ্রয় ত্যাগ করিয়াই আসিয়াছে! চিন্তা আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। গুহামধ্য হইতে সেই পদশব্দ। তেমনি করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে পার্ব্বতী বাহিরে আসিল! "গুহার মধ্যে বড় গরম। খোলা আকাশের তলায় থাকিয়া স্বভাব মন্দ হইয়া গিয়াছে"। —বলিয়া পার্ব্বতী সেই গুহাদ্বারে শুইয়া পড়িল, তাহার রুক্ষ কেশরাশি শৈবালের মত চারিদিক আঁধার করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া মধ্যস্থলে সুপ্ত পদ্মের মত মুখখানিকে ধরিয়া রহিল। সন্ন্যাসী চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "পার্ব্বতি! তোমার পিতা কি তোমার বিবাহের স্থির করেন নাই?"

পার্ব্বতী একটু নড়িয়া চড়িয়া চোখ বুজিয়াই উত্তর দিল, "আঃ আপনি এখনো তাহাই ভাবিতেছেন?—করিয়াছিলেন।"

"কাহার সহিত?"

"যাহাকে আমার ভার দিয়াছিলেন, তাহাঁর সহিত।"

"তুমি এইরূপে পলাইয়া আসায় ব্যথিত হইয়া, সে হয়ত তোমায় কত খুঁজিতেছে!" "তাহাতে আমার কি!" পার্ব্বতী পাশ ফিরিয়া শুইল, এবং দেখিতে দেখিতে গভীর ভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

এত নিকটে, এত নিকটে সে! সেই অর্দ্ধস্ফুট চন্দ্রালোকে কঠিন শিলার বক্ষে হয়ত জগতের কত প্রার্থী হৃদয়ের অমূল্যরত্ন। সন্ন্যাসীর নিঃশ্বাস যেন বুকের মধ্যে বাধিয়া যাইতেছিল! আপনার সেই প্রথম যৌবনে পঠদ্দশায় সদা জাগ্রত কামনার স্মৃতি মনে পড়িতেছিল। যাহাদের বর্ণনায় কবি তাহার সমস্ত কল্পনা-ভাণ্ডার উজাড় করি া বিশ্বের সম্মুখে ঢালিয়া দিয়াছেন, কবিকল্পনার সেই জীবন্ত প্রতিমা মেঘদূতের যক্ষপত্নী, রঘুবংশের ইন্দুমতী, শকুন্তলা, কুমারসম্ভবের পার্ব্বতী, অদ্য যেন এই প্রস্তর বক্ষে অনাদরে অপমানে লুণ্ঠিতা হইতেছে।

ঘুমের ঘোরে পার্ব্বতী আবার পাশ ফিরিল, চুলগুলি মুখখানিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলায় হয়ত কষ্ট হইতেছে। বৃদ্ধের অতি আদরের—গর্ব্বের সেই ভ্রমরনিন্দিত কেশগুলি অযত্নে এখন জটা বাধিয়া গিয়াছে।—সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন। চুলগুলি সযত্নে সরাইয়া দিতে, একটু গুছাইয়া রাখিতে মন যেন বিদ্রোহ করিয়াও অগ্রসর হইতে চায়!

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন!—বালিকার ভাগ্যে যাহা হয় হউক, তাঁহাকে যাইতেই হইবে! "জিতং জগৎ কেন?—মনোহি যেন"! এ জগৎজয়ী "শূর" তাঁহাকে হইতেই হইবে।

৪

পাঁচ ক্রোশ পথ অতিবাহনান্তে বর্ষা-বারিপূর্ণ খরস্রোতা "যম্‌না-জোড়্"-কে একটা কাষ্ঠের ভেলায় অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী দেওঘরের পশ্চিমে বনভূমে পৌঁছিলেন এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পশ্চাতে চাহিলেন। পূর্ব্বে ত্রিকূটের তিনটি চূড়ামাত্র জাগিয়া আছে, বাকী সমস্ত দেহটা দূরত্ব হেতু লুপ্ত দর্শন। নদীতীরস্থ বনের গভীরতা এবং নদীস্রোতের দুরন্ততায় সন্ন্যাসী কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দেহকে সেই বনমধ্যে লুক্কায়িত করিলেন। একটু অনুসন্ধানের পর কয়েকটা প্রস্তরখণ্ড মিলিত এমন একটু স্থান পাইলেন, যেখানে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবেন এবং বনের ব্যবচ্ছেদপথে নদীতীর ও ত্রিকূটশিখর বেশ দেখা যাইবে। সন্ন্যাসী দিন কতক ঐ স্থানেই আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক হইয়া বনের ফল ও নদীর জল পানান্তে নিরাপদে রাত্রিযাপনের জন্য শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। এরূপ স্থানে যে হিংস্র জন্তুর আশঙ্কা আছে তাহা তিনি বেশ জানিতেন।

রাত্রি আসিল, কিন্তু অগ্নি জ্বালিতে যে ভয় হইতেছে। যদি এই আলোকচ্ছটা দেখিয়া কোথা হইতে সে এখানেও আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে বুঝি আর তাঁহার রক্ষা নাই!—কিন্তু এই কি তাঁহার মনোজয়? তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন বটে কিন্তু ঐ ত্রিকূট শিখর কয়টি দেখিবার বাসনা ত কই তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। হায়! সে কি দুরন্ত অনির্ব্বাণ ধূনীই জ্বালিয়া দিয়াছে!

হিংস্র শ্বাপদের আশঙ্কায় অগত্যা কতক রাত্রে অগ্নি জ্বালিয়া সন্ন্যাসী বসিয়া রহিলেন। প্রত্যেক শব্দে প্রত্যেক পত্র কম্পনে "ঐ সে আসিতেছে" ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি কাটিয়া গেল, সে আসিল না। সন্ন্যাসীর ভয় একটু কমিল! এত নিকটে তিনি আছেন, তাহা সে আন্দাজ না করিতেও পারে! সন্ন্যাসী এইরূপে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন দেখিয়া অভিমানিনী সে—ত্রিকূট ছাড়িয়া পুরী অথবা নিজদেশ অভিমুখে চলিয়া যাইতেও পারে! কিন্তু তাহা যদি সে না যায়? তাহার দুরন্তপণ ও দুর্দ্দম প্রকৃতিবশে যদি সে ঐ পর্ব্বতেই পড়িয়া থাকে? তাহা হইলে কি হইবে? ত্রিকূট-শিখর দিকে চাহিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সন্ন্যাসীর প্রভাত অতিবাহিত হইয়া গেল। সহসা পশ্চিমে চাহিয়া দেখিলেন, দিগন্ত অন্ধকার করিয়া দিগ্‌ড়ীয়া পাহাড়ের উপর যেন

একদল কৃষ্ণহস্তী যূথবদ্ধ হইতেছে। তাহাদের বপ্রক্রীড়ায় পর্ব্বতের শ্যামঅঙ্গে মুহুর্মুহুঃ উদ্ভাসিত! ক্রমে সেই গগনহস্তীদল বায়ুবেগে দিকে দিকে চালিত হইয়া ত্রিকূট, দিগ্‌ড়ীয়া প্রভৃতি পর্ব্বত গুলির মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড আকাশের তলায় যেন একখানি কৃষ্ণবস্ত্র মেলিয়া ধরিল। তাহাদের গম্ভীর বৃংহিতের সঙ্গে ''হু হু'' বোঁ বোঁ রবে বায়ুও যোগ দিয়া শিলাকোটর মধ্যগত সন্ন্যাসীর কানে যেন উন্মত্ত হাহাকারের সৃষ্টি করিয়া তুলিল, মেঘ দেখিয়া এতক্ষণ তিনি একদৃষ্টে ত্রিকূটপানে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন, যদি সে ওখানে থাকে, তাহার কি ভয় হইতেছে! কিসের ভয়!—এইত একটা বস্ত্রখণ্ডের নিম্নেই উভয়ে রহিয়াছেন! মেঘের এই অপরূপ চন্দ্রাতপ রচনায় তাঁহার মনেও যেন একটু সুখের বিদ্যুৎ খেলিতে ছিল। মেঘের মন্দ্রে বক্ষ দুরু দুরু কাঁপিয়া বলিতেছিল, ''ভয় নাই, আমি এই নিকটেই রহিয়াছি!'' কিন্তু এখন বায়ুর সেই শব্দে তাঁহার মন অশান্ত হইয়া উঠিল। যেন মনে হইতেছিল, নদীতীরে কে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে! ইহা যে তাহার মনের ভ্রম মাত্র, তাহা বুঝিয়াও মন শান্ত হইতে চাহিল না।

বায়ু ব্যর্থরোষে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও মেঘকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিল না! বিরাট সমারোহে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। অন্ধকারকে মুহুর্মুহুঃ শব্দময় করিয়া তড়িন্ময় ধারা বর্ষণে বনভূমিকে শোণিতরক্ত গৈরিকবারিতে প্লাবিত করিয়া তুলিল! ভূমির সেই শোণিতময় স্রোত, উচ্চভূমি হইতে শিলাবক্ষে প্রতিহত কলকল্লোল শব্দের সঙ্গে ফেনপুঞ্জ অঙ্গে মাখিয়া, নিম্ন খাদে পতিত হইতে লাগিল এবং খাদ্ উপ্‌চাইয়া আবার নদীবক্ষে গিয়া পড়িতে লাগিল। জল—জল —জল! আকাশ হইতে ধারার পর ধারা অশ্রান্ত ভাবে নামিয়া, ধরণীকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া, শুধু অনিবার জলস্রোত নিম্নভূমিতে গিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যায় বৃষ্টি থামিয়া গিয়া মাঝে মাঝে এক আধ ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে মাত্র। জলস্থলশূন্য—সর্ব্বত্র সমান অন্ধকার কেবল এক একবার বিদ্যুৎ-বিকাশ ও মেঘের স্বননে পৃথিবীর অস্তিত্ব জানা যাইতেছে। বায়ু স্তব্ধ—নদী শোণিত-জলপূর্ণা, বৈতরণী ক্ষিপ্রবেগশালিনী। সন্ন্যাসী শিলাকোটরসঞ্চিত শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগ করিলেন। আলোক জ্বালিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকার পরে সহসা একটা বিদ্যুৎ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি নদীর অপর তীরে পতিত হইল! চকিতে তিনি দেখিলেন, নদীতীরে কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে! ভ্রম কি? কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অন্য একটা বিদ্যুতের আলোকে বুঝিলেন—এঁবারে এ ভ্রম নয়। সত্যই কেহ নদীতীরে আসিয়াছে। এমন সময়ে এমন স্থানে সে ভিন্ন আর কে হইতে পারে? সেই নিশ্চয়! এই আলোকাকৃষ্টা হইয়া হয়ত এখনি এখানে আসিবে। সন্ন্যাসী সভয়ে ত্রস্তে প্রজ্বলিত অগ্নিকে নিবাইয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই মনে হইল এ ভয় তাঁহার নিরর্থক। সম্মুখে এই তরণীহীনা ক্ষুরধারা নদী—কাহার সাধ্য এ সময়ে ইহার জল স্পর্শ করে। অতি সুরক্ষিত দুর্গেই তিনি বসিয়া আছেন। এই দুরন্ত নদীই তাঁহার অসিহস্তা প্রহরিণী।

নদীর অপরতীরে সহসা ও কি শব্দ? হাঁ সেই ত' ! তাহারই এ কণ্ঠস্বর! এ ত সেই-ই— উচ্চ আর্ত্তকণ্ঠে কি বলিতেছে! ভাষা ভাল বোঝা গেল না, কিন্তু 'আলোক' এইরূপ একটা শব্দ পুনঃপুনঃ সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর মনে হইল, সে যেন বলিতেছে—''আলোক জ্বাল, ওগো, আলোক আবার! কেন নিবাইলে? কোথায় কোন্ দিকে তুমি—আমায় আর একবার বুঝিতে দাও। আবার একবার আলোক জ্বাল!''

আবার বিদ্যুৎ-বিকাশ! ঐ ত' নদীতীরে সেই-ই দাঁড়াইয়া! আবার সেই আর্ত্তকণ্ঠস্বর, কিন্তু সেই 'আলোক' শব্দটি ব্যতীত অন্যভাষা কিছুই স্পষ্ট হইতেছে না। আবার সন্ন্যাসীর মনে হইল, যেন সে চিৎকার করিয়া সেই কথাই বলিতেছে;—

"আলোক দেখাও, বুঝিতে দাও তুমি ঐখানেই আছ! আবার যদি পলাও, আমি এখনি গিয়া তোমায় ধরিব। আলোক দেখাও একবার—।"

সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট, ক্রমে যেন অঙ্গস্পন্দনশক্তি রহিত হইয়া পড়িতেছিলেন, চক্ষুও যেন বুজিয়া আসিতেছে। মন, কেবল এক একবার গর্ব্বাগ্নির শেষ স্ফুলিঙ্গ উদ্রিক্ত করিয়া, মাথা নাড়িতেছিল,—"না—আলো জ্বালা হইবে না। জয়ী হইতেই হইবে।" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আর একজন কে বলিতেছিল, "এখনও তোমার জয়ী হইবার সাধ? তোমার এই সুপ্ত বাসনাযুক্ত স্নেহপ্রেমের প্রতিঘাত-স্পন্দনময় হৃদয় লইয়া যৌবনের উত্তেজক খেয়ালে নানাশাস্ত্র আলোচনার ফলে ঝোঁকের বশে তুমি যে এই কৃত্রিম সন্ন্যাসপন্থা লইয়াছিলে—ইহাতে সেই মহাসন্ন্যাসী মহাযোগীও প্রতারিত হন নাই। তিনি তোমার হৃদয় বুঝিয়াই সেই আড়াই বৎসর পূর্ব্বে একদিন এই লোক-দুর্লভ নির্ম্মাল্যটি যেন স্বেচ্ছায় আশীর্ব্বাদ স্বরূপেই তোমায় দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভোগ নহিলে তোমার দুর্ব্বল মনে এই সাধনার উপযোগী বল সঞ্চিত হইবে না! যাহা দিলাম, মস্তকে ধারণ করিয়া তোমার অত্যন্ত ক্ষুধিত তৃষিত আত্মাকে অগ্রে স্নেহ-প্রেম-ভোগে তৃপ্ত করিয়া লও! দম্ভ ত্যাগ কর, দম্ভ লইয়া আমার নিকটে কেহ আসিতে পারে না। আত্মসমর্পণশীল বিনতশির না হইলে আমার নিকটে আসিবার উপায় নাই।"

দর্পোন্নত মস্তক তাঁহার সে করুণা মস্তক পাতিয়া লয় নাই; বাসনার দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্জ্জিত হইয়াও পরাজয়ের অপমান স্বীকার করে নাই। সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিতেছিলেন, সেই বাসনাই এখন প্রবল অগ্নি-স্রোতের ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর পলাইবার উপায় নাই; এ অগ্নিতে তাঁহাকে ভস্ম হইতেই হইবে! ঐ যে জলস্থল, বনপর্ব্বত একযোগে চিৎকার করিয়া বলিতেছে,—"অনল জ্বাল, তোমায় এ আগুনে পুড়িতেই হইবে।" তীর হইতে পুনর্ব্বার যেন শব্দ আসিল, "আলোক জ্বালিলে না?—পলাইতেছ? কোথায় পলাইবে?—আমি এখনি গিয়া তোমায় ধরিব।"

বিমূঢ়ের ন্যায় সন্ন্যাসী নির্ব্বাপিত অগ্নিকে পুনঃ প্রজ্বালিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কম্পিত হস্তের কার্য্য শীঘ্র সমাধা হয় না! সহসা একটা অন্যপ্রকারের শব্দ তাঁহার কর্ণে গেল;—যেন জলের প্রবল আস্ফালন-শব্দ। সে কি এই নদীগর্ভে—এই অলঙ্ঘ্য নদীস্রোতে—ঝাঁপাইয়া পড়িল?—সন্ন্যাসীর হস্ত এবারে একেবারে যেন অবশ হইয়া আসিল। নদীগর্ভ হইতে আবার সেইরূপ অস্পষ্ট চিৎকার—"এখনো একবার আলোক দেখাইয়া বুঝিতে দাও কোনখানে তুমি আছ,—জ্বাল একবার আলোক।" বনতল সমস্বরে চিৎকার করিল আলোক, আলোক।

পশ্চিমে ওকি ভৈরব গর্জন! জলে ওকি উন্মত্ত কল্লোল শব্দ? পর্ব্বত হইতে 'বুহা' নামিয়া, 'যম্‌না-জোড়'—বক্ষে 'বানের' ন্যায় প্রমত্ত স্রোতে ছুটিয়া আসিতেছে। সন্ন্যাসী ক্ষিপ্রহস্তে দাহ্য কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগ করিয়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠ হস্তে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন।

প্রমত্ত নদী-বুহা-জল বেগে স্ফীত হইয়া, উভয় তীরের উন্নত ভূমি পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া ঘোর রোলে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই কাষ্ঠদণ্ডস্থ আলোক-রেখা সম্পাতে সেই ফুটন্ত রক্ত ধারার মত জল যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া ঘোর অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে ছুটিতেছে! কে কোথায়! কে আলোক দেখিবে? কে আলোক চাহিতে ছিল,—কোথায় সে? সন্ন্যাসী আলোক-দণ্ড হস্তে সেই রক্ত-স্রোতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন।

এইত উত্তাল নদী-তরঙ্গ! এইত তাহার অনুত্তরণীয় বেগ। ইহার মধ্যেও আলোক-হস্তে তোমায় খুঁজিতেছি, এই আলোকে একবার তোমায় দেখিতে চাই। যে আলোক তুমি জ্বালাইয়াছ, তাহারই কিরণে একবার উভয়ে উভয়কে খুঁজিয়া লইতে দাও, খুঁজিয়া পাইতে দাও! কোথায় তুমি লুকাইবে, কোথায় পলাইবে? এই চির-প্রজ্বলিত অনির্ব্বাণ আলোকের

সম্মুখে একদিন আবার তোমায় পড়িতেই হইবে! এ আলোকে উভয়ের উভয়কে এক দিন খুঁজিয়া পাইতেই হইবে যে!

হুহু ধূধূ! লুপ্ত জল-ধারা, শুষ্ক নদীবক্ষ অফুরন্ত বালুকার রাশি! শুষ্ক রুক্ষ ভূমির প্রকট পঞ্জরাস্থি কেবল চাহিয়া আছে। শূন্যে অলক্ষ্যে কাল-স্রোত-মাত্র নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে।

পূর্ব্বে ত্রিকূট ও পশ্চিমে দিগ্‌ড়ীয়ার অস্পষ্ট ছবি, মাঝখানের অবাধ আকাশে অন্ধকারে অসংখ্য তারকা ফুটিয়া উঠিয়াছে! জ্বলিতেছে! সেই শুষ্ক নদীতীরেও সেই অনির্ব্বাণ ধূনী জ্বলিতেছে এবং সেই জ্বলন্ত আলোক চলন্ত ভাবে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—"কোথায়, ওগো—কোথায় তুমি!"

গল্প থামিয়া গেলেও কিছুক্ষণ আমরা স্তব্ধভাবে সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। একজন কেবল একবার নদীতীর পানে চাহিয়া দেখিয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ, এখনও সমান ভাবেই জ্বলছে!"

যৌবনের মূল্য ॥ শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

শীতের শেষ।

আসন্ন দুপুরের ঝল্‌মলে সোনালী রোদ জান্‌কীদের খোলার ছাদ ছাপিয়ে আঙ্গিনায় ঝরে পড়েছে।

আজ দেরী করে চড়ালেও জান্‌কীর রান্না শেষ হয়ে গেল। কি-ই বা রান্না? খানকতক ছোলা ও গম মিশানো যাঁতায় ভাঙ্গা আটার মোটা মোটা রুটী, আর একটুখানি সরষে শাকের 'ভুজিয়া' বা ছেচ্‌ কি। তাতে আর কতই বা সময় লাগে?

রন্ধন শেষে রন্ধনকারিণী তার খাস 'চৌকা'র জন্য ব্যবহৃত ছেঁড়া আধময়লা ফুলপেড়ে শাড়ীখানা একটু গুছিয়ে পরে দুয়ারে এসে দাঁড়াল, সম্ভবতঃ উঠানে পড়া রোদের সঙ্গে বেলার পরিমাপ করতে, বারোটা বাজে কি, বেজে গেছে। সুখরাম কখন ফিরবে কি জানি? সেই কোন্‌ সকালে বেরিয়ে গেছে শুধু এক টুক্‌রা রুটী নুন আর লঙ্কা দিয়ে খেয়ে...

একটা উদ্বেলিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিয়ে সে 'চৌকায়' ফিরে এল, তারপর শিলখানা পেতে আম্‌সী-পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে চাটনী বাটতে বসল আজিকার অকিঞ্চিৎকর আহার্য্য উপভোগ্য করে তুলবে এই আশায়।

গরীব হলেও সংসারে তাদের এমন অস্বচ্ছলতা আগে ছিল না। একদিন নিজেদের ক্ষেতের গম স্বহস্তে ভেঙ্গে সেই তাজা আটার গরম গরম রুটী, ক্ষেত্রোৎপন্ন দাল, শাক-সব্‌জী এবং ঘরের গরুর খাঁটি দুধ ঘী সহযোগে জান্‌কী স্বামীকে তৃপ্তিপূর্ব্বক খাইয়েছে, তাছাড়া উদ্বৃত্ত সঞ্চয় থেকে দু'চারখানা চাঁদির গহনাও সে গড়িয়েছিল; কিন্তু এখন—

দু'টী বৎসর পর পর অজন্মা হওয়ায় সমস্তই নিঃশেষিত। চাষীর প্রধান সম্বল বলদ জোড়া ও গাইটি বাছুরটি তা'ও গোমড়কের করালগ্রাসে গেছে। উপরন্তু দেনা,—এখন দিন চলা ভার, এমন অবস্থা।

পোড়া 'দেহাতে' অন্য রোজগার নেই।

গ্রাম ছেড়ে শহরে গেলে তারা স্বামী-স্ত্রী চাক্‌রী-বাক্‌রী করে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান করতে পারে কিন্তু মহাজন ছাড়বে কেন? দেনাটা দিয়ে ফেলতে পারলে—কিন্তু তা কেমন করে হয়? এ ঋণ সে পরিশোধ করবে কি দিয়ে? কি তা'র আছে? হাতে গালার চুড়ী, পায়ে কাঁসার মল, গলায় পুঁতির মালা, এই তো সম্বল—এ ছাড়া গরীবের ঘরে এমন কি আছে যাতে—জান্‌কী হাতের কাজ স্থগিত রেখে উন্মনা উদাস দৃষ্টিতে একবার সেই 'চিক্‌না' মাটিতে লেপা কুড়ে ঘরখানার চারি দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার একপাশে একখানা দড়ীর খাটিয়ার বিছানা বা কাঁথাধোক্‌ড়া একটা পায়া ভাঙ্গা কাঠের চৌকীর ওপর কতকগুলো মাটির হাড়িকুড়ি আর এই রান্না কর্‌বার কাঁসা-পেতলের বাসন ক'খানি, আর যে কিছুই নেই!

জান্‌কীর উন্নত বক্ষ কম্পিত করে সহসা ঝরে পড়ল একটা উতল দীর্ঘশ্বাস।

কিন্তু সেই ব্যথাবিধুর ভাব তার স্থায়ী হল না। তেইশ বছরের পূর্ণ জাগ্রত যৌবন তরুণী

জান্‌কীকে মুহূর্ত্তে সজাগ করে তুললে। শিথিল মুষ্টিতে 'নোড়া'টা চেপে ধরে সে পুনবায় তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে লেগে গেল এবং গোলগাল সুঠাম বাহু দু'খানির প্রতি সঞ্চালনে লাবণ্যের হিল্লোল তুলে, তরুণ চিত্তে অতর্কিতে এসে পড়া গ্লানিটুকু নিঃশেষে ঝেড়ে ফেল্‌বার জন্যই হয় তো মিষ্টি মিহি সুরে কাঁপা গলায় গান কর্‌তে লাগল—

"মোরে ইয়ে যোবনা সইয়াঁকে খেলও না,
রুপইয়া যাছে লেয় লো—
যোবনা নাহিঁ দুঙ্গি—"

ঘরেব বাতাস চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

কর্ম্মনিরতা জান্‌কীর লীলায়িত দেহখানির তটে তটে পরিপূর্ণ যৌবন-সায়রের ছল ছল ঢেউ উচ্ছল হয়ে উঠেছিল।

সেই যৌবনের মাদকতা, তারুণ্যের মায়া, আর গানের সুরের মোহ দরিদ্র শ্রমিকের দীর্ণ কুটীরের সকল দৈন্য, সকল হীনতা মুছে দিয়ে যেন নিমেষে রাজপুরীব শ্রীসম্পদে ভরিয়ে তুল্‌লে।

ভাউজী!

কে ডাকে?

জান্‌কীর গান থেমে গেল। সে একটু চকিত হয়ে দুয়ার পানে চেয়ে বললে—কেরে বিরজু? ভেতরে আয় না।

অভ্যর্থিত ব্যক্তি বিরজু বা ব্রিজ্ ভুখন ঘরে এসে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে রাখা পিঁড়িখানা পেতে জাঁকিয়ে বস্‌ল; বললে—সুখরাম ভাইয়া কোথায়?—ক্ষেতে?

ক্ষেতে আর কি করতে যাবে—ধুলো খেতে?

কথাটা হাস্‌তে হাস্‌তে বললেও তার কাজল-আঁকা চপল আঁখিদু'টীতে একটা চাপা ব্যথার আভাস জেগে উঠ্‌ল। ক্ষিপ্রহস্তে পাথরবাটিতে চাটনীটুকু তুলে ফেলে, ঘটির জলে হাত ধুতে ধুতে সে আবার আপন মনে গুন্ গুন্ করতে লাগল—

"আরে—মোরে ইয়ে যোবনা সইয়াঁকে খেলও না—"

কিন্তু তোর যোবনার যে ভাগীদার জুটেছে ভউজী! এখন শুধু সইয়াঁর খেলওনা করে রাখলে তো চল্‌বে না!

বিরজু গ্রাম সুবাদে জান্‌কীর দেওর হয়, ঠাট্টার সম্পর্ক, তাই তার এ পরিহাসোক্তির উত্তরে বিরজুব প্রতি একটা তীব্র চটুল কটাক্ষ হেনে সে মুচকে হেসে বললে—তাই না কি? কিন্তু কার রে? আমার না তোর বহিনীর?

ছোট জাতের মেয়ে শ্লীলতার ধার ধারে না।

দিল্লগী নয় ভউজী! সত্যি বল্‌ছি, সে লোকটা দু'টো জিনিস চায়, হয় রূপইয়া, নয় তোর যৌবন, টানটা তার শেষের দিকেই বেশি, সেই জন্যই তো—

বিরজু কথার মধ্যে হঠাৎ থেমে গিয়ে জান্‌কীর পানে চেয়ে রইল।

জান্‌কী তখন চৌকার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে আঁচলে হাত মুছ্‌ছিল।

তার লাবণ্যে ঢল ঢল শ্যামল মুখখানিতে কৌতুকে চঞ্চল সরস চোখ দু'টীতে কি মধুর ভাব!

স্বাস্থ্যপুষ্ট যৌবনপুষ্পিত তনুকান্তি তার জীর্ণ মলিন বাসে সবটুকু ঢাকা পড়ে নি—

সতৃষ্ণ লুব্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে খানিক চেয়ে থেকে বিরজু একটা ক্ষুদ্র ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলে বললে—লোভ পড়েছে তার অনেকদিন—কিন্তু—

কার কথা বলছিস ভইয়া?

কে আবার? মহাজনের সুত— চন্দু—

জান্‌কীর ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল। রাগের মাথায় সে একটা অকথ্য গালি দিয়ে উঠল।

বিরজু থতমত খেয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে বললে—তা আমাকে গালি দিচ্ছিস কেন ভউজী? আমার কি দোষ? সে আমাকে বল্‌তে বললে—তাই—আমি তো তাকে—

—তার মুখে ঝাড়ু মারতে পারলি না তুই?

কথাটা বেপরোওয়া ভাবে ঝাঁঝরি সহিত বললেও জান্‌কীর মুখে-চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। বিরজুর সামনে মাটীতে বসে পড়ে শুষ্ককণ্ঠে সে বললে—র পুতের জ্বালায় কূয়োয় জল আন্‌তে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছি, আচ্ছা, এর তম্বী দেখা সে কিসের জোরে? টাকা ধার দেছ্‌ল তার বাপ, সে তো নয়?

—তা তো ঠিক্, কিন্তু এখন সে-ই মালিক কি না? চন্দু সেদিন স্পষ্টই বললে সুখরামের বউ যদি আমার কথায় রাজি হয়, তা হলে এ টাকা তো ছেড়ে দেবই, তাছাড়া ওরা যাতে আগের মত চাষ-বাস করে খেতে পারে...

জান্‌কীর টানা টানা কালো ভুরু দুটী কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সে ছোট জাতের মেয়ে হলেও মহাজন পুত্রের সেই ঘৃণিত প্রস্তাব শুনে তার নারীত্বের গর্ব্বে একটা সত্যিকার আঘাত লেগেছিল।

স্বামীকে সে ভালবাসে যথার্থই। সেই স্বামীর কত প্রিয়, কত সাধের গর্ব্বের সামগ্রী তার এ নিটোল যৌবন!

এই দরিদ্র সংসারে দুঃখ দৈন্য অভাবের শত তাড়না সহিয়া দিবসব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর রাত্রে যখন ছিন্ন কন্থায় স্বামীর বলিষ্ঠ বাহুশিথানে শয়ন করে শ্রমিক-বধূ জান্‌কী রাজ্যলাভের স্বপ্ন দেখে, তখন সে প্রাণময়ী নয়, শুধু যৌবনময়ী হয়ে তার নিঃস্ব শ্রান্ত দয়িতকে এ মাটীর পৃথিবীর অনেক ঊর্দ্ধে স্বর্গের কাছাকাছি পৌছে দেয়—সেই যৌবন তার এক লম্পটের লালসা-নিবৃত্তির ...না, না, জান্‌কী তা পারবে না। কিন্তু দেনার কি হবে? কম তো নয়, সুদে আসলে প্রায় দেড় শো টাকা, এত টাকা সে পরিশোধ করে কি দিয়ে?

যদি অন্য কোথাও ধার পাওয়া যায়—সুখরাম আজ সেই চেষ্টাতেই বেরিয়েছে, কিন্তু খালি হাতে, শুধু তাদের অনিশ্চিত রোজগারের ওপর নির্ভর করে কে দেবে এত টাকা?

জান্‌কীর মুখে কতক্ষণ কথা ফুটল না। তার মৌন ক্লিষ্ট মুখের পানে আড়ে আড়ে তাকিয়ে বিরজু বললে—শালা কি বলছিল জানো? মাসখানেক আরো দেখবে, তারপর—

—তারপর কি করবে শুনি? কি নেবে আমাদের? আছেই বা কি? এই তো মাটীর ঢিবি—ভাঙ্গা কুঁড়ে টুকুন্ তাও আবার বন্ধক—

—তা সে জানে, নইলে কি ছেড়ে দিত এতদিন? কিন্তু ঐ বললুম তো, তার লোভটা তোর...

বিরজু চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে যে কথা বলে ক্ষণপূর্ব্বে তার ভউজীর কাছে গাল খেয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি করলে; অর্থাৎ বিলাসী মহাজন-পুত্রের এই পর্ণকুটীরেরচেয়ে তরুণী কুটীরবাসিনীর প্রতিই নজর বেশী।

জান্‌কীর শ্যামল মুখখানি সূর্য্যাস্তে শেষ আভা লাগা সান্ধ্য মেঘের মত রঙীন্ হয়ে উঠল। কিন্তু সে এবার আর সেই হীন প্রস্তাবকারীর দগ্ধাননে পূর্ব্বেকার মত সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা করতে পারল না। কেবল একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভ্রূভঙ্গী করে বললে—হতভাগার আস্পর্দ্ধা কম নয় তো! আচ্ছা, একমাস পরে সে কি করবে বললে?—

—তার যা খুসী তাই। সত্যি, আমার বড় ভয় করছে ভউজী! যে রকম আক্রোশ তার, শেষে হয় তো ভইয়াকে ধরে জেলে আটক—

জান্‌কী চম্‌কে উঠল।

জেলে!—যেমন সেদিন ছেদী কুমোরের ছেলেটাকে—

কিন্তু সে যে চুরি করেছিল! তার স্বামী তো চোর নয়—অক্ষম, অক্ষমতা কি এতই কসুর যার জন্য জেলে দিতে পারে?

উঃ! তাই যদি হয় তা হলে—

মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তি জান্‌কীর চোখে কালো হয়ে গেল। তার উদ্বেগ-কাতর মলিন মুখপানে খানিক নীরবে তাকিয়ে থেকে বিরজু বললে—আচ্ছা, কথাটা ভেবে দেখো তা হলে, আমি যাই এখন, ওবেলা আবার আসব। হাঁ দেখো খবরদার। সুখরাম ভইয়াকে তুমি কিছু বলো না, বেচারা ঘাবড়ে যাবে।

জান্‌কী হাঁ-না কিছুই বলতে পারল না। সে গালে হাত দিয়ে বসে গুম্ হয়ে ভাবতে লাগল। একমাত্র আশা লালাদের হাতে-পায়ে ধরে সুখরাম যদি কিছু সবিধা করতে পারে, কিন্তু—

সুখরাম আধ ঘন্টা বাদে ফিরে এলো, মুখ শুকিয়ে, লালাজীও জবাব দিয়ে দিলেন, এত টাকা শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস করে কে দেবে?

২

জান্‌কীর শেষ আশাতেও ছাই পড়্‌ল।

আহারের পর খাটিয়া পেতে ছিলম্ ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে সুখরাম বললে—তুই একা থাকতে পারবি জান্‌কী; তা হলে আমি বেরিয়ে পড়ি।

জান্‌কীর বুকের ভেতর জোরে ধ্বক্ করে উঠল; সে ত্রস্তে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায়?

—শহরে, এ দেশেতে তো রোজগারপাতি কিছুই নেই, শহরে গেলে বরং—

—সে তো আমি কবে থেকেই বল্‌ছি,—কিন্তু একলা কেন? আমি সঙ্গে থাক্‌লে তোর হাত-পা বেঁধে রাখব না কি?

কথাটা বলতে জান্‌কীর ঠোঁট দু-খানি কাঁপ্‌ছিল, চোখে বুঝি জলও এসেছিল।

সুখরাম ছিলম্ রেখে অভিমানিনী পত্নীকে কাছে টেনে নিয়ে আদর মাখা মিষ্টসুরে বললে—বুঝতে পারছিস নি—দুজনে গেলে তো ভালই হয়, কিন্তু মহাজন ছাড়বে কেন? সে কি বলে জানিস? টাকা না পেলে আমাকে জেলে দেবে—

জান্‌কী শিউরে উঠল।

—না না, তাই কি কর্‌তে পারে?—

কেন পারে না? টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, তখন আমাকে নিয়েও যা খুসী করতে পারে। তাই তো বলছি তুই যদি এখানে থাকতে পারিস, তা হলে আমি মেহনৎ-মজুরী করে বছর দু'বছরে—

একটা তপ্ত নিঃশ্বাস সুখরামের বুকের ওপর ঝরে পড়ল।

বছর-দু'বছর—উঃ!

ভীতি-ব্যাকুল বাহুপাশে স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন করে জান্‌কী ত্রস্তে বললে—চল, আমরা দু'জনেই রাতারাতি চুপি চুপি পালিয়ে যাই, কোন দূর দেশে যেখানে কেউ পাত্তা পাবে না।

—বাউরী!—দূর দেশে যাব কি করে—হেঁটে?

কথাটা মিথ্যে নয়, যাবার রেস্ত কই? ঘরে এমন কিছু নেই যা বিক্রী করে তাদের দূর দেশ-যাত্রার পাথেয়—না; সে হতেই পারে না।

অসম্ভব। কিন্তু স্বামীকে ছেড়ে সে থাকে কি করে?

তের বছর বসয়ে জান্‌কী 'গওন' হয়ে এসেছে, সেই ইস্তক তাদের ছাড়াছাড়ি এক দিনের তরেও হয় নি, এখন সে যে কেমন করে একলাটী—উদগত চোখের জল কষ্টে চেপে জান্‌কী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললে—আমি যদি—যদি এ দেনাটা শোধ করে—

তুই শোধ করবি! তোর আছে কি যে তাই দিয়ে—হ্যাঁ রে? গায়ে একরতি চাঁদিও তো নেই আর—

জান্‌কীর এবার আর মুখ ফুটল না, তার বুক ভেঙ্গে কান্না আসছিল। হায়! স্বামীকে কোন্ মুখ নিয়ে বলে, কোন্ প্রাণে জানায়—কি দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করবে?

জান্‌কী!

ব্যথিতা জান্‌কীর অশ্রু-ভেজা কাতর মুখখানি সোহাগভরে চুম্বন করে সুখরাম সান্ত্বনা-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে—পাগলামী করিস নে জান্‌কী, আমাকে ছেড়ে দে। আমি যা করে হোক মহাজনের দেনাটা দিয়ে ফেল্‌তে পারলেই তোকেও নিয়ে যাব—

কিন্তু এখানে আমি একলাটী কেমন করে—

একলাটী কেন? বিরজুরা রয়েছে, চন্দুদেরও বলে যাব, ভয় কি?

জান্‌কীর মনের উদ্বেগ-আশঙ্কা স্বামীর আশ্বাসবাক্যে শান্ত হয় না, বরং বৃদ্ধিই হয়।

স্বামীর কাছছাড়া হয়ে সে কেমন করে থাকবে, এই ব্যাকুল প্রশ্নটাই সজাগ হয়ে তার শঙ্কা-কাতর চিত্তে ক্রমাগত ঘুরপাক্ খেতে লাগল। তা কি পারা যায়?

জান্‌কীকে একা অসহায় পেয়ে মহাজন-পুত্র যদি—যদি কেন, নিশ্চয়—সেই সুযোগ পাবে বলেই না জান্‌কীর স্বামীকে জেলে পাঠাবার জন্য তার এত আগ্রহ!

কথাটা মনে আসতেই জান্‌কীর বুকখানা কেঁপে ওঠে। না গো! না! সে হবে না! তার চেয়ে যদি পথে পথে ভিক্ষে করতে হয় স্বামীর হাত ধরে—কিন্তু দেনা?—

জান্‌কী ভাবে—গালে হাত দিয়ে বসে শুধুই ভাবে, ভেবে কূল-কিনারা পায় না কিন্তু।

৩

সন্ধ্যার আবছায়া আঁধারে জান্‌কী তার শূন্য কুটিরে একলাটী ক্রমাগত ঘর-বার করছে। সুখবাম গেছে শুকুল্‌দের বাড়ী, জান্‌কীই তাকে ঠেলে পাঠিয়েছে।

শুকুল গাঁয়ের মধ্যে একজন মাতব্বর লোক, তাদের এই বিপত্তিতে যদি কোন সুরাহা করতে পারে—ঠিক এই প্রত্যাশায় নয়, তবে বাহানায় বটে!

জান্‌কীর বুক দুরু দুরু করছিল, বিরজু বলে গেছে সন্ধ্যের আগেই আসবে—এলো না কেন?

বিরজুর এই অনুপস্থিতিতে প্রতীক্ষমানার প্রাণে উৎকণ্ঠা ও স্বস্তি এই দুই বিরুদ্ধভাবের কোনটী প্রবল হয়ে উঠছিল, তা ঠিক বোঝা যায় না। তার মুখে শঙ্কার ছায়া সুস্পষ্ট, চাহনী চকিত।

এখন এলো না, তবে কি সে—

জান্‌কী অস্থির।

কোথাও একটুকু শব্দ হলেই সে চঞ্চল চরণে কম্পিত বক্ষে ছুটে যায়—আঙ্গিনার সীমা ছাড়িয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় কান পেতে—কারুর সাড়া-শব্দ পায় না—তখন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে—যাক গে! না এলেই তো ভাল—বরাতে যা আছে তাই হবে।

এবার সত্যই শোনা গেল—খুস খুস করে কার সতর্ক পদক্ষেপের শব্দ। জান্‌কী চমকে উঠল,—কে বিরজু? কি খবর রে?—

খবর ভাল।

বিরজু জান্‌কীর হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল। তারপর এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে—ভয়ে আর ত্বর সয় না—জানিস? বলে বোকা! তাকে সঙ্গে করেই আন্‌লি না কেন? তা হলে আর—

জান্‌কীরও আর ত্বর সইছিল না, বিরজু কথাটা শেষ না করতেই সে তার সামনে হাত পেতে বললে—কই? দেখি।

—কি?

বিরজু বিস্মিত হয়ে জান্‌কীর মুখপানে চাইল—সেই 'চিঠ্‌খানা' যাতে তোর ভইয়ার 'অঙ্গুঠা'র ছাপ—

ওঃ, তাই বুঝি তুই...কিন্তু তা কেমন করে হয় ভউজী?

সে কি এত বড় উল্লুক যে জিনিস পরখ না করে দাম দিয়ে দেবে? এ যে আব্‌দার দেখছি।

জান্‌কীর আগ্রহদীপ্ত মুখকান্তি পলকে ম্লান হয়ে গেল। তবু জোর করে একটু মুচকে হেসে, ঠোঁট ফুলিয়ে, মিষ্ট অভিমানের সুরে সে বললে—বা রে, তবে আর কি—এই বুঝি পুরুষের ভালবাসা?

—ভালবাসার কসুর নেই ভউজী। সে কেবল বলছে, জান্‌কী একবারটী পাঁচ মিনিটের জন্যেও এসে, দু'টো কথা বলে 'চিঠ্‌খানা' নিজের হাতে নিয়ে যাক্, তারপর যখন খুসী তার দিনে-রেতে, যখনই 'মওকা' পাবে...সত্যি, ও লোকটা তোকে কি চ'খে যে দেখেছে—বলে সুখরামের দেনা তো চুকে গেলই, এবার ওরা যাতে খেতে-পরতে কষ্ট না পায় সেই ব্যবস্থা...

জান্‌কী নীরব স্তব্ধ।

তার সেই মৌন-গম্ভীরভাবে অসহিষ্ণু হয়ে বিরজু বললে—ভাবছিস্ কি? এমন 'মওকা' হাতছাড়া করিস নি ভউজী। আখেরে পস্তাতে হবে তা হলে। বেচারা সুখরাম এক তো ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেছে, তার ওপর আবার ধরপাকড় হলে তাকে কি আর—

জান্‌কী অন্তরে অন্তরে শিউরে—বওনার হাত ধরে শশব্যস্ত বলে উঠল—না, না, আমি যাচ্ছি চল্—কিন্তু...দেরী করতে পারব না, তোর ভইয়া ফেরবার আগেই—

—ওঃ। বলছি তো—পাঁচ মিনিট শুধু একবার সাম্‌না-সাম্‌নি—নইলে তার বিশ্বাস হবে কেন?

*　　　*　　　*　　　*

সুখরামের ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল।

অনর্থক যাওয়া। সংসারে কে কার ঝামেলায় পড়তে চায়?

জান্‌কীর যেমন বুদ্ধি—জানে কোনও 'উমেদ' নেই তবু জবরদাস্ত। স্ত্রীকে খুব একচোট বকুনী দেবে বলে দোর ঠেলে ঘরে ঢুকেই সে দেখতে পেলে প্রদীপের সামনে খাটিয়ার ওপর রাণীর মত বসে জান্‌কী পা দোলাচ্ছে,—তার ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। ঘরের জিনিস-পত্র সব এলো-মেলো ভাবে ছড়ানো কিন্তু ঘরণীর সাজের ক্রুটী নেই! পরণে তার পাল-পার্ব্বণে পরবার জন্য যত্নে তুলে রাখা সুর্‌মাই রংয়ের ঘাগরা, ধানি রংয়ের ওড়না, ঝুঠো জরী লাগানো লাল টুকটুকে আঙ্গিয়ায় উন্নত বক্ষ অর্দ্ধ-আবরিত—তার ওপর সোনালী পুঁতির মালা দুলছে। সিঁথীভরা সিন্দূর, কপালে রঙীন 'টিক্‌লী', চোখে কাজল পর্য্যন্ত বাদ যায় নি।

হুঁ। 'সিঙ্গার' করবার এই সময় বটে। ঘরে অন্ন নেই, স্বামী দেনার দায়ে জেলে...

কিন্তু কি সুন্দর আজ মানিয়েছে জান্‌কীকে—চমৎকার।

তরুণী পত্নীর সেই মোহিনী মূর্ত্তি দেখে সুখরাম বকতে ভুলে গেল, শুধু বিস্ময়ের সঙ্গে

বললে—আজ কি জান্‌কী? রাত্তির বেলা এত সাজ-গোজ করে যাবি কোথায়?

—যেখানে দানাপানি নিয়ে যাবে? জান্‌কী ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে স্বামীর হাত দু'খানা—পরম আগ্রহে ধরে বললে—আর দেরী নয়—চল্ এই বেলা আমরা পালিয়ে চলি। অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না, কেউ ধরবে না—এখানে থাকলে আর রক্ষে নেই—চল্—

কোথায় পালাব জান্‌কী? এ তো মগের মুলুক নয়, ইংরেজের রাজত্ব, যেখানে যাব পাকড়াও করে—

—কিসের জন্যে? দেনার দায়ে? কিন্তু দেনা যদি না থাকে? এই দেখ্ তবে—

জান্‌কী ক্ষিপ্রহস্তে তার 'আঙ্গিয়া'র ভেতর থেকে বার করলে একটুকরা বাদামী রংয়ের চিল্‌তে কাগজ, এ সেই কাগজ...ঋণ গ্রহণের সময় সুখরাম যাতে...কিন্তু জান্‌কী এ কোথায় পেলে? সুখরাম একেবারে হতভম্ব।

কাগজখানা প্রদীপের শিখায় ভস্মসাৎ করে, বিস্মিত নির্ব্বাক স্বামীর মুখপানে তাকিয়ে জান্‌কী বললে—হাঁ করে দেখছিস কি? আয় দু'জনে মিলে জিনিস-পত্রগুলো বেঁধে-ছেঁদে নি, দেরি করলে হয় তো—

সুখরাম সন্নিগ্ধ দৃষ্টিতে পত্নীর মুখপানে তাকিয়ে ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু এ কাগজ তুই কোথায় পেলি জান্‌কী? চুরী করে যদি...

আ গেল যা। চুরী করব কেন রে? টাকা পাঠিয়ে আনিয়েছি বিরজুর হাতে—

বলিস কি? অ্যাঁ? এতগুলো টাকা তোকে দিলে কে?

জান্‌কী বিস্ময়-বিমূঢ় স্বামীর বিহ্বল দৃষ্টির সামনে থেকে চোখ দুটো নামিয়ে নিয়ে গদ্‌গদ্‌ভাবে বললে—দেবে আর কে? আমিই রেখেছিলুম,—সময় যখন খারাপ ছিল তখন এক টাকা দু'টাকা করে জমিয়ে লালাদের বউয়ের মত একটা সোনার 'বুলাক' গড়াবার জন্যে...তা দরকার নেই আর, এর পরে শহরে গিয়ে দু'জনে মিলে রোজগার করব যখন—

সুখরামের বাক্যস্ফূর্ত্তি হল না। তার নীরবতার কারণ অনুভব করে জান্‌কীর মুখখানি এতটুকু হয়ে গেল। ব্যথাম্লান ছল ছল চোখে সে বললে ঘাট হয়েছে—আমাকে মাপ কর—তোকে না জানিয়ে আমি যা করেছি তা শুধু তোরই জন্যে—তা ছাড়া আর কোন মতলবে নয়—স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জান্‌কী কেঁদে ফেললে। ছলনা সে আজ করেছে—একজনকে না, তিনটি প্রাণীকে কিন্তু স্বামীর সঙ্গে এই প্রতারণা—এটাই তার প্রাণে সব চেয়ে বেশি বাজছিল।

* * * *

শীতের অন্ধকার রাত্রি।

সোজা পথ ছেড়ে তারা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে চল্‌ছে।

মাথায় একটা মস্ত বড় গাঠরী, হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি নিয়ে সুখরাম অবাধে চল্‌ছিল হন্ হন্ করে, কিন্তু জান্‌কী তা পারছিল না, তার ক্ষিপ্র চরণের গতি থেকে থেকে বাধা পাচ্ছিল। চল্‌তে চল্‌তে সে বার বার ফিরে ফিরে চাইছিল তাদের পরিত্যক্ত কুটিরের পানে। এক আধদিন নয়, তার জীবনের প্রায় দশটী বছর কেটে গেছে সেই কুটিরে সুখে-দুঃখে, ব্যথায় আনন্দে, তারই মোহময় সহস্র স্মৃতি নৈশ তিমিরের ঘন কালিমায় সোনার রং ফলিয়ে, আলোর বাহু মেলে জান্‌কীকে যেন ডাকছে! প্রদীপটা নিবিয়ে আসা হয় নি—ভুলক্রমে নয়, জেনে, পাছে কেউ সন্দেহ করে।

স্বল্পায়ু দীপ ক্ষণে ক্ষণে নিবে যাবে তারপর বিরজু আসবে তাকে নিয়ে যেতে সেইখানে—যেখানে টাকার বিনিময়ে তার যৌবন—উঃ! ত্রস্তে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, গতি দ্রুত করে জান্‌কী সুখরামকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে বলে উঠ্‌ল—শীগগির শীগগির পা বাড়িয়ে চল্ না—

সুখরাম চম্‌কে দাঁড়িয়ে বললে—তুই যে খালি খালি পেছিয়ে যাচ্ছিস।

—না, আর পেছোবো না, চল্।

চল্‌তে চল্‌তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুখরাম চুপি চুপি বললে—বেরোতে কি পারতুম, ভাগ্যিস তুই টাকাগুলো লুকিয়ে রেখেছিলি, জান্‌কী।

লুকিয়ে রাখা? হায়!—জান্‌কীর ইচ্ছা ছিল একবারটী মুখ ফুটে বলে এ টাকা সঞ্চয় নয়—তার যৌবনের মূল্য।

ইচ্ছাটাকে সবলে দমন করে সে শুধু চাপা গলায় বললে—চুপ।

দূরে—বহুদূরে—কুটিরের ছায়াখানি মিলিয়ে গেছে, আলোটুকুও হারিয়ে গেছে দিশাহারা অন্ধকারে, কি জানি কোথায়।

নীরবে নিঃশব্দে গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে এসে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ওড়নার রঙীন আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে জান্‌কী ধরা গলায় মৃদু মৃদু গাইতে লাগল—

'মোরে ইয়ে যোবনা সইয়াঁকে খেলও না—'

জাগরণ।। শ্রী গিরিবালা দেবী

দুর্গাপুর গ্রামে খরস্রোতা নদীর অদূরে কয়েকখানি মৃণ্ময় কুটির-ঘেরা পরিস্কৃত অঙ্গনে দাঁড়াইয়া কাত্যায়নী ভ্রাতৃবধূর উদ্দেশে ডাকিলেন, "রাণী।'

শয়নগৃহের অর্ধোন্মুক্ত দ্বারের মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া রাণী উত্তর করিল, "ডাকছিলে দিদি?"

"হ্যাঁ ডেকেছি, তুমি নাকি আজ কলকাতায় যাচ্ছ রাণী?"

ননন্দার ঔৎসুক্যপূর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া রাণী মৃদুস্বরে কহিল, "আজ রাত দশটার গাড়ীতে যাবার কথা ঠিক করে বাবা চিঠি লিখেছেন। আজই যাব।"

বধূর মুখ হইতে এ উত্তরটি কাত্যায়নী বোধ হয় প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "যাচ্ছ তো রাণী, কিন্তু এবার বেশি দিন থেকো না। আমি আশ্বিন মাসেই তোমাকে আনতে পাঠাব। নিজের ঘর সংসার ফেলে বারমাস বাপের বাড়ি থাকলে তোমার চলবে কেমন করে বোন?"

কাত্যায়নীর কথায় রাণীর অধরে একটু মৃদু-হাস্যের রেখা খেলিয়া গেল। তাহার আবার ঘর সংসার! সে দরজা ধরিয়া চিত্রিত প্রতিমার মতন তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল; কথা কহিল না। রাণীর চিন্তাপূর্ণ সুন্দর মুখখানির দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া চাহিয়া কাত্যায়নী কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

তিন বৎসর হইল ধীরেনের সহিত রাণীর বিবাহ হইয়াছে। রাণী ধনবান পিতার পরমাদরে পালিতা কন্যা। তাহার বড় দুইটি বোনের অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ও বহু অনুসন্ধানের পর ভাল পাত্রেই বিবাহ হইয়াছে। একটি ডিপুটি, অপরটি পুলিশ বিভাগের বড় চাকুরে। সর্ব্ব-কনিষ্ঠা রাণীর জন্য পিতা অনেক বাছিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর, পিতৃ-মাতৃহীন সদ্য এফ-এ পাশ ধীরেনকেই মনোনীত করিয়া তাহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন। আশা করিয়াছিলেন, ছোট জামাইটিকে নিজের কাছে রাখিয়া নিজে চেষ্টা করিয়া তাহাকে উপার্জ্জনের পথ দেখাইয়া দিবেন। কিন্তু দুই দিন না যাইতে তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইল না। শ্বশুরের চির-পোষিতআশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ধীরেন শ্বশুরের আশ্রয় ত্যাগ করিল। কলেজ ছাড়িয়া, তাহার পতি-পুত্রহীনা বিধবা ভগিনীকে লইয়া নিজের গ্রামে সংসার পাতিয়া বসিল।

শ্বশুর, জামাতার জন্য কয়েক দিন ব্যক্তি বিশেষের 'মোসাহেবী' করিয়া, কোন সরকারী আফিসে মাসিক একশত টাকা মাহিনার একটি চাকুরী জুটাইয়া ধীরেনকে অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাহাতে আরও জানাইলেন যে, তাঁহার বাড়ির সংলগ্ন একখানি ক্ষুদ্র বাড়ি মাসিক কুড়ি টাকা ভাড়ায় তিনি জামাতার জন্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। শ্বশুর বাড়িতে থাকা তাহার অমত হইলে সস্ত্রীক সে বাড়িতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে; আবশ্যক হইলে তিনিও দুই চারি টাকা কন্যা-জামাতাকে সাহায্য করিতে কাতর হইবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জামাতা উত্তরে লিখিলেন, "আমার বাড়িতে যে জোত-জমা আছে, তাহাই ভোগ করিবার লোকাভাব। আমি পরের গোলামি করিতে ইচ্ছুক নহি। আর নিজের পৈতৃক ভিটা চাবিবন্ধ করিয়া শহরে থাকিবার আমার প্রবৃত্তি নাই।"

জামাতার এই মূঢ়ের ন্যায় অসংযত ব্যবহারে এই শাশুড়ী ব্যতীত শ্বশুর বাড়ির সকলেই তাহার উপর মর্মান্তিক চটিয়া রহিল, রাণীও তাহাদেরই দলভুক্ত।

২

শ্রাবণের ঘন-ঘোর মেঘাবৃত রাত্রি। আজ আকাশ তারার হার গলায় পরিয়া চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল হয় নাই। পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘগুলি দুর্গাপুরের সমস্ত আকাশকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ধীরেন তাহার নির্জ্জন শয়ন-গৃহের মেজেতে মাদুর বিছাইয়া একটি ক্ষীণপ্রভ প্রদীপের মৃদু আলোকে কি একখানি বহি নিবিষ্ট মনে পড়িতেছিল। তাহার আশেপাশে অনেকগুলি মোটা মোটা বহি ইতস্ততঃ সজ্জিত রহিয়াছে। এ অধ্যয়নশীল যুবক কলেজের সম্পর্ক ছাড়িয়া দিলেও লেখাপড়া যে ছাড়িয়া দেয় নাই, তাহা তাহার শয়ন-গৃহের স্তূপীকৃত পুস্তকপূর্ণ সেলফ এবং পঠ্যমান পুস্তকে একাগ্রতা দেখিলেই সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধ হয়।

যাত্রার অনিতিবিলম্বে সুসজ্জিতা রাণী ঘরে প্রবেশ করিয়া অধ্যয়ন-রত ধীরেনের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, ''আমি এখন যাচ্ছি।''

ধীরেন পঠ্যমান পুস্তক হইতে নয়ন-যুগল উত্তোলন করিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, ''এক্ষণি যাচ্ছ রাণী? রাত দশটায় গাড়ি, এত তাড়াতাড়ি কেন?''

রাণী ধীরেনের কথায় বাধা দিয়া কহিল, ''একটু শীগগির করেই যেতে হবে। যে মেঘ করেছে, বৃষ্টি এলে গরুর-গাড়িতে আজ আর স্টেশনে যেতে পারা যাবে না।''

একটু হাসিয়া বিদ্রুপ-পূর্ণ কণ্ঠে ধীরেন কহিল, ''আজ এ আঁধার রেতে আমার হৃদয়টি আরও গাঢ় অন্ধকারে নিক্ষেপ করে তুমি চলে যাবে? বৃষ্টি যদি তোমায় যেতেই না দেয়, তা হলে বিশেষ কি আর ক্ষতি হবে রাণী?''

''ক্ষতি আর কি? তবে সরকার মশাই আর ঝির যা কষ্ট। তাদের ত বাপের জন্মে এমন কুঁড়েঘরে বাস করবার অভ্যাস নেই।''

ধীরেন ব্যথিত বিবর্ণমুখে রাণীর গর্ব্বভরা গৌর মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। একটি কঠিন উত্তর তাহার ওষ্ঠাগ্র হইতে বাহির হইবার জন্য আকুলিব্যাকুলি করিয়া উঠিল। সে কষ্টে মনঃসংযম করিয়া ধীর শান্ত কণ্ঠে কহিল, ''তোমার বাবা ধনবান লোক, তাঁর বাড়ির ঝি-চাকরকে আমার কুঁড়ে ঘরে রাখতে চেয়েছিলাম, এর জন্যে আমার অপরাধ হয়েছে রাণী। তুমি আমায় মাপ কর।''

রাণী তাচ্ছিল্য ভরে মুখখানি ঘুরাইয়া কহিল, ''আমায় বাপ তুলে গাল দিচ্ছ? আমার বাবা ধনবান হোন আর না হোন, কিন্তু তোমাদের মত ছোটলোক নন।''

''সকলেই যদি বড়লোক হবে রাণী, তাহলে ছোটলোকও ত কাউকে হতে হবে? যাবার সময় কেন মাথা গরম কচ্চ? এ সব কথা যাক—আশ্বিন মাসে কিন্তু তোমায় আসতে হবে; আমি গিয়ে তোমায় নিয়ে আসব। তুমি এখানে না থাকলে আমার ঘর-সংসার সব অন্ধকার!''

ধীরেনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, ''যে তোমার আলো করা ঘর-সংসার, তার আবার অন্ধকার! আশ্বিন মাসে আমার দিদিরা আসবেন, তখন কেমন করে আসা হবে, তা''—

হঠাৎ ম্লান আলোকে ধীরেনের বেদনাপূর্ণ মলিন মুখখানির দিকে চাহিয়া রাণীর মুখের কথা মুখেই মিলাইয়া গেল। তাহার গর্ব্বভরা হৃদয়কোণে একটু ক্ষীণ করুণার ধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে নীরবে নতবদনে চিন্তা করিতেছিল, আজ যাইবার সময় অনর্থক গায়ে পড়িয়া স্বামীকে এতটা দুঃখিত করা তাহার বোধ হয় ভাল কাজ হইল না। সে বেচারা না হয় গরীবই আছে, তবুও ত স্বামী! তাহার গর্ব্বভরা মন উত্তর করিল,—অন্যায় আবার

কিসের ? যাহারা গরীব তাহাদের ধনবানের দুহিতার নিকটে এমন একটু আধটু কথা না শুনিলে চলিবে কেন?

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল; অথচ ঘরের মধ্যে দুইটি প্রাণীর কথা বলিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না! আকাশে মেঘ-গর্জ্জনের সাথে সাথে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে শুরু হইল। বর্ষণ-মৃদু বাতাসে ঘরের দীপশিখাটি ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল।

বাহির হইতে রাণীর বাপের বাড়ির ঝি ডাকিয়া বলিল, "কৈ গো দিদিমণি, শুধু শুধু দেরি করচ কেন, বৃষ্টি যে এল!"

ঝির আহ্বানে রাণীর চমক ভাঙ্গিল! সে ধীরেনের দিকে চাহিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল, "তা হলে আমি আসি?"

ধীরেন রাণীর মুখের উপর উদাস-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ম্লানমুখে উত্তর করিল, "আবার এস রাণী।"

৩

বর্ষান্তে শরৎ আসিয়াছে। নদীর কূলে কাশ-তৃণগুলি শুভ্র ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। সাধকের হৃদয়-তন্ত্রীতে ও রাখালের বাঁশরীতে আগমনীর করুণ স্বরের মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। সে দিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই কাত্যায়নী পাঠনিরত ধীরেনের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "ধীরু, কথা বল্লে কি কানে যায় না?"

ধীরেন বিস্মিত-নয়নে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া স্মিত-কণ্ঠে কহিল, "কোন্ কথা তোমার শুনছি না দিদি?"

"কোন্ কথা শুনছ? আজ ক'দিন হল বলছি 'রাণীকে নিয়ে আয়'—তা' সে কথায় কান দেওয়াই হয় না। আমার কেন এত মাথা ব্যথা ভাই, আমায় কাশী পাঠিয়ে দিয়ে তোর যা' খুসী তাই কর! দেখতেও আসব না, বলতেও আসব না।"

ধীরেন কলহাস্যে গৃহখানি মুখরিত করিয়া কহিল, "এ মাথা-ব্যথার হাত এড়িয়ে দু'টি ভাই বোনের বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাশীবাসী হওয়াটাই সব চাইতে ভাল।" একটু থামিয়া আবার কহিতে লাগিল, "এতদিন মনে না করিয়ে বড়ই অন্যায় করেছ দিদি। এখন তাড়াতাড়ি বোঁচকা বাঁধা শুরু কর গে।"

ধীরেনের কথার সুরে এবং বলিবার ভঙ্গীতে কাত্যায়নী আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। হাসিমুখে 'রণে ভঙ্গ' দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন কিন্তু কার্য্যের কথা ভুলিলেন না। মধ্যাহ্নে বধূকে আনিবার জন্য ভাইকে ধরিয়া বসিলেন।

দিদির পুনঃ পুনঃ মিনতি-ভরা অনুরোধে ধীরেন ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "তুমি রোজই এক কথা বল দিদি, কিন্তু আমি আন্‌তে গেলেই কি সে আসবে? কয় মাসের ভিতর যে একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লেখে নি সে"—

ভ্রাতার কথায় বাধা দিয়া কাত্যায়নী কহিলেন, "তুই শুধু তার দোষই খুঁজে বেড়াবি ধীরেন! ছেলেমানুষ চিঠি যদি নাই লিখে থাকে, তাতে এমন কি দোষ হয়েছে? হয়ত চিঠি লেখার কথা তার মনেই নেই।

দিদির কথায় ধীরেন একটু ক্ষোভের হাসি হাসিল। কোন উত্তর দেওয়া নিষ্ফল বুঝিয়া চুপ করিয়াই রহিল। পতি-পুত্রহীনা কাত্যায়নীর শূন্য হৃদয় রাণী যে কতখানি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, এ কথা রাণীর নিকট অপ্রকাশ থাকিলেও ধীরেনের নিকট অপ্রকাশ ছিল না। রাণীর প্রতি যে হৃদয় মাতার স্নেহে, ভগিনীর প্রীতিতে পরিপূরিত, অন্যায়ের প্রমাণ দেখাইয়া দিদির সেই স্নেহমমতাময় হৃদয়ে ধীরেন আঘাত করিতে পারিল না। ভ্রাতার নিরুত্তর গম্ভীর মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাত্যায়নী যখন বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিলেন তখন আর ধীরেনের

আপত্তির কোন কথাই মনে স্থান পাইল না। এই অন্ধ ভালবাসার নিকট সে যেন পরাজয় স্বীকার করিয়া, রাণীকে লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

৪

শরতের মধুর অপরাহ্ন। সন্ধ্যার অন্ধকার রূপ প্রফুল্ল ধরণী-দেহে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। কলকাতা হ্যারিসন রোডেব উপর একখানি বৃহৎ এক বাড়ির নির্জ্জন ছাদে বসিয়া কয়েকটি রমণী গল্প করিতেছিলেন।

রাণীর বড়দিদি মৃণালিনী বলিলেন, "আজ ধীরেন খুব জব্দ হয়ে ফিরে গেল।" মেজ, মণিমালা অদূরে উপবিষ্টা রাণীর দিকে চাহিয়া উত্তর দিলেন, "রাণী না গিয়ে বেশ করেছে! ধীরেনের যেন পাড়াগাঁয়ে খড়ের ঘরে বাস করার অভ্যাস আছে, তা' বলে ও কেন সেখানে মরতে যাবে?" মৃণালিনী বলিলেন, "দুটো ভাত দু'খানা কাপড় এর দুঃখেই কি রাণী বনবাসে যাবে? ওর ভাত-কাপড়ের দুঃখ কি? বাপ, ভাই রয়েছে, তা'ছাড়া আমরা দু'বোন ত হাবাতের হাতে পড়ি নি!" মৃণালিনী ও মণিমালার মুখে গর্ব্বের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বধূ নীলিমা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ননদদিগের মন্তব্যগুলি শুনিয়া যাইতেছিল, এখন আর উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিল না। ধীরস্বরে বলিল, "ঠাকুরঝি, তোমরা বলছ রাণীর বাপ ভাই আছেন, ভগ্নীপতিরাও বড়মানুষ, কাজেই রাণী স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি না গিয়ে খুব ভাল কাজ করেছে। কিন্তু এ রকম কাজ যেন পৃথিবীতে আর কেউ ভ্রমেও না করে। স্বামী তার সাত পুরুষের ভিটায় চাবি বন্ধকরে পরের গোলামী করতে আসে নি, এই অপরাধে স্ত্রী স্বামীর ঘর করেন না! রাণী যদি আমার বোন হত, তা হলে সাত জন্মে আমি ওর মুখ দেখতাম না।"

অতুল ঐশ্বর্যশালী পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী স্পষ্টবাদিনী এই বধূটিকে দেখিয়া শ্বশুরবাড়ির সকলেই একটু সমীহ করিয়া চলিত, তাই অপ্রিয় সত্য কথা শুনিয়া ননদিনীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি ভিন্ন আর কোন কথার উত্তর করিল না। নিচে হইতে ঝি ডাকিল, "তাঁতী-বউ কাপড় এনেছে, দিদিমণিরা নেবে এস গো।" মৃণালিনী ও মণিমালা উঠিয়া গেল।

রাণী নীলিমার কোলের উপর মুখখানি লুকাইয়া উচ্ছ্বসিত বাষ্পবারিতে বক্ষঃস্থল সিক্ত করিয়া ফেলিল। আজ প্রাতঃকালে সে যখন ধীরেনের মুখের উপর তাহার বিলোল-বিস্ফারিত নয়নদ্বয় স্থাপন করিয়া ভরাট কণ্ঠে কহিয়াছিল, "আমি কখনও আর তোমার কুঁড়ে ঘরে যেতে পারব না।" তখন একবারও মনে হয় নাই, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাহার হৃদয়-নদীতে বিপরীত ভাবের তরঙ্গ উঠিতে থাকিবে। আজ নীলিমার কথায এবং তাহার দৃষ্টান্তে অনেক দিনের অনেক ত্রুটি অনেক ভুল রাণীর চক্ষুর সম্মুখে জাগিয়া উঠিল। তাহার সুপ্ত নারীত্বের জাগরণ হইল। আজ প্রভাতে বিদায়কালে স্বামীর সেই ব্যথিত ম্লান মুখচ্ছবি রাণীর হৃদয়ে শূলের মত বিঁধিতেছিল। অনুতাপের তীব্র জ্বালায় সমস্ত দিনটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া রাণী আর সহিতে পারিল না।

নীলিমা সস্নেহে রাণীর মস্তকে তাহার স্নিগ্ধ কোমল হস্তখানি রাখিয়া মমতাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "এখন কেঁদে কি হবে রাণী! এতদিনে যে তোমার ভুল তুমি বুঝতে পেরেছ এর জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দাও!"

রাণী অশ্রুভরা রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল, "তোমাকেই ধন্যবাদ দিচ্ছি বউদি, তুমিই আমায় রক্ষা করেছ।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া, রাণী তাহার সুকোমল করপল্লব দুইখানি দিয়া নীলিমার পদযুগল ধারণ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "বউদি, তুমি দয়া করে আজই আমায় দুর্গাপুর পাঠিয়ে দাও। আমি যে আর এখানে থাকতে পারছি না।"

ভূলুণ্ঠিতা ননন্দার মুখখানি আপনার স্নেহভরা বক্ষে তুলিয়া লইয়া নীলিমা কহিল, "শান্ত

হও রাণী, আজ ত তোমায় পাঠান যাবে না। কাল ভোরের ট্রেনে মাকে বলে নিশ্চয় তোমায় পাঠিয়ে দেব। ধীরেন বাবুর সঙ্গে যাওনি বলে মা মনে বড় আঘাত পেয়েছেন! তুমি এইখানে বস; আমি মাকে বলিগে, যাতে কাল সকালেই তোমার যাওয়া হয় তার ব্যবস্থা করতে।''

৫

সমস্ত পথটা রাণী স্বপ্নাবিষ্টের মত বসিয়া ছিল।

গরুর গাড়ীতে উঠিয়া সেই চিরপরিচিত রাস্তাটি দেখিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। সেই আঁকা বাঁকা পরিচিত পথ ঘাট আজ তাহার নয়নে কি যেন একটি অপরূপ সুষমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রের সুশীতল সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না-কিরণে শস্যশ্যামলা ধরিত্রী পুলকিতা হইয়া উঠিয়াছেন। শত চন্দ্রের প্রতিবিম্ব বক্ষে লইয়া স্রোতস্বিনী ক্ষুদ্র নদী কোথায় কাহার উদ্দেশে ছুটিয়া যাইতেছে। ঘন পল্লবিত বৃক্ষপত্রের উপর চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়া হীরক খণ্ডের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা সমীরণ প্রস্ফুটিত কুসুম গন্ধ বহিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। রাণী মুগ্ধ নয়নে এই রূপরসময়ী শ্যামলা পল্লীভূমির দিকে চাহিয়া রহিল। আজ বিলাসসর্ব্বস্ব শহরের কথা মনে হইতেই তাহার চিত্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে গাড়ীখানি তাহার গন্তব্য পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। রাণী গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিল, সম্মুখে বারোয়ারীতলা কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, আজও তেমনি অতীত দিনের মত নিতাই বৈরাগী তাহার একতারা বাজাইয়া গ্রাম্য সুরে পাঁচালি গাহিতেছিল—

''রামের মা যে কৈকেয়ী রাণী রামায়ণে শুনি।''
সে বড় অভাগিনী।
বাকল পরায়ে বনে দিল সোণার চাঁদ।''

এ সঙ্গীত রাণীর কানে মধু হইতে মধুরতর বলিয়া মনে হইল।

গাড়ী হইতে প্রাঙ্গণে পা দিয়াই রাণী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, সেই ছোট বড় ধানের 'মরাই' ঘেরা প্রাঙ্গণ আজও তেমনি রহিয়াছে। মঙ্গলা গাভীটি এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া 'জাবর' কাটিতেছে। তাহার কয়েক দিন হইল প্রসূত কালো রঙের বাছুরটি উচ্ছ্বসিত আনন্দে সমস্ত অঙ্গনে লাফাইয়া বেড়াইতেছে। বাঘা কুকুরটা চিরপরিচিতের ন্যায় রাণীর সম্মুখে আসিয়া লেজ নাড়িয়া যেন অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। এ সব দেখিয়া রাণীর নয়নে জল আসিল। প্রীতিরস তাহার সমস্ত হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া উঠিল।

রাণী অন্দরে ঢুকিয়াই দেখিল, আজও তাহার শয়নগৃহের মেজেতে মাদুর বিছাইয়া ক্ষীণপ্রভ প্রদীপের নিকটে সেই অধ্যয়নরত নবীন তাপস তেমনিই বসিয়া আছেন। আজ রাণী আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, যে এই অপার্থিব দেবহৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। এই স্বামী—সৌম্য সহাস্য বদনমণ্ডল জ্ঞান ও প্রতিভার লীলা ক্ষেত্র, ঐ বিস্তৃত ললাট, ঐ দীপ্তিপূর্ণ আয়ত পদ্মপলাশলোচন—ইনি কি রাণীর স্বামী? ইনি যে রাজরাজেশ্বর। দীনা বিবশা বুদ্ধিহীনা রাণী কিসের মোহে ভ্রান্ত হইয়া ইহাঁকে ব্যথিত করিতে সাহসী হইয়াছিল!

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাণী বারান্দায় উপবিষ্টা জপে রতা কাত্যায়নীর নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া অনুতাপপূর্ণ কোমল কণ্ঠে ডাকিল—''দিদি আমি এসেছি। আমার সব অপরাধ তোমাদের মাফ করতে হবে।''

রাণী আর কথা কহিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

কাত্যায়নী জপের আসন হইতে উঠিয়া, রাণীর সুকোমল দেহখানি বক্ষে জড়াইয়া অনন্দ জড়িত স্বরে কহিলেন, ''রাণী—এসেছি দিদি! ও ধীরেন দেখে যা—আমার রাণী এসেছে।''

সুনন্দা ॥ শান্তা দেবী

মাধবপুর গ্রামের একেবারে শেষে নদীর ঠিক কোলের কাছে প্রকাণ্ড বাগানের মাঝখানে মাথা উঁচু করে যে লাল বাড়ীখানা দাঁড়িয়ে আছে, তারি চারি পাশের পাথরের নক্সাকাটা ঝোলানো বারান্দাগুলিতে প্রায়ই একটি মেয়েকে দেখা যেত। ভোর বেলা সে স্নান করে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় তার পদ্মকলির মত হাত দুখানির উপর মুখখানি রেখে প্রায়ই নদীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত। ভোরের আলো তার অমন তুষারের মত শাদা মুখেও একটু রঙের ছোপ ধরিয়ে দিত। সেই গৌরী সুন্দরীটিকে শুধু তরুণী বল্লে ঠিক বোঝানো যায় না। বয়স তার কত বলা শক্ত। তার ভাসা-ভাসা ধূসর চোখ দুটির গভীর দৃষ্টিতে যেন শতাব্দীর দুঃখ মাখানো। গতি তার প্রৌঢ়ার মত মন্থর, কিন্তু অতিক্ষীণ তনুলতাখানি কিশোরীর সরল সতেজ দেহযষ্টির মত কমনীয়। সূর্য্যোদয়ের আগে প্রথম পাখীর ডাকের সঙ্গে-সঙ্গেই তন্বী সুনন্দা যখন স্নান করে নদীর ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে ভিজে কাপড়ে ভিজে চুলে পায়ে পায়ে জলের ছাপ ফেলে ঘাট থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত একটি জলের রেখা টেনে ধীরগতিতে কোনো দিকে না চেয়ে উঠে চলে যেত, তখন তাকে দেখে যদি কেউ কোনোদিন চিরযৌবনা জলদেবী বলে ভ্রম করত, তা হ'লে তাকে নেহাৎ দোষ দেওয়া যায় না। তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে জল ঝরে ঝরে পড়ত, আর চোখ দুটি দেখে মনে হ'ত সমস্ত সাগরের জল তারি কোলে অশ্রু হয়ে টলটল করছে। মৃণালের মত তার সুগোল কোমল হাত দুখানিতে কালো চুলের রাশ শৈবালের মত জড়ানো। পাতলা ঠোঁট দুখানি রক্তের উচ্ছ্বাসে রাঙা নয়; ঝিনুকের বুকের মত স্বচ্ছ উজ্জ্বল গোলাপী। ভোরের হাল্‌কা হাওয়ায় তার গায়ের ধপধপে শাদা কাপড়খানা সমুদ্রের বুকের শুভ্র ফেনার মত দুলে দুলে উঠ্‌ত। গতি কিন্তু তার ঢেউয়ের মত চঞ্চল নয়; গভীর জলের মত স্থির। গায়ের রং তার শাঁখের মত শাদা; রক্তের লেশ তাতে বড় দেখা যেত না। কোন্ গোপন গভীর দুঃখে এই জলদেবীটি তাঁর রহস্যময় জল-রাজ্যের বুকের ভিতর থেকে উঠে এসে নিস্তব্ধ ধরণীর এই নিরালা কোণটিতে একলা ভোরের বাতাসে তাঁর বেদনার ভার লঘু করে যেতেন তা' মানুষে দেখ্‌লে বুঝত কি না কে জানে?

পাথরের বারান্দা-ঘেরা সেই সেকেলে-ধরণের বাড়ীখানায় প্রায় সারাদিনই তার হাসি গান শোনা যেত। সুনন্দার শরীরখানি দেখ্‌লে মনে হয় অশ্রুসাগর মন্থন করে তোলা, কিন্তু সেই অশ্রু-সজল চোখের দৃষ্টি ছাপিয়ে তার মুখের হাসির অভাব ছিল না। তার সখী মন্দা আর মানসী তাকে অনেক সময়ই বলত—"হ্যাঁ ভাই, তোর এত হাসি আসে কোত্থেকে?" সুনন্দা বর্ষা-সন্ধ্যার সূর্য্যকিরণের মত হাসিতে মুখ ভরে বল্‌ত, "আমার দুঃখ করবার কি আছে ভাই, যে হাসব না? ঘরও নেই সংসারও নেই, মরে দুঃখ দিতেও কেউ নেই, মান করে চোখের জল ফেলাতেও কেউ নেই; আছে ত শুধু পর, তা' পর ত কখন কাউকে কাঁদাতে পারে না; তাই আমি হাসি নিয়েই আছি।" এমনি করে যখন সে জগতের লোকের সবচেয়ে

বড় দুঃখটাকেই তার হাসির খোরাক বলে পরিচয় দিত, তখন তার সৃষ্টিছাড়া পাষাণ-প্রাণের পরিচয় পেয়ে সখীরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে তার হাসিভরা মুখ আর জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌ত। মানসী হয়ত মুখ ফুটে বলেই ফেল্‌ত, "সই, তোর হৃদয়টা কি পাষাণ?" সই বল্‌ত, "না, টাট্‌কা রক্ত আর কোমল মাংসের।"

মানুষের চোখের আড়ালে এলেই সুনন্দার মুখের হাসিটুকু অস্ত যেত। হাসিটা ছিল তার পোষাকী অলঙ্কার। লোকসমাজে তার অমন অলঙ্কারখানি বাদ দিয়ে যাওয়া তার পক্ষে দুষ্কর; কিন্তু নিজের একলার রাজ্যে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই বাইরের সজ্জা আপনা থেকেই খসে পড়ত।

নদীর ঘাটের উপরেই ছিল শিবমন্দির। মন্দিরের চূড়া আলো করে ভোরের বেলা সূর্য্য উঠ্‌তে যেমন কোনো দিন ভুল হ'ত না, সন্ধ্যায় আমবাগানের পশ্চিমে আকাশ রাঙা করে সূর্য্য অস্ত যেতেও যেমন ভুল হত না, তেমনি প্রতিসন্ধ্যায় মন্দিরের আরতির সময় চওড়া ঢালা জরিপাড়ের ধপধপে শাদা একখানা কাপড় পরে, জরির আঁচলখানা গলায় দিয়ে বিগ্রহের সাম্‌নে জোড় হাত করে দাঁড়াতেও সুনন্দার কখন ভুল হ'ত না। ঘিয়ের প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো তার রক্তহীন মুখের উপর পড়ে তাকে আরো রক্তহীন দেখাত। মনে হত কে যেন সযত্নে মোম দিয়ে একটি ভক্তিমতী পূজারিণীর প্রতিমা গড়ে রেখে গেছে। মন্দিরের যে দরজা দিয়ে শুক্লপক্ষের দিনে শ্বেত-পাথরের মেজের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়ত, তারই উল্টো দিকের দরজার সামনে সেইদিকে মুখ করে সে প্রতিদিন ঠিক একটি জায়গাতেই এসে দাঁড়াত। আরতির শেষে জ্যোৎস্নার আলোর মধ্যে রূপোলি জরির আঁচল গলায় দিয়ে সে যখন বিগ্রহের আসনের তলে তার ক্ষীণ গৌর তনুখানি নত করে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করত, তখন মনে হত যেন একঝাড় রজনীগন্ধা ফুল ডাল-সুদ্ধ তুষার-স্তূপের উপর নুয়ে পড়েছে। তখন তার সে শুভ্র নিষ্কলঙ্ক দেহে এককণা ধূলা লাগলেও বোধ হয় লোকের চোখে সইত না। এই পৃথিবীর ধূলিতেই যে তার জন্ম, এই পৃথিবীর শ্মশানের কোলেই যে তার শেষ শয্যা, তা তখন কে বল্‌বে? দেবলোকের কোনো ঋষির গলার পারিজাতমালা যেন কোন্ ক্ষ্যাপা হাওয়ার টানে এই দেবমন্দিরে খসে পড়েছে।

ঝড় বৃষ্টি, বজ্রপাত, অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার, আরতির সময় সুনন্দার কাছে সবই সমান। সেই এক বেশে এক পথে রোজ এসে সেই একটি জায়গাতে সে দাঁড়াবেই। পূজার শেষে পূজার নির্ম্মাল্যেরই মত সে নিজেকে শুচি মনে করত। তখন আনন্দে তার ম্লান মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। চোখের জলও উপচে পড়তে চাইত, কিন্তু কাজল কালো পক্ষ্মজালের মধ্যেই সে জল মিলিয়ে যেত। কোনো মানুষ বোধ হয় কখনও তার চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখে নি। লোকের চোখে তার অশ্রুধারা হাসি হয়েই দেখা দিত। চোখের সমস্ত জল সিঞ্চন করে সে এই হাসির ফসল ফলিয়েছিল।

২

সুনন্দার শোবার ঘরে তার শিয়রের কাছে ছোট একটি শ্বেত-পাথরের বাক্সের মধ্যে কয়েকটি জিনিষ ছিল। সবকটিই ছোটখাট জিনিষ, একটি একটু বড় ছিল, সেটা একখানা চিঠি। চিঠিখানা কিন্তু সুনন্দার হাতেরই লেখা। সেই নিজের হাতের লিখনখানার উপরেই তার সবচেয়ে বেশী টান। সেখানা সে কাকে লিখেছিল বলা যায় না। কারণ লিপির মাথায় কোনো সম্বোধনই ছিল না। ভিতরে তার আসল লোকটির নামের খোঁজ মেলে না। তবে চিঠিখানা যে লিখেছিল তার খোঁজ যেটুকু মেলে সেটাও নেহাৎ ফেলে দেবার মত নয়।—

—মানুষের যেটা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন, তার ভাগ সে প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারে না। দিতে গেলেই যে কমে যাবে। তাই আমার দুঃখিনীর ধন যে দুঃখ তার ভাগও আমি আর কাউকে দিতে চাই না। আর কিছু আঁকড়ে ধরবার মত, সারাজীবন যত্নে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার মত ত আমার নেই; দুঃখও যদি না থাকত, আমি বাঁচতাম কার মুখ চেয়ে? কিন্তু যেদিন আমার শেষ হবে, মনে করেছিলাম, সেদিন তোমার হাতে আমার এ একলার ধন তুলে দিয়ে যাব। এ যে একান্ত আমারই। আর কাউকে কি আমি এর সন্ধান বলে দিতে পারি? এ ত বাইরে প্রকাশ করবার নয়। আমার দেবতা যে নিভৃতে এসে আমার বুকের মাঝখানটিতে এ অমূল্য নিধি রেখে গিয়েছেন। বাইরে ত তিনি তার কোনো চিহ্ন রেখে যান-নি। দেবতার উপর হাত চালিয়ে আমি কোন্ সাহসে জগতের কাছে তার সন্ধান বলে দেবো? কৃপণের ধন যেমন পৃথিবীর মাটির মাঝখানে কঠিন হয়ে লুকিয়ে থাকে কিন্তু উপরে তার চির-হরিৎ বসুন্ধরার ঘাসের আস্তরণ কোমল অঙ্গ মেলে থাকে, আমার এ বুকভরা কঠিন দুঃখের উপরেও তেমনি করেই আমার মুখভরা হাসি ফুটে আছে।

আমার মুখে তুমি চিরদিন হাসিই দেখে এসেছ, তাই ভয় হয় হয়ত এ কান্নার ইতিহাস তুমি বিশ্বাস করবে না।

শিশু যেদিন প্রথম পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে, সেদিন সে আনন্দের মাঝখানেই জেগে ওঠে। আমার সে প্রথম জাগরণের দিনেও কিন্তু কেউ আমাকে আনন্দে বরণ করে নেয়নি। যার কোলে আমি এসে পড়েছিলাম শুধু সেই আমায় কোল দিয়েছিল, কিন্তু তাও চোখের জলে ভেসে। সেই মায়ের কোলই ছিল আমার সমস্ত জগৎ। ওই একটি বন্ধনই আমায় সংসারের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। শিশুর বন্ধু জগতে অসংখ্য। রক্তের বাঁধন যাদের সঙ্গে তারা ত আছেই, আবার আনন্দের ভিতর দিয়েও বিশ্ব তার কাছে নানান রূপে ধরা দেয়। শিশু-সম্রাটের কাছে স্বেচ্ছায় দাস-খত লিখে দিতে সবাই পাগল। যাকে শিশু তার কচি আঙুলের কঠিন বাঁধনে না বাঁধে, তার দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে না। কিন্তু সেই জন্মমুহূর্ত থেকেই বিধাতা সেই শিশু আমির উপর বাম। রক্তের বাঁধন আমার কার সঙ্গে ছিল জানতাম না, তবে আনন্দে আমার কাছে কোনো মানুষ ধরা দেয়নি। বিশ্ব আমার কাছে নীরব প্রকৃতির বেশেই ছিল। মানুষের প্রাণের উচ্ছ্বাস তার মধ্যে এক কণাও ছিল না।

ছেলেবেলায় আপন বলে মেনেছিলাম এমন একটিমাত্র মুখ আমার মনে পড়ে, সে আমার মায়ের মুখ। তখনকার দিনে ঘটনা ত কিছু আমার জীবনে ঘটেনি, খেলার সাথীও কেউ ছিল না যে তার সঙ্গে কোনো স্মৃতি জড়িয়ে থাকবে। তাই সবই ছায়ার মত অস্পষ্ট।

প্রথম যে ঘটনার স্মৃতি আমার মনের মধ্যে পরিষ্কার করে আঁকা আছে, সে একটা কান্নার স্মৃতি। ছবির মত মনে পড়ে আমি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি আর মায়ের দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অবিশ্রাম জল পড়ে যাচ্ছে। চোখের জলে ভেজা মায়ের সুন্দর মুখখানি শিশির-ভেজা পদ্মের মত আমার চোখের উপর এখনও ভাস্‌ছে। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটি বৃদ্ধ। মাথার থোকা থোকা কোঁকড়া চুল তাঁর একেবারেই শাদা। সমুদ্রের ফেনার মত সেই চুলের রাশ তাঁর শান্ত করুণ মুখখানিকে ঘিরে আছে। মা তাঁকে বল্লেন, "দুঃখিনীর এই মেয়েটিকে আপনাকে দিতে এসেছি। এটুকু কাছে রাখবারও আমার উপায় নেই।" তিনি হাত বাড়িয়ে আমায় কোলে নিতে গেলেন; আমি মায়ের গলা আরো জোরে চেপে জড়িয়ে ধরলাম। মায়ের চোখের জল আমার মাথার উপর ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। জগৎ বলে আমি আমার মাকেই জানতাম। সেই আমার জগৎ, আমার বিশ্ব যে আমায় চোখের জলে বিদায় দিতে এসেছে, তা ওই তরুণ বয়সেই আমি

বুঝেছিলাম। জন্মে অবধি যে অভাগিনী মা ছাড়া আর কারো কোলে যায়নি, আজ তাকে আদর করে কেউ বুকে তুলে নিতে এলে ত তার সংশয় হবেই। তার উপর আবার মায়ের চোখে জল। আমি সেই কান্না দেখেই কান্না সুরু করে দিলাম। খুব যে কিছু বুঝেছিলাম, তা বল্‌তে পারি না। সেই অশ্রুনাট্যের অভিনয় যে কতক্ষণ ধরে চলেছিল, তা আজ আর ভাল করে মনে পড়ে না, কিন্তু যখন সেই করুণ কোমল পুরুষ তাঁর নিষ্ঠুর হাতে আমাকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিলেন, তখন আকাশ অন্ধকার, পথে পথিকের চলাচলও বন্ধ। অশ্রুমুখী মা আমার তখনি ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, ভয় হয়েছিল বোধ হয়, পাছে আমার লোভ এড়াতে না পেরে আবার আমার ক্ষুদ্র বাহুর ডোরে বাঁধা পড়ে যেতে হয়। সেইখান থেকেই ঘাড় ফিরিয়ে আমায় কি একটা আশীর্ব্বাদ করে মা চিরবিদায় নিলেন। সেই আমার মাকে শেষ দেখা। তাঁর পরিচয় আমি জানি না, তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদ-বাণীও আমার মনে নেই। মনে আছে কেবল তাঁর শেষ দান যা তাঁর আশীর্ব্বাদ-রূপে বিদায়ের দিনে আমার মাথার উপর শত ধারে ঝরে পড়েছিল। বিশ্বে আমার আপনার বলতে যে একজন ছিল, সেও আমায় দিয়ে গেল শুধু অশ্রুজল। তাই মাথা পেতে সেই দান নিয়েই আমি আমার জীবন-যাত্রা সুরু করলাম। সেইদিন থেকে অল্পে অল্পে আমার হৃদয়ের গোপন কক্ষটিতে আমার এই অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করে আসছি। মূলধন আমার মায়ের দান।

বুকভরা অভিমান নিয়ে আমি জন্মেছিলাম, কিন্তু অভিমান করবার লোক ত আমার কেউ ছিল না। যে ছিল সে ত শুকতারার মত ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই মিলিয়ে গেল। দীর্ঘ দিনটা পড়ে রইল শুধু আমার জন্যে। তাই আমি আমার ভাগ্যের উপর, দুঃখের উপর আর আমার ভাগ্যদেবতার উপরই অভিমান করলাম। ভগবান আমাকে কাঁদতেই সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর বিধানকেও উল্টে তবে ছাড়লাম। সেই যেদিন অচেনা সেই নিষ্ঠুর হিতৈষী আমাকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে এনে এই জগৎ-সংসারের মাঝখানে লোক-সমুদ্রে অসহায়ভাবে ফেলে দিলে, সেদিন থেকে আমি আর কাঁদিনি।

প্রথম কদিন সেই অজানা পুরীর একটি লোকের সঙ্গেও আমি কথা বলিনি। সেদিন রাত্রে আমার অভিভাবক আমায় যে খাটের উপর শুইয়ে রেখে গিয়েছিলেন, সেই খাট আঁকড়ে ধরেই আমি কদিন পড়ে রইলাম। নাইতে খেতেও আমি সহজে উঠতাম না। বৃদ্ধ আদর করে নিজের হাতে তুলে আমায় খাইয়ে দিতে এলেও আমি মুখ খুলতাম না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট এমন জোরে চেপে ধরে থাক্‌তাম যে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে আসত, তবু আমার জেদ ছাড়তাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃদ্ধ ভাতের থালা কোলে করে ম্লান মুখে বসেই আছেন। আমার জেদের জন্যে কত বেলা বোধ হয় তাঁর মুখেও দুটি অন্ন ওঠেনি। আমার মানভঞ্জনের জন্যে রাশি-রাশি খেলনা এসে বিছানায় জড়ো হতে লাগল; বাগানের ফুলের গাছে একটি কুঁড়ি অবধি বাকি রইল না, সবই আমার ঘরে। তারপর ঘুসের লোভে পাড়ার যত খোকাখুকীও এসে জুট্‌তে লাগল। চিরকাল ওদের সঙ্গ-থেকে বঞ্চিত বলে ওদের উপরেই আমার সবচেয়ে লোভ ছিল। এত সাধ্যসাধনাতেও বৃদ্ধ আমার মুখে যে হাসিটি ফোটাতে পারেননি, এই তরুণ মানবকদের সাহায্য নিতেই সে হাসি আপনা হতেই ফুটে উঠল। তারপর ক্রমে এই নূতন ঘরই আমার চিরপুরাতন হয়ে উঠল। শান্তমূর্ত্তি সেই অজানা বৃদ্ধকে আমি দাদামশায় বলে ডাক্‌তে সুরু করে দিলাম। নানান সম্পর্ক পাতিয়ে অতিদুঃখের মাঝখানে একটু সুখের হাওয়া এনে ফেললাম। দাদামশায়ই আমার নাম রেখেছিলেন সুনন্দা। তার আগে কি নাম ছিল তা জানি না।

আরো দুচার বছর পরে দাদামশায়ের কাছে আমি পুজো করতে শিখলাম। ওতেই আমার

ছিল সবচেয়ে আনন্দ। দাদামশায় বলেছিলেন, ঠাকুরের কাছে সব দুঃখ নিবেদন করা যায়, সব কান্না কাঁদা যায়, সব কিছু চাওয়া যায়। মানুষকে কিছু দিতে হ'লে এক তিনিই পারেন। অতিবড় দুঃখও তাঁর আশীর্ব্বাদে সয়ে যায়। কথাগুলো আমার খুব মনে ধরেছিল। রোজ সন্ধ্যায় ঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়ে আমি আমার মনের সকল কথা নিঃশেষে তাঁর চরণে অঞ্জলি দিয়ে আসতাম। মানুষের কাছে আমার মুখ ত অনেক দিনই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা সব ছিল আমার পর; তাই আমার বাইরের জিনিষ হাসিটুকু শুধু তাদের জন্যে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার অন্তর জুড়ে যে কান্না ছিল, সে ত পরের কাছে কাঁদা যায় না, তাই আমার যে আপনার সেই ঠাকুরের কাছেই আমি আমার হাসির ঘোমটা খুলে ফেলে নিজের আসল রূপে দেখা দিতাম। দাদামশায়ের ঘরে আমার আদরের অভাব ছিল না, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার যে একটা বিশেষ প্রভেদ ছিল, সেটা আমি সেখানেও অনুক্ষণ পদেপদে অনুভব করতাম। তিনি আমায় নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মাঘের রাত্রেও যদি কোনো দিন খাওয়ার কি পূজার আগে আমায় ছুঁতে হয়েছে, তা হ'লেই স্নান না করে নিস্তার নেই। আমি পাছে মনে একটুকু ব্যথা পাই, কি সামান্য কিছু সন্দেহ করি, তাই আমার সম্বন্ধে সমস্ত আচার-বিচারে দাদামশায় আমাকে খুব লুকিয়ে চল্‌তেন। কিন্তু আনন্দ যার চোখের পর্দ্দা হয়ে আড়াল করে নেই, তার চোখ এড়াবে কার সাধ্য। দাদামশায় ধরা পড়ে গেলে মুখ তাঁর শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যেত, চোরের মত পালিয়ে বেড়াতেন পাছে আমি তাঁর এ ভীষণ অপরাধের কোনো কৈফিয়ৎ চেয়ে বসি। কিন্তু তিনি জানতেন না যে আমার ঠাকুর লোকের কাছে চাইবার কি বলবার জন্যে আমার আর কিছু রাখেননি। আমার যা কিছু নালিশ সব সেই একজনেরই চরণে। আসামী দাদামশায়কে আমিই এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে মুক্তি দিতাম। তাঁর কিন্তু আমার দিকে চোখ তুলে চাইতে অনেক দেরি হ'ত। পাড়ার লোকে অনেক সময় এসে দেখত আমি দাদামশায়ের তুষার-শুভ্র চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে কত-রকম হাসি গল্প করছি। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কেউ কেউ জিগেষ করত, "ঠাকুর, উমা মা কি আপনার ঘরে এসে বাঁধা পড়ে গেছেন?" কথা শুনে দাদামশায়ের মুখ শাদা হয়ে যেত, তিনি আমার কি যে পরিচয় দেবেন ভেবে কূল পেতেন না। আমি হেসে বলতাম, "আমি দাদামশায়ের কুড়োনো নাতনী, উমাও না, রমাও না।" দাদামশায় ক্ষীণ হাসি হেসে ঘাড় নাড়তেন, মুখ দিয়ে কথা বেরোত না।

বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে দাদামশায়ের ক্ষীণ দেহ আরো ক্ষীণ হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। একদিন মাঘের শেষে শুন্‌লাম, এখানে থাকা আর আমাদের চল্‌বে না। শেষ বয়সে দাদামশায় মাধবপুরে দেশের মাটিতে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতে চান। মাধবপুরের আমবাগানে বসন্তের দূত আম্রমঞ্জরীর আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে বাগানের মাঝখানের লালবাড়ীখানাতে আমাদেরও উদিত হতে হ'ল। শ্মশানপুরীর মত শূন্য সেই নির্জন বাড়ীর চারধারে লোকজনের চিহ্নও পাওয়া যায় না। শুনেছি এককালে ঐ বাড়ীতেই লোক ধরত না। উৎসবে আনন্দে সারা বছরের মধ্যে বাড়ীখানা একদিন বিশ্রাম পেত কি না সন্দেহ। অন্দর-মহল, বৈঠকখানা, নাটমন্দির, দেবালয়, কিছুরই অভাব নেই; কিন্তু সবই এখন শূন্য। আছে কেবল দেবালয়ের নিত্য পূজার পাট। লক্ষ্মী যেদিন সামান্য কোন্ অছিলায় দাদামশায়ের প্রতি প্রথম বাম হন, সেদিন থেকে একে-একে সবাই তাঁর প্রতি বাম হ'তে সুরু করলে। শুনেছি ষষ্ঠীর কৃপা তাঁর উপর অফুরন্ত ছিল, কিন্তু শেষকালে একটি মাত্র পৌত্র না দৌহিত্রতে গিয়ে ঠেক্‌ল। তার মায়াও কাটাবেন বলেই তিনি দেশের ঘরবাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মরণ যখন ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর বংশের শ্মশান তাঁকেও নিজের কোলে ডাক দিলে। দাদামশায় বাড়ী ফেরবার

দিনে বল্লেন, "যে মাটিতে একে-একে বুকের সব ক'খানি হাড় বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি, এ ভাঙা পিঁজরাখানা আর তার কাছ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে কি সুখ পাব? যাই, তবু তাদের শ্মশানে মরেও যদি জুড়োতে পারি।" যে মরণের লোভে এখানে এসেছিলেন, সে মরণ ত আসতে ভোলেনি, কিন্তু হাড় তাঁর জুড়িয়েছে কি না কে জানে!

এই শ্মশানপুরীর সেই প্রদীপ তোমায় যেদিন প্রথম দেখি, সে অনেক দিনের কথা। তোমার কি মনে আছে? তোমাদের বাড়ীর ঘাট যখন বাঁধানো হয়েছিল, তখন বোধ হয় নদীর গতি অন্য-রকম ছিল। তার পর কতকাল গেছে, নদীর মুখ ফিরে গেছে, কিন্তু পাথরে-বাঁধা ঘাট সেই তার চির-পুরাতন কোণটিতেই অচল হয়ে আছে। জল সরে যাওয়াতে ঘাটের শেষ সিঁড়ির পরেও অনেকখানি পায়ে-হাঁটা পথ সাপের মত এঁকে-বেঁকে নদীর ভিতর গিয়ে পড়েছে। তার উপরে ত্রিভঙ্গ হয়ে একটা বড় বটগাছ নদীর উপর ঝুঁকে পড়ে কালো জলের বুকে কতকাল ধরে নিজের ছায়াই দেখে আসছে। নদী আদর করে তার পা ধুইয়ে ধুইয়ে সমস্ত ধূলামাটি নিজের অঙ্গে তুলে নিয়ে শুধু অসংখ্য শিকড়ে বোনা হাড়-পাঁজরের মত কাঠামোখানা রেখেছে। আদরের ঘটা বেশী বাড়লে হয়ত তাকে একদিন সশরীরেই নদীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই বটগাছের তলায় দুখানা বড় পাথর জোড়া দিয়ে এখানকার ঘাট। সেদিন খুব ভোরে, নদীর জল তখনও উষার আলোয় রাঙা হয়ে ওঠেনি, ধূসর অঙ্গ মেলে দিয়ে তরুণ অরুণের প্রথম চুম্বনে সিঁদুর হয়ে ওঠবার অপেক্ষা করছে; আমবাগানে দোয়েল পাপিয়া সেই সবে সূর্য্যদেবকে ডাকাডাকি সুরু করেছে; এমন সময় আমি ঘর ছেড়ে নদীর ঘাটের সেই পাথরের উপর গিয়ে বসেছিলাম। ভাবছিলাম আমার ভাগ্যের কথা; ত্রিকুলে কেউ আছে কি না জানি না বলেই কপালগুণে যার ঘরে এসে পড়েছি, তারও ঘরে দুদিন পরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাবার লোক জুটবে কি না বলা ভার। হাত দিয়ে নদীর জল কাটতে কাটতে এমনি কত কি ভাবছিলাম, পায়ের শব্দে চোখ তুলে হঠাৎ চাইতেই দেখি তরুণ ব্রহ্মচারীর মত দীপ্তমূর্ত্তি তুমি সেই পায়ে-হাঁটা পথে নদীর দিকে এগিয়ে আসছ। উষার আলো চোখে পড়বার আগেই তোমার সঙ্গে সেই আমার প্রথম শুভদৃষ্টি। জানি না সে কি অশুভক্ষণে ঘটেছিল!

তার পর যখন জানলাম, এ বাড়ীতে নবীন আর প্রবীণ বলতে তুমি আর দাদামশায় এই দুটিমাত্র আমার পাবার মত সঙ্গী, তখন প্রবীণকে বাদ দিয়ে আমি তোমাকেই বেছে নিলাম, তুমিও আমাকেই বেছে নিলে। তোমার সঙ্গ পেয়ে আমার চিরদিনের বাইরের হাসি ক'দিনের জন্যে অন্তরের হয়ে উঠে আমার ভিতর-বাহির আলোয় আলো করে দিলে। সে কদিনের জন্যে আমার সব দুঃখ আমি বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম; মনের কোনো কোণে এতটুকু দুঃখও মুখ আঁধার করে ছিল না। ঘাটে, পথে, মাঠে দিনগুলো যে কেমন করে কেটে গেল, তা আমি একবার টেরও পেলাম না। এখন শুধু মনে হয়, কোন্ সুদূর অতীতে স্বপ্নের ঘোরে তারা দেখা দিয়েছিল, আবার চোখ না মেলতেই সোনার পাখা মেলে নিঃশব্দে কখন্ আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেছে। স্মৃতি হয়ে পড়ে আছে শুধু তাদের ডানাখসা একটি পালক।

আমি চোখ বুজে আমার এতদিনের দুঃখের শোধ বোধহয় সেই কদিনেই তুলে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অত মূর্চ্ছনা সে সোনার তারে সইবে কেন? তার একদিন ছিঁড়ে গেল, আমার আনন্দ-গানও সেই থেকে থেমে গেছে।

আমাদের ছেলে-খেলার দিনগুলো হাসি আর গানে যখন ভরপুর হয়ে উঠেছে, তখন ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটার এক কোণে দাদামশায় তাঁর শেষ শয্যায়। সারাদিনটাই নিজের আনন্দ নিয়ে কাটিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় আমি রোজ দুবার তাঁর ঘরে খোঁজ নিতে যেতাম। আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে দাদামশায়ের শান্ত দৃষ্টি কেমন যেন করুণ হয়ে আসত, তিনি তাঁর দুর্ব্বল

হাতখানি তুলে আমার মুখে চোখে মাথায় এমন স্নেহভরে বুলিয়ে দিতেন, যেন আমার দেহের সমস্ত গ্লানি তাঁর হাতের স্পর্শে দূর হয়ে যাবে। আমি জানতাম, পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার দিনে পরপারের কথার চেয়ে তিনি তাঁর আশ্রিতা দুঃখিনীর কথাই বেশী ভাবেন। এই বয়সে দরিদ্রার এই অসহায় অনাথা মেয়েটিকে কার কাছে ফেলে যাবেন, সেই ভাবনাতেই তাঁর আয়ু যেন আরো শীঘ্র শেষ হয়ে আসছিল। আমি জানতাম, আমার নীচকুলে জন্ম, দাদামশায়ের মত উদার মহৎ পুরুষও যখন খাবার আগে আমায় ছুঁলে স্নান করতেন, তখন আর-কোনো ভদ্রলোক ত আমায় ঘরে ঠাঁইও দেবে না। কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলনের সে কটা দিন আমার ওসব কথা ভাববারও অবসর ছিল না। দাদামশায় কত সময় আমাকে কাছে টেনে বসিয়ে কি যেন একটা কথা বলবার ব্যর্থ প্রয়াস করতেন, তাঁর চোখে সে কথা প্রায় ফুটে উঠত, আমার কাছে—তাঁর এই আশ্রিতার কাছেই তাঁর যেন কি একটা নিবেদন আছে মনে হ'ত, কিন্তু আমার তখন সে বৃদ্ধের চোখের কান্নার ভাষা পড়ার সময়ও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না; তোমার তরুণ চোখে যে নিত্য নূতন ভাষা শতদল-পদ্মের মত হাজার কথা ফুটিয়ে তুল্‌ত, আমার সমস্ত মন তখন সেই দিকে। হেসে দুটো কথা বলে, মাথার বালিশ কটা গুছিয়ে দিয়ে, বিছানার চাদরটা একটু ঝেড়ে দিয়ে, আমি যখন ক্ষিপ্রগতিতে কত ঘর বারান্দা পার হয়ে নিজের মনে চলে যেতাম, তখন আমার পিছনে যে কত দীর্ঘশ্বাস শূন্যে মিলিয়ে যেত, তার ঠিকানা নেই। আজ চোখে না দেখেও সে সমস্তই আমার চোখে পরিষ্কার ভেসে উঠ্‌ছে, কিন্তু সেদিন চোখে আঙুল দিলেও চেয়ে দেখ্‌তাম না বোধ হয়।

সেই যে একদিন পদ্মবনের ধারে ঘাসের উপর বসে তোমাতে আমাতে প্রকাণ্ড পদ্মফুলের মালা গেঁথেছিলাম, সেদিনকার কথা তোমার মনে আছে কি? একই সুতোর দুই মুখ দিয়ে দুজনে ফুল পরিয়ে পরিয়ে মালাটা বড় করে তুল্‌ছিলাম; পাছে দুজনের ফুল মিশে যায় বলে মাঝখানে একটা বড় ফোটাফুল দুলিয়ে দিয়েছিলাম। দাদামশায় পদ্মফুল বড় ভালবাসতেন, তাই আমি মালাটা নিয়ে তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি মুখ ফিরিয়ে শুয়ে ছিলেন। আমি ডেকে বল্লাম, ''দেখ দাদামশায়, কত বড় মালা, এই দেখ, পরলে আমার পা পর্য্যন্ত পড়ে।''

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, ''পদ্মের আড়ালে যে লুকিয়ে গেলিরে! একেবারে দেবী সরস্বতী! এত ফুল কে দিলে?''

''তোমার নাতি শঙ্করপ্রসাদ।''

মনে হ'ল দাদামশায়ের রক্তহীন মুখ যেন আরো একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু তিনি হেসে বল্লেন, ''সুনন্দা দিদি, তোমরা যে হেসে খেলেই দিনগুলো শেষ করলে দেখছি। তা প্রতিদিনই সকাল সন্ধ্যে এত হাসি খেলা কি ভাল? এর পর, বড় হচ্ছ, আরো কত ভাবনা চিন্তা আছে, সুখ দুঃখ আছে, সেদিকেও ত চাইতে হবে? পৃথিবীটা ত শুধু হাসি দিয়ে গড়া নয়; কাঁদবার জিনিষেরও সেখানে অভাব নেই। হেসেই যদি দিন কাটে, তবে কান্নার দিনে দুঃখ বড় কঠিনরূপে দেখা দেবে। বেদনার সে আঘাত সইতে পারবে কি না বলা শক্ত। তা' দিদি তোমায় দেখে কথাগুলো মনে হ'ল তাই বল্লাম। ঠাকুর করুন, তোমার যেন দুঃখের দিন না আসে। তবু প্রস্তুত হওয়া ভাল।''

আমি ফুলের মালাটা দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে চলে এলাম। বুঝলাম আমাদের প্রতি-অঙ্গই তাঁর কাছে আমাদের আনন্দ-উৎসবের কথা জানিয়ে দিয়েছে। তাঁর কোণের ঘরটিতেও আমাদের হাসির ঢেউ বাতাসের সঙ্গে ভেসে গিয়েছে। কিন্তু সে হাসি আনন্দ তাঁকে সুখ দেয়নি, বেদনাই দিয়েছে। তাঁর হৃদয়ের কোনো গোপন দুঃখ আমাদের হাসির ঘায়ে আবার জেগে উঠেছে। আমিই কি সে দুঃখের কারণ?

সেদিন আর কারুর সঙ্গে কথা কইনি। নদীর ধারের পাথরের বারান্দায় একলাটি মুখ আঁধার করে বসে রইলাম। কেবলি মনে হচ্ছিল, কি একটা কঠিন দুঃখের অগ্রদূত আজ দেখা দিয়েছে। আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌ছিল। কি সে দুঃখ, যা আমার মাথার উপর উদ্যত হয়ে আছে? কিসের জন্যে প্রস্তুত হব? একবার মনে হ'ল তুমি বুঝি আমার নামে কোনো কথা দাদামশায়ের কাছে বলেছ। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লাম, আমি ত কখনো তোমার কাছে কোনো অপরাধ করিনি। তবে কি? দাদামশায়ের কাছেও ত কোনো দোষ হয়নি। তবে বুঝি আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে! সেই খবরটা আমাকে দেবার জন্যে দাদামশায় অত করে আমায় প্রস্তুত কর্‌ছিলেন। সেই কোন্ শিশুকালে মাকে দেখেছি; মায়ের সেই অশ্রুসজল মুখ মনে পড়ল, কিন্তু আজ ত সেই সে-দিনের মত দুই চোখ বেয়ে জল নেমে এল না। আমার আর আপনার বলতে কেউ নেই মনে করে দুঃখ হ'ল বটে, কিন্তু সেটা আগে ভেবে-চিন্তে দেখ্‌বার পর। যে-দিন চোখের জলে মাকে বিদায় দিয়েছিলাম, সে দিনকার কথা মনে পড়ল। মা ত আমাকে লোককে দিয়ে দিয়েছে, সে মায়ের জন্যে কাঁদতে যাব কেন? কেন, গরীবের ঘরে কি আমার এক মুঠো অন্নও জুট্‌ত না? যার যা খুসী হোক, আমি কিছুতেই কাঁদব না। শক্ত হয়ে বসে আমি দাদামশায়ের ভয়-দেখানো কথাগুলো মন থেকে দূর করে দিলাম।

তার পরদিন থেকেই আমাদের অজস্র আনন্দের স্রোতে মন্দা পড়ে গেল। আমিই সব-তাতে গা-ঢিলে দিতে সুরু করলাম। যেন এককোণে বসে আপন মনে কাজকর্ম্ম করাই আমার চিরদিনের অভ্যাস, এমনি ভাবে খুঁটিনাটি যা' তা' নিয়ে সারা দিন কাটিয়ে দিতাম। তুমি আমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে ফিরে যেতে; কখনো যদি বা কিছু বলতে, আমি এক মুখ হেসেই উত্তর দিতাম; কিন্তু আগের মত তেমন সহজ আনন্দের উচ্ছ্বাস আর রইল না।

কদিন ধরে আমার ব্যবহার লক্ষ্য করে যেদিন সকাল-বেলা তুমি গিয়ে সারা সকালটাই দাদামশায়ের ঘরে কাটিয়ে এলে, সে-দিন তুমিই বা তাঁকে কি বলেছিলে আর তিনিই বা তোমাকে কি বলেছিলেন, তা' আমি জানি না; কিন্তু সারাদিন বাড়ীতে বই হাতে করে বসে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা যেই তুমি বেরিয়ে গেলে অমনি দাদামশায়ের ঘরে আমার ডাক পড়ল। দাদামশায় বল্লেন, "দিদি সুনন্দা, আমার ত দিন ফুরোলো। এখন যাবার আগে তোমার আর শঙ্করের কাছে আমার যা' বলবার আছে, তা' বলে যেতে হবে ত। তাই দিন থাক্‌তে আজই তোমায় ডাকলাম। তাকে যা বলবার আমি বলে নিয়েছি। আর সে পুরুষ মানুষ তার জন্যে আমার ভাবনা কি? বিয়ে করে ঘর সংসার পাতবে, যেমন করে হোক দিনগুলো কেটে যাবে। তোমার জন্যেই যা ভাবনা।" দাদামশায় আমার মুখের দিকে তাকালেন। তোমার বিয়ের কথা আগে কোনো দিন ভেবে দেখিনি, প্রথম কথাটা শুনে আমার মুখ শুকিয়ে গেল; আমি মুখটা নীচু করে পাশ ফিরে বস্‌লাম। দাদামশায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না।

তিনি আবার বল্‌তে লাগলেন, "দেখ দিদি, তোমায় আমি যে কতখানি ভালবাসি তা' তুমি বুঝবে না। আমার শঙ্করের চেয়ে কম হবে না। যে-দিন এ ঘর দোর শ্মশান করে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলাম, সেদিন মনে করেছিলাম যে-কটা দিন আছি ভাল আর কাউকে বাস্‌ছি না। ওর মত দুঃখ জগতে আর কিছুতে দেয় না। কিন্তু তোর মুখখানা দেখে আমার সব প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল। ভগবান শূন্য মন ফেলে রাখেন না; কাউকে না কাউকে তার মাঝখানে আসন দেনই। তাই সেদিন থেকে আমার বুক জুড়ে তোর মুখখানা জেগে রইল। শঙ্কর মামাবাড়ী ছিল, তাকে আমি ইচ্ছে করেই কাছে নিইনি; কিন্তু ফাঁকি দিয়ে যাব কোথায়? তুই এসে তার ঠাঁই জুড়ে বস্‌লি। সেদিন থেকে প্রাণ দিয়ে কেমন করে তোকে হাতে করে গড়ে তুলেছি, কত দুঃখ পেয়েও তোকে ছাড়িনি, তা ত তুই জানিস্ দিদি। দুঃখের একটি আঁচড় তোর গায়ে লাগতে দিইনি, পাপের ধূলিকণাও পায়ে ঠেক্‌তে দিইনি। বুক দিয়ে সব থেকে তোকে আমি বাঁচিয়ে

এনেছি। কিন্তু হলে কি হয় দিদি, আজ যাবার আগে অতি কঠিন আঘাত আমাকেই তোর প্রাণে দিতে হবে নইলে যে উপায় নেই। আর কোনো পথ ভেবে পেলাম না। এতদিন যে বোঝা আমি বয়েছি, আজ তোর কোমল অঙ্গে তার ভার তুলে দিতে হবে।'' দাদামশায়ের কথা শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছিল। আমি একবারও না নড়ে নিঃঝুম হয়ে সেইখানেই বসে রইলাম।

তার পর যা শুন্‌লাম, সে বড় কঠিন কথা। শুন্‌লাম আমার অজানা পাপের ইতিহাস। পাপ কাকে বলে তা আমি জানতাম না; কিন্তু শুন্‌লাম আমার শরীরের প্রতি বিন্দু রক্তেই পাপ। বুঝলাম, অন্নের অভাবে আমি এঘরে আসিনি, মায়ের সঙ্গের হাত থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্যেই মা আমাকে নিজের হাতে বিসর্জ্জন দিয়েছেন। দাদামশায়ের পুণ্যের জোরে যদি আমার পাপটা ধুয়ে যায় তাই তাঁর হাতে আমাকে সঁপে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাপ ত যায়নি। আমি যে জন্ম-দাগী, আমার দাগ মিলোবে কি করে? কয়লার কালী কি ধুলে যায়?

দাদামশায় বল্লেন, ''দেখ্ দিদি, তোকে আমি বড় ভালবাসি। কিন্তু মানুষের মাটির শরীর কিনা; একটু ছোঁয়া লাগলেই কালী লেগে যায়। তাই তোকে ব্যথা দিয়েও আমি তোর ধরা-ছোঁওয়ার আচার-বিচার করেছি। তোর কাছে ধরা পড়বার ভয়ে আমি চোরের মত পালিয়ে বেড়িয়েছি। আজ যাবার সময় ঘনিয়ে এল, আজ আর আমার লুকিয়ে রাখা সাজে না; তাই সব বলে যাচ্ছি। যে বুড়ো মরণকাল অবধি তোকে আগলে এল, তার একটি অনুরোধ রাখিস্, দিদি। তোর নিজের চোখে এখনো যা ধরা পড়েনি, আমার চোখে অনেক দিনই তা' ধরা পড়েছে। আমার শঙ্কর যে দিনে দিনে তোকেই তার চোখের মণি করে তুলছে তা আমি দেখেছি, আজ সকালে তার প্রমাণও পেয়েছি। সুনন্দা, আমি জানি তোর মনে কোথাও একটু পাপ নেই, গঙ্গাজলের মত তুই নির্ম্মল। কিন্তু মানুষের সমাজে তাতে যে কিছু হয় না ভাই। মানুষ তার মাটির শরীর নিয়ে বড় ভয়ে ভয়ে বাঁচিয়ে চলে। তাই বলছি দিদি, আমার এই একমাথা পাকা চুল ছুঁয়ে তুই বল্, আমার আঁধার ঘরের শেষ রশ্মি শঙ্করকে তুই সমাজের চোখে সমাজের মানুষ হয়েই চলতে দিবি। তুই যদি কঠোর হোস্ তবে তার পুরুষের মন একদিন তোকে ভুলবেই ভুলবে।

''আমার এ ঘর বাড়ী কিছু আমি শঙ্করকে দিয়ে যাব না। সমস্ত তোরই নামে লিখে দিয়েছি। নইলে তুই দাঁড়াবি কোথায়?''

ঘরবাড়ীর কথায় আমার গায়ে যেন কে বিছুটি দিয়ে গেল। তবু কথা কইলাম না; তাঁরই কথামত মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম। কিন্তু যখন করলাম তখন বুঝলাম কতখানি করেছি। আগে একদিনও বুঝিনি।

তিনি আরো বল্লেন, ''দিদি, আশীর্ব্বাদ করছি আর জন্মে তুমি সাবিত্রী হয়ে জন্মো। তোমার এজন্মের তপস্যায় জন্মজন্মান্তরের সমস্ত কালী ধুয়ে যাবে। এজন্মে দেবতা রইলেন তোমার স্বামী, পৃথিবীর পাপ তাঁকে স্পর্শ করে না। সতীলক্ষ্মী হয়ে তাঁর সেবা কোরো। তাঁর চরণপ্রসাদে জন্মান্তরে তুমি তোমার তপস্যার ফল পাবে।''

কঠিন প্রতিজ্ঞা করে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সেই দিন থেকে শঙ্করের জন্য আমার উমার তপস্যার সুরু। এতদিন ছিলাম বালিকা, সেদিন হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে নারীর প্রাণ জেগে উঠ্‌ল। বুঝলাম, না জেনে দিলেও তোমাকেই সব দিয়ে ফেলেছি। সকল-লজ্জা-নিবারণ যিনি তিনিই আমার মুখ রেখেছেন; তাই এ দানের কথা তুমিও জাননি, আমিও জানিনি। তোমায় ভাল বেসেছি বলেই আজ তোমায় ভুলতে হবে। কিন্তু মানুষের মন যেটা ভুলতে চায় সেইটেই যে তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসে। এতদিন যা ছিলে না, তোমার পথ মাড়াব না প্রতিজ্ঞা

করতেই তুমি আমার তাও হয়ে বস্‌লে। সোজা পথে ত মানুষের মন চলে না, অসম্ভবের আশাই তাকে টেনে নিয়ে চলে।

তার পর অল্পে অল্পে আমি তোমার পথ থেকে সরতে সুরু করলাম। হঠাৎ সরলাম না, পাছে তুমি টের পাও। এমনি ভাবেই সরতে লাগলাম, যেন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেখেলার সাধটা ফুরিয়ে যাচ্ছে! তোমার উপর যে আমার একটা টান ছিল, সেটা আমি নিজের কাছেও অস্বীকার করতে সুরু করে দিলাম; যেন খেলারই আনন্দ তোমায় শুধু সঙ্গী নিয়েছিলাম।

আগে তোমার সঙ্গে আমি কখনও বিয়ের কথা বলিনি, আজকাল অহরহ তোমায় বউয়ের কথা বলে ক্ষ্যাপাতে সুরু করে দিলাম। তুমি রাগ করতে, আমি আমার উপর তোমার রাগটা বাড়িয়ে তোলবার জন্যে আরো বল্‌তে থাক্‌তাম। ভাব্‌তাম তুমি আমারই উপর রাগ করেছ। কিন্তু এখন বুঝেছি আমার উপর নয়। সেই পৌষ সংক্রান্তির দিনে তুমি বোধহয় আমায় কি বলবে বলে এসেছিলে। তোমার হাতে একছড়া ফুলের মালা ছিল। হাসিমুখে সেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে তুমি কি বল্‌তে যাবে, অমনি আমি বলে উঠ্‌লাম, "আচ্ছা বোকা যাহোক তুমি, এখন থেকে পরের জন্যে বেগার খেটে মর কেন? যখন একজন আসবে তখন ফুলের মালা জুগিও। বেনা বনে শুধু শুধু মুক্তো ছড়াও কেন?"

তুমি নীরবে ব্যথাভরা চোখ তুলে আমার দিকে চাইলে। তোমার দৃষ্টি যেন বলে গেল, "সুনন্দা, তোমার মুখে এমন কথা!" আমি যেন কিছুই বুঝিনি এমনি ভাবে নেহাৎ খাপছাড়া-রকমের কি একটা পিঠের গল্প জুড়ে দিলাম। কিন্তু তোমায় ঘা দিতে আমার বুকে যে কতখানি লাগত তা ত তুমি বুঝতে না। তুমি মনে করতে আমার পাষাণ-হৃদয়ে কোথাও এক ফোঁটা কোমলতা নেই। কিন্তু সেই পাষাণ ভেদ করেই আমার হৃদয়ে সহস্রধারা ঝরে পড়ত।

সেদিন তোমার কথা বলা হ'ল না। ম্লান মুখে তুমি চলে গেলে। আমি তোমায় শুনিয়ে শুনিয়ে খুব হাসির লহর তুলে ও-পাড়ার মন্দাকে রাজ্যের হাসির খবর দিতে বস্‌লাম। মন্দা শুনেছিল কি না জানি না, কিন্তু তুমি যে শুনেছিলে তা' জানি।

তোমায় ভাল বেসেছিলাম বলেই তোমাকে আমি অত করে ঘা দিতে চেষ্টা করতাম, আমায় নিষ্ঠুর বলে বুঝলেই যে তোমার মঙ্গল। তোমারি মঙ্গলের জন্যে আমি সাধ করে তোমার কাছে খোসনাম হারাতে চাইতাম। নইলে আমার কিসের গরজ।

যে অপমানের বোঝা নিয়ে আমি জন্মেছিলাম, সে অপমান ধ্রুব হ'য়ে আমায় ঘিরেই থাকুক; আর কাউকে সে বোঝা মাথায় নিয়ে মাথা হেঁট কবতে আমি দেবো না। আর তোমায় ত আমি তার এককণা স্পর্শ করতেও দিতে পারব না। তাই এ অপমানিতার কাছ থেকে দূরে রাখবার জন্যই তোমায় আমি অত করে ঘা দিতাম। তোমার নিষ্কলঙ্ক কপালে কলঙ্কের ছাপ দিতে আমি প্রাণ থাক্‌তে পারব না। আমার ভয় হ'ত যদি একবার তোমার কাছে আমার মনের কথাটি ধরা পড়ে যায়, যদি তুমি জান্‌তে পার, তোমাকে আমি কতখানি দিয়ে ফেলেছি, তবে হয়ত শত অপমানের বোঝা মাথায় করেও তুমি আমায় তোমার চিরসঙ্গী করে নেবে। কিন্তু আমি তা হ'তে দেবো না। সকল ধর্ম্ম যাকে ছেড়ে দিয়েছে, যাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়েছে, তোমার সহধর্ম্মিণী হবে সে কিসের স্পর্দ্ধায়?

একবার মনে করেছিলাম, তোমার কথাগুলো শুনে, আমারও যা বলবার আছে বলে নি। আমি যে কিসের দায়ে ঠেকে তোমাকেও বেদনা দিতে পেরেছি তা' জানিয়ে দি। কিন্তু মনে হ'ল আমি যদি তোমাকে এ দুঃখের ভার দি, তবে তোমার দুঃখই বাড়বে; দুঃখ ভোলবার পথ আর হবে না। তাই ভেবেছিলাম, আপনি বিরূপ হয়ে তোমাকেও বিরূপ করব। কিন্তু এখন দেখছি আমিই ভুল বুঝেছিলাম। এর চেয়ে সে দুঃখ ছিল ভাল।

পূজোর সময় সেবার যখন পদ্মবনের ধারে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল, তখনই তোমার চোখে আমাদের সেই পুরানো স্মৃতির কথা ভেসে উঠল। তুমি ভেবেছিলে আমিও তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই সে সব কথা বুঝে ফেলব। কিন্তু আমি একেবারে নূতন মানুষের মতন বল্লাম, "এখানে ত দেখি এবার খুব পদ্মফুল ফুটেছে!"

তুমি বল্লে, "কেন, সেই যেবার তুমি আর আমি একসঙ্গে একটা মালা গেঁথেছিলাম সেবার কি কিছু কম ফুটেছিল?"

আমি বল্লাম, "ওঃ সে কবে ছেলেবেলায় কি হয়েছিল, আমার মনেও পড়ে না।"

তুমি বল্লে, "সে কি, সুনন্দা, এখনো যে বছর ঘোরেনি, এর মধ্যে ভুলে গেলে?"

আমি একটু হেসে বল্লাম, "তা হবে হয়ত, আমার অত খুঁটিনাটি মনে থাকে না।"

তুমি দুঃখিত হয়ে বল্লে, "আমার ওর চেয়েও ঢের খুঁটিনাটি মনে আছে।"

আমি ভালমানুষ সেজে বল্লাম, "আমার ভাই, স্মৃতিশক্তিটা দিন-দিনই যেন কোথায় যাচ্ছে, এর পর তোমার কাছে মনে রাখা শিখতে হবে।"

আজ যদি সাক্ষ্য দিতে পারতাম, তবে কিন্তু দেখিয়ে দিতাম খুঁটিনাটি মনে রাখায় আমি তোমার কত উপরে। মুখে অমন অনেক কথা বল্লেও, বাইরে তোমায় একেবারে এড়িয়ে চল্লেও, তোমার সকল কাজ, সকল অভ্যাস, চলা-ফেরা, কথা বলা, সব আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, আমার সমস্ত দেহমনে তার সাড়া বাজত। তোমাকে ভুল বোঝাবার জন্যে আমি তোমার চলাফেরা দেখেও দেখতাম না; কিন্তু তোমার সমস্ত কাজের সঙ্গে-সঙ্গে আমার কাজকর্ম্ম দিনে দিনে ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিত হয়ে উঠছিল। তোমার সমস্ত কাজের সুবিধা অসুবিধা দেখে আমি যে কেন তার সুব্যবস্থা এতকাল ধরে করে এলাম তা তুমি বুঝলে না। আমার না হয় ভয় ছিল তুমি পাছে ধরে ফেল, তা বলে তুমি কি এমনি অন্ধ হয়ে ছিলে যে এতদিনেও টের পেলে না?

তোমায় জানিয়ে তোমার কাজ করা, কথা শোনা, তোমায় দেখা, আমার যত কমে আসতে লাগল, আড়ালে সেটা ততই বেড়ে উঠল। কখন্ যে কিসের অবসর মিলবে সব আমার নখের আগায় গোনা ছিল। আমি জান্‌তাম, এতে আমার কোনো পাপ নেই, শুধু তৃপ্তি আছে। তোমার অনিষ্ট এতে এক বিন্দু হবে না। আর আমারই বা কেন হবে? তুমিই ত আমার দেবতা; গোপনে দেবতার পূজায় কি পাপ আছে?

মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করতে আমি রোজ ভোরেই যেতাম। তখন আমার সমস্ত সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার কথা তাঁকে জানিয়ে আসতাম। আমি যে তোমারি জন্যে তোমার সঙ্গে ছলনা করেছি, নিজের সঙ্গেও করেছি, সে কথাও বলতে ভুলতাম না।

কিন্তু বল্লে কি হবে? তোমার জন্যে আমি সেই দেবতার সঙ্গেও ছলনা করেছি। আজ মাথা হেঁট করে যে অপরাধ স্বীকার করছি, চিরজাগ্রত ঠাকুর দুঃখিনী অবলাকে ক্ষমা করবেন। আরতির সময় হাত জোড় করে মাথা নীচু করে রোজ সন্ধ্যায় যখন আমি শিবমন্দিরে ওই পাষাণ-প্রতিমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকতাম, তখন কি আমি তার পূজা করতাম? আমি তখন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতাম, তোমার দৃষ্টির অভিষেক। তুমি যে তোমার শুভ নির্ম্মল অকলুষ দৃষ্টি দিয়ে আমার এ পাপ দেহকে স্নান করিয়ে তিলে তিলে তার অণুপরমাণুকে পবিত্র করে তুলতে আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে তাই অনুভব করতাম। আর ভাবতাম তপস্যার শেষে সিদ্ধিলাভের দিন আমার এগিয়ে আস্‌ছে। এ জন্মে তোমার দৃষ্টির তলে নিষ্পাপ হয়ে উঠে পরজন্মে তোমাকেই লাভ করব। তখন দেবমন্দিরের আরতির শব্দ আমার কানে মিলিয়ে যেত। ঘিয়ের পঞ্চপ্রদীপের আলো কি ঘ্রাণ আমার কোনো ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করত না। শব্দ,

গন্ধ, রূপ, রস, সব তখন তোমাতেই একাকার। আজও সে মন্দিরের হাওয়ায় প্রতি-সন্ধ্যায় আমি তোমাকেই অনুভব করে পুলকিত হয়ে ঘরে ফিরে আসি।

ঘরে এসে তার পর ভয় হ'ত, দেবতার সঙ্গে ছলনা করে আমি যদি তোমার অকল্যাণ করে থাকি? তবে তার বাড়া শাস্তি আর আমার কি হতে পারে? আরো মনে হ'ত পাষাণের ঠাকুরের উপর ত তোমার বিশ্বাস নেই, তবে তুমিও ছলনা করেছ? যদি করে থাক তবে সে আমারি জন্যে, সে পাপও আমারি। তখন আমি শিউবে উঠে তোমার মঙ্গলের জন্যে আমার দেহ মন সমস্ত মানত করতাম।

দাদামশায় বলেছিলেন, মানুষের পাপ দেবতাকে স্পর্শ করে না, তাই আমি ঠিক করলাম মন্দিরের সেবাতেই আমি আমায় উৎসর্গ করব। শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ মন্দিরের দরজা ধরেই এ বাড়ীতে পড়ে থাকব; তোমার ঘরবাড়ী আমি দাদামশায়ের হাজার কথাতেও নিতে পারিনি, সে তোমাকেই আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। মন্দিরের কাছে ছোট একখানি ঘর বেঁধে থাকবার আমার সাধ ছিল। ইচ্ছা ছিল ঐখান থেকে দেখব, তোমার ঘর আলো করে তোমার গৃহলক্ষ্মী তাঁর শুভস্পর্শে সোনার সংসার সাজিয়ে তুলছেন। কিন্তু সে সাধ আমার মিটবে কি না কে জানে? আমি জানি মিটবে না, কিন্তু প্রাণ ধরে ও-কথা বলতে কিছুতেই পারি না। এখনও সেই আশাতেই তোমার ঘর আগ্‌লে বসে আছি।

আজ কতদিন ধরে রোজ ভোরে স্নান করে মন্দিরের সিঁড়ি ধুয়ে ফুল সাজিয়ে, আঙিনা ঝাঁট দিয়ে আসছি। আমি সকলের অধম হ'লেও একাজে আমায় বাধা দিতে কেউ নেই। রোজ সন্ধ্যায় নিজের চুলের গোছা দিয়ে আমি মন্দিরের ধূলো মুছে নিয়ে যাই। সেই যেমন তখনকার দিনে করতাম, আজও তেমনি করি। কিন্তু আজ সে পদধূলার এক কণাও মাথায় তুলে নেবার জন্যে পড়ে নেই।

এখন আমাদের মন্দিরে আর তেমন লোকের ভিড় নেই। কিন্তু তোমার মনে আছে ত তখন আরতির সময় মন্দিরে লোক আর ধরত না। মেয়ের ভিড় যত না হোক ছেলের ভিড় তার চেয়ে ঢের বেশী। গাঁ ভেঙে ছেলেরা রোজ মন্দিরে এসে জুটত। তাদের জ্বালায় আমার চলাফেরা ভার হয়েছিল।

আষাঢ় মাসের শেষাশেষি সেই যেদিন ঝড়ে আকাশ-পাতাল তোলপাড় হয়ে উঠেছিল, সেই অমাবস্যার দিনে ঘন মেঘের ঘটায় আরতির অনেক আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। আম-বাগানের কত গাছ যে সেদিন ভেঙেছিল, নদীতে কত নৌকো যে ডুবেছিল, নদীর পাড়ও যে কত জায়গায় ধসে পড়েছিল, তার ঠিকানা নেই। সেদিন প্রকৃতির প্রলয়কাণ্ড দেখে লোকের চোখের ঘুম কোথায় উড়ে গিয়েছিল। সারারাত ধরে কড়কড় করে বাজ পড়েছে, ঝুপঝুপ করে নদীর পাড় খসে খসে পড়েছে, সাঁ সাঁ করে ঝড় গাছপালা উপড়ে বন-বাদাড় ভেঙে ছুটেছে, আর ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি ত সারারাত্রির মধ্যে একবারও থামেনি।

জোরে ঝড় আরম্ভ হবার আগেই তাড়াতাড়ি করে আরতি হয়ে গেল। সকলে বেরিয়ে বাড়ী চলে গেল। আমি তখন বাড়ী গেলাম না, মনে হ'ল মন্দিরের কাজ শেষ করে গেলেই হবে, নইলে হয়ত আবার আসতে পারব না। তুমিও যে যাওনি, তা' আমি জানতাম না, কিন্তু আমি যে যাইনি তা তুমি জান্‌তে। মন্দিরের দাসীর কাজ আমি কোনো দিন কারুর চোখের সাম্‌নে করিনি, এমন কি পূজোরী-ঠাকুরও আমায় কাজ করতে কখন দেখেনি। আমি ফুল দিয়ে যাই এইটুকুই সে জান্‌ত, আর কিছু কেউ জানত না। তাই বোধহয় তুমি আমায় থাক্‌তে দেখে একটু অবাক হয়ে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যেই মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলে।

সবাই চলে যেতেই আমি এদিকের সিঁড়ি ধুয়ে মুছে, প্রদীপ পরিষ্কার করে রেখে, তোমাদের দিকের সিঁড়ির কাছে গেলাম। হেঁট হয়ে খোলা চুল দিয়ে আমি যখন সিঁড়ির ধূলো মুছছিলাম, তখন প্রদীপের আলো আমার জরির আঁচলায় লেগে চক্‌চক্ করে উঠ্‌তেই বোধ হয় সে দিকে তোমার চোখ পড়েছিল। সেদিন আমি রূপোলি জরির পাড় আর আঁচলাদার একখানা কাপড় পরে ছিলাম। তুমি এগিয়ে এসে আমায় অমন ভাবে দেখে বললে, "সুনন্দা, এত রাত্রে পাষাণের ঠাকুরের সিঁড়িতে মাথা পেতে পড়ে আছ কিসের টানে?"

ইচ্ছা হচ্ছিল, সত্যি কথাটা বলি। কিন্তু আমি যে পণ করেছিলাম, যেদিন তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হবে, সেই দিনই আমার মনের কথা বলব; তার আগে বল্লে ত' চলবে না। তাই বল্লাম, "ঠাকুরের টানেই ঠাকুরের দরজায় পড়ে আছি।"

আমার উত্তর না শুনেই তুমি হঠাৎ বলে উঠ্‌লে, "এ কি, তুমি চুলের গোছা দিয়ে সিঁড়ির ধূলো কুড়োচ্ছ? কে এমন ভাগ্যবান যার পায়ের ধূলো তোমার মাথার চুল স্পর্শ করবার স্পর্দ্ধা রাখে?"

আমি হেসে বল্লাম, "স্পর্দ্ধা কেউ রাখে না। তবে আমার যে প্রিয় তার পায়ের ধূলো আমি আপনি সগৌরবে মাথায় তুলে নি।"

অন্ধকারে তোমার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। মনে হ'ল গলার স্বরটা যেন একটু ভারী-ভারী শোনাল। তুমি বল্লে, "সে তোমায় কি দিয়েছে, যে, তার এত মান?"

"সে কি দিয়েছে সেই জানে, আমি যতখানি দিতে পারি দিয়েছি।"

"আর কারুর জন্যে বুঝি এক কণাও রাখনি।"

আমি বেশ স্থির ভাবেই বল্লাম, "না।"

তুমি বল্লে, "সুনন্দা, তবে সত্যিই আমার সব আশা বৃথা।"

আমি বল্লাম, "ওমা, তোমার আবার আমার কাছে কিসের আশা?"

তুমি কথা কইলে না; চলে গেলে। আমিও উঠে বাড়ী গেলাম।

পরদিন ভোরে উঠে দেখ্‌লাম, এক রাত্রের ঝড়ে মাধবপুরের চেহারা বদলে গেছে। কোথাকার কি যে কোথায় গেছে, কত ঘর বাড়ী বাগান যে ধ্বংস হয়ে গেছে, তা গোনা যায় না। আমারও সব সেদিন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কি না জানি না।

সেদিন থেকে তোমায় ত আর দেখিনি। পথ চেয়ে আজ কতদিন বসে আছি। যাবার দিনে তোমায় সব বলে যাব সেই আশাতেই যত্নে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। যদি না পারি তবে এই আমার লিপি রইল, যা বলবার তা' এতেই বলে গেলাম। তবে এক সাধ ছিল— তোমায় নিজে মুখে বলে যাব; তোমার মুখে আনন্দের হাসি দেখে, আমিও আনন্দেই হেসে যাব, দুঃখের জোর-করা হাসি সেদিন আর হাসব না। যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় হব, সেদিন আমার এই অশ্রুসাগরে ওই একটি দিনের স্মৃতি শ্বেতপদ্মের মত টলটল করবে। কিন্তু সে সুখ কি আমার হবে?—

অভাগিনী সুনন্দা।

বিবাহ॥ শ্রী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

"আমার যে হৃদয় তাহা তোমার—"

তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত সভা। পুষ্পগন্ধ, নরনারীর বেশবাসের আতরের সৌরভের ভার বহিয়া বায়ু যেন ক্লান্ত। ঘূর্ণায়মান তাড়িত-ব্যজনীও যেন তাহাকে নাড়াইতে পারিতেছে না—পূর্ণগর্ভা রমণীর ন্যায় সে অলস, অচঞ্চল। সহস্র উৎসুক নেত্র, সহস্র উৎকণ্ঠ শ্রবণ, বর ও কন্যার মুখের দিকে তাহাদিগের উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা শুনিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছে।

সহসা সভাপ্রান্তে কিসের কলরব উঠিল। সুধার লজ্জাশীল কণ্ঠস্বর তাহাতে ডুবিয়া যাওয়ায় আচার্য্য আবার কহিলেন—"আমার যে হৃদয়—"

একজন লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া আসিল "মশাই থামুন! থামুন!" রুক্ষ্ম তাহার কেশজাল, বক্ষ তাহার দ্রুততালে উঠিতেছে পড়িতেছে, গাত্রে তাহার মদের গন্ধ।

আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বর মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার গৌরসুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, চন্দনলিপ্ত ললাট কি এক ঘৃণায় বেদনায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কন্যাকর্ত্তা প্রিয়নাথ বাবু সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আগন্তুককে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। দুই চারিজন নিমন্ত্রিত আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দক্ষিণা বাতাসের আগমনের আভাস পাইয়া যেমন সমস্ত বনানী মরমর করিয়া ওঠে, তেমনি গণ্ডগোলের আভাস পাইয়া সমস্ত সভা সচকিত হইয়া উঠিল।

পশ্চাৎ হইতে কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল "(Scoundrel) স্কাউনড্রেল পাজী, মারো উস্কো।"

আগন্তুক চীৎকার করিয়া উঠিল "বর সতীশ বিবাহিত। তাহার স্ত্রী বর্ত্তমান।"

পুষ্পমাল্যের গ্রন্থির নীচে সুধার একমুঠা-ফুলের-মত-কোমল হাতখানি সতীশ বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। সে অনুভব করিল যে সে হাতখানি বেতসপত্রের মত কাঁপিতেছে—কি হিমশীতল তাহার স্পর্শ!

সভায় ভীষণ কোলাহল উঠিল। সুধার দুই ভ্রাতা ছুটিয়া আসিয়া সতীশকে চাপিয়া ধরিল। প্রিয়নাথবাবু তাহাদিগকে থামাইয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন "বাবা সতীশ! এ কি সত্য?"

আগন্তুক তখনও চেঁচাইতেছে "সতীশের হিন্দুমতে বিবাহিতা স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান আছে; ও—যদি অস্বীকার করে ত তাকে (Produce) প্রোডিউস করতে পারি! বলেন ত মশাই—" কয়েকজন ভদ্রলোক লোকটিকে টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কোলাহল-মুখর সভাতল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ছিন্ন পুষ্পমাল্য, পরিত্যক্ত মুদ্রিতপদ্ধতিপত্র ও শূন্য আসনের উপর বিজলীবাতি আলোক বিকিরণ করিতে লাগিল। কোথায় সে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ! কোথায় সে মণিমাণিক্যের তীব্র দ্যুতি!

বাসরশয্যায় রক্তাম্বরা আভরণময়ী সুধা সারারাত্রি বিনিদ্র নয়নে নিশ্চল প্রস্তরপ্রতিমার মত জাগিয়া বসিয়া রহিল। কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে বা স্পর্শ করিতে সাহস পাইল না।

প্রভাতে গতরাত্রির অভুক্ত ভোজ্যদ্রব্য বিতরণকালে যখন কাঙালীদিগের মধ্যে কোলাহল রব উঠিল তখন প্রায়লুপ্তচেতনা সুধার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে সেই শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল "ওগো! আমার এ কাঙালহৃদয় কাহার দ্বারে ভোজ্য প্রার্থনা করিবে? তাহাকে এমনি করিয়া হে নিষ্ঠুর রিক্ত করিয়া গেলে কেন? কোন্ অপরাধে তাহাকে এত লাঞ্ছিত, এত অবমানিত করিয়া গেলে?"

সংবাদপত্রগুলি যে তাহাদিগের অপমানে মুখর হইয়া উঠিবে, ভ্রাতা দুটি এই ক্ষোভে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ভগ্নহৃদয় পিতামাতা দুঃখিনী কন্যাকে লইয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন।

দোষ ত তাঁহাদেরই! তাঁহারা কেন ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলেন না! তাঁহারাই বা কি করিবেন? সতীশকে তিন বৎসর তাঁহারা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছেন—কি নম্র, কি শান্ত, মিষ্টভাষী সে! তাহাকে সচ্চরিত্র বলিয়া জানিতেন বলিয়াই ত আদরের দুলালীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে গিয়াছিলেন। তাহার স্ত্রী যে বর্ত্তমান তাহা ত ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারেন নাই। পুত্রবৎ তাহাকে স্নেহ করিতেন, তাই ত সানন্দে তাহাকে জামাতৃপদে বরণ করিতে গিয়াছিলেন। হায় সতীশ! তোর মনে এই ছিল? আনন্দের হাট ভাঙিয়া দিলি? ফুল্ল কমল যে শুকাইয়া যায়!

২

নির্জ্জন প্রদেশে বন্যপ্রকৃতির নীরব শোভায় সুধা আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। কতদিন একাকিনী সে নদীতটে পলাশবনে বিচরণ করিতে করিতে আপনার তপ্তহৃদয়ের ব্যর্থকামনা বিশ্বদেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিত।

একদিন সে তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময় ভগ্নকণ্ঠে তাহাকে কে ডাকিল—সুধা! এ যে তাহারই কণ্ঠস্বর যাহাকে হৃদয়মন্দিরে আসন দিয়া সে কলঙ্কের বোঝা তুলিয়া লইয়াছে—তবুও ভুলিতে পারে নাই। যাহার কথা, সমাজ উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া বলিয়াছে, তাহার ভোলা উচিত ছিল; কিন্তু তবুও ভুলিতে পারে নাই। এই কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য, এই একজনের সান্নিধ্য অনুভব করিবার জন্য, তাহার প্রাণ এখনও কাঁদিয়া ওঠে। এ যে তাহার নিকট ঘোরতর অপরাধী, কিন্তু তবুও সে যে ইহাকে অপরাধী করিতে পারে নাই—ক্ষমা করিয়া ভালবাসিয়াই চলিয়াছে। এই ভালবাসার জন্য যে সে আজ অনেকের ঘৃণার পাত্রী হইয়া উঠিয়াছে।

সুধা থমকিয়া দাঁড়াইবা মাত্র সতীশ নিকটে আসিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল "সুধা! দয়া করে একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

সুধার কি বলা উচিত ছিল—আমার সঙ্গে তোমার কোনও কথা থাকতে পারে না? সুধা ত তাহা বলিতে পারিল না। সে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার জন্য সে দুঃখ-বেদনায় তোলপাড় হইয়া যাইতেছিল। অভিমান যে হৃদয়ের উপর গুমরাইয়া কাঁদিতেছিল "ওগো, আমি কি করেছিলাম তোমার? ওগো আমি কি করেছিলাম যে তুমি আমায় এই দাগা দিলে?"

সতীশ কাঁদিয়া কহিল "সুধা, আমায় ক্ষমা কর। আমি জানতাম না, আমি জানতাম না। তাই তোমার কাছে আমি ঘোর অপরাধী। আমায় তুমি ক্ষমা কর। আমি সেই রাত্রি থেকে এই কথাটি তোমায় বলবার জন্যে আকুল হয়ে আছি। তুমি আমায় কি ভাবলে সুধা, এই

ভেবে আমি যে কোনও শান্তি পাইনি! তোমার অজানিতে এই সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজে খুঁজে ছায়ার মত যে পিছনে পিছনে ঘুরেছি। উঃ সুধা, সেদিন যখন ওরা আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আমি একটিবার তোমার কাছে যাবার জন্য কত কাতরাতে, কত মিনতি করতে লাগলাম, কেউ আমার কথায় কান দিলে না, উল্টে ঠেলতে ঠেলতে বার করে দিলে! সুধা! আমার সে যন্ত্রণা তুমি ভিন্ন আর কেউ বুঝবে না! আমার অন্তর বোধ হয় তুমি বুঝতে পারছ?''

সুধা মনের মধ্যে সমস্ত ঝড় চাপিয়া রাখিয়া প্রলয়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তের প্রকৃতির মত শান্ত স্থিরকণ্ঠে কহিল ''আমি সে-অপরাধ ক্ষমা করেছি—সেই দিনই করেছি।''

সতীশ আবার কহিল ''সুধা! মনে পড়ে, আমার প্রতিজ্ঞা করা হয়ে গিয়েছিল; তুমি প্রতিজ্ঞা করছিলে তুমি কি বলছিলে মনে আছে? আমার যে হৃদয়—''

বাধা দিয়া সুধা কহিল ''এই বলতে এসেছেন আপনি? আমি তবে যাই।''

হায় সুধা! হৃদয়ের বাঁধ যে ভাঙিয়া গিয়াছে। এ বন্যা কি অত অল্পে থামে? ''না না, সুধা যেও না, আমি এ বলতে আসিনি। সুধা! সুধা! আজ আমি 'আপনি', আজ আমি পর?''

''হাঁ, আর আমিও সুধা নই। আমি মিস রায়।''

''আচ্ছা তাই হোক; মিস রায়—না, না, সুধা তুমি সুধা, চিরদিনই আমার কাছে সুধাই থাকবে। জান ঈশ্বর সাক্ষী করে আমি তোমায় স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—''

''সে প্রতিজ্ঞার কোনও মূল্য নেই।''

''মূল্য নেই? আছে, খুব আছে।''

''না, নেই! আপনি সে প্রতিজ্ঞা আগে আরেকজনের কাছে করেছেন।''

''আগের প্রতিজ্ঞারই মূল্য নেই, সুধা! তা জানি বলেই আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে এ প্রতিজ্ঞা কর্‌তে পেরেছিলাম।''

''মূল্য নেই? আগের প্রতিজ্ঞার মূল্য নেই? আপনার স্ত্রী তবে?—'' আশার বেদনায় সুধার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

''বেঁচে আছে, সুধা! তা ঠিক! কিন্তু আমার কাছে সে মৃত! বুঝতে পারলে না? তাকে আমি গ্রহণ কর্‌তে পারি না। তোমায় ভালবাসি বলে নয়, সুধা। সমাজ তার হাতে আমার হাত বেঁধে দিয়েছিল বটে কিন্তু সে স্বেচ্ছায় বন্ধন খুলে দিয়েছে, তাই সে প্রতিজ্ঞার মূল্য নেই। তাই তুমি আমার সুধা!''

''বেঁচে আছেন? মরেন নি? তবে—তবে?''

''বুঝলে না? সে আমাকে ত্যাগ করে গেছে!''

''কিন্তু তিনি ত আপনার স্ত্রী?'' সুধার নিকট বিশ্বজগত একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ের চিহ্ন, একটা অসীম জিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না।

''হাঁ, সে আমার স্ত্রী ছিল এককালে, আজও সে বল্‌বে যে সে আমার স্ত্রী। হিন্দুমতে বিবাহিতা সে, তার স্ত্রীত্ব ত যাবে না, তাই সে আমার স্ত্রী।''

''তাই আপনার স্ত্রী।''

''সুধা! সুধা! তুমি জান না সে আমার অদৃষ্টাকাশের কি রাহু! সে যে আমার সব সুখ গ্রাস করে ফেল্‌ছে।''

সুধা দুই হাত জোড় করিয়া বলিল—অন্তরের মধ্যে কিসের প্রেরণা সে অনুভব করিল সে বুঝিল না—কাতরকণ্ঠে মিনতির সুরে সে বলিল ''আপনি আমায় ভালবাসেন

বলেছিলেন তাই বলছি, সতীশ বাবু, যদি আপনি মানুষ হন, যদি আপনি আমায় ভালবাসেন—''

''যদি, সুধা! যদি ভালবাসি!'' হায় নারী, তুমি কি বুঝিবে কি গভীর ভালবাসা এ; এ যে দামোদরের বন্যার মত হৃদয়ের দুইকূল প্লাবিয়া, সমাজশাসন কর্ত্তব্য সংযম সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

''তবে সেই ভালবাসার দোহাই দিয়ে বলছি—আপনি তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, আপনি তাঁকে গ্রহণ করুন।''

''তুমি কি বলছ তুমি বুঝছ না সুধা। সে যে—!''

সুধা বাধা দিয়া কহিল ''বুঝেছি, ভাল করেই বুঝেছি, তবু বলছি, আপনি যান তাঁকে ফিরিয়ে আনুন।''

ম্লানমুখে, অপরাধীর মত দণ্ডাজ্ঞা শিরে তুলিয়া সতীশ চলিয়া গেল। সুধা যে কি করিয়া কখন গৃহে ফিরিল তাহা অন্তর্য্যামী ছাড়া কেহই জানিল না।

''ওগো তুমি যাও। কর্ত্তব্যপালনে যে অবহেলা করিয়াছ সে অপরাধের গুরু প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ কর। যে বৃহৎ প্রতিজ্ঞা অগ্নি সাক্ষী করিয়া একদিন করিয়াছিলে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা কর। বুক যদি ফাটিয়া যায়, হৃদয়রক্ত যদি বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষরিয়া পড়ে, তবুও তাহা রক্ষা কর। আমায়ও তুমি গ্রহণ করিয়াছ, ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমিও তোমার স্ত্রী? ওগো, সমাজ যে বলে ''না,'' আইন যে বলে ''না''। কি জানি তবে আমি কি! সমাজের জীব আমি, তাই তারই শাসন মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু অন্তর আমার তোমাকেই জানে, তোমাকেই স্বামী বলিয়া চিনে, সে পাপই হোক আর পুণ্যই হোক তাই আজ তোমার সঙ্গে ব্রত করিতেছি, তোমারই মত দারুণ দুঃখ মাথায় তুলিয়া লইতেছি।''

৩

থিয়েটারের গ্রীনরুমে বসিয়া বিজলী যেখানে পান চিবাইতে চিবাইতে একদল পুরুষের সঙ্গে রসালাপ করিতেছিল, সতীশ ঠেলাঠেলি করিয়া একেবারে সেখানে ঢুকিয়াই কহিল ''বিজলী তোমায় নিতে এসেছি, বাড়ী চল।'' যাহারা তাহাকে চিনিত না তাহারা মনে করিল যে এ বুঝি তাহাদেরই মত এক পতঙ্গ বিজলীর রূপবহ্নিতে আপনার পাখা পুড়াইতে আসিয়াছে। দু-একজন যাহারা চিনিত, তাহারা প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই মাতালের বিকট হাসি হাসিয়া কহিল ''উঁহু বাবা, তা হবে না। বিজলী যাবে না।'' সতীশ বিজলীর রংমাখা হাত ধরিয়া কহিল ''ওঠ, এস!''

বিজলী হাত ছিনাইয়া লইয়া, নয়নে অধরে বিজলীরই মত তীব্র হাসি খেলাইয়া, ললিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে মধুর কণ্ঠে গাহিল

''যদি এসেছ, এসেছ বঁধুহে,
দয়া করে কুটীরে আমার।''

সতীশ তীব্রস্বরে কহিল ''তুমি যাবে কি—না?'' মাতালেরা উত্তর দিল ''না, না, যাবে না।'' বিজলী শুধু হাসিল। কি দারুণ অবজ্ঞারই হাসি সে! সতীশের আপাদমস্তক সেই হাসিতে জ্বলিয়া উঠিল—এই তাহার স্ত্রী! সমাজ তাহাকে ইহারই সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। আর সুধা! অদৃষ্টের এ কি নিদারুণ পরিহাস!

বিজলীকে তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে—এ যে সুধারই আদেশ। কিন্তু সুধা ত জানে না যে বিজলী বাস্তবিকই বিজলী—সেই রকমই সুন্দর, সেই রকমই ভয়ঙ্কর জ্বালাময়! যে তাহাকে ধরিবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়, সে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবেই মরিবে।

"হাস আর যাই কর, তোমাকে যেতেই হবে।" দৃঢ়কণ্ঠে এই কথা বলিয়া সতীশ আবার বিজলীর হাত ধরিল। সেই স্পর্শে ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর কুঞ্চিত হইয়া শিহরিয়া উঠিল। আচার্য্য যখন সুধার হাত তাহার হাতে দিয়াছিলেন তখন তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিয়াছিল কি পুলকে! কি গভীর আনন্দে! আর বহুদিন পূর্ব্বে একদিন এই হাতখানিই সে কত আশার মোহে, কত আগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল! সেদিন সে কত সুখের স্বপ্নই না রচনা করিয়াছিল!

বিজলী সে বজ্রকণ্ঠে ও বজ্রমুষ্টিতে ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "ওগো আমায় মেরে ফেল্লে গো। ও লালুবাবু, ও টুরো, তোরা আয় না।"

ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল যেমন রক্তের গন্ধে ছুটিয়া আসে তেমনি করিয়াই অনেকে ছুটিয়া আসিল মজা দেখিবার জন্য। মাতালদের নেশা ছুটিয়া গেল। থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন "হাঁ, হাঁ, কে হে তুমি বেয়াক্কেল! মাঝ সিজনে ষ্টারকে নিয়ে টানাটানি!"

সতীশের চোখ মুখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া উঠিল "আমার স্ত্রীকে আমি নিতে এসেছি। বিজলী চল!"

বিজলী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "কে ওর স্ত্রী? কোথাকার মাতাল একটা!—আমি যাবো না, কিছুতেই যাবো না।"

সতীশ আর সেখানে দাঁড়াইল না। সারারাত্রি পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ভোরের বেলা সে ক্লান্তদেহে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাহার পর চিঠির কাগজের পর কাগজ নষ্ট করিয়া বেলা প্রায় ৮টার সময় সে সুধাকে একখানা চিঠি লিখিল। তাহার মনের সমস্ত জ্বালা সেই চিঠিতে ভাবে ভাষায় মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিল। তাহার অন্তরের কাতর ক্রন্দন ও মিনতি জানাইয়া সে লিখিল "সুধা, তবুও কি তোমার দয়া হবে না?"

দুইদিন পরে বড় আশায় চিঠি খুলিয়া দেখিল সুধা লিখিয়াছে—

"আপনি যে দয়া কর্‌তে বলেছেন সেই দয়াই যে পরম নির্দ্দয়তা হবে। আর আজকের এই নিষ্ঠুরতা যে উভয়ের চরম কল্যাণ।

"যদি কখনো সময় হয়, তখন নিজে থেকেই, যা জিজ্ঞাসা করেছেন, তার উত্তর দেবো। আর যদি সময় না হয়, তবে আশা আছে, জীবনান্তে এ জীবনে যা কিছু আজ জটিল এবং অবোধ্য মনে হচ্ছে তা সরল এবং সহজবোধ্য হয়ে উঠবে।

"আপনি আবার চেষ্টা করুন, কৃতকার্য্য হবেন।

সুধা।"

হতাশহৃদয়ে সতীশ বসিয়া পড়িল। তাহার জীবনের এই জটিল সমস্যার মীমাংসা কে করিবে? এই দুর্ব্বহ অন্ধকারে কবে আলোকের রেখাপাত হইবে? এ দুঃখরাত্রির অন্তরালে তাহার জন্য প্রভাত অপেক্ষা কোথায় করিতেছে? কতদিন, সে কতদিন!

হতাশার প্রথম অবসাদ কাটিয়া গেলে বিদ্রোহী চিত্তকে সংযত করিয়া, সঙ্কুচিত হস্তে সতীশ বিজলীকে এক পত্র লিখিল—

"বিজলী, যদি তুমি কখনো গৃহে ফির্‌তে চাও, শঙ্কা বা সঙ্কোচ বোধ না করে ফিরে এসো। আমার গৃহদ্বার তোমার কাছে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত অবারিত থাক্‌বে। সতীশ।"

৪

পুরীতে সমুদ্রতীরে জ্যোৎস্নাবিধৌত রজনীতে সতীশ ও সুধার আবার দেখা! সতীশ অন্যমনস্ক হইয়া চলিতে চলিতে সম্মুখে সুধাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া কহিল "সুধা?"

"হাঁ আমিই, সুধা! আপনি এখানে?"

"হাঁ, আমরা কয়েক দিন হল এখানে এসেছি। আমার স্ত্রীর বড় অসুখ, তাই তাকে নিয়ে এসেছি।"

সুধার পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। সতীশ তবে তাহার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছে! একি ব্যথা তাহার অন্তরে আজ জাগিয়া উঠিতেছে? সেই দুর্ভাগ্যবতীর এ ভাগ্যবিবর্ত্তনে সে কেন সুখী হইতে পারিতেছে না?

উত্তরে সংক্ষিপ্ত একটি "ও" বলিয়াই সুধা দ্রুতপদে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার সংযমের উপর সে কোনও বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছিল না।

হায় সুধা! তাহার চিত্তসিন্ধু মন্থন করিয়া কর্ত্তব্য যে গরল তুলিয়াছে তাহাতে তাহার সকল বিশ্ব যে জ্বালায় ছটফট করিতেছে। অন্তর তাহার কেবলি কাঁদিতে লাগিল "ওগো সে তোমার স্ত্রী! আর আমি, আমি কি?"

সতীশের পত্র লিখিবার বৎসর দুই পর বিজলী যখন যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া তাহার স্বরের মাধুর্য্যের সহিত থিয়েটারে প্রতিপত্তিও হারাইয়া ফেলিল, তখন তাহার স্বামীর সেই অনাদৃত লাঞ্ছিত পত্রের কথা স্মরণে আসিল। এই পত্র লইয়াই মর্ম্মান্তিক উপহাস করিয়াছে যে-সকল বন্ধুরা সেই বন্ধুর দল যখন দুরারোগ্য ছোঁয়াচে রোগগ্রস্ত বলিয়া তাহাকে দূরে রাখিতে লাগিল, তখন একদিন সে সতীশের বাসায় আসিয়া, শুষ্ক ম্লানহাসি হাসিয়া তাহাকে জানাইল যে সে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই অবধি সতীশ তাহাকে লইয়া দেশদেশান্তরে ঘুরিতেছে।

৫

বৎসর দুই পর মসুরী পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া সুধা একদিন শুনিল যে সতীশ মসুরীতে আছে। সে ভাবিল ভাগ্যদেবতার একি নিষ্ঠুর খেলা! তিনি যদি তাহাদিগকে মিলিত হইতে দিবেনই না, তাহা হইলে তাহাদিগের জীবনসূত্রকে এরূপভাবে গ্রথিত করিয়াছেন কেন যে এই বিশাল ধরণীতে তাহাদিগের এত ঘন ঘন সাক্ষাৎকার ঘটিতেছে? কি উদ্দেশ্যে এই দুটি জীবনকে অনন্তের পথে ধূমকেতুর মত বারবার সন্নিহিত করিয়া সরাইয়া দিতেছেন?

বিজলী কেমন আছে জানিবার জন্য সুধার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। বিধাতা তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া জানিবার সুযোগ আপনিই মিলাইয়া দিলেন। একজন অল্পবয়স্ক ডাক্তার সুধার মাকে দেখিতে তাহাদিগের বাড়ীতে আসিতেন, তিনিই একদিন কথাপ্রসঙ্গে সতীশের কথা তুলিয়া বলিলেন "বেচারী ভদ্রলোকের স্ত্রী (Pthisis) থাইসিস হয়ে এখানেই মারা যান। তারপর ভদ্রলোকটিরও সেই রোগ দাঁড়িয়েছে, সেই অবধি লোকটি এখানে। আহা এমন নম্র বিনয়ী লোক খুব অল্পই দেখা যায়।"

সুধার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। সতীশ অসুস্থ রোগগ্রস্ত! তাহার দেহমন সতীশের সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য সুধার সমস্ত হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল।

সে লজ্জার মাথা খাইয়া সতীশকে পত্র লিখিল—

"শুন্‌লাম, আপনার অসুখ করেছে এবং আপনি একলা। এসময়ে আপনার সেবার অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত করছেন কেন?

সুধা।"

উত্তরের প্রতীক্ষায় সে ব্যাকুল হৃদয়ে পথ চাহিয়া রহিল। রক্ত তাহার দপ্ দপ্ করিয়া

শিরায় শিরায় ছুটিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। উত্তর আসিলে চিঠিখানি বুকে ধরিয়া বিছানার উপর পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার প্রতি সতীশের গভীর ভালবাসা বিন্দুমাত্র কমে নাই এবং সেইজন্যই সতীশ তাহাকে ডাকিতে পারে না। মৃত্যুপথের যাত্রী সে, পারের খোঁজে চলিয়াছে, এপারে কোনও বন্ধন আর সে রাখিতে চাহে না। সুধাকে সে চিরদিনই ভাল বাসিয়াছে। আজও বাসে। সুধা তাহার সেবার অধিকার পাইতে ইচ্ছুক এই তাহার চরম সুখ ও পরম সান্ত্বনা, কিন্তু সেবায় যে তাহার আর প্রয়োজন নাই। সুধার জীবনে শনির মত সে, তাহাকে দুঃখই দিয়াছে, আজও দুঃখ দিতেছে, এই দুঃখ বহন করিবার শক্তি তাহার হোক সতীশের অন্তরের কামনাই যে এই।

সুধার কর্ত্তব্যজ্ঞান সতীশ ও সুধাকে এতদিন দূরে রাখিয়াছিল। আজ সতীশের কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাদিগকে একত্রিত হইতে দিল না। নদীর মত এই দুটি হৃদয়তটের মধ্যে ব্যবধান কি কখনো ঘুচিবার নয়! হায় কোন্ সে হেতু যে এই ব্যবধানের বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়া তাহাদিগের চিরবাঞ্ছিত মিলন-বাঁধনে তাহাদিগকে বাঁধিয়া দিবে?

সুধা যেদিন শুনিল সতীশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, আর বাঁচিবার আশা নাই, সেদিন সে তাহার অন্তরের ক্রন্দন কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া একেবারে সতীশের গৃহে গিয়া যেখানে সতীশের কঙ্কালসার দেহযষ্টি শয্যার সহিত মিশাইয়া গিয়া আপনার নশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিতেছিল সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার নিঃশব্দ আগমনও সতীশের কর্ণে বাজিয়া উঠিল। আসন্ন মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তাহার সকল শক্তিই যেন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অতি স্নেহের সুরে সে ডাকিল "সুধা!" সেই ডাকে সুধার এতদিনের সঞ্চিত সযত্নে চাপা বেদনার রাশি হৃদয় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল, সে সতীশের পায়ের উপর কাঁদিয়া পড়িল "ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় পায়ে ঠেলো না। তোমার কাছে এই শেষ সময়টুকু থাক্‌বার অধিকার দাও।" সতীশ তাহাকে বুঝাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই পারিল না। সুধার অশ্রুজল ও অনুনয়ের নিকট সে হার মানিল।

আইন অনুসারে তাহাদিগকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য পনর দিন অন্ততঃ অপেক্ষা করিতেই হইবে। এ পনর দিন যদি না কাটে? সুধা যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে প্রতি দিন প্রার্থনা করিতে লাগিল "হে কাঙালের ঠাকুর দয়া কর। আমায় একটি দিন অন্ততঃ তাঁর স্ত্রী হয়ে সেবা করবার অধিকার দাও। আমায় দয়া কর।"

অনেকে এই বিবাহের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন, কেহ বলিলেন এ ত উদ্বাহ নয়, এ যে উদ্বন্ধন। সুধা কিন্তু চারিদিকের এই ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও আপনার সঙ্কল্পের উপর দৃঢ় অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৬

সতীশ মৃত্যুর মত শীর্ণ, কঙ্কালসার মুখ, মৃত্যুর দেবতা যমের মতই অগ্নিময় গৌরবর্ণ। চক্ষু দুটিতেই দেহের সমস্ত জীবনীশক্তি যেন সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদিগের দৃষ্টি এত সজীব, এত প্রখর। আজও দীপালোক বরের অঙ্গের পট্টবাস পুষ্পমাল্য ও চন্দনের উপর উচ্ছলধারে ঝরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু তাহার অন্তরে আজ সুখের পরিবর্ত্তে বেদনা জাগিতেছিল, যদিও সেদিনকার সে চাঞ্চল্যের পরিবর্ত্তে সে আজ গভীর শান্তি অনুভব করিতেছিল।

আজিও সুধা রক্তাম্বরা, সেই সজ্জাই তাহার অঙ্গে, আজ কিন্তু সে লজ্জাবনতা নহে। স্থির অকম্পিত কণ্ঠে সে আপনার মন্ত্র পাঠ করিয়া গেল। মৃত্যু-পুরোহিতের আসন-সম্মুখে আচার্য্য যখন কহিলেন "আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হোক" তখন সুধা অনুভব করিল যে পুষ্পমাল্যের গ্রন্থির নীচে সতীশের মুষ্টি বজ্রকঠিন হইয়া উঠিতেছে।

বেহুলার মত বিনিদ্রনয়নে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া সুধা তাহার বাসররজনী কাটাইল। কালসর্প যে তাহার স্বামীকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

অরুণালোক পূর্ব্বাকাশকে রাঙাইয়া তুলিবার পূর্ব্বেই সতীশের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সুধার আনতনয়নের সপ্রেম করুণ দৃষ্টির নীচে তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল "সুধা, বড় সুখী আমি। বড় সুখেই যাচ্ছি। আবার একবার বল ত শুনি, আমার যে হৃদয়—"

আর্দ্র সজল-কণ্ঠে সুধা কহিল "আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হোক—"

সতীশের কণ্ঠ মৃদুতর সুরে বাজিল "আর তোমার যে হৃদয়—"

"আর তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হোক—"

মদের নেশার মত, গভীর সুখের আবেশের মত, মৃত্যু ধীরে ধীরে আসিয়া সতীশের নয়নপল্লবের উপর নামিল।

লাফো ॥ শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া

সে দিন বিজয়া দশমী।

পাঁচ বৎসর রেঙ্গুণে আছি। সুদূর প্রবাসে নির্জ্জন বাসায় কয় দিন হইতে একলা পড়িয়া থাকায় মনটা বড়ই খারাপ হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তরফ হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কড়ারে যে ঠিকাদারী কাজগুলা লইয়াছি—চোখ কান বুজিয়া সে গুলার ঝক্‌মারী পোহান ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। সারাদিন ছোটলোক চরাইয়া ঘুরিয়া বেড়ান, এবং সন্ধ্যার পর বাসায় বসিয়া কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় টাকা আনা পাইয়ের হিসাব লেখার মত অত্যন্ত নীরস কাজে আবদ্ধ হইয়া প্রবাস-বেদনা-পীড়িত চিত্তটা বড়ই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সেদিন বৈকালের দিকে কাজ কর্ম্ম সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া, ছড়ি ও চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। সহরের কোলাহল ছাড়িয়া নির্জ্জন পথ ধরিয়া মন্থর পদে বাসার দিকে ফিরিতেছি, এমন সময় উৎকটগন্ধ চুরুটের ধোঁয়া উড়াইয়া একদল ইতর জাতীয় লক্ষ্মীছাড়া ধরণের 'মগ' হাস্য পরিহাস করিতে করিতে আসিয়া পড়িল। আমায় দেখিয়া তাহারা একটু সংযত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। আমি চলিয়া যাইতেছি, সহসা সকলের পশ্চাৎ হইতে নীল পাগড়ী, পায়জামা ও মেরজাই আঁটা এক লম্বা-চওড়া আকৃতির বৃদ্ধ মগ অগ্রসর হইয়া সহাস্যে অভিবাদন করিয়া মগ ভাষায় বলিল, ''বাবু সাহেব এদিকে যে?''

দেখিলাম কাঠের কারখানাওয়ালা লাফো মগ। লোকে তাহাকে বলিত 'পাগলা লাফো।' পাঁচ বৎসর ব্যাপী আমার এই ঠিকাদারী ব্যবসায়ের খাতিরে এই শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় রাখিতে হইয়াছে। বিশেষ লাফো মগের অমায়িকতার জন্য তাহাকে আমি ব্যবসায় সম্পর্কের অতিরিক্তও একটু ঘনিষ্ঠতা দেখাইতাম—ক্রমে সম্পর্কটা হৃদ্যতায় পরিণত হইয়াছিল। লাফোর প্রশ্নের উত্তরে আমিও মগ ভাষায় বলিলাম, ''একটু বেড়াইতে বাহিব হইয়াছিলাম। তুমি কোথায় যাইতেছ?''

স্বভাব-সিদ্ধ সরল হাস্যে বৃদ্ধ মগ কহিল, ''আজ্ঞে, আজ আমার এই শ্বশুররা কারখানাতে চড়িভাতি করিয়াছেন কি না, এবার ঘরে যাইতেছেন। একলাটী কি করি, তাই উঁহাদের সঙ্গে বাহির হইয়াছি।''

আমি জানিতাম—তাহারই কাছে শুনিয়াছিলাম—লাফোর স্ত্রী পুত্রাদি কেহ নাই। সে দুইবার বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু দুই স্ত্রী অতি অল্প দিনের মধ্যেই মারা যায়। সে তার পর আর বিবাহ করে নাই। কারবার হইতে বৎসরান্তে তাহার যথেষ্ট আয় হইত। টাকাগুলা মাঝে মাঝে পর্ব্বোৎসব বা অন্য কোন কিছু উপলক্ষ্যে রীতিমত 'দিল্‌-দরিয়া' মেজাজে সে খরচ পত্র করিয়া উড়াইত। অবশ্য মগের মুল্লুকে লোকেদের স্বভাবটাও অনেকটা এই রকমই বটে, সুতরাং লাফোর কার্য্যকলাপ কোনও দিন আমার বিস্ময় উদ্রেক করে নাই।

লাফোর কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমারই মত তোমারও 'কি করি' অবস্থা হইয়াছে লাফো? চল আমার সঙ্গে আমার বাসায়,—সেখানে বসিয়া গল্প সল্প করা যাইবে!"

আমার কথা শুনিবামাত্র লাফো তৎক্ষণাৎ কারখানার মজুরগুলাকে বিদায় দিয়া আমার সঙ্গে অগ্রসর হইল। অল্প দূরেই লাফোর কাবখানা বাড়ী, সে কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিল, কারখানা বাড়ীর কাছাকাছি হইয়া একবার দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাবু সাহেব, বাসায় নাই বা গেলেন, চলুন ঐখানে নিরিবিলি বেশ ঘাট আছে, জ্যোৎস্নার আলোয় সেইখানে বসিয়া গল্প করা যাক্।"

বাসায় যাইবার আগ্রহ আমারও বড় ছিল না, সুতরাং লাফোর প্রস্তাব মত তখনি মোড় ভাঙ্গিয়া বামদিকে রাস্তার ধারে বাঁধা ঘাটে আসিয়া বসিলাম।

প্রকাণ্ড দীঘির জল চন্দ্রালোকে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। দীঘির চতুষ্পার্শ্বে গোটাকতক বড় গাছ। নিকটে লাফোর কারখানা বাড়ীটা ছাড়া অন্য কোনও ঘর বাড়ী নাই, চারিদিকে মাঠ ধু ধু করিতেছে। চন্দ্রালোকে চারিদিকের দৃশ্য তখন ঠিক একটা চমৎকার চিত্র-শিল্পের মত দেখাইতেছিল।

আমি যেখানটায় বসিয়াছিলাম, লাফো তাহার দুই পৈঠা নীচে বসিল। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই লাফো বলিল, "বাবু সাহেব, আপনাদের বাংলা দেশের গল্প বলুন।"

আমি একটী ছোট খাট দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "লাফো, আজ আমাদের দেশে কত ধুম-ধাম হইতেছে যে তার আর কি বলিব। ঘরে ঘরে আমোদ, আজ বিজয়া-দশমী।"

লাফো একটু বিচলিত হইয়া বলিল, "আজ বিজয়া-দশমী?—ওঃ জবর দিন বটে!"

আমি বিজয়া-দশমীর উৎসব সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। লাফো কিছু বলিল না, সে দীঘির জলের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে যে আমার কথাগুলাই শুনিতেছিল একথা বলিতে পারি না। আমার বক্তব্য শেষ হইতেই লাফো একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "চমৎকার রাত্রি।"

সহসা ঘাটের দক্ষিণ পাশে একটা প্রকাণ্ড প্রাচীন দেবদারু গাছের ডালে দোদুল্যমান একছড়া টাটকা বনফুলের মালা দেখিয়া আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "ওটা ওখানে কে রেখেছে লাফো?"

চকিত নেত্রে চাহিয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া লাফো বলিল, "আমি সখ করিয়া মালা টালা মাঝে মাঝে গাঁথিলে ঐখানে পরাইয়া দিই।"

আমি সংশয়পূর্ণ চিত্তে বলিলাম, "তা ওখানে কেন?"

লাফো জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, হাসিতে পারিল না। অবনত দৃষ্টিতে ঢোক গিলিয়া, কি যেন একটা কিছু সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "জ্যোৎস্না রাত্রি, চারিদিকে খুব ফুল ফুটিয়াছিল—আর কি জানেন, দেবদারু গাছটা আমি বড়—" লাফো থামিয়া গেল।

আমার কৌতূহল বাড়িল। বলিলাম, "ব্যাপারখানা কি?"

সহসা লাফোর মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি পাগড়ীটা খুলিয়া দুই হাতের অঙ্গুলি দ্বারায় তাহার দীর্ঘ বাব্‌রীগুলা উস্কাইয়া বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিল। চুলগুলা সর্পশিশুর মত মুখের পাশে ফণা ধরিয়া দুলিতে লাগিল। লাফো একবার দেবদারু গাছটার পানে চাহিল, তারপর দূর আকাশের পানে তাকাইয়া ফিরিয়া বসিল। বেদনা-কোমলকণ্ঠে বলিল, "সত্যই যদি জানিতে চাহেন বাবু সাহেব, আচ্ছা শুনুন তবে বলি।—বাহিরে আপনারা আমার যে চেহারাটা দেখিতে পান,—বাস্তবিক আমি তাহা নহি, এটা আমার ছদ্মমর্ত্তি!"

আমি অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। গ্রীবা উন্নত করিয়া তীব্র স্বরে লাফো বলিল, "আচ্ছা বাবু সাহেব, আপনিও কি আমায় সত্যকার লাফো বলিয়া বিশ্বাস করেন?"

ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝিতে পারি নাই, তার সত্য মিথ্যা কি বিশ্বাস করিব? আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "কি বল দেখি?"

একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া লাফো বলিল, "আপনি বাঙ্গালী হইয়া, এমন বুদ্ধিমান্ লোক হইয়াও আমায় ঠাওরাইতে পারেন নাই? আশ্চর্য্য বটে।—আপনি বিশ্বাস করেন কি, আমি বাংলা দেশের একজন খুনী আসামী?"

আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "অ্যাঁ, সত্য নাকি?"

লাফো দেবদারু গাছটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মগ ভাষাতেই বলিল, "ঐ গাছটায় প্রায়ই ফুলের মালা ঝুলাইয়া রাখি, কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে 'কেন?'—আমি জবাব দিই—'সখ', কিন্তু সখ নয়।"—বলিয়া সে নীরব হইল।

আমি এবার বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি বাঙ্গালী?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া লাফো বলিল—"আজ পঁয়ত্রিশ বছর এ সব কথা কাহাকেও বলি নাই, বলিবার দরকারও হয় নাই। কিন্তু আজ আপনি স্মরণ করাইয়া দিলেন—আজ বিজয়া দশমী। আজিকার রাত্রে এখানে বসিয়া কিছু লুকাইব না, সমস্ত সত্য বলিব। বাবু সাহেব, পৃথিবীর মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাল বাসিতাম, তাহাকেই নিজের হাতে খুন করিয়া—ঐ গাছের তলায় তাহার মাথা পুঁতিয়া রাখিয়াছি। এই বিজয়া দশমীর তিথিতে—সে ঠিক আজ পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হইল।"

আমি আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। কি ভয়ানক! আমার নিকট হইতে পাঁচ হাত তফাতে একটা মড়ার মাথা প্রোথিত রহিয়াছে, আর যে তাহাকে খুন করিয়াছে, সে আমার সম্মুখে বসিয়া! আমি স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। আমার মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না।

সম্মুখের দিকে চাহিয়া লাফো তখন পূর্ব্ববৎ মগভাষায় বলিতে আরম্ভ করিল ঃ—

"আমাদের বাড়ী বাঁকুড়া জেলার সোনাগঞ্জ গ্রামে। রায় বাবুরা সে গ্রামের জমিদার। তাঁহারা যখন দুই তরফে পৃথক হইলেন, তখন 'ভাগের ভাত' খাইতে হইবে বলিয়া বাবুদের নায়েব, আমার পিতৃব্য, বঙ্কু পাঁজা বুড়া বয়সে চাকরী ছাড়িয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। আমার বয়স তখন বাইশ বছর।

ছেলেবেলা হইতে আমি খুড়ার যত্নেই মানুষ, পিতা মাতা দেখি নাই। খুড়া লেখা পড়া কিছু শিখাইয়াছিলেন। আমার তেরো ও সতের বৎসর বয়সে যথাক্রমে দুইটী ছোট ছোট বালিকার সহিত বিবাহও দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার অদৃষ্টে মৃতপত্নীক যোগটা এমনই প্রবল ছিল যে উভয়ের কোন পক্ষই ছয় মাসের বেশী পৃথিবীতে টিকিতে পারিল না।

পাঁচজন গ্রাম্য যুবকের মত আমিও ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কিন্তু খুড়ার কর্ম্মত্যাগের পর তাহা আর পোষাইল না। রায় বাবুদের ছোট তরফের আহ্বানে এবং খুড়ার ইচ্ছাক্রমে, আমি সেইখানেই একটী গোমস্তার চাকরী লইলাম।

আমার পিতা পিতামহ সকলেই এই সংসারে কাজ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং মনিব-গোষ্ঠীর উপর আমার এমনই অগাধ শ্রদ্ধা জমিয়া গিয়াছিল যে, সেই পরিবারের একটী অতি নগণ্য প্রাণীর নিকটেও আমি বিনয় ও কৃতজ্ঞতায় আ-ভূমি প্রণত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু সেইটা আমার অত্যন্ত ভুল হইয়াছিল। আমার বয়স তখন অল্প, তখন জানিতাম না, সংসারে যে যত নম্র ও ভালমানুষ, সে তত অসুবিধা ও অত্যাচার ভোগ করে।

শীঘ্রই আমার 'নম্রতার' ফলভোগ করিতে আরম্ভ করিলাম। চোখ কান বুজিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। সময় সময় যখন অত্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতাম তখন মনকে বুঝাইতাম যে এই পরিবারে আমার পিতা-পিতামহ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমাকেও তাহাই করিতে হইবে!

কিন্তু সেদিন যখন কাটিয়া গিয়াছে তখন সে সব কথার সবিস্তারে বর্ণনায় কোন লাভ নাই, সুতরাং কেবল এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে চারিদিক হইতে আঘাত পাইয়া আমার মনের মধ্যে ক্রমশঃ একটা তীব্র বিদ্রোহিতা জাগিয়া উঠিল, এবং আমি তখন নিজেই মানিতে বাধ্য হইলাম যে আমার শরীরটাও রক্তমাংসে গঠিত।

আমার খুড়ার একমাত্র পুত্র শঙ্কর আমার অপেক্ষা সাত বৎসরের ছোট, এবং তাহার চেয়েও পাঁচ বৎসরের ছোট ছিল খুড়ার কন্যা শোভা। খুড়া নিজে দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন, ছেলে মেয়ে দুটীও তেমনি সুন্দর হইয়াছিল।

খুড়ার পুত্র শঙ্কর ছেলেবেলা হইতে আমার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিল; সমস্ত বিষয়েই আমি ছিলাম তাহার একমাত্র নির্ভর। তাহার প্রকৃতি ছিল, উচ্ছ্বসিত সরল তারুণ্য পূর্ণ, তাহার মুখখানি বালিকার মত অসঙ্কোচ-আনন্দ-উজ্জ্বল ছিল।

গ্রামে পূজা-পার্ব্বণে উৎসব ব্যাপারে আসর সাজাইতে, আলো জ্বালিতে, প্রতিমার সাজ পরাইতে—এবং যত কিছু বেগার খাটিবার স্থলে সকলেরই আগে শঙ্কর আবির্ভূত হইত! আর যখন নিতান্ত কোন কাজ থাকিত না তখন বাঁশের ডগে লোহার তীক্ষ্ণধার ফলাযুক্ত 'কুঁচে' হাতে পুকুরের পাড়ে পাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং তীর হইতে 'তাক্' করিয়া জলচারী মীনের উদ্দেশে কুঁচে ছুড়িয়া, তাহাকে গাঁথিয়া তুলিত। শুধু যে মাছের উপরই কুঁচের সদ্ব্যবহার চলিত তাহা নয়, অনেক সময় সাপও মরিত।

ছোট'র উপর অবাধ প্রভুত্বের সুযোগ পাইলে, বড়'র স্বাভাবিক স্নেহ স্বত্বঃই বাড়িয়া উঠে। আমি তাহাকে বড় ভালবাসিতাম, শুধু খুড়ার ছেলে বলিয়া নহে,—অনুগত ছোট ভাই বলিয়া নহে,—তাহার নির্ম্মল আনন্দ-উজ্জ্বল, প্রীতি-প্রবণ অন্তরাত্মার কোমল সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই তাহাকে ভালবাসিতাম!"

লাফো চুপ করিল। আমি বলিলাম—"লাফো বাঙ্গালা কি ভুলে গেছ? আর মগ ভাষা কেন? বাঙ্গালায় বল।"

সে মগ ভাষাতেই বলিল—"ভুলি নাই বাবুজি—মাতৃভাষা কেহ কখনও ভুলিতে পারে? তবে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর সে ভাষা মুখে উচ্চারণ না করিয়া অভ্যাস হারাইয়াছি।"—এই বলিয়া লাফো স্থিরদৃষ্টিতে দূরস্থ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাড়ীতে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার ললাটে বিষাদের রেখা অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আমি চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম, লাফো কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল ঃ—

"আমার খুড়া কিছু দিন পরে, মারা গেলেন। শঙ্করের বয়স তখন ষোল বছর, শোভা বারো বছরে পড়িয়াছে। পিতৃব্যের শ্রাদ্ধ শান্তি চুকাইয়া, আমি ভগিনীর বিবাহ সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিলাম। শোভা সুন্দরী মেয়ে ছিল, তাহার মাতুলালয়ের কাছেই কোন গ্রামে এক বর্দ্ধিষ্ণু উগ্র-ক্ষত্রিয়ের পুত্রের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু সেই সময় এমন কতকগুলি কারণ ঘটিল যে আমাকে বাধ্য হইয়া ছোট তরফের কাজ ছাড়িয়া দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুসুমপুরের দে বাবুদের জমীদারী সেরেস্তায় প্রবেশ করিতে হইল।

দুইজন পাশাপাশি জমীদারের মধ্যে অল্প স্বল্প বিবাদ প্রায় লাগিয়াই থাকে। এই দুই

জমীদারেও সেইরূপ ছিল, কিন্তু আমি যখন দে বাবুদের বাড়ী ঢুকিলাম তখন আমার পূর্ব্বকার মনিব-গোষ্ঠী একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। নানা ছুতায় দুই দলে রীতিমত শত্রুতা বাধিয়া গেল।

উত্তেজনার মুখে সন্ধির অপেক্ষা যুদ্ধের দিকেই সকলের ঝোঁক্টা পড়ে বেশী। এই দুই জমীদার-গোষ্ঠীও পরস্পরের কুৎসা বিদ্রূপ এবং ছিদ্রান্বেষণ করিয়া খুব রোখের সহিতই লড়িতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে দুই দলে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইল না—তাহাও নহে, কিন্তু শ্রাদ্ধ বেশী দূর গড়ায় নাই।

এ-তরফ হইতে আমাকে ভাঙ্গাইবার এবং ও-তরফ হইতে সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা চলিতে লাগিল। এবং এই টানাটানির হিড়িকে পড়িয়া, পূর্ব্ব-পক্ষের প্রতি আমার ঘৃণাটা আরও বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে আমি সোনাগঞ্জের বাড়ীর সম্পর্ক ছাড়িয়া দে বাবুদের কাছারি বাড়ীতেই আশ্রয় লইলাম। তাহাতে এ-পক্ষের গর্ব্ব এবং পূর্ব্ব-পক্ষের নিষ্ফল আক্রোশটা চড়িয়াই গেল।

সোনাগঞ্জের বাড়ীতে ছেলে মেয়ে লইয়া খুড়ী থাকিতেন। আমি সেখান হইতে তাঁহাদের সবাইয়া আনিবার সঙ্কল্প করিলাম। ধীরে ধীরে আয়োজন চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ শোভার ভাবী শ্বশুরের মৃত্যু হইল, এবং কালাশৌচের জন্য বিবাহের সময় আরও পিছাইয়া গেল।

শোভার গড়ন বাড়ন্ত ছিল। আমি চিন্তিত হইলাম, কিন্তু শোভার ভাবী স্বামী মনোরঞ্জন আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "হোক না, ক্ষতি কি!"—আমি 'মোনা'কে ভাল রকমই চিনিতাম, নিশ্চিন্ত হইলাম।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। অগ্রহায়ণ মাসে শোভার বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। সাম্নে আশ্বিন মাস, দে বাবুদের যত্নে আমি ইতিমধ্যে তাঁহাদের জমীদারীর ভিতরই একটু জায়গা লইয়া ছোট একটি বাড়ী করাইলাম এবং আশ্বিনের পূজার পর ত্রয়োদশীর দিন খুড়ী ও ভাইবোন দুটীকে সোনাগঞ্জ হইতে আনাইবার সঙ্কল্প করিলাম।

রায় গোষ্ঠীর ছোটবাবু যখন দেখিলেন যে আমি সকল রকমে তাঁহাদের হাত হইতে খসিয়া পড়িতেছি তখন তিনি মরণ কামড় বসাইবার আয়োজন করিলেন। তাহার পরিণাম যাহা হইল তাহা ভয়ঙ্কর।"

লাফো দীর্ঘশ্বাস ফেলিযা আর একবার থামিল। তাহার চোখ দুইটা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, মুখে বিষণ্ণ-বেদনার সহিত একটা ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমি বলিলাম, "তার পর?"

"সে দিন বিজয়া-দশমী; আশ্বিন কিস্তির খাজনা দাখিল করিতে আর দুইদিন মাত্র বাকী আছে। দে বাবুদের পূজা বাড়ীর গোলে জমিদারী সেরেস্তার লোকজন সবাই কয়দিন ব্যস্ত ছিল। দূরে বেলগাঁয়ের মহাজনের নিকট অনেকগুলি টাকা পাওনা ছিল, নায়েব বাবু সকাল বেলায় বলিলেন, "বীরু মহাজন কদিন থেকে লোক ফিরাফিরি করিতেছে, তুমি ভাই আজ গিয়া চেষ্টা কর, যা করিয়া হউক আজই টাকাটা আদায় করা চাই!"

আমি চলিলাম। অনেক চেষ্টায় সমুদয় টাকাটা আদায় করিয়া ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কাছে এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়ীতে কিছু জলযোগ করিয়াছিলাম। আসিবার সময় বিজয়া দশমীর প্রথামত তাঁহার কাছে এক পাত্র সিদ্ধি খাইয়া আসিলাম।

কুসুমপুরের মাঠে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন রাত্রি এগারটা; প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর ঢাক ঢোল ও সানাইয়ের বিদায়ী সুর তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। দুই এক ঘরে গৃহস্থ রমণী তখনও জাগিয়া আছে, কিন্তু গ্রাম্য পুরুষ সম্প্রদায়ের সকলেই তখন সিদ্ধি ও মদের নেশায়

অচেতন! ভদ্রঘরের পুরুষগণ, যাহারা কোন দিন কোন মাদক স্পর্শ করে নাই, তাহারাও আজিকার দিনে নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকে। এবং কেহ কেহ নিয়মের বাহিরে গিয়াও পৌঁছে।

আমি চলিয়াছি। বামে দামোদর, বর্ষা শেষে তখনও নদের স্রোত উদ্দাম কল্লোলে ছুটিতেছে। রাস্তার দুই পাশে ঝাউ ও তেঁতুল গাছের শ্রেণী। শরতের উজ্জ্বল চন্দ্রালোক চারিদিক ছাইয়া হাসিতেছে। সহসা পিছন হইতে ডাক শুনিলাম, "দাদা।"

দেখিলাম, শঙ্কর ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। সবিস্ময়ে বলিলাম, "শঙ্কর নাকি!"

মাথায় বাব্‌রী চুল, গলায় প্রসাদী ফুলের মালা, আঠারো বছরের গৌর-সুন্দর শঙ্কর আমার কাছে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিল। আমি তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া দ্রুতস্বরে বলিলাম, "কিরে কি হইয়াছে?"

শঙ্করের হাতে সেই কুঁচেটা ছিল, একটা কোলা ব্যাং লাফাইয়া চলিয়া যাইতেছে; চক্ষের নিমেষে তাহাকে কুঁচেয় গাঁথিয়া শঙ্কর মৃদুস্বরে বলিল, "দাদা, শীঘ্র বাড়ী চল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

আমি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "কি? কি?"

ব্যাংটা ধড়ফড় করিতেছিল; শঙ্কর তাহাকে কুঁচে শুদ্ধ এক আছাড় দিল; তারপর কম্পিতস্বরে বলিল, "ছোটবাবুর মতিচ্ছন্ন হয়েছে!"

শঙ্কর একটীর পর একটী করিয়া সমস্ত কাহিনীটা আমায় শুনাইল; যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার শরীরের রক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল, মাথার ভিতর নেশার উষ্ণ-আবেশটা চম্ চম্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল!

শঙ্কর বলিল, রায়েদের ছোটবাবু দুইজন নীচ শ্রেণীর প্রজাকে টাকা খাওয়াইয়া বশ করিয়াছেন, শোভাকে তাহারা ছোট বাবুর বৈঠকখানায় বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

আমি কোন কথা ভাবিবার অবকাশ পাইলাম না, আমার সমস্ত অনুভূতি ছাপাইয়া একটা রক্তাঙ্কিত দৃপ্ত কঠোরতা হুঙ্কার করিয়া উঠিল—খুন্ করিব!

আপাদ মস্তকে আগুনের হল্কা বহিতেছিল, স্ফীত নাসারন্ধ্র দিয়া জ্বালাময় নিঃশ্বাস ছুটিতেছিল, আমি ক্ষিপ্ত-উত্তেজনায় বলিলাম, "চল একেবারে কাজ শেষ করে ফেলি, তার পর অন্য কথা।"

দীর্ঘ দ্রুত চরণে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই মনে পড়িল, মনিবের টাকা আমার কাছে আছে। আমি আবার ফিরিয়া মোড় ভাঙ্গিয়া কুসুমপুরের কাছারির দিকে ছুটিলাম, শঙ্কর আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

অন্তরে রুদ্র-উন্মাদনার প্রখর তরঙ্গ বহিতেছিল। আমি বলিলাম, "শঙ্কর তুই ছেলেমানুষ, আজকের মত কুসুমপুরে থাক্‌বি চ, কাল সকালেই মামার বাড়ী যাস্—কিন্তু আমি আজ রাত্রেই এক কাণ্ড কর্‌ব!"

শঙ্কর সাগ্রহে বলিল, "আমিও তোমার সঙ্গী।"

আমার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া যাইতেছিল। বলিলাম, "মরতে ভয় পাবি না?"

সে দৃঢ়ভাবে বলিল, "না—কিছুতে না!"

আমার মনে পড়িল আজ রাত্রে যে কাণ্ড করিব, সেজন্য কাল সকালে এখানে দাঁড়াইয়া সূর্য্য দেখিতে পাইব না। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা কিছুই নাই। আদায়ী টাকা হইতে আমার মাহিনা বাদ ৬০্ টাকা কাটিয়া লইলাম, তাহার পর বাকী টাকা ও চালানী রসিদ সব একত্র বাঁধিলাম। কুসুমপুরে বাবুদের বাড়ীর সকল আলো তখন নিবিয়া গিয়াছিল, দেউড়ী বন্ধ হইয়াছিল, শ্রমক্লান্ত লোকজন সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমি সদর বাড়ীর প্রাচীর লঙ্ঘন

করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। নিঃশব্দ পদে বারান্দায় উঠিয়া নায়েব বাবুর বসিবার ঘরের জানালা গলাইয়া টাকার তোড়া ঝনাৎ করিয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিলাম। তার পর নগ্দীর ঘর হইতে একখানা শাণিত ভোজালী সংগ্রহ করিয়া নিঃশব্দে নিদ্রিত পুরী অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিলাম।

আমার হাতে ভোজালী দেখিয়া শঙ্কর সভয়ে বলিল, "দাদা জনকতক লোক নিলে হয় না?"

আমি তীব্রকণ্ঠে বলিলাম, "না, এ ত সবাইকার গরজ নয়, কেন সবাইকার কাছে হাত পাতব? এ আমাদের ঘরোয়া অপমান, ঘরে ঘরে এর মীমাংসা চাই!"

শঙ্কর মটাশ করিয়া কুঁচের তীক্ষ্ণ মুখটা ভাঙ্গিয়া বাঁশটা ফেলিয়া দিল। বলিল, "আজ এইতে ছোট বাবুর চোখ দুটো কানা কর্‌ব!"

আমি কিছু না বলিয়া দ্রুতপদে চলিলাম। শঙ্কর আমার সহিত চলিতে পারিতেছিল না, তবুও হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিতেছিল, কিন্তু বিশ্রামের নাম করিল না।

যখন আমরা সোণাগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ। কোনদিকে একটী মানুষের শব্দ নাই, দূরে দূরে শৃগাল ডাকিতেছে, গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট অন্নজীবী কয়েকটা শীর্ণাকৃতি লোমওঠা কুকুর এদিক ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রকাণ্ড জমীদার বাড়ীর ফটক বন্ধ।

সুকৌশলে লাঠিতে ভর দিয়া আমি তড়াক্ করিয়া প্রাচীরের একস্থানে উঠিলাম। ইঙ্গিত মত শঙ্করও আমার অনুসরণ করিল, কিন্তু পা পিছলাইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেই আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। সহসা একটা দ্বিধায় মনটা কেমন বিকল হইয়া গেল; আমি বলিলাম, "শঙ্কর, যদি বেগতিক দেখিস্ যমের হাতে ধরা দিস্ কিন্তু খবরদার ওদের হাতে ধরা দিস্ না!"

প্রাচীর বহিয়া বৈঠকখানা মহলের দিকে অগ্রসর হইলাম, ক্রমে দ্বিতলের বারান্দায় গিয়া উঠিলাম। বাড়ীর সমস্ত স্থানই আমার পরিচিত—দুই বৎসর পূর্ব্বেও শুভাকাঙ্ক্ষী অনুগত ব্যক্তি হইয়া এই বাড়ীতে খাটিয়াছি। আর, আজ আসিয়াছি, প্রতিহিংসালোলুপ পিশাচের বেশে!

আমার রগের শিরা দুইটা স্ফীত হইয়া আঙ্গুলের মত আকার ধারণ করিয়াছিল। নিষিদ্ধ কার্য্যের উগ্র উত্তেজনা আমার কাণের কাছে তখন প্রলয়ের করাল বিষাণ বাজাইতেছিল, আর চক্ষের সম্মুখে খেলিয়া বেড়াইতেছিল, রক্ত-বিজলীর তীব্র রেখা!

কিন্তু শঙ্কর প্রতিপদে কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল। বেশ বুঝিলাম সে জোর করিয়া মনটাকে নিদারুণ দানবীয়তায় মাতাইয়া তুলিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া পড়িতেছে, তবু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। আমি ঘৃণাভরে বলিলাম, "তুই পালা।"

সে বলিল, "না কিছুতেই না, আজ মনিবই হোক, আর মহাদেবই হোক, কাউকে মানি না, আজ দাদার পাশে দাঁড়িয়ে দাদার ভাই হয়ে কাজ করব!"

বৈঠকখানায় ছোটবাবুকে না পাইয়া আমি অনুমান করিলাম, তবে সে অন্তঃপুরে। বৈঠকখানার ছাদে উঠিয়া, ছাদে ছাদে অন্দর মহলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ক্রমে আমরা ছোটবাবুর শয়ন কক্ষের মুক্ত দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মূল্যবান আসবাব সজ্জিত কক্ষে, পালঙ্কের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ছোটবাবু নিদ্রা যাইতেছেন, পাশে দুই শিশু পুত্র ও পত্নী নিদ্রা যাইতেছে।

ছোটবাবুর বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হইবে; প্রকাণ্ড মুখে এক যোড়া মস্ত গোঁফ, মাথায় জাঁদ্‌রেল টাক, চেহারা বিপুল।

ছোটবাবুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আমার সর্ব্ব শরীরে এক অসহনীয় জ্বালা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইয়া সেই কাদা শুদ্ধ পায়ে লাফাইয়া পালঙ্কে উঠিলাম, নিদ্রিত ছোট বাবুর মাথায় এক পদাঘাত করিলাম।

সশব্দে পালঙ্ক কাঁপিয়া উঠিল; সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শিশু দুইটী কিছু বুঝিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিল, ছোটবাবুর স্ত্রী অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে কেমন যেন হইয়া গেল, তারপর প্রাণপণে চিৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো ডাকাত ডাকাত!"

চক্ষের নিমেষে শঙ্কর আসিয়া সবলে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

মুহূর্ত্ত পরে নিম্নতলে একটা কোলাহলের সাড়া পড়িয়া গেল। শিশু দুইটা ভয়ে কান্না বন্ধ করিল। আমি ছোট বাবুর বুকে হাঁটু দিয়া, দৃঢ় হস্তে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া সেই শাণিত ভোজালী শূন্যে তুলিলাম।

ক্ষণ মধ্যে আমার মনে হইল, এই ভোজালী এখনি নীচে নামিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তপ্ত রক্ত-ধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া আমার মুখ বুক প্লাবিত করিয়া ফেলিবে!—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তার চেয়েও তপ্ত—তার চেয়ে তীক্ষ্ণ—সকরুণ আর্ত্তনাদ, আমার মর্ম্মে সবেগে আঘাত ক'রিল! চমকিয়া চাহিয়া দেখি,—সবলে শঙ্করের হাত ছাড়াইয়া পত্নী পতির বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ব্যাকুল মিনতিতে বলিতেছে, "রক্ষা কর বাবা, সর্ব্বস্ব নাও,—আমার সর্ব্বনাশ কোর না।"

আমি একেবারে স্তম্ভিত! তাইত! এ প্রতিহিংসা কাহার উপর লইতে আসিয়াছি? কাহার দোষে কাহার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছি? এই নিরপরাধা রমণীর! হাঁ, তা নয়ত কি? এই লোকটার জীবনের যেখানটা লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিব, সেইখান হইতেই এই রমণীর হৃদয় শোণিত উচ্ছলিত হইয়া উঠিবে। তবে, তবে?—

আমি ছুরি নামাইয়া, আক্রান্তকে ছাড়িয়া পালঙ্ক হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। নিম্নে, অঙ্গনে তখন হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়িয়া গিয়াছে! দুড়্দাড়্ করিয়া দ্বার খুলিয়া লোকে বিকট চিৎকার করিতে করিতে দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে!

আত্ম-মুক্তির জন্য রমণীর প্রাণপণে বলপ্রয়োগে শঙ্কর ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। দেখিলাম সে নিশ্চেষ্ট স্তম্ভিত হইয়া, অর্দ্ধোপবিষ্টভাবে তখনও মেঝের উপর বসিয়া। নিস্ফল উত্তেজনায় আমার অন্তরে তখন যেন একটা প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতেছিল; আমি পুরুষ-কণ্ঠে ডাকিলাম—"উঠে আয়!"

শঙ্কর, ভয়ত্রস্তা বালিকার মত চকিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল।

বাহিরের পদশব্দ ও চিৎকার খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।

ফাঁসী কাঠে উঠিবার সময় খুনী আসামী যেমন মন হইতে সবলে কাতরতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া নির্ভীক ভাবে নিশ্চয়-মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়—আমার নির্ম্মম কণ্ঠস্বরে শঙ্করও যেন তেমনি 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে আর ফিরিয়া তাকাইবার অবসর দিলাম না, বজ্র মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরের বাহিরে আনিলাম।

এবার আর ধীরে সুস্থে ফিরিবার উপায় নাই, লোক জন সকলেই প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে লইয়া বাগানের দিকে খোলা ছাদে ছুটিয়া গেলাম,—সম্মুখে সঙ্কেত করিয়া আদেশ দিলাম—"লাফিয়ে পড়।"

সভয়ে পিছু হটিয়া শঙ্কর বলিল, "এত উঁচু থেকে?"

আরও কঠোর-স্বরে উত্তর দিলাম, "হাঁ";—সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎ হইতে এক ধাক্কা মারিয়া

তাহাকে ছাদের প্রান্তভাগে আনিলাম। ঝোঁক সাম্‌লাইয়া ভয়-কাতর শঙ্কর বলিল, "তুমি আগে লাফাও!"

আমি গর্জ্জিয়া উঠিলাম। সে যখন মরণের ভয়ে অভিভূত হইয়াছে, তখন তাহাকে আর বিশ্বাস কি?

কম্পিত কলেবরে শঙ্কর বলিল, "আমি পার্‌ব না, তুমি আগে লাফাও!"

পুনশ্চ তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই সে হাত ছিনাইয়া পিছাইয়া গেল, মুখ ফিরাইয়া ব্যগ্র করুণ দৃষ্টিতে ছোটবাবুর শয়ন কক্ষের পানে চাহিল। সে যে কি ভাবিতেছিল, তাহা সেই জানে আর ভগবানই জানেন। আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

ক্ষণ পরেই দ্বিতলের বারান্দায় লোকজনের উচ্চ কলরব ও অগণ্য আলোর জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; আমি রূঢ় স্বরে বলিলাম, "আর এক মুহূর্ত্ত শঙ্কর—এখনো বলছি।"

আর্ত্তনাদ করিয়া সে বলিল, "না—না।"

আমার চোখে তখন জগৎ জুড়িয়া খুনাখুনীর মেলা বসিয়া গিয়াছে, চারিদিক হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্তের উৎস ছুটিতেছে, আমার রক্ত-লোলুপ চিত্তে এক রাক্ষসী যেন হুঙ্কার করিয়া উঠিল! দুই হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে শাণিত ভোজালী ধরিয়া, আমি চক্ষের নিমিষে তাহার স্কন্ধে বসাইয়া দিলাম!

মুণ্ডটা দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া গেল। লুণ্ঠিত দেহটা একবার সজোরে আকুঞ্চিত হইয়া, তারপর স্থির হইয়া গেল। একটা বিকট পরিতৃপ্তির উল্লাসে আমার সারা অন্তরাত্মা উন্মাদ হইয়া উঠিল। আমি সেই মুণ্ডের চুলগুলা সবলে মুঠা করিয়া ধরিয়া ছাদ হইতে লম্ফ দিলাম।

নীচে বাগানে একঝাড় কলাগাছ ছিল, তাহারই উপর পড়িলাম, পা মচ্‌কাইয়া গেল! ভ্রূক্ষেপ করিলাম না;—সেই রক্তাক্ত মুণ্ড লইয়া তীর বেগে ছুটিলাম।

কতদূর আসিলাম কে জানে? সম্মুখে ভৈরব তাণ্ডবে প্রবাহিত ক্ষিপ্তস্রোত দামোদর। আমি জলের কাছে আসিয়া পড়িলাম। জলরাশি একবার সবেগে ছিট্‌কাইয়া উঠিল। তারপর আমার অবশ ইন্দ্রিয়গ্রাম আর কিছুই অনুভব করিতে পারিল না।

যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম দশমীর ক্ষীণ আলোকে পশ্চিম গগন পাণ্ডুবর্ণে চিত্রিত। আমার হাঁটু ছাপাইয়া দামোদরের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, আর আমি বালীর উপর দুই হাতে শঙ্করের মুণ্ড বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া আছি। উঠিয়া বসিলাম, মুহূর্ত্তে সব স্মরণ হইল। আমি বালকের মত হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম।

তখন অনুভব শক্তি ফিরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! একবার ভাবিলাম, এই মুণ্ডটা লইয়া আমিও ঐ দামোদরের উচ্ছল স্রোতে হাত পা ছাড়িয়া ঝাঁপাইয়া পড়ি;—এই দুর্ব্বহ শোক—এই অসহ্য বেদনাকে ফাঁকি দিয়া আরাম লই।— কিন্তু তখনই মনে পড়িল, সেটা বিষম স্বার্থপরতা হইবে! গৃহে বিধবা জননী আছেন, অন্যান্য পরিজন বর্গ আছে, তাহাদের ভার যে একমাত্র আমারই উপর!—আমার এখন বাঁচিবার শক্তি থাক আর নাই থাক, মরিবার স্বাধীনতা নাই, অবশ্যই নাই!

কেমন করিয়া কয়দিন পরে, কি উদ্দেশ্যে রেঙ্গুণে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, ঠিক মনে পড়ে না। এইটুকু মাত্র বলিতে পারি, যখন প্রথম আমার মস্তিষ্কে যথার্থ স্থিরতা আসিল, তখন আমি এই নির্জ্জন প্রান্তরে একলা ঐ দেবদারু গাছের তলায় বসিয়াছিলাম। গাছটা তখন ছোট ছিল।

আমার বাক্সে তখনো বস্ত্রাবৃত শঙ্করের মাথা। সেটাকে অনেক রাত্রে গাছতলায় পুঁতিয়া ফেলিলাম। পাথর দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া খোঁড়া জমিকে শক্ত করিয়া তাহার উপর ঘাসের চাবড়া বসাইয়া দিলাম।

পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের ভয়ে পরদিন সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলাম। এখান হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূর এক গ্রামে গিয়া, নিজেকে বিহারবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া এক বর্দ্ধিষ্ণু মগ-কৃষকের ধান্যক্ষেত্রে মজুরী করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলাম। ছয় সাত বৎসর সেখানে থাকিয়া, কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া যখন রেঙ্গুণে আবার ফিরিয়া আসিলাম, তখন হইতে আমার এই বর্ম্মীজ্ ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম।

এখানে আসিয়া এক বৃদ্ধ ছুতারের আশ্রয় লইলাম। সে আমার ছদ্মবেশ ধরিতে পারিল না, আমার কল্পিত জীবনেতিহাস শুনিয়া তাহাও অবিশ্বাস করিল না। তাহার কাছে কয় বৎসরের জন্য কাজে চুক্তিবদ্ধ হইয়া, মাতুলের নামে কিছু টাকা পাঠাইলাম। লিখিলাম, "সোণাগঞ্জে আমি একটা খুন করিয়া গোপনে পলাইয়া আসিয়াছি, শঙ্কর আমার কাছে আছে, আপনারা ভাবিবেন না।"

বৃদ্ধ ছুতারের গৃহ এখান হইতে কিছু দূরে ছিল। অবসর পাইলেই এখানে আসিতাম, ঐ দেবদারু গাছটির তলায় বসিয়া থাকিতাম। মাঝে মাঝে ফুলের মালা আনিয়া ডালে টাঙ্গাইয়া দিতাম। আমার এই সব অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া লোকে আমার নাম দিল "পাগলা লাফো।"

দুই সপ্তাহ পরে পত্রের উত্তর আসিলে, সাত বৎসর পরে বাড়ীর সংবাদ পাইলাম। মামা লিখিয়াছেন বিজয়া-দশমীর পরদিন এক পুষ্করিণীতে শোভার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, পুলিস তদন্তে স্থির হয় যে বালিকা স্নান কবিতে নামিয়া অসাবধানে গভীর জলে গিয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে।—আমার বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ; ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া শোভা নিজ নশ্বর দেহের কলঙ্ক-কালিমা ধৌত করিয়া লইয়া স্বর্গে গিয়াছে।

যতদিন খুড়ী জীবিতা ছিলেন ততদিন এমনি করিয়া শঙ্করের কুশল লিখিয়াছি। তাহার পর তিনিও মরিয়াছেন। এখন শঙ্করের সংবাদের জন্য কেহ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবার নাই, কারণ শঙ্কর আমার কাছে নিরাপদে আছে, সবাই জানে!

আমার অনুমান, আমার কৃত কার্য্যের জন্য দেশে পুলিসের কিছুই হাঙ্গামা হয় নাই, কারণ রায় বাবুদের কোন লোকই খুন হয় নাই, এবং খুন করিতেও কেহ কাহাকে দেখে নাই!—বিশেষতঃ অন্দর মহলের ভিতর এ সব ছেঁড়া ল্যাঠা লইয়া কি পুলিসে হাঙ্গামা করে? তাঁহারা সব চাপিয়া লইয়াছেন!

সমস্ত জীবনের উদ্বৃত্ত আয় একত্র করিয়া দুই বৎসর হইল এই জায়গাটা কিনিয়া লইয়াছি। একজন অংশীদার জুটাইয়া কাঠের কারখানা ফাঁদিয়াছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার মামা, খুড়ীমা কি এখনও জীবিত আছেন?"

সে বলিল—"না বাবুজি। আমাদের বংশে এখন আর কেহই নাই, খালি আমি আর শঙ্কর। জমির উপর আমি, নীচে শঙ্কর।"

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া লাফো বলিল—"বাবু সাহেব, সবাই ভুলিয়াছে—আমি পাগল লাফো। আমি ভুলিয়াছি, আমি বাংলাদেশের বীরেশ্বর পাঁজা। কিন্তু যখনই এই গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াই, তখনই অতীতের সমস্ত স্মৃতি সজীব হইয়া আমায় স্মরণ করাইয়া দেয়, আমি পাগল নয়, লাফো নয়, বীরেশ্বর নয়, আমি নরঘাতক দস্যু!

সময় সময় ইচ্ছা হয়, ঐ গাছতলাটার চারিদিকে লোহার বেড়া দিয়া ওখানটা পাথরে বাঁধাইয়া, উপরে এক বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করি। কিন্তু তখনই মনে হয়, শঙ্করের অশরীরী আত্মা হয়ত তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবে।"

লাফো চুপ করিল। চারিদিকে শান্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গাছপালা- গুলা সমস্ত নিথর নিস্তব্ধ। আমরা দুইজনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। লাফো স্থির দৃষ্টিতে অল্পক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, তারপর সনিঃশ্বাসে বলিল, "বাবু সাহেব, যে শাস্তি ভোগ করিতেছি, তাহার তুল্য শাস্তি শুধু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কেন, সারা পৃথিবীর কোন শক্তি আমায় দিতে সমর্থ নয়।"

জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিলাম, লাফোর চক্ষে অশ্রু চক্ চক্ করিতেছে।

চোখের আলো ॥ শ্রী সীতা দেবী

হিন্দুর মেয়ে হয়েও চম্পা যে কেন নবাব-বাড়ীর দাসী হয়েছিল, তা সবাই বুঝতে পারত না। কিন্তু জিনিসটার ভিতর আসলে আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না। নবাব-বাড়ীর অনেক কালের পুরানো ঝি পান্না যেদিন ভাইয়ের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে শুন্‌লে যে পাশের বাড়ীর হরিমতী ভোররাত্রে মারা গিয়েছে আর তার ছোট মেয়েটিকে দেখবার কেউই নেই, তখন থেকেই চম্পার কপাল ফিরে গেল।

রোগা, কালো, মেয়েটাকে নিয়ে যখন পান্না মনিববাড়ী ফিরে এল, তখন দাসী-মহলে বেজায় হাসা-হাসির ঘটা লেগে গেল। মাগো, অমন মেয়ের ভার নাকি মানুষে সাধ করে ন্যায়? মেয়ে পালবার সাধ হয়েছে তা একটা না হয় সুন্দর দেখেই নে! কিন্তু চিরজন্ম নবাব-বাড়ীর বিলাসের হাওয়ায় কাটিয়েও পান্নার মনের ভিতরে যে একটি মা লুকিয়ে ছিল, সে ঐ রোগা মেয়ের ডাগর চোখের ব্যথিত দৃষ্টিতে জেগে উঠল। তাকে আর পান্না কিছুতেই ফেলতে পারলে না।

পান্না ছিল বড় বেগমের খাস দাসী। তার আদর বেশি আর কাজ কম। কাজেই চম্পার আদর-যত্নের কোনো কমতি হল না। আর একটা তার লাভ হল এই যে প্রাচীনা বেগম মহলে মানুষ হয়ে ওঠাতে নবাববাড়ীর কলুষের হাওয়া তাকে অকালে শুকিয়ে দিলে না। বুড়ী পান্না ক্রমেই অথর্ব্ব হয়ে পড়ছিল, তার সব কাজই এখন চম্পার হাতে। নবাবের বেগমও তাকে একটু স্নেহের চোখেই দেখতেন। জগতের যৌবনের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে ঐ তরুণী মেয়েটি তাঁর আশে পাশে ঘুরে বেড়াত, আর সবই তাঁর আগেকার দিনের লোকজন। বেগমের বয়স যত বাড়ছিল, তাঁর মহলের স্তব্ধতাও সেই সঙ্গে নিবিড় হয়ে উঠছিল। নবাবকে এখন কালেভদ্রে এদিকে দেখা যায়, তাঁর আসার দিনেই কেবল ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে ওঠে, দরজার আড়াল থেকে রঙীন ওড়নার আভাস পাওয়া যায়, টুং টাং করে সেতারের ঝঙ্কারও কানে এসে বাজে। অন্য দিন সব চুপ্‌চাপ্‌।

প্রকৃতি-রাণীর মহলেও একদিকে চাঁদ ডুবে যায়, আর একদিকে পূবের আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য্য উঠে আসে। তেম্‌নি নবাববাড়ীর পুরানো মহলের আলো নিব্‌তে না নিব্‌তেই নবাবজাদার মহলে হাজার রঙীন বাতি জ্বলে উঠল। সেখানে আলো কোনোদিন নিবে আসে না, চিরবসন্ত নিজের ফুলের হাট নিয়ে সেখানে বাঁধা পড়েছে। গান বাজনা একদিনের তরেও থামে না।

নবাবজাদার মহলে দাসীর প্রয়োজন ক্রমেই বাড়ছিল। অন্য সব মহল খালি করে যত সুন্দরী পরিচারিকা ছিল সবই ঐ মহলেই গিয়ে জুটছিল। চম্পার সঙ্গিনী মরিয়ম আর গোলাপীও চলে গিয়েছে, সে-ই কেবল নিজের কুরূপের সৌভাগ্য নিয়ে এই নিরানন্দ পুরীতে থেকে গেল। সারাদিনটা তার নানা কাজে যেত, অবসরের সময় বেগম তাকে জরির কাজ শেখাতেন। যৌবন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁর স্বামীর মনও তার কাছ থেকে সরে গেল,

তখন থেকে এইসব কাজেই বেগম সারাদিন নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন, অবসর জিনিসটা তাঁর কাছে বড় ভয়ের হয়ে উঠেছিল। তাঁর তরুণী পরিচারিকাকে নিজের কাজের অংশ দিতে তাঁর একটা আনন্দ ছিল সেও যে তাঁরি মত অনাদৃতা।

কিন্তু সন্ধ্যার পর আর জরির কাজ চলে না। কালো মখমল তখন চোখের উপর মিলিয়ে আসে, জরির সোনালি রূপালি ডোরা আর চেনা যায় না, আর মানুষের বিফল অনুকরণের চেষ্টা দেখে বিধাতার কৌতুক-হাসির মত আকাশের কালো মখমলের গায়ে তারার চুমকি ঝিকমিকিয়ে ওঠে। বেগম এই সময়টিতে নিজের ঘরের জানলার ধারে চুপ করে বসে থাকেন, ঘরের সামনের গোলাপ-বাগান এখন জঙ্গল হয়ে উঠছে, সন্ধ্যার ম্লান আলোতে এই দুই উপেক্ষিতা নীরবে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।

চম্পা বেগমের কাজ থেকে ছুটি পেয়েই বাইরের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াত। সেখান থেকে নবাবজাদার মহল পরিষ্কার দেখা যায়। ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে একদৃষ্টে সেই আনন্দ-নিকেতনের দিকে তাকিয়ে থাকত। ওখানের বাঁশীর সুর ফুলের গন্ধ আর রঙীন আলো তাকে কেবলি আকুল করে তুলত।

মরিয়ম আর গোলাপী কালেভদ্রে এক আধ-বার পুরানো মনিব-বাড়ী বেড়াতে আসত। বেগমের কাছে একবার ঘুরে এসেই তারা চম্পাকে নিজেদের এতকালের সঞ্চিত কাহিনী বলতে বসে যেত। নবাবজাদা দেখতে কেমন, তাঁর বেগমরাই বা কেমন, কার কি নাম, কার উপরেই বা তাঁর টান সব চেয়ে বেশী। আর তা ছাড়া নাচগানের আর আরও হাজার-রকমের বিলাস-বিভ্রমের কথা ত ছিলই। তাদের গল্পের ভিতর প্রত্যেকবারেই নূতনত্ব যে কিছু থাকত তা নয়, কিন্তু তারা সেই পুরানো কথাই মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যেত। তার মনে ঘুরে ফিরে বাজাতে থাকত, "নবাবজাদার মত রূপ কিন্তু আর কখনও চোখে দেখিনি ভাই, এ নবাব বংশের যে এত রূপের জন্যে নাম ডাক, কিন্তু এদের মধ্যেও এমনটি কখনও হয়নি; সব নবাবেরই ছবি ত দেখেছি!"

চম্পা আগেকার নবাবদের ছবি কখনও দেখেনি, কারণ চিত্রশালাটা এ মহলে ছিল না; আর নবাবজাদাকেও দেখেনি। কিন্তু নিজের মনের চিত্রশালায় একটি তরুণ সুকুমার ছবি সে কল্পনার রঙে এঁকে রেখেছিল, আর সে ছবি যে অন্য সব নবাবের ছবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে তার সন্দেহ মাত্র ছিল না।

হঠাৎ একদিন বড় বেগমের মহলে সকাল থেকে ধুমধাম বেধে গেল। সেদিন কি শুভলগ্ন ছিল জানি না, নবাব আর নবাবজাদা দুজনেই এ মহলে আসবেন। সমস্তদিন ধরে কেবল উৎসবের আয়োজন চলতে লাগল। কাজে আর সেদিন চম্পার মন যাচ্ছিল না, কিসের একটা আকুল আবেগ তার সমস্ত দেহ-মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। আজ তার মনের ছবির সঙ্গে সত্য মানুষটির পরিচয় হবে। এই সন্ধ্যাটা তার জীবনে যে কি অপূর্ব্ব হয়ে উঠবে তারই পূর্ব্বাভাষ সে যেন ভিতরে বাইরে অনুভব করছিল।

সন্ধ্যার ছায়া ঠিক সময়েই পৃথিবীর উপর ঘনিয়ে এল, কিন্তু চম্পার মনে হচ্ছিল, রোদ পড়তে এত দেরী বুঝি তার জীবনে আর কখনও হয়নি। সে তার সব কাজ শেষ করে ফেলে বেগমের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। এ ঘরকে আজ আর চেনবার জো নেই। চিরকালের অনাদরের মেয়ে যেন আজ বাসর-সজ্জায় সেজে দাঁড়িয়েছে। বেগমের মুখের হাসি আজ সারা বাড়ীর আঁধার দূর করে দিয়েছে। এ যেন ভাগ্যদেবীর প্রসন্ন আশীর্ব্বাদে তাঁর দশ বছরের আগের দিন ফিরে এসেছে। তখন স্বামী তাঁকে উপেক্ষা করতে পারতেন না, ছেলেরও তাঁকে একটু প্রয়োজন ছিল। চম্পার মনে কিন্তু আনন্দই একছত্র রাজত্ব করছিল না, একটা কিসের অজানা আশঙ্কা তার মনকে ক্ষণে ক্ষণে পীড়িত করে তুলছিল।

হঠাৎ চম্পা সজাগ হয়ে উঠল। ঐ যে সেতার-এস্রাজের আনন্দ-ঝঙ্কার কোনো প্রিয় অতিথির আগমন জানিয়ে দিচ্ছে। চকিতে দরজা খুলে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ঘরের সামনে সকলে এসে পড়ল, তখন নবাব আর বেগম একসঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু তাঁদের পিছনে কে ও? তার দিকে চাইবামাত্র চম্পার মনের সেই ছবি লজ্জায় ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল না যে সে তার মানস-প্রিয়ের পরাজয়ে বেদনা পেলে, না, এই নূতন অতিথির জয়লাভের আনন্দই তার বেশী।

নবাবজাদার ভুবনমোহন রূপে যা দুই-একটা খুঁৎ ছিল তা অন্যের চোখে ধরা পড়ল। তাঁর মুখে পুরুষোচিত বীর্য্যের অভাব সম্বন্ধে চম্পার পিছনের একজন দাসী কি একটা মন্তব্য প্রকাশ করলে। চম্পা অবাক দৃষ্টিতে তার বড় বড় চোখ মেলে সেই দাসীর দিকে তাকিয়ে রইল।

বেগমের ঘরের উৎসবে সেদিন চম্পার মন গেল না। সেই পুরানো বাগানের ঝরাফুলের মেলার মধ্যে একটা ভাঙা পাথরের বেদীর উপর সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বেগমের মহলের সেদিকে কোনো আলো ছিল না, কৃষ্ণপক্ষের রাতের সেখানে অবাধ রাজত্ব।

নবাবজাদার এ মহলে মনটা বিশেষ জমছিল না, তিনি এধার ওধার অস্থির ভাবে কেবলি ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছিলেন। নবাবের বেশী অস্থির হবার বয়স ছিল না, তিনি কৌচের উপর লম্বা হয়ে গড়গড়া টানছিলেন, সঙ্গীতকারিণীদের এবং বাদিকাদের প্রয়াসগুলো সফল হচ্ছে কি না সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। বেগম ছেলের অস্থির ভাব লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু তাঁর মহলের অনেক জিনিস বাস্তবিক দেখবার উপযুক্ত। তিনি ছেলেকে সে-সব দেখাবার জন্যে একজন লোক খুঁজছিলেন, নিজে তখন ঘর ছেড়ে যেতে পারছিলেন না। আর-সব দাসীরা তখন খাওয়ার আয়োজন করতে কি অন্য কাজে ব্যস্ত, কেবল চম্পার দেখা নেই। বেগম জানলা দিয়ে মুখ বার করে ডাকলেন "চম্পা, চম্পারে, একবার এদিকে আয়।"

আকাশের তারার দিক থেকে জোর করে চোখ ফিরিয়ে চম্পা বাগান থেকে ফিরে চলল। তার আঁচল আর খোলা চুলের রাশ থেকে সারা পথে ছড়িয়ে পড়ল শুকনো পাতা আর ঝরা ফুলের পাপ্‌ড়ি।

বেগমের ঘরের সামনে আসবামাত্র তিনি বললেন, "একটা বাতি নিয়ে নবাবজাদাকে আমার উত্তর দিকের ঘরগুলো দেখিয়ে আন।" নবাবজাদা কৌতূহলী দৃষ্টিতে একবার চম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে তখুনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

একটা ভারি আলো তুলে নিয়ে চম্পা এগিয়ে চলল। সে যে সকলের আগে আগে চলেছিল, তার মুখখানা যে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না, এতে তার মনে একটা আরাম হচ্ছিল। নবাবজাদার সঙ্গে তাঁর এক ছোট ভাই আর দুতিনটি পুরমহিলাও ঘর দেখতে চললেন। কত ঘরেই যে তারা ঘুরলো তার ঠিক নেই। এখানে কত শ বছর আগের হাতির দাঁতের আসবাব, ওখানে কাশ্মীরী গালিচার অপূর্ব্ব কারুকার্য্য, কোথাও বা বিচিত্র গঠনের সোনা-রূপোর গৃহসজ্জা। সব ঘরের শেষে একটি ছোট ঘর, তাতে তালা চাবী বন্ধ। চম্পাও কোনোদিন সে ঘরের কপাট খুলতে দেখেনি। নবাবজাদা সে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা বন্ধ যে? এর ভিতর আছে কি?" চম্পা কি বলবে ভাবছে, এমন সময় লাঠির উপর ভর দিয়ে বুড়ী পান্না সেইখানে এসে উপস্থিত হল। সেই প্রকাণ্ড দালানের মধ্যে চম্পার হাতে কেবল মাত্র একটি আলো, সেই আধ-আলো আধ-ছায়ার মধ্যে বুড়ী পান্নার লোলচর্ম্ম মূর্ত্তি সেই কতকাল বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, পিছনে তার কালো অন্ধকার। নবাবজাদা চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হল, এই কতকালের পুরানো নবাববাড়ীর বিস্মৃত ইতিহাসের এক অংশ যেন তাঁর চোখের সামনে হঠাৎ মূর্ত্তি ধরে দাঁড়াল।

বুড়ী নিচু হয়ে সেলাম করে ভাঙা গলায় বলতে লাগল "নবাবজাদা আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ? অনেককাল আগে তোমাকে কোলে করে মানুষ করেছিলাম। তখন চেহারা এমন ছিল না, সকল দাসীর চেয়ে আমার কোলই তোমার লাগত ভাল। তোমাকে সেই কোলের ছেলে দেখেছিলাম, তারপর আজ এই দেখছি। এই ঘরের কথা বলছ? চম্পা কি করে জানবে, ও ত তখন এ বাড়ীতে আসেওনি। যেদিন এ ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমি এইখানে দাঁড়িয়ে; যাঁরা এ ঘরের ভিতর ছিলেন এখন তাঁরা কেউ বেঁচে নেই। এ ঘরের তালার চাবী তখনকার বড় বেগম, তোমার ঠাকুমা, আমাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। যে কাল রাতে এ ঘরের দরজা বন্ধ হল, তারপর এই পঞ্চাশ বছর ভিতর এ ঘর কেউ খোলেনি। কি অবস্থায় তোমার ঠাকুরদাদা মারা যান সবই ত জানো। তোমাকে দেখে আজ আমার পুরানো মনিব জাহান আলি খাঁর কথা মনে পড়ছে, একমাত্র তুমিই এ বংশে রূপে তাঁর কাছাকাছি এসেছ। তাঁর ছবি তোমাদের চিত্রশালায় নেই, কোথায় আছে তার খোঁজ কখনও নিয়েছ? দেখতে চাও ত দেখাতে পারি।"

নবাবজাদা শুধু ঘাড় নাড়লেন, তাঁর যেন কথা বলবার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

বুড়ী পান্না তালা খুলে দরজার কপাটে ধাক্কা দিলে। ঝন ঝন শব্দে খুলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পান্না সেই ঘরের জমাট আঁধারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। নবাবজাদা এগোবার কোনো লক্ষণ দেখালেন না, আলো হাতে চম্পাও পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের ভিতর থেকে পান্নার ডাক সকলের কানে এসে পৌঁছল। চম্পা আলো নিয়ে ঘরে ঢুকল, আর সকলেও পিছন পিছন এল। ঘরটির সজ্জা অপরূপ, তবে কালের অত্যাচারে তার মখমলের রং ম্লান হয়ে এসেছে, তার উপরের জরির আলোও নিভে আসছে। হাতীর দাঁতের কাজ করা প্রকাণ্ড পালঙ্কের চারধারে এখনও শুকনো ফুলের মালা দুলছে, এক এক দিকে বা ছিঁড়ে গালিচার উপর লুটিয়ে পড়েছে। ঘরে ঢুকতেই সামনে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক আয়না, কিসের এক প্রচণ্ড আঘাতে তার উপর থেকে নীচ অবধি একটা বিদারণ-রেখা চলে গিয়েছে। তার দুইধারে দুটো সোনার বাতিদান শূন্য বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নবাবজাদা ঘরে ঢুকতেই সামনের আয়নায় তাঁর ছায়া পড়ল। চম্পা হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠল, নবাবজাদার পাশেই এ কার চেহারা? পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে, কেউ ত তাঁর পাশে নেই? কিন্তু নিজের চোখকে কি অবিশ্বাস করা যায়? ঐ যে দেখা যাচ্ছে তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে ঠিক তাঁরই যেন আর একটি ছায়া। এ কে?

পান্নার গলা শোনা গেল, "ঐ দেখ নবাবজাদা, তোমার ঠাকুরদাদার ছবি, ঐ যে আয়নার পাশেই ঝুলছে। দেখে নাও আমার কথা ঠিক কি না। যে রাতে তিনি চলে যান, তার বেশী দিন আগের এ ছবি নয়, তখন তাঁর বয়স তোমার চেয়ে খুব বেশী ছিল না।" সকলে ছবির দিকে এগিয়ে গেল, চম্পা সবার আগে। নবাব জাহান আলি খাঁর ছবি একদৃষ্টে আগন্তুকদের দিকে চেয়ে রইল। ছবিখানা আঁকা নয়, গাঢ় নীল মখমলের গায়ে কার নিপুণ হাত জরির আর রেশমের সুতোয় তাঁর মূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলেছে। এ যেন নবাবজাদারই ছবি, কেবল মুখের ভাব বিষাদে মাখা।

নবাবজাদার সঙ্গিনীদের ভিতর একজন বলে উঠল "ওমা! কি আশ্চর্য্য সেলাই, মানুষে এমন করতে পারে তা ত জানতাম না! এটা কে করেছিল গা পান্না আয়ি?"

পান্না বললে, "যে করেছিল সে অনেক কাল চলে গিয়েছে। এই কাজ করতে করতেই তার চোখ অন্ধ হয়ে গেল, তখনও নবাবের হাতের ফুল আর মাথায় টুপীটা বাকি ছিল। তার ছেলে এদুটো করলে।"

তরুণী কলকণ্ঠে হেসে বলে উঠল, "চোখ কাণা করবার মতন চেহারা বটে বাপু! আমার

করবার ক্ষমতা যদি থাকত তা হলে আমিও এমনি রূপবান একজনের ছবি তৈরী করবার জন্যে চোখ দিতে পারতাম!'' নবাবজাদার দিকে তাকিয়ে তার হাসবার ভঙ্গীই সকলকে জানিয়ে দিলে যে সে ''একজনটি'' কে।

নবাবজাদা তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে পিতামহের ছবি দেখছিলেন, তিনি একটু হেসে বললেন ''শুধু রূপ সমান হলে হয় না আমিনা, কপাল-জোরও সমান চাই। এই দেখ না, তুমি যদি বা চোখের মায়া ত্যাগ করতে রাজী হলে, তা তোমার বিদ্যেটা নেই, আর যদি বিদ্যে-ওয়ালা কোনো লোক পাওয়া যেত তা হলে সে কখনই আমার ছবি বানাবার জন্যে চোখ খোয়াতে চাইত না।''

আমিনা আবার হাসির লহর তুলে বললে ''যদি লোক জোটে তা হলে তাকে কি বকশিশ দাও?''

নবাবজাদাও হেসেই বললেন ''সব।''

সেদিন গভীর রাতে, উৎসবের দীপের মালা নিভে যাবার পর চম্পা নিজের ঘর ছেড়ে, সেই প্রকাণ্ড আঁধার দালান পার হয়ে বুড়ী পান্নার ঘরে চলল। সেদিন কি জানি কেন বুড়ী পান্নারও চোখে ঘুম ছিল না। হয়ত বা নবাববাড়ীর পুরানো তালাবন্ধ ঘর খুলবার সঙ্গে সঙ্গে তারও মনের কোনো ভুলে-যাওয়া কুঠরীর দরজা খুলে গিয়েছিল। যে দিন সে নিজের নিটোল রূপ যৌবন নিয়ে এই বাড়ীতে ঢুকেছিল, সেই হারানো দিনগুলোর দিকেই মন তার জরার বন্ধন খসিয়ে ফেলে ছুটে যেতে চাইছিল।

চম্পাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বুড়ী জিজ্ঞাসা করলে ''কি নাতনি, এত রাতে যে?''

চম্পা বল্‌লে,''আয়ি, নবাব জাহান আলি খাঁর ছবি যে বানিয়েছিল, তার ছেলে কোথায় গেল?''

বুড়ী অবাক হয়ে চম্পার দিকে তাকিয়ে বললে, ''তার খোঁজে তোর কি দরকার? তার কাছে সেলাই শিখবি নাকি? অমন কথা মনেও করিসনে ভাই, ও কাজ যে হাতে নেয় দু বছরের বেশী তার চোখ থাকে না। বেগম-সাহেবা তোকে যা শিখিয়েছেন তাই ঢের, অতখানিই বা কটা লোক জানে? বুড়োর ছেলে রহমত ত শেষে কানা হবার ভয়ে ও-কাজ ছেড়ে দিলে, দিয়ে দোকানপাট বেচে আগ্রায় চলে গেল। কাশিমের মা বুড়ী, সেদিন আমায় বলছিল যে কাশিম ও-বছর আগ্রায় তাকে দেখে এসেছে।...ও কি নাতিন চললি নাকি?''

চম্পা বুড়ীকে একবার দু হাতে জড়িয়ে ধরে আবার তখুনি ছেড়ে দিয়ে বললে ''হ্যাঁ আয়ি, আসি তবে।''

সে দিন সন্ধ্যা থেকেই আকাশ মেঘে ছেয়ে ছিল, রাত্রে ঝড় বইতে আরম্ভ হল। নবাব-বাড়ীর পুরানো আগাছায়ভরা বাগানে শুক্‌নো পাতার ঘূর্ণি নাচ শুরু হয়ে গেল, আর তাদেরই সহচরীর মত একটি মলিনা তরুণী মূর্ত্তি ঝড়ের মুখে সেই বাগানের ঘাসে ঢাকা পথের উপর দিয়ে দ্রুত পা ফেলে বেরিয়ে গেল। উড়ে-যাওয়া শুক্‌নো পাতারই মত তার আর কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না।

২

বুড়ো রহমতের মতে আগ্রায় এবার যেমন শীত পড়েছে, তার এই ষাট বছরের জীবনের অভিজ্ঞতায় সে আর এমনটি দেখেনি। সেই ষাট বছরের যে ক-বছর সে আগ্রায় কাটিয়েছে তার প্রত্যেক বারেই এই মতটা প্রকাশ করাতে তার মতের মূল্য তার নিজের কাছে ছাড়া আর সবার কাছেই একটু কমে এসেছিল।

আজ সকালে তার উঠতে একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল, অনেক-রকম আক্ষেপোক্তি করতে

করতে যাতে পঙ্গু শরীরখানা দরজার কাছে টেনে এনে বাহিরের রোদের অবস্থাটাকে পরখ করে নিলে, তারপর নিজের জীর্ণ খাটিয়াখানাকে টেনে বের করে আরামে তামাক সাজতে বসল।

তার আড্ডার লোকদের আজ আসতে বড় দেরি হচ্ছে, বুড়োর অম্বুরী তামাকের লোভে এখানে কোনোদিন লোকের অভাব হয় না। তামাক টানতে টানতে তাদের সঙ্গে নিজের পুরানো মনিব-বাড়ীর আমীরিয়ানার গল্প করাই ছিল বুড়ো রহমতের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির প্রথম কর্ম্ম।

আঙিনার মাঝখান অবধি রোদ এগিয়ে এল, এখনও যে কারো দেখা নেই। ঐ যে শিকলটা নড়ে উঠল, এবার তা হলে দলের লোকগুলো আসছে। বুড়ো খাটিয়ার উপর জমিয়ে বসে চোখ বুজে সেই সাবেককালের গড়গড়ার নলে দুটো টান লাগালে।

সদর দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল, আর একজন কে ভিতরে এসে দাঁড়াল। তার বন্ধুদের ভদ্রতার বালাই কোনোদিনই বেশি ছিল না, তাদের কাউকে এমন ধীর মন্থর গতিতে আসতে শুনে কিছু আশ্চর্য্য হয়ে বুড়ো ফিরে চাইলে। হঠাৎ তার কোটরে ঢোকা চোখ বিস্ময়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসবার জোগাড় হল। সাদা গোঁফ দাড়ীতে একেবারে আচ্ছন্ন, ময়লা চাপকান-পরা বন্ধুমূর্ত্তির বদলে এ কে দাঁড়িয়ে? বুড়ো বয়সে চোখের ভুল নাকি? আর একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলে। না, ভুল কেন হবে, ঐ ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ফিরোজা রঙের ওড়নাতে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ছিপছিপে পাতলা একটি মেয়ে ডাগর চোখে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। একি বিশ পঁচিশ বছর আগেকার একটা দিন হাওয়ায় উড়ে এল নাকি? তখন ত এইরকম কত তরুণীমূর্ত্তির নবাববেগমের দূতী হয়ে তার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াত। কি আপদ! মেয়েটা যে নড়েও না, কথাও কয় না, ঠিক ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে! এমন অবস্থায় কি যে করা উচিত তা রহমতের তখনও ঘুমঘোরাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে কিছুতেই চট করে ঢুকছিল না। যা চোখে দেখছে সেটা বাস্তবিকই মানুষ কি না সে বিষয়ে তখনও তার সন্দেহ যায়নি।

হঠাৎ তার কানে একটা কোমল গলায় স্বর এসে পৌঁছল "এই কি রহমত আলির বাড়ী?"

যাক, তা হলে এটা মানুষই বটে, কথা বলছে যখন। বুড়ো হাঁফ ছেড়ে বললে, "হ্যাঁ, আমিই রহমত। তুমি কে, কোথা থেকে আসছ?"

উত্তরে শুনলে, "আমি চম্পা, নবাব-বাড়ী থেকে আসছি।"

আবার নবাব-বাড়ী! আজ দেখছি নেহাৎই তার মাথা খারাপ হয়েছে, তা না হলে হঠাৎ এতকাল পরে নবাব-বাড়ী থেকে একটা মেয়ে এসে কখনও হাজির হয়? আচ্ছা দেখাই যাক না কতদূর গড়ায়। সে জিজ্ঞাসা করলে, "তা তুমি কি চাও, কে তোমায় পাঠিয়েছে?"

"কেউই পাঠায়নি, নিজেই এসেছি, তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

ওঃ, এতক্ষণে ব্যাপার বোঝা গেল, ছুঁড়ি ভিক্ষে চাইতে এসেছে! তা ছেলেমানুষ, তাড়াহুড়ো না দিয়ে ভাল কথায় বুঝিয়ে বিদায় করা যাক,—"তা দেখ বাছা, এমন বাড়ীতে কি কিছু মেলে? দেখছই ত বুড়ো মানুষ, তিনকুলে কেউ নেই, নিজেকেই চেয়ে চিন্তে খেতে হয়; এত যে বয়েস হয়েছে তবু একটা ঝি চাকর রাখি এমন ক্ষমতা নেই, অসুখের দিনে মুখে কেউ এক ফোঁটা জল দেবার নেই। ঐ রাস্তার ওধারে অনেক বড়লোকের বাড়ী, গেলে তারা নিশ্চয়ই কিছু না-কিছু তোমায় দেবে।"

তরুণীর মুখে একটু হাসির আভাস ফুটে উঠল, সে বললে, "আমি টাকাকড়ি কিছুই তোমার কাছে চাইছি না, আমার সে রকম অভাব কিছু নেই। আমি তোমার কাছে জরির ছবি তৈরীকরা শিখতে এতদূর এসেছি, এই আমার ভিক্ষা, আর কিছু না।"

মেয়েটা টাকা চায় না শুনেই বুড়োর মন খুসী হয়ে উঠেছিল,তার উপর জরির কাজ

শেখানো। পৃথিবীর আর সব জিনিসের চেয়ে সে নিজের ঐ কাজটিকে ভালবাসত। নেহাৎ চোখ যাবার ভয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু বিচ্ছেদের কষ্টটা তার কিছু কম হয়নি। তার প্রিয়তমার স্বর্ণময়ী কান্তি অহরহ তার মনকে টান্‌ত, এক এক সময় তার মনে হত চোখের মায়া ছেড়ে দিয়ে আবার তার হাতেই ধরা দেয়। তারপর যত দিন যেতে লাগল, ততই পুরানো স্মৃতি মিলিয়ে আসতে লাগল, এখন সে দিব্যি পাড়ার ছোটলোকগুলোর সঙ্গে মিশে ছোটলোক হয়ে আছে। সে যে নবাব জাহান আলি খাঁর পেয়ারের কারিগর ছিল তা কি এখন তাকে দেখে কেউ বুঝতে পারে?

কিন্তু এতকাল পরে আবার কোথা থেকে তার হারানো যৌবনের দূতী এসে হাজির হয়েছে। একে ত ফেরাতে পারা যায় না! অম্বুরী তামাক উপেক্ষার অভিমানে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল, বুড়ো তখন চম্পাকে জরির ছবির কৌশল বোঝাতে ব্যস্ত।

কিন্তু ও কাজ ত একদিনে শিখবার নয়, আগে অনেক রাস্তা পার হতে হবে তারপর তীর্থের সন্ধান মিলবে। বুড়োর বাড়ীতে কেউ নেই, সেখানে থাকা চলে না। বুড়ী ফাতেমা রহমতের ঠিকা ঝি, তাকেই অনেক খোসামোদ করে টাকাকড়ির লোভ দেখিয়ে চম্পা তার খোলার ঘরে একটুখানি জায়গা করে নিলে।

তারপর একটি একটি করে দিন কেটে যেতে লাগল। চম্পার সারাদিনটা রহমতের বাড়ীতেই কাটত। নবাবজাদার ছবি এখনও আরম্ভ হয়নি, রহমতের সব পরীক্ষায় এখনও সে জয়লাভ করেনি। মখমলের বুকে জরির সুতো দিয়ে লতা, ফুল পাখী আঁকতে আঁকতে, তার মনটা মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে তার সেই চিরপরিচিত বাড়ীতে গিয়ে হাজির হত— সেই অন্ধকার দালানের সামনের ঘর, আর নবাবজাদা সেই ছেঁড়া ফুলের মালার হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে, আর ঐ যে সামনে মৃত নবাবের ছবি ঝুলছে!

রহমতের কর্কশ কণ্ঠ তাকে আবার আগ্রায় ফিরিয়ে আনত, চমকে উঠে সে আবার কাজে মন দিত।

এমনি করেই এক বছর কেটে গেল, তারপর চম্পার শুভদিন দেখা দিলে। তার তৈরি তাজমহলের ছবি বুড়োর ভারি পছন্দ হয়ে গেল। এই ত ঠিক কারিগরী হাত! এবার চম্পা নবাবজাদার ছবি বানাতে পারবে, এখন চোখ থাকলেই হয়।

চম্পার বুকের ভিতর কেঁপে উঠল। চোখ যে তার থাকতেই হবে যেমন করে হোক। রাত্রে কাজ করা সে ছেড়ে দিলে, দিনের বেলা যতক্ষণ আলো থাকত ততক্ষণ একমনে সে কাজ করে যেত। যখন দিনের আলো নিভে আসত, তখন চুপ করে চোখ বন্ধ করে আঁধার ঘরের কোণে পড়ে থাকত। চোখের দৃষ্টির সবটুকুই সে এক জায়গায় দান করে ফেলেছিল, পৃথিবীর আর কোনো জিনিসকে তার ভাগ দিতে সে পারত না।

দিন যত যেতে লাগল, চম্পার সম্বলও তত ফুরিয়ে আসতে লাগল, বুড়ী ফাতেমা এখন মাঝে মাঝে টাকাকড়ি নিয়ে বচসা করে। যার খাওয়া-পরার সংস্থান নেই তার রোজ রোজ অত করে সাঁচ্চা জরি কেনা কেন? সেলাই ত ঝুঁটো জরিতেও করা যায়। চম্পা রাত্রের খাবারের পাট তুলে দিলে, জরি সাঁচ্চাই থেকে গেল। কিন্তু এত করেও বুঝি শেষ রক্ষা হয় না। অনাহারে অপটু দেহ তার ভেঙে পড়তে লাগল। সেলাইয়ে একদিন একটা ভুল করে ফেলাতে রহমত এমন ভাবে তার দিকে তাকালে যে চম্পার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। রহমতের আশঙ্কা বুঝি এবার কাজে খেটে যায়। চম্পা ক্রমেই বুঝতে পারছিল যে তার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে, কিন্তু সে এই ধারণাকে কিছুতেই আমল দিতে চাইত না। কিন্তু আর যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, দিন দুপুরেও সোনালি জরির আগুনের ফিনকির মত রং তার চোখে ঘোলা হয়ে ওঠে। এখনও যে ছবির অনেক বাকী। চম্পা সন্ধ্যেবেলা প্রদীপ জ্বেলে

আবার কাজ আরম্ভ করলে। কিন্তু ভিতরের আলো যার নিভে আসছে, তাকে প্রদীপে কতক্ষণ আলো জোগাবে?

সেদিন উত্তরের হাওয়া দরজায় দরজায় শীতের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে বেড়াচ্ছিল। চম্পা ঘুম থেকে উঠে একবার বাইরে এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। আজ আর হাঁটবার ক্ষমতা নেই, রহমতের বাড়ী যাওয়া হবে না, বাড়ীতেই কাজ করতে হবে। যমুনার নীল ধারা তার চোখে পড়ল, চম্পার মনে হল, এই ক-দিনের অ'দেখাতেই পৃথিবী যেন তার কাছে অপরিচিত হয়ে পড়েছে, আর নতুন পরিচয় করবার সময়ও নেই।

ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আজ আর কাজের তাড়া নেই, দুপুরে বসলেই হবে। তাই চম্পা দাঁড়য়ে-দাঁড়িয়ে নিজের অনেক-কালের উপেক্ষিত সাথীদের চোখের দেখা দেখে নিচ্ছিল। কারো যেন আজ হাসিমুখ নেই, সবাই তার উপর অভিমান করে মুখ বিষণ্ণ করে আছে। রাস্তার ধারের শিশুগাছের পাতা চোখের জলের মত অবিশ্রাম ঝরে পড়ছে, শীতের বাতাস তাদের উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। যমুনারও আজ মুখ আঁধার।

চম্পা দাঁড়িয়ে সেই রাতের কথা ভাবছিল, যখন সে ঝড়ের মুখে আজন্মের বাড়ী ছেড়ে চলে এল।

বুড়ী ফাতেমা এতক্ষণে হুঁকোটা ঘরের কোণে রেখে কাশ্‌তে কাশ্‌তে রহমতের বাড়ী কাজে চলল, চম্পাও ঘরে ঢুকল।

দুপুর বেলা বাড়ীতে একমনে কাজ করে যেতে লাগল। ছবি শেষ হয়ে গেলে আর আগ্রায় থাকবার কোনো দরকার নেই। যাবার আয়োজনও সে সব ঠিক করেই রেখেছিল।

আচ্ছা, আজকে সন্ধ্যেটা কি খুব শিগ্‌গির ঘনিয়ে আসছে, ঘরের ভিতরের আলো কমে এল যে! কিন্তু এইত ফাতেমা খেয়ে গেল। তবে বোধ হয় আকাশে মেঘ করেছে। দরজার কাছে এস চম্পা একবার উপর দিকে তাকালে। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, যেন কার অশ্রুহীন নীল চোখ তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। তবে, তবে কি? এ কি তাই নাকি? এই শেষ? কিন্তু এখনও যে নবাবজাদার চোখে সেই মধুর হাসিটি ফুটে ওঠেনি!

চম্পার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল, এই একটুক্ষণের জন্যে তার সারা জীবনের সাধনা বিফল হয়ে যাবে? তার অবসন্ন দেহ মেজের উপরে লুটিয়ে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে আসতেই সে উঠে বসল। সামনেই ঐ যে তার প্রিয়তমের ছবি, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কেবল চোখের দৃষ্টি এখনও শূন্য অর্থহীন। নিজের জীবন বলি দিয়েও কি শেষে এই হবে? চম্পা প্রাণপণ শক্তিতে উঠে বসল। ঘরের ভিতরের আঁধার ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। সে ছবি নিয়ে দরজার কাছে এসে বসে পড়ল। সোনালী জরির সুতো বিদ্যুতের মত কালো মখমলের গায়ে খেলে যেতে লাগল। যে হাসিভরা চোখের ছবি সে বুকে করে এত পথ বয়ে এনেছিল তাকে এই মখমলের বুকে যে রেখে যেতেই হবে! ঐ যে সেই মোহন হাসিটি নবাবজাদার মুখকে আলোয় ভরে দিয়েছে! চম্পা একবার ছবির দিকে তাকালে, মুহূর্ত্তের জন্যে তার চোখের সামনে সোনালী আলোর ঢেউ খেলে গেল, তারপর সব আঁধার!

৩

তখনও ভোর হতে দেরি আছে। পূবদিকের আকাশ সবে ধূসর হয়ে উঠ্‌ছে, তবে রাত্রির অন্ধকারের নিবিড়তা কমে গিয়ে তারার ম্লান আলো মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। একটা পাৎলা কুয়াসার আবরণ এখনও পৃথিবীর মুখে আধ-ঘোমটা দিয়ে রেখেছে।

মাঠের মাঝখানের সরুপথ ধরে দুটি মানুষ আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। সেই কুয়াশা ঘেরা মাঠে আর কেউ কোথাও নেই, একটা পাখীর ডাকও কানে আসে না। দুজনই স্ত্রীলোক,

একজন বৃদ্ধা, আর একটি তরুণী কি বালিকা সহজে বোঝা যায় না। বুড়ী একহাতে একটা পোঁটলা নিয়ে আর একহাতে মেয়েটির হাত ধরে পথ চল্‌ছিল, তার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। তরুণীর মুখের উপর ঐ চারপাশের কুয়াসারই মত কিসের যেন এক আবরণ পড়ে গিয়েছে, তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। একহাতে সে সযত্নে নিজের বুকের কাছে কাপড়ে জড়ানো কি একটা জিনিষ ধরে রেখেছে।

বুড়ী হঠাৎ ভাঙা গলায় বলে উঠ্‌ল "এখনও ত রাত ভোর হল না, আর ত পারা যায় না। আচ্ছা কাজ নিয়েছি যা হোক্! হ্যাঁ গা, এখন বোসো না একটু, তোমার নবাবদের বাড়ী ঐ ত দেখা যাচ্ছে, ঐ শাদা পাথরের চূড়াওলা বাড়ীখানা ত?"

যুবতী মাথা নেড়ে ইসারায় বল্‌লে—"হাঁ।"

"তবে আর কি। ও আর কতদূরই বা হবে। আধকোশ বড়জোর। রোদ্দুর উঠলে বাকীপথ হাঁটা যাবে এখন, তার আগে ত আর লোকজন উঠবে না এই শীতের দিনে। এখন একটু বোসো বাপু, হাতপাগুলো একটু জিরোক।"

এই মাঠের মাঝখানে নবাববংশের কে একজন অনেককাল আগে সখ করে এক ফলের বাগান করেছিলেন। বাগানের আর সবই লোপ পেয়েছে, কেবল বাকী আছে গোটা কয়েক বড় বড় আমগাছ, আর মালীর ঘরের বিদীর্ণ অস্থিপঞ্জর। সেই গাছের তলায় বুড়ী তার সঙ্গিনীকে নিয়ে হাজির করলে।

বুড়ী বসেই আবার মুখ ছোটাতে শুরু করে দিলে, "হ্যাঁগা বাছা, ফাতেমা বুড়ী যে আমায় আসবার আগে বলেছিল যে তোমার বেশ টাকাকড়ি আছে, তুমি নবাব-বাড়ীর মেয়ে, তুমি তা হলে এত পথ হেঁটে আসছ কেন?"

অন্ধ চম্পা এতক্ষণ তার দৃষ্টিহীন চোখ দিয়ে যেন নিজের এই ফিরে-পাওয়া জন্মভূমিকে চিনবার চেষ্টা করছিল। বুড়ীর কথায় সে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'টাকাকড়ি সবই ফুরিয়ে গেছে। আমি ত নবাব-বাড়ীর মেয়ে নয়, দাসী।"

"দাসী? তাই বলো, আমিও ত তাই ভাবি যে নবাব-বাড়ীর মেয়ের নাকি এমন ছিরি! তা হ্যাঁ গা, তোমার চোখ খোয়ালে কি করে?"

তরুণী একটু ক্ষীণহাসি হেসে বল্‌লে "চোখ আমার দেবতাকে দিয়েছি মা।" হাসি মিলোতে না মিলোতে তার দৃষ্টিহারা চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল।

"আহা, তা কাঁদবেই ত, কাঁদবেই ত। এ বয়সে চোখ যাওয়া কি কম দুঃখের কথা? আমার পিসীটার সত্তর বছর বয়সে চোখ কানা হয়েছিল, তাতেই সে সারাদিন মানুষকে গাল দিয়ে ভূতছাড়া করতো। তোমার ত এই কাঁচা বয়েস। আহা, তাই বুঝি পুরানো মনিববাড়ী ফিরে যাচ্ছ, যদি খেতে পরতে দ্যায়?"

চম্পা বল্‌লে, "হ্যাঁ মা, ঐখানেই আমার শেষ আশ্রয়।"

"আচ্ছা, তুমি সারাদিন ওটা কি বুকে করে নিয়ে থাক গা? গয়না-পত্তর আছে বুঝি কিছু?"

চম্পার মুখে একটা বেদনার আভাষ দেখা দিল, সে বল্‌লে, "না মা, গয়নার চেয়ে এর দাম ঢের বেশী, সারা জীবন দিয়ে আমি এটা পেয়েছি।"

বুড়ী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তার তরুণী সঙ্গিনীর দিকে চাইলে, তারপর আপন মনে বিড়-বিড় করে বললে, "হবেও বা, নবাব-বাড়ীর ঝি, সেখানে কত হীরে মুক্তো গড়াগড়ি যায়, দু-একখানা সরিয়ে থাকবে হয়ত।"

অনেকখানি পথচলার ফলে চম্পা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, বসে-বসে তার ঘুম আসতে

লাগল। একটু পরেই গাছের গোড়ায় মাথা দিয়ে সে মাটির উপর শুয়ে পড়ল। কতক্ষণ যে অঘোরে ঘুমোলো তার ঠিক নেই।

বিকালবেলায় পড়ন্ত রোদের সোনালী আভা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চম্পার মুখে এসে পড়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। সে উঠে বসতেই বুড়ী বলে উঠল "আচ্ছা ঘুম যাহোক তোমার বাছা! চল বাকী পথটুকু পার হয়ে নি, আবার বেশী সন্ধ্যে হয়ে পড়লে পথ চলতে কষ্ট হবে।"

চম্পা দাঁড়িয়ে উঠে বললে "আগে আমার সেই গোলাপী ওড়নাটা দাও মা, এটা পথের ধুলোয় বোধ হয় ময়লা হয়ে গেছে।"

নবাব-বাড়ীর সদর দরজায় তারা দুজন যখন এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, লোকজনের কোলাহলে সেই পাঁচ-মহলা বাড়ী মুখর হয়ে উঠেছে। সব কোলাহলের উপরে শোনা যাচ্ছে নবাবজাদার মহলের হাসির গর্‌রা আর গানের লহর।

চম্পা শাদা পাথরের বিশাল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ীর কানে কানে বললে, "দরজায় যে শান্ত্রী আছে তার হাতে এই টাকাটা দিয়ে বল নবাবজাদার মহলে আমাদের নিয়ে যেতে।"

মার্ব্বেল পাথরের বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে খট্ খট্ শব্দ করে শান্ত্রী এগিয়ে চলল, চম্পা তার পিছনে। এখানে আর তাকে হাত ধরে নিয়ে যাবার দরকার নেই, তার অন্ধ চোখ এখানে তাকে বাধা দেয় না। তার সর্ব্বাঙ্গ যে এখানকে চেনে, চোখ নাইবা থাকল।

চম্পার মনে পড়ল সেই আগেকার দিনে সে কেমন করে সন্ধ্যাবেলা বেগমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই দিকে চেয়ে থাক্‌ত। বেগম বোধ হয় এতক্ষণ সেই গোলাপ-বাগানের জানলার ধারে গিয়ে বসেছেন। আর বুড়ী পান্না? সে কি এখনও বেঁচে আছে? কে জানে?

নবাবজাদার মহলের সিঁড়িতে পা দিয়েই চম্পার বুক কেঁপে উঠল। তার জীবনের নিবিড়তম মুহূর্ত্ত এই যে এসে পড়ল। পা যে আর চল্‌তে চায় না, তার এতদিনের সঞ্চিত সাহস কোথায় হারিয়ে গেল? কত কথা বলবে বলে ঠিক করে এসেছিল, তার একটাও আর মনে পড়ে না কেন?

নবাবজাদার ঘরের দ্বাররক্ষকের হাতে শান্ত্রী চম্পাকে সঁপে দিয়ে আবার খট্ খট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

দ্বাররক্ষক চম্পার দিকে একবার তাকিয়ে বললে, "এসো গো আমার সঙ্গে।"

পা আর ওঠে না, কিন্তু দেরি করবারও সময় নেই। ঐ যে তার পথপ্রদর্শক এগিয়ে চলেছে। দুই হাতে তার অমূল্য ধনটিকে বুকে চেপে চম্পাও তার পিছনে পিছনে চল্‌ল।

এইবার সে ঘরে এসে পৌঁছেচে, পায়ের তলার নরম গালিচা আর আতরের আর ফুলের মিশ্রিত সুগন্ধই তাকে তা জানিয়ে দিলে।

দারোয়ান কুর্নীশ করে বললে, "জাঁহাপনা, এক কানা ভিখিরী মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

এইবার ঘরের সব লোকের চোখ তার উপর পড়েছে। কেউ কি তাকে চিন্‌বে? কেউ না, সে ত এ মহলে কখনও আসেনি। নবাবজাদাও না, তিনি তাকে একদিন মাত্র রাত্তিরে দেখেছিলেন।

কে একজন এগিয়ে এল। এই ত! এ পায়ের শব্দ কি চম্পা চিন্‌বে না? এই যে সেই গলার স্বর "কি গো, কি চাও?"

এত কথা বলবার ছিল, সব গেল কোথায়? চম্পার চোখের দৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে যেন কথা কইবার শক্তিও চলে গিয়েছে। আবার প্রশ্ন হল "কি চাইতে এসেছ?"

চম্পা প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করে অস্ফুটকণ্ঠে বললে, "কিছু চাই না, দিতে এসেছি!"

ঘরে একটা বাক্যহীন বিস্ময়ের ঢেউ খেলে গেল, সেটা দৃষ্টিহীনা চম্পা যেন তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করলে। নবাবজাদা একটুখানি ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হেসে বললেন, "তাই নাকি? আচ্ছা, কি দেবে দাও।"

নিজের ওড়নার ভিতর থেকে চম্পা তার সেই বহুযত্নে রক্ষিত মোড়কটি কম্পিত হাতে তুলে ধরলে। নবাবজাদা সেটা তার হাত থেকে তুলে নিলেন।

চম্পা আর দাঁড়াতে না পেরে বসে পড়ল। তার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। এই বুঝি মোড়কটার বাইরের আবরণ খসে পড়ল! এইবার তার পাওনার সময়, তার নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়ে গেছে, এইবার দেবতার বরদানের পালা! চম্পার অন্ধ চোখ আকুল আগ্রহে বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

ওকি, ওকি! "হাঃ হাঃ, হাঁঃ হাঃ," সমস্ত ঘর ভরে একটা বিদ্রূপের হাসির রোল উঠল যে! চম্পার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। এই তার প্রাপ্য? তার সারা জীবনের মূল্য এই বিদ্রূপের হাসি?

নবাবজাদার একজন অনুচর মোটা গলায় বলে উঠল "ছুঁড়ি ক্ষ্যাপা নাকি। নবাজাদাকে কতগুলো ছেঁড়া ন্যাকড়া উপহার দিতে এসেছে।"

"ছেঁড়া ন্যাকড়া!"

ওগো এ কোন নিষ্ঠুর দানবের পরিহাস?

কোন্ ডাকিনীর মন্ত্রে তার চিরজীবনের সাধনার ধন এত তুচ্ছ হয়ে গেল?

চম্পা কাঁপতে কাঁপতে সেই গালিচার উপর লুটিয়ে পড়ল, ভিতর-বাইরের সব আলো তার আজ এক পলকে নিভে গেল।

নবাবজাদা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন "আঃ কি আপদ! ওরে, কে আছিস, এটাকে এখান থেকে নিয়ে যা। এইখানেই মরে গেল নাকি!"

তাঁর এক মোসাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "সকালে এক বুড়ী ভিখিরীর কাছে অমন খাসা তসবীর মিলল, ভাবলাম সন্ধ্যেয় না জানি ছুঁড়ির কাছে কি মিলবে। সাধে কি লোকে বলে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট!"

নবাবজাদা তাঁর অনুচরদের নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। চম্পার দেহ সেইখানেই পড়ে রইল। সে তার নিজের চোখের শেষ জ্যোতিকণা দিয়ে যে ছবির চোখের জ্যোতি ফুটিয়ে তুলেছিল, পাশের দেয়াল থেকে ছবির সেই হাসিভরা চোখ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

মূক সাথী।। শ্রীরাধারাণী দেবী

হেমন্তের কুহেলিগুণ্ঠিত রাত্রি।

শুভ্র জ্যোৎস্নাধারায় এতটুকুও উজ্জ্বলতা নেই,—হিমকুয়াশায় শুক্লা-চুতর্দ্দশীর চন্দ্রকিরণ ম্লান, নিষ্প্রভ।

নির্জ্জন ছাদের কোণে মিণ্টু কোলের ভিতরে আঁচল চাপা দিয়ে কি যেন একটা জিনিস সযত্নে লুকিয়ে নিয়ে বসে ছিল। মাঝে মাঝে আঁচলের ভিতরে নিজের ছোট্ট কচি হাতখানি পুরে'—তার গায়ে সযত্নে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

নীচের তলা থেকে তখন ডাকাডাকি শোনা যাচ্ছে—মিণ্টু মিণ্টু—ও মিণ্টি—কোথায় গেল বল্ তো হতভাগা মেয়েটা—

ছাদের কোণে মিণ্টুর কানে সে ডাক যে পৌঁছায়নি তা নয়—কিন্তু তার নীচে নামবার আগ্রহ ছিল না বলে এই ডাকের কোনও সাড়া দিলে না—বরং আঁচল ঢাকা জীবটিকে দ্বিগুণ স্নেহে নিজের বুকটির কাছে চেপে—নেড়ে চেড়ে দোলা দিয়ে—গায়ে হাত বুলিয়ে—তারই প্রতি মনোনিবেশ করলে।

ছাদের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং তার পরই একটি কিশোরী মূর্ত্তি ছাদের উপরে এসে দাঁড়াল।

ঝাপ্‌সা চাঁদের আলোয় ছাদের একটেরে কোণটিতে নীলাম্বরী পরা ছোট্ট মানুষটিকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েই সে উৎসাহিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো—ও ছোড়দা—মিণ্টু এই যে ছাদে বসে রয়েচে—তুলোকে নিয়ে—

অদৃশ্য হিমকর্ণা বর্ষণে সমস্ত ছাদ বেশ সিক্ত ও ঠাণ্ডা কন্‌কনে হয়ে উঠেছিল।

মিণ্টুর দিদি সরলা এগিয়ে গিয়ে কঠোর শাসনের সুরে বল্‌লে—এই দারুণ হিমে যে ছাদে বসে রয়েছিস—জ্বর হলে কে তোকে দেখবে?...

সরলা মিণ্টুর চার বৎসর মাত্র আগে পৃথিবীতে এসেছে! এই চার বৎসর পূর্ব্বে আসার বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার দাবী নিয়ে সে যখন-তখন তার ছোট দুটি ভাই-বোন মিণ্টু ও মঞ্জুর প্রতি শাসন ও উপদেশ সম-পরিমাণেই বর্ষণ করে থাকে।

আজও তাই সরলা ডান হাতখানি বাড়িয়ে পাঁচটি আঙুল দিয়ে মিণ্টুর ছোট্ট কাণটিতে সজোরে পাক দিয়ে দিলে।

অত জোরে কাণমলা খেয়েও মিণ্টুর নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। গোঁ ভরে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌ল—তোমরা সবাই মিলে কেন আমার তুলুকে মারলে? ও কক্ষনো ক্ষীরপুলি চুরি করে খায়নি! নিশ্চয় আর কেউ খেয়েচে!...

ইতোমধ্যে সরলা কর্ত্তৃক আহূত 'ছোড়দা'ও ছাদের উপর উঠে এলেন।

—আবার বুঝি সেই হতভাগা বেড়ালটা এসে জুটেছে?

রোসো, দেখাচ্ছি মজা—বলতে বলতে ছোড়দা সদর্পে মিণ্টুর দিকে অগ্রসর হলেন!

মিণ্টু নিঃশব্দ ব্যাকুলতায় আঁচল-ঢাকা বিড়াল-শিশুটিকে নিজের বুকের নীচে সন্তর্পণে দুহাত দিয়ে আগলে রেখে মিনতি-করুণ কাতর কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—ছোড়দা, দুটি পায়ে পড়ি তোমার—তুলুকে আর মেরো না!...

ছোড়দা মিণ্টুর একখানি হাত ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে ধরে ধমকের সুরে বল্‌লে—শীগ্‌গীর নেমে আয় তা'হলে নীচে—

মিণ্টু কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে—ছেড়ে দাও,—আমি আপনিই নীচে যাচ্ছি!...কিন্তু তোমরা তুলুকে আর ঠ্যাঙাবে না বলো?—

ছোড়দা রুখে উঠল—ঠ্যাঙাবো কেন?...এইবার এক দিন ওকে গুলি করে আপদ চুকিয়ে দেব।

সরলা ব্যঙ্গস্বরে বললে—না, ঠ্যাঙাবে না—আরও বেশী করে ক্ষীরপুলি তৈরী করে খাওয়াবে!...

আট বছরের মিণ্টুরাণী তার প্রিয় বিড়ালছানার গাটি তুলোর মত কোমল ও ধব্‌ধবে শাদা দেখে নাম রেখেছিল—তুলো বা তুলু।

নবনীত-শুভ্র কোমল সুন্দর কাবুলি বিড়াল। গায়ের নরম লোমগুলি যেন ব্রাশ্‌ করা সুবিন্যস্ত শাদা তুলা।

চকচকে উজ্জ্বল চোখ দুটি মাণিকের মত জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে।

গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত গোলাপী রংয়ের পাত্‌লা জিভখানির আগাটুকু দিয়ে চুক্‌ চুক্‌ শব্দে দুধ খায়।

ফুটন্ত যুঁই ফুলের ঠাস্‌ গোড়েমালার মত মোটা শুভ্র লেজটির অহরহ সচঞ্চল লীলায়িত ভঙ্গীটুকু অতি সুন্দর!

তুলুতে ও মিণ্টুতে অগাধ প্রণয়।

সকালবেলা মিণ্টু বাইরের ঘরে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে মাদুর পেতে পড়তে বসে। তার ডুরে শাড়ীর আঁচলের কোণে বাঁধা ক্ষুদে ক্ষুদে চাবি গাঁথা ছোট্ট রিংটি পিঠের উপরে দুলতে থাকে।

তুলু মিণ্টুর পিঠের উপবে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে তার চাবি বাঁধা আঁচলখানি নিয়ে খেলা করে।

মিণ্টু পড়ায় ভুল করলেই তুলুকে ধমক্‌ দিয়ে ওঠে—এই তুলো,—পড়তে দিবিনে নাকি? রোস্‌ দেখাচ্চি মজা—

তুলুর কাণ ধরে' পিঠের দিক থেকে সামনে টেনে নিয়ে এসে নিজের ছোট কোল্‌টির ভিতর ফেলে—তার মাথায় গোটা দুই থাপ্পড় কষিয়ে বলে—চুপ করে শুয়ে থাক্‌—একটুখানি নড়্‌বি যদি,—কান মলে ছিঁড়ে দেব!

মিণ্টুর কোলের মধ্যে কুণ্ডুলি পাকিয়ে তুলু বাধ্য শান্ত শিশুটির মত চুপ করে পড়ে থাকে!

হঠাৎ দেখলে ভ্রান্তি হয়—পেঁয়াজী ডুরে শাডীর উপরে বুঝি খানিকটা পরিষ্কার ধোনা-তুলোর ডেলা পড়ে আছে।

শরৎকালে ভোরবেলায় বাগানের বেড়ার ধারে শিউলীগাছের তলায়—মিণ্টু চুব্‌ড়ি হাতে ফুল কুড়ুতে যায়। সঙ্গে থাকে তুলু।

শিশির ভেজা সবুজ দূর্ব্বাদলের উপরে ঝরে পড়া টাট্‌কা ফুলের নিবিড় আল্‌পনা আঁকা। শাদা পুষ্পাস্তরণের ফাঁকে ফাঁকে দূর্ব্বার সবুজ বং উঁকি দেয়।—শিউলি বৃন্তেরা-শাদা ও

সবুজের মাঝে বাসন্তী রংয়ের বুটি ফুলিয়ে ফুলবাসরের সৌন্দর্য্য অনিন্দ্য করে তোলে।

মিণ্টু আঁচল ভরে ফুল কুড়ুতে কুড়ুতে তুলুর সাথে অনর্গল বকতে থাকে!

—তুল্ তুল্,—এত বড় হয়েছিস কিন্তু একটুও কাজ কর্ম করতে শিখলি না আজো! তোর দ্বারা বাপু আমি একটিও কাজ পাই না—আর কি ছোটটিই আছিস? এখন একটু বুদ্ধি-বিবেচনা করতে শেখ্—

তুলু মিণ্টুর সুদপদেশে বিশেষ কর্ণপাত না করে ঝরা ফুলগুলির উপরে ছুটাছুটি করে ইঁদুর শিকারের ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে খপ্ করে হয় তো একটা শিউলি ফুল তুলে নেয়। তার পর সেটিকে সাগ্রহে সোৎসুক ভাবে নেড়ে চেড়ে শুঁকে ফেলে দিয়ে—আবার আর একটা ঝরা শিউলি শিকারে মন দেয়।

মিণ্টু হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে—শুঁকছিস কি রাক্ষুসি! ...ও কি মাছ, যে কুপ্ কুপ্ করে খাবি?—

তারপর রোষভরে ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে—এই, সরে যা বলছি! ফের যদি ফুল নষ্ট কর্‌বি তো খুন করে ফেলবো।

মিণ্টুর বৌদিদি রাগ করে এসে শাশুড়ীর কাছে নালিশ করে—মা, ছোট্‌ঠাকুরঝির আদরের বেড়াল আমার খোকার দুধে মুখ ঠেকিয়েচে! ঠাকুরপোকে দিয়ে এক দিন ওকে মার্ না খাওয়ালে ওর আস্পদ্দা দিন-দিন বেড়ে চলেচে।

শাশুড়ী বলেন—দুধ একটু সাবধানে রাখতে হয় মা। ঢেকে রাখলেই ল্যাঠা থাকে না।

বৌমা মুখ ভারী করে চলে যান্।

সন্ধ্যাবেলায় মিণ্টুর ছোড়দা বীরু এসে—হঠাৎ তুলুকে খুঁজে বেড়ায়। হাতে লম্বা ছিপ্‌টি।

মিণ্টুর শোবার ঘরে মিণ্টুর বিছানার ভিতরে তুলুকে আবিষ্কার করে দরজা বন্ধ করে বীরু ছিপটি দ্বারা তুলুর শাস্তি বিধান করে।

তুলুর আর্ত্তনাদ শুনে মিণ্টু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে রুদ্ধ দ্বারের উপর আছড়ে পড়ে। ব্যাকুল কান্নায় কাকুতি মিনতি করতে থাকে—ও' ছোড়দা,—তোমার পায়ে পড়ি,—তুলুকে আর মেরো না গো—মরে' যাবে—

মিণ্টুর ছোটভাই মঞ্জুর টাইফয়েড্ হয়েছে।

মায়ের ম্লান মুখখানির উপরে চিন্তার নিবিড় কৃষ্ণ ছায়া ঘনিয়ে আছে।

বাড়ীশুদ্ধ সকলেই চিন্তিত, উদ্বিগ্ন।

মিণ্টু সদা সর্ব্বদা তুলুকে আগলে কাছে-কাছে রাখে। পাছে সে রোগীর ঘরের দিকে যায়—কিম্বা ডাকে। বিড়ালের ডাক অমঙ্গলের লক্ষণ।

নির্জ্জন স্থানে তুলুর সাথে নিভৃতালাপ করতে করতে মিণ্টু তাকে সতর্ক করে দেয়—তুল্‌তুল্—খবরদার! টুঁ শব্দটি ক'রবি না! বুঝেছিস? মঞ্জুর ভারী অসুখ করেচে—এখন যদি তুই ডাকিস—ছোড়দা আর দাদা তোকে গলা টিপে মেরে ফেলবে! বুঝতে পারছিস্ তো?

তুলু সে কথা বোঝে কি না বোঝা যায় না। তবে পরম আরামে পালয়িত্রীর ক্রোড়ের ভিতরে পদচতুষ্টয় গুটিয়ে গোলাকার ভঙ্গীতে শুয়ে গম্ভীর মুখে কাণ খাড়া করে শোনে। মাঝে মাঝে মাথাটি নত করে কোলের উপরে নাক মুখ ঘষে মনের খুশী জানাবার চেষ্টা করে।

রৌদ্র-উজ্জ্বল স্তব্ধ মধ্যাহ্নের সুদীর্ঘ অবসর-ক্ষণ মিণ্টু বিড়াল-শিশুর সাথে চঞ্চল ক্রীড়ায় আনন্দে অতিবাহিত করে।

তুলুর বসা, হাঁটা, ছুটাছুটি, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমানোর ধরণটুকু, সর্ব্বাঙ্গ ধনুকের মত বাঁকিয়ে উঁচু হয়ে উঠে রোমাঞ্চিত দেহে হাই তুলে আলস্য ভাঙার মধুর ভঙ্গিমাটি, উড়ন্ত মাছি শিকারের বিচিত্র লম্ফঝম্ফ—যা' কিছু সবই মিণ্টুর নয়নে অপরূপ মনোমুগ্ধকর রূপে প্রতীয়মান হয়।

দুপুরবেলা এক দিন মা কি-যেন দরকারে মিণ্টুর খোঁজ করেন।

মিণ্টু তখন বাগানের দিকে কুয়ার সান-বাঁধানো উঁচু চাতালে বসে তুলুর সাথে বিশ্রম্ভালাপে তন্ময়।

মিণ্টুর দিদি সরলা সারা বাড়ী খুঁজে হায়রাণ হয়ে—বাগানের ধারে কুয়ার পাড়ে মিণ্টুকে বিড়ালসহ দেখতে পেয়ে তখনি উদ্দীপ্ত রোষে মিণ্টুর পিঠে ঘা'কতক কষিয়ে দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—অতবড় মেয়ে—দিনরাত্রি খালি বেড়াল নিয়ে খেলা করা!—চল্, মা ডাকছেন,—আজ তোর খেলা-করা একেবারে ঘুচবে।

মিণ্টু অশ্রুনিষিক্ত অপরাধ-কুণ্ঠিত মুখে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই—ছোটদাদা বীরেন তার কাণটি ধরে টেনে নরম ফুলো ফুলো গাল দু'টির উপরে ঠাশ্ ঠাশ্ শব্দে দু'তিন ঘা চড় কষিয়ে দিয়ে বললে—বুড়োধাড়ি মেয়ে ছোট ভাইটির এত অসুখ,—এখন দিনরাত বেড়াল নিয়ে খেলিয়ে বেড়ানো হচ্ছে!...আপদের মূল বেড়ালকে বাড়ী থেকে না বিদেয় করলে হবে না!—

মাও আজ মিণ্টুকে তীব্র ভর্ৎসনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রহৃতা মিণ্টুর অশ্রুআপ্লুত করুণ মুখখানির পানে তাকিয়ে তাঁর অপ্রসন্নতা ছায়ার মত মিলিয়ে গেল।

স্নিগ্ধ চক্ষে কন্যার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লেন—বড় হচ্ছ মা,—সব সময়েই কি খেলা করতে হয়? ছোট ভাইটির অসুখ,—তার কাছে এসে বসতে হয়, সেবা-যত্ন করতে শিখতে হয়। মেয়েমানুষ যে তুমি!

ছোটদাদা এবং দিদির তীব্র ভর্ৎসনা ও প্রহারের চেয়ে মায়ের এই মিষ্ট সস্নেহ উপদেশে মিণ্টু মনে মনে অপরাধকুণ্ঠিত অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

বীরু অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলে—মা আর দাদার অতিরিক্ত আদরে-আদরেই তো মেয়েটি উচ্ছন্নয় যাচ্ছে!

টাইফয়েড্ ব্যারাম সংক্রামক।

মঞ্জু ভাল হয়ে উঠলো কিন্তু মিণ্টু জ্বরে পড়লো।

জ্বরে টাইফয়েডের দুর্লক্ষণগুলি দিনের পর দিন ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে লাগল।

সন্ধ্যাবেলা মিণ্টু মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে সবেমাত্র একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে!... মা তার মাথায় বরফের ব্যাগটি ধরে বসে আছেন।

ঘরের দরজার বাইরে দালানে করুণ স্বরে ডাক'শোনা গেল—মাঁ—য়ু—

মা তাড়াতাড়ি সন্তর্পণে বরফের ব্যাগটি মিণ্টুর মাথা হতে নামিয়ে রেখে পা টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, চাপা গলায় তাড়না ক'রলেন—হুট্—হুট্—দূর হ'—

তুলু নিঃশব্দে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল। মা ফিরে এসে আবার মেয়ের মাথায় বরফের ব্যাগ ধরে' বসলেন।

কিন্তু আবার খানিক বাদে দরজার বাইরে হ'তে শব্দ এলো—মীঁ—উ—

মা উঠে গিয়ে বড় ছেলে নরেনকে ডেকে বললেন—নরু, অলুক্ষুণে বেড়ালটাকে মেরে বিদেয় করে দে তো বাবা! দিন রাত ম্যাঁও মাঁও করে ডেকে ডেকে বাড়ীতে ছেলেপিলের রোগ ধরিয়ে তবে ছাড়লে!

নরেন বল্‌লে—কিন্তু মিণ্টু যে এখুনি ওকে খুঁজবে মা! তুলোকে দেখতে না পেলে সে কেঁদে কেটে অস্থির হবে। শেষে টেম্পারেচার বেড়ে মাথায় রক্ত উঠে যাবে!...ওকে তাড়িয়ে কাজ নেই।

মা অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠলেন—কিন্তু বেড়ালের ডাকে বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ হয়ই,—এ একেবারে নিঃসন্দেহ কথা! তার উপরে ঐ হতভাগা বেড়ালটা আবার এমন কান্নার সুরে ডাকে যে, আমার শুনলে বুক কাঁপে! বেড়াল-কাঁদা ভারী অ-কল্যাণ!

নরেন লাঠী নিয়ে সারা বাড়ী ঘুরে ঘুরে তুলুকে মার্‌ধর্ করে তাড়িয়ে বাড়ী ছাড়া করলে।

কিন্তু আবার গভীর নিশুতি রাত্রে মিণ্টুর ঘরের ভেজানো দরজাটির বাইরে মৃদুচ্চারিত কণ্ঠের সকরুণ সুরে ডাক শোনা গেল—মীঁ—উঁ-উঁ-উ—

মিণ্টু ঘুমোয়নি। যাতনায় ছট্‌ফট্ করছিল।

'মিঁউ' শব্দ কানে যাবা-মাত্র সচকিতে উৎকর্ণ হয়ে উঠে চোখ মেলে মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—মা, তুলু ডাকচে, নয়? তুলুকে আমার কাছে আসতে দাও মা,—ও' আমার জন্যে কাঁদচে—

মা অপ্রসন্ন মুখে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তুলু মা'র পানে তার উজ্জ্বল চোখের জ্বলন্ত মণি দু'টির দৃষ্টি স্থির রেখে, লেজটি ও কাণ দু'টি খাড়া করে দ্বিধাপূর্ণ ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘরের ভিতরে ঢুকলো না।

তুলুর দিকে রোষ-তিক্ত দৃষ্টি হেনে—মা বিরস মুখে নিঃশব্দে পুনরায় মিণ্টুর পাশে গিয়ে বসলেন।

অনেকক্ষণ নিষ্কম্প ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর তুলু আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দ পাদক্ষেপে—সতর্ক ভঙ্গীতে সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে মিণ্টুর খাটের কাছে গিয়ে, একেবারে তার বিছানার উপরে উঠে পড়লো। মিণ্টুর পাঁজরার পাশটি ঘেঁষে' তার গায়ের বালাপোষ খানিতে নিজের মাথা ঘষ্‌তে লাগল।

রুগ্না মিণ্টুর সামনে তুলুর সম্বন্ধে কোনও আপত্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করতে কেউই পারে না। বাড়ীশুদ্ধ সকলেই জানে তুলু মিণ্টুর কতখানি প্রিয়।

রোগীর ঘরের বাইরে মিণ্টুর ছোড়দা বীরেন বলে—রুগীর বিছানায় অমনতর লোমওয়ালা বেড়াল রাখা ভাল নয়!

মা শঙ্কিত মুখে বলেন—কী ক'রবো বাবা! হতভাগা বেড়াল মোটে নড়তে চায় না। আজ ন'দিন মিণ্টুর অসুখ করেছে,—তা ও একরকম খাওয়া দাওয়াই ছেড়ে দিয়েচে!...কাল দুপুরে বৌমাকে বল্‌লুম—না খেয়ে শেষে কি বাড়ীতে একটা জীব হত্যে হবে? ওকে এক বাটী গরম দুধ দাও! বৌমা দুধ এনে দিলে, কিন্তু সে দুধ মোটেও' ছুঁলে না। শুঁকে' সরে গেল। ক'দিনই কিছু খাচ্চে না দেখে আজ সকালে বৌমা মিণ্টুর বিছানার পাশে টেবিলের উপরে এক বাটী দুধ রেখে এলো। মিন্টু আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে বল্‌লে—তুলু দুধ খা'—তখন দেখি, আস্তে আস্তে টেবিলের উপরে উঠে চক্ চক্ করে সব দুধটা খেয়ে বাটিটা চেটে ঝক্‌ঝকে করে তুল্‌লে।

সরলা বললে—ওঁর নবাবের মতন মুখ। আমি সেদিন পাতের মাছের কাঁটা নিয়ে খাওয়াবার জন্যে, এত চেষ্টা ক'রলুম, মোটে ছুঁলে না।

বড় ভাই নরেন গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে বললে—না, না, টাইফয়েড রোগীর বিছানায় বেড়াল রাখা ভাল নয়।

নরেন ফোর্থ ইয়ারে ডাক্তারি পড়ে।

মা চিন্তিত মুখে বললেন তা' হ'লে বাপু ওকে তোরা নদীর ওপারে বিদেয় করে দিয়ে আয়! বাড়ীতে থেকে মিণ্টুর কাছে যেতে না পেলে, ও' কেঁদে কেঁদে অকল্যাণ বাধাবে।

তার পরদিনই, তুলুকে মিণ্টুর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে চুপি চুপি নদীর ওপারে বিদেয় করে দেওয়া হল!

মিণ্টু সদা সর্ব্বদাই তুলুকে খোঁজে। সকলে মিলে তাকে নানান্ মিথ্যা স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে রেখে দেয়।

সতেরো দিনে মিণ্টুর জ্বর ছাড়ল। জ্বর ছাড়ার পরে সে তুলুর জন্য আরও ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তুলুর বিরুদ্ধে এরা যে একটা-কিছু ষড়যন্ত্র করেছে, তার একটা অস্পষ্ট অনুমান তার মনের ভিতর দৃঢ় হয়ে ওঠায় সে শঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

রাত্রি তখন প্রায় দু'টা বাজে। মিণ্টুর শিয়রের কাছে পাখা হাতে মা নিদ্রাবেশে ঢুলে পড়েছেন। উপর্য্যুপরি বহু রাত্রি উৎকণ্ঠা-পূর্ণ জাগরণের পর এখন কতকটা নিরুদ্বিগ্ন হওয়ায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গে নিদ্রা যেন নিবিড় ভাবে জড়িয়ে এসেছে!

মিণ্টুও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিস্তব্ধ অবশ ভাবে পড়েছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে শব্দ ভেসে এলো —মিঁ—উঁ—উঁ—

যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে মৃদু কুণ্ঠিত সুরে দূর থেকে কে তাকে ডাক্‌ছে!

মুহূর্ত্তেই মিণ্টুর পাতলা তন্দ্রাটুকু ভেঙ্গে গেল এবং সে সচকিতে চক্ষু মেলে উৎকর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

আবার অত্যন্ত আস্তে আস্তে মৃদু অথচ স্পষ্ট ডাকটি শোনা গেল!—মিঁ-উ-উ-উ—

সে সুরে যেন ভীরু কুণ্ঠা ও ভয় জড়িয়ে আছে!

মিণ্টু নিঃসন্দেহ হল—এ তুলুরই গলার আওয়াজ!

ঘরের ভিতরে ল্যাম্পের নীল কাচাবরণের ভিতর হতে মৃদু স্নিগ্ধ নীলাভ আলো সারা ঘরখানি আধ আলো আধ-ছায়ায় ভরে রেখেছে! ঘড়ির 'টিক্ টিক্' শব্দ ছাড়া আর কোথাও কিছু সাড়া-শব্দ নেই।

মিণ্টু আস্তে আস্তে বাহুতে ভর্ দিয়ে বিছানার উপরে উঠে বস্‌লো।

তার রক্তলেশশূন্য বিবর্ণ পাঙাশ মুখখানি ও কোটরপ্রবিষ্ট নিষ্প্রভ চক্ষু দু'টি তখন অস্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।...আবার শব্দ এলো—মিঁ—উ—

মিণ্টু খাট হতে আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে মেঝেয় নামল। নামতে গিয়ে মাথা একবার টলে গেল! খাটের বাজু ধরে কোনও রকমে পতনের বেগটা সামলে নিয়ে তারপর দেয়াল ধরে ধরে—টলে' টলে' এলোমেলো পাদবিক্ষেপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। পায়ের আঙুল থেকে উরু পর্য্যন্ত থর্‌থর্ করে কাঁপছে,—সর্ব্বাঙ্গ অবশ বোধ হচ্ছে।

বিপুল মানসিক উত্তেজনা বশে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে মিণ্টুর দুর্ব্বল শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে অসাড় হয়ে এলো,—চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলো—

ঠিক সেই সময়ে সিঁড়ির দিক হতে সকরুণ কাতর শব্দ এলো—মীঁ—য়ু

বহমান বাতাস স্পর্শে কচি কলাপাতের মত, মিণ্টুর শীর্ণ তনুখানি তখন থর্‌থর্ করে'

কাঁপছে!—পা'দু'টি প্রায় দুমড়ে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে,—কাণে ঝিঁঝির ডাকের মত শব্দ,—চোখের সামনে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হলদে বিন্দু ঘুলিয়ে উঠ্‌ছে!—

তবুও সে প্রাণপণ আগ্রহে ও উত্তেজনায় কেবল মাত্র মনেরই শক্তিতে সিঁড়ির দিকটাতে এগিয়ে গেল।

দেয়ালের অবলম্বন ছেড়ে সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই—পা' টলে' মাথা ঘুরে' একেবারে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

ভারী বস্তু পতনের একটা শব্দ—ও সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল ক্ষীণ কণ্ঠের একটি অস্ফুট আর্ত্তনাদ—

মায়ের নিদ্রা টুটে' গেল।

চম্‌কে জেগে উঠে দেখেন—বিছানা শূন্য,—মিণ্টু নেই।

যে-দুর্ব্বল রোগী অপরের সাহায্য ব্যতীত নিজের শক্তিতে পাশ ফিরে শুতে পর্য্যন্ত পারে না—সে যে বিছানা ছেড়ে উঠে—ঘরের বাইরে চলে যেতে পারে এ' যেন কল্পনারও অতীত!

মা পাগলিনীর মত বিস্রস্ত বেশ-বাসে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

মায়ের ভীতি-ব্যঞ্জক চীৎকারে বাড়ীর সবাই জেগে উঠ্‌ল।

নিরুদ্বিগ্ন দ্বিপ্রহর রাতে সুষুপ্তিমগ্ন অন্ধকার বাড়ীখানি সচকিতে জাগ্রত ও আলোকিত হয়ে উঠ্‌ল।

তারপর ছুটাছুটি—শঙ্কা-ব্যাকুল কণ্ঠের ডাকাডাকি—ডাক্তারের বাড়ী দৌড়ানো—ডাক্তার আসা প্রভৃতি পর্ব্ব প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে চল্‌ল।

ভোরের সদ্যঃবিকাশ লগ্নে—পূর্ব্ব দিক যখন সবেমাত্র স্বচ্ছ হয়ে উঠছে—মিণ্টুর মায়ের বুকফাটা কান্না সুষুপ্ত পল্লী সচকিত করে তুল্‌লো।

পাঁচ-ছয় ধাপ গড়িয়ে, সিঁড়ির বাঁকের মুখে চাতালে ঘাড়মুখ গুঁজে মিণ্টু পড়ে গিয়েছিল। দুর্ব্বল দেহে মাথায় প্রবল আঘাত লেগে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে নাক দিয়ে বেগে রক্ত ছুটতে থাকে। তারপর কয়েক ঘন্টার মধ্যে সব শেষ!

মিণ্টুকে দাহ করে' তার ভাইয়েরা যখন বাড়ী ফিরে এলো—সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে! সারা বাড়ী অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ। চারিদিক যেন দারুণ ফাঁকা-ফাঁকা!

শুধু একতলার একখানি কোণের ঘরের ভিতর হতে শোকাতুরা মায়ের শ্রান্ত অবসন্ন কণ্ঠের ক্ষীণ করুণ কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে—ওমা মিণ্টু—ফিরে আয় মা,—আর আমি তোকে রেখে ঘুমিয়ে পড়বো না! আর তোকে তোর তুলুর জন্যে বোক্‌বো না মিণ্টু —ফিরে আয়—

সন্ধ্যার পরে সদ্যঃশোকাহত আত্মীয় ক'টি—ভাই বোন বধূ সকলে মিলে একত্রিত হয়ে এক জায়গায় বসে গত রাত্রির দুর্ঘটনার সম্বন্ধে বিষণ্ণ মন্থর আলোচনা চলছিল।

প্রত্যেকেরই মুখে চোখে গভীর শোকের ছায়া সুস্পষ্টতর।

এমন সময়ে সিঁড়ির থেকে আর্ত্ত কান্নার সুরে বিড়ালের ডাক শোনা গেল।—ম্যাঁ—ও-ও-ও—ম্যাঁ—ও-ও-ও—

মিণ্টুর বড়দাদা নরেন আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন—ঐ সেই সর্ব্বনেশে বেড়ালটা আবার এসেচে—

মিণ্টুর বৌদিদিরও মুখে আতঙ্কের ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ক্রোড়ে শায়িত শিশুটিকে

সন্তর্পণে বুকের উপরে তুলে নিয়ে স্বামীর দিকে একটু এগিয়ে ঘেঁষে সরে গিয়ে ভীতিবিহ্বল অস্ফুট কণ্ঠে বল্‌লে—উঃ, কী ভয়ানক ডাক ডাক্‌চে—

সরলা উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে—ও' বেড়াল নয়, যমদূত এসেছে! আমাদের সবাইকে খাবে তবে এই বাড়ী ছাড়বে!

সরলা সিঁড়িতে গিয়ে দেখলে—সিঁড়ির যে চাতালটার উপরে মিণ্টু গতরাত্রে দোতলা থেকে গড়িয়ে এসে পড়েছিল—সেই চাতালটিতে চঞ্চলভাবে ঘুরে ঘুরে দেয়াল ও সিঁড়ি শুঁকতে শুঁকতে তুলু অদ্ভুত স্বরে অনবরত এক সুরে ডাকছে—ম্যাঁ—ও-ও-ও—ম্যাঁ—ও-ও-ও—

তার সেই ভীষণ অদ্ভুত ডাক যেন আর্ত্তনাদের চেয়েও ভয়াবহ এবং কান্নার চেয়েও করুণতর!

তুলুর কণ্ঠে এমনধারা ডাক এর আগে আর কখনও শোনা যায়নি।

সরলা একটা ভাঙা খড়ম তুলুকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে মারলে। তুলু আঘাত পেয়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু সেদিন সমস্ত রাত্রি কখনও তেতালার ছাদে—কখনও ছাদের কার্নিসে,—কখনও উঠানে—কখনও সিঁড়িতে—কখনও বাগানের ধারে, তুলু অবিশ্রান্ত ঘুরে ঘুরে সেই শোকার্ত্ত কান্নার ডাক্ ডাকতে লাগল।

এক জায়গা হতে তাড়না করে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়,—সেখান থেকে সরে গিয়ে ক্ষণকাল বাদেই আবার অন্য আর এক জায়গায় কাঁদতে আরম্ভ করে।

এমনি করে তি[illegible]ন দিন কেটে গেল। দিনের বেলায় তুলুর চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায় না। কোথায় যে সে থাকে কেউই ঠিকানা পায় না। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকেই সেই অদ্ভুত আর্ত্ত স্বরে কান্না—সমস্ত রাত্রি আর থামে না—সারা বাড়ীটি ঘুরে ঘুরে ব্যাকুল কান্না কেঁদে ফেরে।

সে কান্নার শব্দে মিণ্টুর মা এবং বাড়ীর আব সবাই রাত্রে ঘুমুতে পারেন না,—আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে বিনিদ্র নেত্রে রাত কাটান্!

চার দিনের দিন রাত্রি তখন সওয়া ন'টা হবে। তুলুর সেই বিকট কান্না শুরু হল।

বীরুর হাতের কাছে ভারী লোহার একটি ডাম্বেল পড়ে ছিল। সেইটি তুলে নিয়ে কান্না লক্ষ্য করে সে উত্তেজিত ভাবে ছুটে চললো।

সিঁড়ির সেই চাতালটার কোণে তুলু লেজ উঁচু করে গায়ের সমস্ত রোমগুলি ফুলিয়ে কাঁটার মত খাড়া করে ঘুরে ঘুরে ভীষণ স্বরে কাঁদছে! সে কান্নায় সত্যিই যেন বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে!

বীরু দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে গিয়ে হাতের নিরেট্ লোহার ভারী ডাম্বেলটি তুলুকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে মারলে।

ডাম্বেলটি সজোরে গিয়ে ঠিক তুলুর মাথায় লাগল। লাগ্‌মাত্রই একবার খুব জোরে আর্ত্তনাদ করে উঠেই তুলু নিস্তব্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়্‌ল।

বীরু স্পন্দিত বক্ষে সত্বর নেমে গিয়ে দেখলে—টকটকে লাল রক্তে তুলুর দুধের মত ধবধবে মুখখানি সিক্ত হয়ে উঠেছে! ভল্‌ভল্ করে তার নাক কান মুখ দিয়ে রাঙা রক্ত ছুটছে!

নরেন দ্রুতপদে ছুটে এসে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠ্‌লো—হায় হায় কী করলি বীরু? খুন কর্‌লি জীবটাকে?

বৌদি ছুটে এলো,—সরলা ছুটে এলো,—বাড়ীতে যে যেখানে ছিল সকলেই ছুটে এসে সিঁড়িতে জড়ো হয়ে তুলুকে ঘিরে 'হা-হুতাশ' করতে লাগল।

তখনই বরফ প্রভৃতি এনে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করা হল,—সিঁড়ি থেকে উঠিয়ে এনে তুলুকে বাঁচাবার জন্য সকলেই একান্ত প্রয়াস করতে লাগলো। কিন্তু সে সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে তুলুর শুভ্র-সুন্দর নরম বুকের মৃদু ধুক্‌ধুকুনিটুকু কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্তব্ধ স্থির হয়ে গেল।

তিন রাত্রি আগে মিণ্টু যে জায়গাটি তার তপ্ত রক্তে সিক্ত করে পরপারে চলে গেছল—ঠিক সেই জায়গাটিই তুলুও নিজের টাটকা রক্তে ভিজিয়ে মিণ্টুর কাছে চলে গেল।

তুলু আর নেই—তবুও বাড়ীশুদ্ধ সকলকারই কানে গভীর নিশীথে কিম্বা নিস্তব্ধ দুপুরবেলায়—যখন তখন যেন বিড়ালের করুণ কান্নার শব্দ ভেসে আসে!

তারা জানে এটা তাদের মনের বিকারমাত্র; কিন্তু তবু তারা এক-একদিন রাত্রে ভাল করে ঘুমুতে পারে না। চ'ম্‌কে চ'ম্‌কে জেগে ওঠে।

তার পরে বহুবর্ষ কেটে গেছে। দুই যুগেরও অধিক। মিণ্টু ও তুলুর ঘটনা যারা জান্‌ত—তাদের জন কতক পরপারে চলে গছে,—যারা আছে, তারা বহুকাল পূর্ব্বের দুর্ঘটনার বেদনা ভুলেই গিয়েছে। ক্ষীণ স্মৃতিটুকু মাত্র মনের কোনও এক কোণে চাপা পড়ে আছে।

শুধু প্রৌঢ় বীরেন আজও কোনওখানে বিড়ালের কণ্ঠের 'মিঁউ' শব্দ শুনলে হঠাৎ অস্বাভাবিক আতঙ্কিত কিম্বা উত্তেজিত হয়—তার পরেই নিতান্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে।

চিকিৎসকেরা বলেন—ও' না কি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যজনিত এক প্রকার হিস্ট্রীক্ ম্যানিয়া ভিন্ন আর কিছু নয়।

কুলির অদৃষ্ট।। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

কয়েকদিন দারুণ বর্ষার পরে আকাশটা আজ একটু পরিষ্কার বোধ হইতেছিল।

সরযূয়া সকালে কাজে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই। মাহিন তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে, ঘর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে নাই। কে জানে সে কখন আসিয়' হয় তো তাহাকে দেখিতে না পাইয়া রাগিয়া যাইবে। তাহার প্রকৃতি এক রকমের, একবার রাগ করিলে আর যদি কিছুতেই ঠাণ্ডা হয়।

সখীয়া প্রত্যেক দিনকার মত তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, মাহিনের কথা শুনিয়া তাহার মুখে হাসি আর ধরে না,—ছিঃ সরযূয়াকে নাকি আবার ভয় করিয়া চলিতে হইবে। সে যখন খুসি যেখানে যায়, রামলালের সাধ্য কি যে তাহাকে একটা কথা বলে? রাগ করা অমনি আর কি? কথা অমনি বলিলেই হইল,—কথা বলিলে কথা শুনিতে হয় তাহা বুঝি মনে নাই?

কিন্তু মাহিন তাহার কথা শুনিয়া গেলেও মনে গাঁথিতে পারে নাই। রামলাল রাগ করিলে সখীয়ার কিছু না হইতে পারে, সরযূয়া রাগ করিলে মাহিনের মাথায় যে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে।

ল্যাংটিংকের নিকট রেললাইন খারাপ হইয়া গিয়াছে, সর্দ্দার জন কত কুলি লইয়া সে স্থান মেরামত করিতে গিয়াছে, এই জন কত কুলির মধ্যে সরযূয়াও একজন।

কাল রাত্রে শয়নের সময়ও তাহারা জানিত না সরযূয়াকে ভোর বেলায় সেখানে যাইতে হইবে। কয় দিন পরে সে আজ পথ্য করিবে, কয় দিন অসুখে ভুগিয়া সে আহারের জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে। কাল অর্দ্ধেক রাত্রি সে ঘুমাইতে পারে নাই, আজ কি দিয়া সে ভাত খাইবে এই কল্পনা লইয়া জাগিয়াছিল, রাত জাগিয়া আবার অসুখ হইবে, আর আহার করিতে পারিবে না এই বলিয়া মাহিন তাহাকে ঘুম পাড়াইয়াছিল।

আজ প্রভাতেই সর্দ্দারের কঠোর কণ্ঠস্বরে উভয়ে সচকিত হইয়া জাগিয়াছিল। সরযূয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেই সর্দ্দার জানাইল তাঁহাকে এখনই সাহেবের নিকট যাইতে হইবে, জরুরী তলব।

এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম লইয়াও সে খানিকটা বকিল, সরযূয়া অপ্রস্তুতভাবে জানাইল কয় দিন সে অসুখে ভুগিয়াছে সেই জন্য কাল রাত্রে তাহার ঘুম না হওয়ায় আজ বেশি বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়াছে।

সে একটু বেলা হইলে যাইবে বলায় সর্দ্দার রাগিয়া উঠিল। কর্কশকণ্ঠে বলিল, সাহেব হুকুম দিয়াছেন এখনই যাইতে হইবে, না গেলে ধরিয়া লইয়া যাইবার আদেশ আছে।

বিমর্ষমুখে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সরযূয়া পত্নীকে বলিল, "শুনে আসি সাহেব কি বলছে। তুই রেঁধে রাখিস মাহিন, আমি খানিক বাদেই ফিরব। আমার বড় ক্ষিদে রে, বাড়ীতে এসে আর দেরী করব না।"

মাহিন তাড়াতাড়ি ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিয়া উনানে আগুন দিল। সরযূয়া যাহা খাইতে চাহিয়াছিল সব রাঁধিয়া রাখিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, সরযূয়া ফিরিল না, নিত্যকার মত সখীয়া দুপুরে বেড়াইতে আসিলে প্রথম সে তাহারই মুখে শুনিতে পাইল সর্দ্দার কয়েকজন কুলীকে লইয়া ল্যাংটিংয়ে রেল লাইন সারিতে গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সরযূয়াও একজন।

সখীয়া বিদ্রূপ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরও সে খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পথে দেখা হইল ভিখনের সহিত।

ভিখন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কোথায় চলেছিস মাহিন?"

মাহিন বলিল, "সরযূয়ার খোঁজ কিছু জানিস ভিখন?" একটু ভাবিয়া ভিখন বলিল, "সে যে লাইনে কাজ করতে গেছে রে, তোকে কিছু বলে যায় নি?"

উদগতপ্রায় অশ্রু চাপিতে চাপিতে মাহিন বলিল, "আমায় বলে যাবে কি করে, সে যে ভোর বেলা ঘুম ভেঙ্গে উঠেই চলে গেছে। সর্দ্দার এসে বললে সাহেব ডেকেছে,—কেন ডেকেছে তা তো কিছুই বলেনি। সে আমায় ভাত তরকারি রেঁধে রাখতে বলে চলে গেছে—"

অশ্রুজল আর সে সামলাইতে পারিল না, চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

ভিখন ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "কেঁদে কি করবি মাহিন, ঘরে ফিরে যা, রাস্তায় রাস্তায় কোথায় ঘুরবি! সাহেব তার অসুখের কথা শোনে নি, জোর করে পাঠিয়েছে। কখন আসবে তাও ত বলতে পারিনে, তুই খেয়ে নে গিয়ে, তার জন্যে কেন শুকিয়ে মরবি?"

রুদ্ধকণ্ঠে মাহিন বলিল, "আজ পাঁচ দিন তার খাওয়া নেই, সে কি কাজ করতে পারবে ভিখন?"

বেদনার হাসি হাসিয়া ভিখন বলিল, "সে কথা কে শুনবে বল দেখি? কাজ তাকে করতেই হবে না করলে পরে—"

সে চুপ করিয়া গেল; ব্যগ্রকণ্ঠে মাহিন বলিল, "না করলে কি করবে রে ভিখন,—মারবে?"

ভিখন বলিল, "কি করে বলব বল দেখি? দয়া মায়া কি ওদের আছে রে, ওরা যে কসাই, ওরা সব পারে।"

ভিখন নিজের কাজে চলিয়া গেল।

শ্রান্ত চরণ আর দেহভার বহিতে পারে না তবুও মাহিন ফিরিল।

দাওয়ায় সে বসিয়া পড়িল, সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ঘরের মেঝেয় ভাত-তরকারি সাজানো সরযূয়া আসিয়া আহার করিবে।

ভিখন তাহাকে আহার করিবার পরামর্শ দিল, তাই কি পারে সে? স্বামী, আজ কয়দিন খায় নাই, আজ সে খাইবে কাল সেই আনন্দে সে রাত্রে ঘুমাইতে পারে নাই, সে যে অনেক আশা করিয়া গিয়াছে বাড়ী ফিরিয়া খাইবে। তাহার বড় আশার ভাত-তরকারী, মাহিন মুখে তুলিবে কি করিয়া?

সম্মুখে মাঠ, উঁচু নীচু, যেন ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। অদূরে গগনস্পর্শী পাহাড়। মাহিন সেই দিকে তাকাইয়া সরযূয়ার কথাই ভাবিতেছিল।

সে যখন মাত্র দুই বৎসরের, সরযূয়া পাঁচ বৎসরের তখন তাহাদের বিবাহ হয়, মাতৃহীনা বালিকা বধূ শাশুড়ীর নিকটেই মানুষ হইয়াছিল। সরযূয়াকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, সরযূয়াও তাহাকে ঠিক ততখানি ভালবাসিত। আজ সে যুবতী, সরযূয়া যুবক, কেহ কাহাকেও একদিন ছাড়িয়া থাকে নাই।

মাহিনার বুকের মধ্য হইতে কান্না ঠেলিয়া উঠিতেছিল, হায় রে, যদি মুখের ভাতদুইটা খাইয়া যাইতে পারিত।

সূর্য্য অল্পে অল্পে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। মাহিন তখনও সেই স্থানে আড়ষ্টভাবে বসিয়া, আশাপূর্ণ চোখে পথের পানে তাকাইয়া।

ক্রমে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, কালো আকাশের বুক চিরিয়া ধরার বুকে অন্ধকার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আকাশে যে দুই একটি তারা উঠিয়াছিল মেঘে তাহা ঢাকিয়া গেল, আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জ্জন হইতেছিল। তাহার পরই ঝর ঝর করিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

সরযূয়া ফিরিল না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাহিন ঘরে গেল। ঘরের মেঝেয় ভাত-তরকারি তখনও তেমনি পড়িয়া। আলোকটা জ্বালাইয়া মাহিন কতক্ষণ একদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল। নিজেও সে দিন অনাহারে রহিল।

সমস্ত রাত্রি সে চোখের পাতা মুদিতে পারিল না, ছটফট করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি বাহিরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলিল। ইহারই মধ্যে তাহার কতবার মনে হইতেছিল সরযূয়া বুঝি আসিয়াছে, বুঝি ডাকিল। ধড়-ফড় করিয়া সে কতবার উঠিয়া বসিল, কতক্ষণ উৎকর্ণ থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, কাঁদিয়া সে উঠিয়া বসিল।

দরজার ফাঁক দিয়া ভোরের আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। উঠিয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল।

রামলালও তো কাজ করিতে গিয়াছিল, সে কি ফিরিয়াছে? একবার দেখা যাক।

মাহিন রামলালের কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

সখীয়া ঘুম হইতে উঠিয়া বারান্ডায় পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল। এত ভোরে মাহিনকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, "এত সকালে যে মাহিন? তোর চেহারা অমন দেখাচ্ছে কেন, অসুখ করেছে?"

মাহিন শুষ্কমুখে বলিল, "না, রামলাল ফিরেছে?"

সখীয়া বলিল, "হ্যাঁ, ঘুমুচ্ছে।"

রামলাল ফিরিয়াছে, সরযূয়া ফিরিল না কেন? মাহিনের বুক পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল, সে বলিল, "কখন ফিরে এসেছে?"

সখীয়া বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "কে জানে তখন কত রাত হবে, বোধ হয় অনেক রাত হবে। যত পেরেছে তাড়ি খেয়ে এসেছে, দরজা খুলে দিতেই সেই যে শুয়ে পড়ল কিছুতেই উঠল না। একটা কথাও বলে নি, কিছু খায়ও নি, দেখ না, অমনি পড়ে আছে।"

মাহিনের দেখিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, বিষণ্ণকণ্ঠে বলিল, "এখন বোধ হয় উঠবে না?"

সখীয়া বলিল, "আজ দিন যে সাহেব ছুটী দিয়েছে, একদিনে পাঁচদিনের কাজ করিয়ে নিয়েছে, আজ কি নড়বার ক্ষমতা আছে? সরযূয়া ফিরেছে?"

মাহিন শুধু মাথা নাড়িল। জোর করিয়া দাঁতে ঠোটে চাপিয়া ধরিয়াছিল, পাছে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বাহির হইয়া পড়ে।

সখীয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "ফেরে নি? যারা গিয়েছিল সবাই তো কাল রাতে ফিরেছে, তবে—"

বলিতে বলিতে মাহিনের সাদা মুখখানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে থামিয়া গেল, বলিল, "কোথাও হয় তো তাড়ি খেয়ে পড়ে আছে। এ উঠুক, তুমি ততক্ষণ বাড়ী যাও, আমি খবর তোমায় দিয়ে আসতে বলব এখন।"

তাহাই ভিন্ন আর উপায় কি?

কান্না চাপিতে চাপিতে মাহিন আবার নিজের কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

সকলে ফিরিয়া আসিল, সে ফিরিল না ইহার কারণ কি? সে তো কখনও কোথাও থাকে না, সে যেখানেই থাক ফিরিয়া আসিবেই। সে যে জানে মাহিন তাহার জন্য বড় বেশি রকম ভাবে, কাঁদে।

বারান্ডায় বসিয়া মাহিন তাহার কথাই ভাবিতে লাগিল। সে যে বড় দুর্ব্বল শরীরে কাজ করিতে গিয়াছে, ভাত খাইবে—বড় আশা লইয়া গিয়াছে যে।

বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। গত কল্য উপবাস গিয়াছে, আজও এতখানি বেলা হইয়াছে, মাহিনের তথাপি ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল না।

অনেক বেলায় রামলাল দর্শন দিল। তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল তাহার আসিবার ইচ্ছা ছিল না, কেবল সখীয়ার তাড়নাতেই তাহাকে আসিতে হইয়াছে।

মাহিন তাহাকে দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে বসিতে জায়গা দিল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আমি ভোর হতেই তোমার কাছে গিয়েছিলুম রামলাল, সখীয়া বললে তুমি উঠলে তোমায় এখানে পাঠিয়ে দেবে। কাল তুমিও তো লাইনে গিয়েছিলে, সরযূয়া তোমাদের সঙ্গে ফিরেছে তো?

ব্যগ্রভাবে সে রামলালের পানে চাহিয়া রহিল।

রামলাল বিশুষ্ক মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইল, কি বলিবে তাহা সে তখনও ঠিক করিতে পারে নাই।

সে কথা কেমন করিয়া বলা যায়? মাহিন যে সরযূয়াকে কতখানি ভালবাসিত তাহা না জানিত এমন লোকই নাই। মেয়েরা মাহিনকে এবং পুরুষেরা সরযূয়াকে এ জন্য কত না বিদ্রূপ করিত। কিন্তু ইহারা দুই জনেই বিদ্রূপ হাসিয়া সহিয়া যাইত।

সেই সরযূয়া—সে আর নাই। কাল দুর্ব্বল শরীর লইয়া সে সকলের সমান কাজ করিতে পারিতেছিল না, সাহেবের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছিল। তাঁহার পদাঘাতে কাল বৈকালে সেই যে সে পড়িয়া যায় আর উঠিতে পারে নাই। হায় অভাগা, তাহার জন্যই কাল অন্য সকলের ফিরিতে অত রাত্রি হইয়া গিয়াছিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া মুখখানা শুকাইয়া গেল, রুদ্ধকণ্ঠে সে ডাকিল—"রামলাল—"

রামলাল শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আমি কি বলব মাহিন?"

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, মাহিন তথাপি জোর করিয়া বলিল,—"বল রামলাল সরযূয়া—আমার সরযূয়া—"

"সে নেই মাহিন, কাল বিকেলে সে মারা গেছে।"

"নেই—নেই—"

বদ্ধদৃষ্টিতে মাহিন রামলালের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখখানা নিমেষে মরা মানুষের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

তাহার মুখ দেখিয়া রামলাল ভয় পাইল,—ডাকিল—"মাহিন"—

"সরযূয়া—আমার সরযূয়া নেই—ওগো, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো গো—"

আর তাহার মুখে কথা ফুটিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিতে গিয়া রামলাল দেখিল সে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

সেই মূৰ্চ্ছাই তাহার শেষ মূৰ্চ্ছা। একদিন একরাত্রি জীবন্তে মৃতাবস্থায় থাকিয়া নিঃশব্দে সে সরযূয়ার অনুগমন করিল। তাহার মৃত্যুতে একটি নারীর শুধু চোখের জল ঝরিয়া পড়িল—সে সখীয়া।

কুলিরা তেমনই খাটে—কোন কাজে কেহ দ্বিরুক্তি করে না। তাহারা জানে তাহাদের জীবন এইরূপেই টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে, তাহাদের কেহ নাই, ভগবানও তাহাদের উপর বিরূপ। তাহারা বুকের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়া, শুধু কাজ করিয়াই যাইবে, এতটুকু ত্রুটী হইলেই, প্রহার ও উৎপীড়ন।

লাইনে কাজ করিতে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা দাঁড়ায়, হতভাগ্য সরযূয়া যেখানে পড়িয়াছিল সেই স্থানটার পানে একবার তাকায়, তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহারা কাজে লাগে, এই ভাবেই দিন যায়।

মন্দাকিনীর প্রেমকাহিনী। লীলা মজুমদার

প্রেমের এমন একটা অবাধ্য ভাব আছে, তার জন্য বিষম আয়োজন করে প্রতীক্ষা করলে তার দর্শন মেলা দায়, কিন্তু যখন তার আগমন কেবলমাত্র অপ্রত্যাশিত নয়, অসুবিধাজনকও বটে, তখন সে ত্রিভুবন জুড়ে বসে।

মন্দাকিনীও এই ধরনের একটা ঘটনায় জড়িত হয়েছিল। যতদিন পুষ্পিত লতার মতন তার জীবনে প্রথম যৌবনের সুরভি লেগেছিল, এবং মর্মরিত বেণুকুঞ্জে কোকিল-কণ্ঠের মতন তার মনের কোণে কোণে অনাগত বনমালীর বাঁশরী বেজেছিল, ততদিন ধরে সে কল্পানানেত্রে তার প্রিয়তমের অতি প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দেখতে পেত।

বেশ দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহখানি, ভ্রমরকৃষ্ণ কোঁকড়া চুল, হরধনুকে হার মানিয়ে দেয় ভ্রূ-যুগল, অধরোষ্ঠে কোমল কঠিনে অপূর্ব সমাবেশ, কিংবা বঙ্কিম গ্রীবা, বাঁশির মতন নাসিকার ডান পাশে নীচের দিকে ভুবনভুলানো ছোট একটি কালো কুচকুচে তিল, দাড়ি-গোঁফ কামানো। কণ্ঠস্বরে কখনও বজ্র-নির্ঘোষ শোনা যায়, কখনও বা কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর কথা মনে পড়ে। পরিধানে কখনও বা সাদা ধুতি চাদর, কখনও বা সুবিন্যস্ত গ্রে-রঙের পাশ্চাত্ত্যবেশ শোভা পায়।

এই আশ্চর্য ব্যক্তি মানসলোকে হয় জ্যোৎস্নানিশীথে বিজন বেণুকুঞ্জে কিংবা বর্ষা-সন্ধ্যায় বসবার ঘরের স্তিমিত দীপালোকের মন্দাকিনীর কানে-কানে কত যে রোমাঞ্চকর মধু-বর্ষণ করত তা লেখাযোখা নেই।

অবশেষে একদিন মন্দাকিনীর ঈষৎ কম্পমান বাঁ হাতখানা ধীরে ধীরে নিজের করকমলে তুলে নিয়ে নীল মখমলের ছোট বাক্স খুলে নক্ষত্রোজ্জ্বল এক হীরের আংটি পরিয়ে দিত এবং মন্দাকিনীর রক্তিম অধরে...এর বেশি কল্পনা করবার ক্ষমতা মন্দাকিনীর ছিল না। তাছাড়া এতেই তার এমন শিহরণ লেগে যেত যে, সে রাত্রে চোখে ঘুম আর আসত না। বলা বাহুল্য এই সকল রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর মধ্যে মন্দাকিনীর পরনে থাকত সুযোগ্য নীল শাড়ি, সোনালী তার আঁচল।

দুঃখের বিষয় এমন সুপ্রকাশ যার রূপ, সে ব্যক্তি চিরকাল মন্দাকিনীর আগ্রহাধীর নয়নযুগলকে ফাঁকি দিয়ে যেতে লাগল। কত যে বর্ষা-সন্ধ্যা, কত যে জ্যোৎস্নাময় নিশীথ বিফল হয়ে যেতে লাগল তার কোন হিসাব নেই। শেষ পর্য্যন্ত মন্দাকিনী তার দুর্লভ আদর্শটিকে ধরা-ছোঁয়ার গোচর করবার দুরাশায় তাকে অনেকটা খর্ব করেও এনেছিল।

তার অমন সুঠাম দেহের দৈর্ঘ্য থেকে দু-চার ইঞ্চি ছেঁটে দিয়ে, তার ওই উজ্জ্বল গৌর কান্তিতে একটুখানি শ্যামলের ছোপ ধরিয়ে, তার দাড়িকে শেষ পর্য্যন্ত না মঞ্জুর করে, (কারণ কে না জানে যে ভক্তির রাজ্যে যাই হোক প্রেমের রাজ্যে দাড়ি অচল) তার গোঁফ সম্বন্ধে একটু উদার হয়ে, তাকে প্রায় সাধারণত্বের কোঠায় এনে ফেলেছিল।

তবু তার দিশা পাওয়া যায় নি। একটি সুকোমল নারীহৃদয়ে তার জন্য এত সম্ভার রক্ষিত

আছে, তবু যদি সে নরাধম অনুপস্থিত থাকে তবে সে কোন রকম সহানুভূতিরও অযোগ্য একথা জেনে অবশেষে একদা নির্দয়ভাবে স্বহস্তে তাকে প্রিয়তমের সিংহাসন থেকে বিদায় দিল। এমন কি মনে-মনে তাকে আহাম্মক আখ্যা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করলে না। তবু মাঝে-মাঝে নির্জন নিশীথে তার মনে সংশয়ের দোলা লাগত, আর ওই শূন্য সিংহাসনখানা অন্ধকারে হাহাকার করত।

সময় কিন্তু লঘুপদে চলে যেতে লাগল আর মন্দাকিনীর যৌবন থেকে একটু একটু করে মধু চুরি করে নিতে লাগল। মন্দাকিনী এতদিন অলস ছিল না, ধীরে ধীরে অনেক বিদ্যাকে অনেক ললিতকলাকে আয়ত্ত করে ফেলেছিল।

তার কাঁচা রূপের সাজ আভরণে আস্তে আস্তে অভিজ্ঞ সুরুচির পরিচয় পাওয়া গেল। সে রূপসীও নয়, কুরূপাও নয়। দুইয়ের মাঝামাঝি এমনটি, যার মাধুর্য দেখামাত্র চোখে পড়ে না, কিন্তু মন দিয়ে খুঁজলে সুপ্রকাশ হয়ে পড়ে।

যত দিন যেতে লাগল তার কথায় ভঙ্গিতে, সজ্জায়, এমন কি কবরী রচনাতেও একটা তীব্রতা প্রকাশ পেল, যার মাধুর্য মধুরের চেয়ে তিক্ত বেশি। রৌদ্রবর্ণ বহুমূল্য সুরা যেমন বেশিদিন রেখে দিলে তিতিয়ে যায়। আর নিয়ত তার কানে বাজতে লাগল কালের রথের চাকার ধ্বনি।

জীবনটাকে যখন শূন্য বোধ হবার আশঙ্কা হল, মন্দাকিনীরও সুবুদ্ধি হল। হৃদয়ের সমস্ত অপ্রার্থিত প্রেমবাশি একজন অনাগত মানুষের চরণ থেকে অপসারিত করে সে সহজে আয়ত্ত বস্তুর উপর ন্যস্ত করল। বস্তুর পোষমানা ভাবটা তাকে নিগূঢ়ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল। যে-সকল বস্তুকে কামনা করলে, এবং যে-ভাবে কামনা করলে অন্তঃকরণ স্থূল ও বৈষয়িক হয়ে যায়, তারা সে ভাবে মন্দাকিনীকে লুব্ধ করল না। সে ভালবাসল প্রাচীন ও আধুনিক চিত্র, পুঁথি, বাসন, সূচিকর্ম, নক্‌শাদেওয়া হাতে-বোনা পর্দা, মিনে-করা চৌকি এমন আরও কত কী।

সৌন্দর্যের এমন একটা মোহিনী শক্তি আছে যে, যে তাকে অর্থ দিয়ে কেনে তাকেও সে নক্ষত্রলোকে নিয়ে যায়। যা কিছু সুন্দর, সৌন্দর্যই তার সার্থকতা। তার আর কোনও গুণের প্রয়োজন নেই। সে নয়নানন্দ। তার কাছে আর কিছু প্রত্যাশা করলে তার প্রাণময় পরিপূর্ণ রূপরাশি অর্থহীন বিলাসে পরিণত হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

যে কেউ সৌন্দর্য উপভোগ করতে জানে না। কিন্তু মন্দাকিনী জানত। তাই তার বারবার হতাশ হয়ে-যাওয়া হৃদয় মরুভূমি না হয়ে গিয়ে নিত্য নূতন রসের উৎসের সন্ধান পেল।

সৌন্দর্যের উপাসকের যে অনাবিল অবসর ও অজস্র অর্থের প্রয়োজন, যে দুষ্ট-শনি মন্দাকিনীর পিছু নিয়েছিল, সে একদিন সে সকল হরণ করে নিল। মন্দাকিনী সৌন্দর্যের উপাসনা তখনকার মতন বন্ধ করে দিয়ে, সৌন্দর্যের সামগ্রীগুলোকে এবাড়ী-ওবাড়ী বাক্সবন্দী করে কেমন করে যেন এক মাস্টারী জোগাড় করে দার্জিলিং চলে গেল।

দার্জিলিংয়ে গুছিয়ে বসলে পর চারদিকে চেয়ে মন্দাকিনী দেখল হিমালয়ের কোলে-কোলে রডোডেণ্ড্রন গাছের সারি, কিন্তু তার একটিরও উদ্ধত শাখার রাঙা পুষ্পস্তবকের নাগাল পাওয়া যায় না। পাহাড়ের কানা ধরে-ধরে একটির পর একটি ঝাউ গাছের শ্রেণী, কিন্তু তাদের দীর্ঘ শীর্ণ ছায়াগুলি অগম্য রাজ্যে। নীচের উপত্যকায় সাদা মেঘ জমেছে, সেখানে পৌঁছনো অসম্ভব।

একদিক রোদে স্নান করেছে, সেদিকে চাইলে মন গলে জল হয়ে যায়; অন্য দিক কুয়াশাচ্ছন্ন, সেদিকে চাইলে মন জমে বরফ হয়ে যায়। কিন্তু এ সৌন্দর্য নৈর্ব্যক্তিক, একে

মন্দাকিনীর সেই জয়পুরী চৌকির মতন কোলের কাছে টেনে নেওয়া যায় না। বরং একে বেশিক্ষণ দেখলে মনে একটা নিষ্কাম বৌদ্ধভাব জন্মায়।

ঠিক এই সময়, যখন জগতটা মন্দাকিনীর কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে আসছিল তখন সে এক ম্লান গোধূলির আলোতে ডাক্তার চ্যাটার্জির খুদে বাড়ীখানা আবিষ্কার করল।

পাহাড়ের গায়ে একটুখানি অপরিসর জমির উপর সত্যি কথা বলতে কি, খানিকটা শূন্যমার্গে, লোহা ও ইটকাঠের উপর ধৃত হয়ে অতি বিপজ্জনকভাবে, কায়ক্লেশে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল সাক্ষ্য দিয়ে কোনও গতিকে বাড়ীটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্দাকিনীর হৃদয়ে তার মায়াজাল বিস্তার করল।

এক মুহূর্তে তার চোখে পৃথিবীর রঙ বদ্‌লে গেল। তার যে মন দূর বনান্তরালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পদাঙ্গুলির অগ্রভাগে নির্ভর করে, দুই পক্ষ বিস্তার করে বিহঙ্গের মতন উড়ে যাচ্ছিল, সে আবার পাখা বন্ধ করে কুলায়ে ফিরে এল।

চর্মচক্ষে মন্দাকিনী দেখল বহুবর্ষের বৃষ্টি ধারায় রঙ ওঠা, কাঁচেমোড়া, বিবর্ণ সবুজ পর্দা ঘেরা, ছোট দোতলা বাড়ী। ভাঙা কাঁচের অন্তরালে দৃশ্যমান ধূলিমলিন মনোমোহিনী কাঠের সিঁড়ি। পশ্চিমদিকের ঝাউগাছ তাদের আলম্বিত ছায়াগুলিকে দেওয়ালের উপর ফেলছে। সামনের শান-বাঁধানো জমির ধারে-ধারে ক্রিস্যান্থিমাম গাছ, জেরেনিয়াম গাছ, আর তাদের পদপ্রান্তে প্রিমরোজ ও ভায়োলেট। কোথাও একটি ফুল ফোটে নি এবং কখনও ফুটবে কিনা সন্দেহ। জনমানুষের সাড়া নেই।

এই শূন্য বাড়ীখানা মন্দাকিনীর হৃদয়কে এক নিমেষে গ্রাস করল। সে তার মাস্টারনী-সুলভ গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে গেট খুলে অনধিকার প্রবেশ করল। এবং অমার্জনীয়ভাবে পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর দেখল গদি মোড়া প্রাচীন ও সুশ্রী আসবাবে ধুলো জমেছে।

তারপর ওই বাড়ী তাকে যাদু করল। অনেকদিন পর সে তার মিনে-করা বাসন ইত্যাদির দুঃখ ভুলে গেল। সমস্ত দিনের কর্ম-ব্যস্ততা অসহ্য মনে হত। বিকেলবেলা ওই রঙ-ধোওয়া বাড়ীর কাছে সে নিজেকে খুঁজে পেত।

দিনের পর সপ্তাহ ও সপ্তাহের পর মাস এই ভাবে গড়িয়ে গেল। মন্দাকিনী মনে মনে বাড়ীখানাকে মেজে-ঘষে ফেলল, পুরনো সবুজ পর্দাগুলি ধোপার বাড়ী পাঠিয়ে নতুন ঘোর গোলাপী রঙের পর্দা লাগাল। প্রাচীন আসবাবের ধুলো মুছল, বাগানটির সংস্কার করে অনেক যত্নে সেখানে ফুল ফোটাল। এমন কি কালো চীনেমাটির চ্যাপটা ফুলদানিতে ফুল সাজাল।

হঠাৎ একদিন মন্দাকিনী মনে-মনে একটা বেহিসাবী কাজ করে ফেলল। মনগড়া অপরূপ এক দাঁড়করান বিজলী বাতি কিনে ফেলল, কোথায় তাকে মানাবে ভেবে মনে বড় অশান্তি অনুভব করল। মনস্থির করবার জন্য বিকেলবেলা সেখানে গিয়ে গেট খুলে ঢুকেই পটের পুতুলের মতো থমকে দাঁড়াল।

আধ-ময়লা ছাই রঙের পেণ্টালুন, গলা-খোলা নীল রঙের শার্ট আর কালো পশমের গেঞ্জি গায়ে একজন লোক ঝাঁঝরি হাতে মরা ফুল গাছে জল দিচ্ছে। তার মুখের ডান পাশে প্রাচীন পাইপ এবং দেখামাত্র বোঝা যায় যে তিনদিন ক্ষৌরকর্ম হয় নি। রান্নাঘরের খোলা জানলা দিয়ে অশুদ্ধ তেলের গন্ধ ভেসে আসছে।

সেই ব্যক্তি মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে, হাত থেকে ঝাঁঝরি নামিয়ে অবাক হয়ে দেখল গেটের উপর হাত রেখে বছর ত্রিশ বয়সের একজন শ্যামবর্ণ মহিলা বেতসলতার মত কাঁপছে। তাকে বিপন্ন মনে করে কাছে যেতেই সে একটু অপ্রতিভ স্বরে বলল, 'আমি রোজ আসি।' ডাক্তার চ্যাটার্জি বললেন, 'বাড়ী আর বাগানের অবস্থা থেকে তার পরিচয় পেয়েছি।' তাইতে

মন্দাকিনীর একটু রাগ হল এবং রোষকষায়িত নেত্রে ঝাঁঝরিখানা নিয়ে যে গাছে ডাক্তার চ্যাটার্জি একবার জল দিয়েছেন তাতে আবার জল দিতে লাগল। আর ডাক্তার চ্যাটার্জি পাইপটা আবার মুখে দিয়ে প্রসন্নচিত্তে মস্ত এক গাছ-ছাঁটা-কাঁচি তুলে নিলেন।

এমনি করে মন্দাকিনীর মন আর মন্দাকিনীর মনোবাঞ্ছার মাঝে এক অন্তরাল রচনা হল। ডাক্তার চ্যাটার্জির মধ্যে নয়নলোভন কোনও গুণ প্রকাশ পেল না যা বিন্দুমাত্র চিত্তাকর্ষণ করে। এমন কি চিত্তাকর্ষণ করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা পর্যন্ত দেখা গেল না।

কোন সুদূর মহানগরীর ছায়াময় খ্যাতি তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত ছিল—তাঁর বিষয় অদম্য কৌতূহল ছাড়া মন্দাকিনীর মনের কোন ভাবান্তর ঘটল না। যৌবনে তার স্বপ্নে-দেখা সেই পুরাতন প্রিয়তমের ইতিবৃত্ত মন্দাকিনীর জানা ছিল না। সে ধনী কি নির্ধন, কোন কাজকর্ম করে কি ঘরে বসে থাকে, এই সকল অতি তুচ্ছ তথ্য জানবার জন্যই তার মনে আসে নি; সে দ্বিধাবিহীন চিত্তে দর্শনমাত্রেই তার গলায় বরমাল্য দিয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার চ্যাটার্জি সম্বন্ধে তার জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না।

এক মাস কাল সময়, অশেষ ধৈর্য ধারণ এবং সমস্ত ছোট বাগানখানার আমূল সংস্কারের পর মন্দাকিনী জানল তাঁর বয়স চল্লিশ বছর, অবিবাহিত, ধর্ম-বিরোধী, কিন্তু ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটু একটু সন্দেহ আছে, দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি, ওজনের কথা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক।

স্ত্রীজনসুলভ নানান চাতুরী অবলম্বন করে মন্দাকিনী তাঁকে দিয়ে নতুন গোলাপী পর্দা কেনাল, দরজা-জানালায় সবুজ সাদা রঙ লাগাল, গেটের পাশে চেরী গাছের কলম বসাল।

এমনি করে মন্দাকিনীর স্বপ্ন ফুলের মতন ফুটতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা মন্দাকিনী আবিষ্কার করল ইডেনে সর্প প্রবেশ করেছে।

কে একজন অতি তরুণী, তনুদেহে সবুজ জর্জেটের শাড়ি অপরূপ করে জড়িয়ে, কালো কোঁকড়া চুলগুলিকে মাথার উপরে অভিনব রুচিতে চুড়ো করে বেঁধে, ডাক্তার চ্যাটার্জির স্কন্ধ অবলম্বন করে অতি-রক্তিম ঠোঁট দুখানিকে ঈষৎ আলগা করে হিমালয় দেখছে। আর তার সর্ব্বাঙ্গ থেকে মাধুরী ঝরে পড়ছে।

এইটুকু মাত্র। কিন্তু মন্দাকিনীর হৃদয় বিকল হল। ত্বরিত পদে সেখান থেকে ফিরে গেল। তার মানসচক্ষের সম্মুখে ওই মেয়েটি তার সবুজ জর্জেটের আঁচলখানা মেলে দিয়ে এমন একটা শ্যামল অন্তরাল সৃষ্টি করল যাকে ভেদ করে মন্দাকিনীর লুব্ধ চোখ আর সেই ছোট বাড়ি কি তার মালিককে দেখতে পেল না।

মন্দাকিনীর হৃদয়ে জীবনে এই প্রথম ঈর্ষা জন্ম নিল। এবং তার সবুজ চোখের কাছে সমগ্র জগতখানা বিষময় হয়ে উঠল। যেখানে কোনও দাবি নেই সেখানে নৈরাশ্যের জ্বালা সব থেকে তীব্র কারণ তার কোনও প্রতিকার হয় না।

মন্দাকিনী নিজেকে শত-শত গঞ্জনা দিল। তার কোন অনুযোগের কারণ নেই। ডাক্তার চ্যাটার্জির বাড়ীতে তাঁর যে কোনও অতিথি আসুক না কেন, মন্দাকিনীর তাতে কি? কিন্তু তবুও দার্জিলিংয়ের হিমকুজ্‌ঝটিকা একেবারে হৃদয়ে গিয়ে প্রবেশ করল। তার ব্যথিত দৃষ্টি হিমালয়ের পুঞ্জিত রূপরাশির মধ্যে কোনও দিন কোন কোমলতা খুঁজে পায় নি, আজও পেল না।

এক সপ্তাহ কাল উত্তরবিহীন আত্মজিজ্ঞাসার পর মন্দাকিনী আবার ডাক্তার চ্যাটার্জির সমীপে উপস্থিত হল। আর তার কোন আশঙ্কা নেই, মন তার বর্ম পরেছে। নৈরাশ্যের গভীরতম অতলে যে ডুব দিয়েছে সে আবার চোখে আলোর রেখা দেখতে পায়। সে ঔদাসীন্যের চন্দ্রালোক, শীতল সুন্দর।

মন্দাকিনী তাই সাহসে বুক বেঁধে দৃষ্টিতে ত্যাগের মহিমা নিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জির সমীপে উপস্থিত হল।

দেখল দরজা-জানলা খোলা হয় নি, ফুলগাছে জল দেওয়া হয় নি। উদাসী মনের উপর উদ্বেগের কালো ছায়া নেমে এল। যাকে ত্যাগ করা যায় তার মঙ্গল কামনা করাতে কোন বাধা নেই।

কম্পিত পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে উপরে গিয়ে মন্দাকিনী দেখল শোবার ঘরের পর্দা ওঠানো, জানালা বন্ধ, শার্সিতে ধুলো এবং টেবিলে বই, ড্রেসিং টেবিলে বই, আরাম কেদারায় বই, আরাম কেদারার নীচে বই, পাশে বই, পিছনে বই মোড়াতে বই, জলচৌকিতে বই এবং মেঝের গালিচাতে রাশি-রাশি দিশী ও বিলেতী বই। স্প্রিংযুক্ত লোহার খাটে বাদামী রঙের কম্বলে ঢাকা, রোগপাণ্ডুর মুখে ডাক্তার চ্যাটার্জিকেও দেখা গেল।

আবেগের আতিশয্যে মন্দাকিনীর বাক্যরোধ হল। ডাক্তার চ্যাটার্জি হাত থেকে রিলিজিও মেডিচিখানা নামিয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

মন্দাকিনী নির্বাক রইল। তার অভিজ্ঞতামতে মনে যার অভিমান নেই, তার স্নেহপ্রেমের লেশমাত্রও নেই। মন্দাকিনী তাই হতাশ হল। কিন্তু তার উৎকর্ণ মন মুহূর্তের মধ্যে নৈরাশ্যের চেয়ে ঘরের অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল। সে আয়নার সামনে গিয়ে প্রথমে নিজের কেশ-বেশ সংস্কারের পরে রুমাল দিয়ে ওই আয়না সংস্কারে মনোনিবেশ করল।

শান্তকণ্ঠে ডাক্তার চ্যাটার্জি বললেন, আমার ভাগ্নী এসেছিল, তোমায় দেখাতে পারলাম না।

মন্দাকিনী এর উত্তরে কি বলবে ভেবে পেল না। ভাবল হয়তো মন্দাকিনীর মনোভাব সম্বন্ধে ডাক্তার চ্যাটার্জির কোন কৌতূহল নেই।

হঠাৎ রুমালের আঘাতে ছোট একটা জিনিস মাটিতে পড়িল। মন্দাকিনী অপ্রতিভ হয়ে তুলে নিয়ে দেখল একটি নক্ষত্রোজ্জ্বল হীরাবসানো মেয়েদের আংটি।

চোখ তুলতেই ডাক্তার চ্যাটার্জি ঈষৎ ক্লান্ত চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। ডাক্তার চ্যাটার্জি স্নিগ্ধ-স্বরে বললেন, আমার মায়ের বিয়ের আংটি। মনে করেছি তোমার হাতে মানাবে। বলে পরিয়ে দেবার বিন্দুমাত্র উদ্যোগ না করে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

মন্দাকিনী শেষ পর্যন্ত আংটিটা নিজেই পরল। আর দুটি মুক্তোর মতন দুই বিন্দু অশ্রু আস্তে-আস্তে গাল বেয়ে গড়িয়ে গেল।

ডাক্তার চ্যাটার্জির নিকোটিন রঞ্জিত ডান হাতখানি মন্দাকিনীর ক্ষীণ মণিবন্ধে নিবদ্ধ হল আর সেই সঙ্গে মন্দাকিনী অনুভব করল তার হৃদয়ের সকল রুদ্ধ বাতায়নগুলি একে-একে খুলে গিয়ে সূর্যালোক আর দক্ষিণ-বাতাস যুগপৎ সেখানে প্রবেশ করল।

পত্রাবরণ।। আশাপূর্ণা দেবী

শনিবারটা উৎসবের দিন। এ দিনে বিকেলবেলায় রান্নাঘরের চালে ধোঁয়া দেখা যায়। গোঁসাইদের পড়োবাড়ির বাগানে খেলতে খেলতে এই ধূমকুণ্ডলী চোখে পড়ায় চম্‌কে উঠল পিতু।

আরে, আজ শনিবার?

সকালে ঠাকুমা বলেছিল বটে! মনেই নেই। হতের ধূলো ঝেড়ে পিতু বলে, 'আর খেলব না ভাই। বাড়ি যাই।'

সঙ্গিনী লাবণ্য মিনতি বচনে বলে ওঠে, 'এখ্‌খুনি যাস নে ভাই, নক্‌খিটি! আর এক দান খেলে যা।'

পিতু বান্ধবীর মিনতিতে ঈষৎ নরম হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে। বিবেচনা করে অনুরোধ রাখা সম্ভব কিনা। নাঃ বেলা পড়ে এসেছে, কে জানে আকাশ কখন চারিদিকে সোনা ঢেলে দিয়েছে।

'না রে না, আজ বাবা আসবে। যাই ভাই।'

লাবি ঠোঁট উল্টে বলে, 'বাবা আসবে বলে অমন করিস কেন রে?' একলা তোরই বাবা আসবে নাকি? আমারও তো আজ বাবা আসবে। আমি তোর মতন অমন ছুটছি?' পিতু বোধ করি এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে বিপন্ন ভাবে বলে, 'তোর বাবা যে বুড়ো।'

'এই অসভ্য মেয়ে!' লাবু চোখ পাকিয়ে বলে, 'আমার বাবাকে বুড়ো বললি? এই বুদ্ধি হচ্ছে? বাবা না তোর জেঠামশাই হয়? বোস্ তোর মাকে বলে দিচ্ছি গিয়ে।'

যদিও লাবু এবং পিতু অভিন্নহৃদয়া, তবু কেউ কারো অপরাধ অগ্রাহ্য করতে রাজী নয়! অবশ্য জেঠামশাই-জাতীয় ব্যক্তিকে বুড়ো বলা অপরাধের মধ্যে গণ্য কি না, এ নিয়ে তর্ক তোলে না পিতু, ম্লান মুখে বলে, 'বলে দিসনি ভাই, তোর দুটি পায়ে পড়ছি। দোষ হয় জানি না, পাকা চুল দেখি, তাই—বলে দিবি না তো?'

ক্ষমাময়ী লাবি আশ্বাসের সুরে বলে, 'আচ্ছা বেশ, বলে দেব না। তার বদলে আর এক দান খেল্।'

'বড্ড দেরি হয়ে গেছে যে রে। বাবা আসবার আগে মুখ হাত ধুয়ে ফরসা জামা পরে নিতে হবে তো? লাবি হেসে উঠে বলে, 'বাবাঃ বাবাঃ! বাবা যেন আর কারুর থাকে না। একলা তোরই আছে। বাবা আসবে খেলব না, বাবা আসবে সাজবো, বাব কি কুটুম?'

পিতু এবং লাবুর মধ্যে বয়সের তারতম্য না থাকলেও বলাই বাহুল্য বুদ্ধির তারতম্য আছে। পিতু বন্ধবীর উপহাসবাক্যে বিব্রত হয়ে গিয়ে বলে বসে, 'বাঃ, কুটুম হবে কেন? ছেঁড়া জামা পরে থাকলে যে বাবা বুঝতে পারবে আমরা গরীব।'

এরপরও লাবুর হাস্যের ফোয়ারা নিষ্ক্রিয় থাকবে, এমন আশা করা চলে না। অদম্য হাসির ফোয়ারায় বান্ধবীকে প্রায় নাকানি চোবানি খাইয়ে লাবি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'উঃ বাবাঃ,

কী নেকী রে তুই? তোরা গরীব আর তোর বাবা বুঝি খুব বড়লোক? তোর বাবা গরীব বলেই তো তোরাও গরীব।'

পিতু আরক্ত মুখে বলে, 'ইস! কক্‌খনো বাবা গরীব নয়। দেখিস গিয়ে। কী ফরসা জামা! কত জিনিস আনে!'

লাবি মুচকি হেসে সুরে সুর মিলিয়ে বলে, 'তোর মার গায়ে কত গয়না!'

লাবির বয়েস আট, তাতে কিছু এসে যায় না। কথা শিখে অবধি পাকা কথাই কইতে শিখেছে লাবি। মা পিসিমার অসতর্কতায় এমন অনেক মেয়েই শেখে।

গয়নার কথায় পিতুর পরাজয়। ও অভিমানভরে বলে, 'বেশ বেশ আমরা গরীব। হল তো?'

'ও বাবা মেয়ের আবার রাগ হল। আচ্ছা বাবা ঘাট মানছি! কাল খেলতে আসবি তো?'

'এলে যে মা বকে।'

রবিবারে পিতু মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, এ পিতুর মা পছন্দ করে না, সেকথা লাবির জানা, তাই এই প্রশ্ন।

অবশ্য উত্তরটাও জানা ছিল লাবির, তাই সঙ্গে সঙ্গেই বলে, 'ওই তো মুশকিলের গোড়া। রবিবার এলেই যেন হাড় জ্বলে যায় আমার।'

পিতু বিস্ফারিত চক্ষে বলে, 'রবিবার এলে হাড় জ্বলে যায়?...বাবা এলে ভালো লাগে না তোর?'

'নাঃ! মোটেই না। এসে আমায় কী রাজা করে দেয় শুনি? এসে তো খালি মা'র সঙ্গে গপ্‌পো করে, আর তাসের আড্ডায় ছোটে। আমার লাভের মধ্যে খালি বকুনি। দেখবে কি, বকবে! কলকাতায় থাকে তাই রক্ষে!'

'আমার বাবা বকে না।'

হৃতগৌরব ফিরে পায় পিতু।

লাবি বান্ধবীর পিতৃগর্বে আঘাত হানে না। গম্ভীরভাবে বলে, 'হ্যাঁ। পঙ্কজকাকা লোক ভালো। যা বাবা, তুই বাড়ি যা। শেষে আবার মার কাছে মুখনাড়া খাবি।'

আট বছরের লাবি বর্ষীয়সীর ভঙ্গিতে নিজের পথ দেখে।

অবিশ্বাসের কিছু নেই। 'বালিকা' বলে যাদের অগ্রাহ্য করা হয় অনেক সময় তাদের সম্মেলন-সভায় কান পাতলেই এ চৈতন্য সঞ্চার হয়, অগ্রাহ্যের যোগ্য তারা নয়।

পিতুর মতন মেয়েরাই বরং ব্যতিক্রম! চোরের মতো বেড়ার দরজা ঠেলে উঁকি মেরে দেখে পিতু। নাঃ বাবার আবির্ভাবের ঘোষণাও কোথাও উচ্চারিত হচ্ছে না। অতএব নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়া যায়। অতঃপর দু'চার খাবলা জল হাতে মুখে রগড়ে জামাটা বদলে চুলে চিরুনির দুটো টানের ওয়াস্তা। আর পিতুকে পায় কে!

বালতি ঘটির ব্যাপারটা যথাসাধ্য নিঃশব্দ রাখার চেষ্টা করেও কিন্তু ফল হয় না। জলে ঘটি ডোবানোর ছোট্ট শব্দটুকুও রান্নাঘরে অবস্থিত মানুষটির কান এড়ান না।

'পিতু।'

ভর্ৎসনার সুর বাজে ঘর থেকে।

'খেলা ফুরোচ্ছিল না বুঝি? চট করে মুখ ধুয়ে নাও। চৌকির ওপর জামা আছে!'—যাক অম্লের ওপর দিয়ে গেছে! কৃতজ্ঞ পিতু এক মুহূর্তে করণীয় কর্তব্য সেরে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে বলে—'আজ কী রাঁধবে গো ঠাকুমা?'

ঠাকুমা মুখ তুলে সহাস্যে উত্তর দেন, 'তুই-ই বল, তোরই তো ব্যাটা আসছে।'

'ধ্যাৎ!'

ঘরে ঢুকে উবু হয়ে বসে পিতু। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে বলে 'কচুরি করছ মা?'—কচুরি করার কারণটা মধুর লজ্জার! মনোরমার মুখে একটু চাপা হাসি খেলে যায়। উত্তর ঠাকুমাই দেন, 'হ্যাঁ রে! তোর বাবা যে কচুরি খেতে বড্ড ভালোবাসে। অবিশ্যি ওদের মেসে কতো কায়দায়, খাওয়ার অভাব কিছু নেই, তবু ঘরের জিনিস বলে কথা! রোজের রোজ একটু করে তেল জমিয়ে—'

মনোরমা মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে বলে, 'থাক মা ওসব কথা। ছেলেমানুষ বলেটলে ফেলবে।'

ঠাকুমা অপ্রতিভ অবস্থা ঢাকতে তাড়াতাড়ি বলেন,—'পিতু আমার তেমন মেয়ে নয়, খুব বুঝদার আছে, কী বলিস পিতু?'

পিতু সলজ্জ হাসি হাসে।

মনোরমা বলে, 'ভাজা তো হচ্ছে, তোর ভাগের দু'খানা খেয়ে নে!'

রসনায় জল সঞ্চার হয়, তবু দুর্দমনীয় বাসনা দমন করে পিতু তাচ্ছিল্যভরে বলে, 'এখন খিদে পায়নি। বাবার সঙ্গে খাবো?'

'সঙ্গে তো খাবি, সামনে বসে হ্যাঙলার মত হাত চাটবি তো?' মনোরমা হাসে।

নাঃ, পিতুর সেই একদিনের অসতর্কতার কাহিনী কেউ আর ভুলে যেতে রাজী নয়!

পিতু আরক্ত মুখে বলে, 'ইস্! রোজ যেন তাই করি! সে তো শুধু একদিন।'

মনোরমা হাসির সঙ্গে বলে, 'আর আজ কী করবি? বলবি, "কচুরি কী জিনিস ঠাকুমা? ও কী রকম খেতে ঠাকুমা?" তাই তো?'

ঠাকুমা বিপন্ন নাতনীকে রক্ষা করেন। কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে বৌকে বলেন 'তোমার খালি ওকে খ্যাপানোর তাল। ও আমার তেমনি বোকা নাকি?—হুঁ! কী বলবি রে পিতু?'

পিতু পৃষ্ঠবলের ভরসায় সোৎসাহে বলে, 'কী বলব? বলব কচুরি তো পেরায়ই খাই, ঠাকুমা নিত্যি করে। কচুরি খেয়ে খেয়ে আমাদের অরুচি ধরে গেছে বাবা, তুমি ভালো করে খাও!'

মনোরমা হেসে ফেলে বলে, 'অত কথা বলতে হবে না তোকে রক্ষে কর। সামনে বসে হাত-পাত না চাইলেই হল!'

পিতু লুব্ধদৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়, আজকের এই উৎসবের সুবর্ণ সুযোগে অপ্রত্যাশিত কোন ভোজ্যবস্তু চোখে পড়ে যায় কি না। এরকম পড়ে মাঝে মাঝে। যেমন সেদিন পড়ে গিয়েছিল। নারকোলের মালার মধ্যে এতটি নারকোল কোরা। পিতু চায়নি, শুধু প্রশ্ন করেছিল, 'ওটা কী ঠাকুমা?' তাতেই ঠাকুমা এতটা তুলে নিয়ে পিতুর হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন।

নাঃ, নারকোল কোরা আজ নেই, একটা বাটিতে কতক ছোলাভিজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র, যা কাঁচা খাওয়া চলে।

'ছোলাভিজে কী হবে ঠাকুমা?'

মনোরমা তিরস্কারের সুরে বলে, 'কী আবার হবে, রান্না হবে। খিদে পেয়েছে, যা খাবার কথা, খা না বাপু।'

ঠাকুমা নাতনীকে বোঝেন।

তিনি তিরস্কার করেন বৌকে, 'খিদে পেয়েছে সে কথা তো ও তোমায় বলতে আসেনি বাছা! সব তাতে তাড়া দাও কেন? ছোলাভিজে দিয়ে লাউ রাঁধবো রে পিতু। লাবিদের গাছের লাউ আধখানা দিয়ে গেল লাবির পিসি। দিব্যি কচি, তোর বাবা রুটি লাউঘণ্ট ভালোবাসে। নে দুটো চিবো ততক্ষণ।'

ঠাকুমা দু'টি ছোলাভিজে তুলে নিয়ে নাতনীর দিকে এগিয়ে দেন।

কিন্তু পিতু সহজে হাত বাড়াবে না। ওর বুঝি মান নেই? আড়চোখে শুধু মা'র দিকে তাকায়।

'হয়েছে, আর লজ্জায় কাজ নেই'—মনোরমা হেসে ফেলে একটিপ নুন নিয়ে বলে, 'নে নুন দিয়ে ভালো লাগবে।'

'রান্নাঘরে কেন? বাইরে গিয়ে বসগে না।'

এটা একটা সংকেত।

'বোসগে না' মানেই 'দেখগে না'। বাবা আসা দেখাও যে মস্ত একটা আমোদ।

একবার ঠাকুমা ছিল না, গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল ত্রিবেণীতে, সে-বার পিতু আর মা দু'জনে দেখেছিল বেড়ার দরজার কাছে একঘণ্টা আগে থেকে দাঁড়িয়ে।

'বাবা! বাবা! বাবা এসেছে, বাবা!'

রান্নাঘরের মধ্যে মনোরমার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। এগারো বারো বছর বিয়ে হয়ে গেছে, তবু ওঠে।

পঙ্কজ হাসতে হাসতে আর মেয়ের কথার নকল করতে করতে ঢোকে, 'বাবা! বাবা! বাবা!...দেখো বাবু ম্যাজিক দেখো, পিতুরানীর বাবা দেখো।...চার চার পয়সা টিকিট বাবু...চার চার পয়সা টিকিট!' এই রকম স্ফূর্তিবাজ লোক পঙ্কজ। সব কথাতেই ওর হাসি।

এরপরও বাবার পিঠ ধরে ঝুলে পড়বে না, এত ধৈর্য পিতুর নেই।

'এই হল আদিখ্যেতা শুরু।' মনোরমা বেরিয়ে এসে চাপা ধমক দেয়, 'মানুষটা তেতে পুড়ে এল, ওকে একটু স্থির হতে দে?'

পিতু কিন্তু আর এখন মাকে ভয় করে না।

করে না দু'কারণে। প্রথম তো বিরাট সহায়—বাবা কাছে। দ্বিতীয়ত মায়ের মুখে চোখে যে চাপা হাসির বিদ্যুৎ-ব্যঞ্জনা, সেটুকু পিতুর চোখ এড়ায়নি।

এ মাকে ভয় না করলেও চলে।

মহামায়ার শুদ্ধাচার পাড়াবিখ্যাত। রেলের কাপড়চোপড়ে জলের পাত্র স্পর্শ করা চলে না। মনোরমা কুয়োর পাড়ে গিয়ে পঙ্কজকে হাত মুখ ধোবার জল ঢেলে দেয়।

পঙ্কজ মুচকে হেসে খাটো গলায় বলে, 'তৃষ্ণার জলকে আটকে রেখে পা ধোবার জল দিয়ে পুণ্য নেই।'

মনোরমা তেমনি ভঙ্গিতে বলে, 'হয়েছে খুব হয়েছে। এবার মেয়ে বড় হচ্ছে, কথাবার্তা সামলাতে শেখো।'

'মেয়ে?—ঢের দেরী আছে বড় হতে।' বলে অদূরবর্তিনী কন্যার দিকে সস্নেহে তাকায় পঙ্কজ।

'সেই তো আরো জ্বালা! এখ্খুনি হয়তো মাকে জিজ্ঞেস করতে ছুটবে, 'ঠাকুমা, তেষ্টার জল মানে কী?'

হেসে ওঠে দু'জনই।

মুখ ধুতে এত দেরী...পিতু ভাবে। মনোরমা বলে, আবার সেই রাশ ক'রে জিনিস এনেছো? তোমার যেন বাজে খরচ করা এক বাতিক। এইটুকু তো সংসার, এত কে খায় বলো তো? গেল বারের আনা পাঁপর তো সবই রয়েছে, আবার পাঁপর এনেছো!'

পঙ্কজ গম্ভীরভাবে বলে, 'তা তোমরা যদি না খাও আর আনবো না।'

'এই দেখ মুশকিল! কত খাব! তরি-তরকারির জ্বালায় এটা ওটা খাবার জো আছে?'

'এত দিচ্ছে কে? আর কারো সঙ্গে বন্দোবস্ত করোনি তো?' হাসতে থাকে পঙ্কজ!

'এইবার তাই করবো ভাবছি। যা অসভ্য হয়ে যাচ্ছ দিন দিন। ঘর করার অযোগ্য!'

মহামায়া হাঁক পাড়েন, 'অ পঙ্কজ, মুখ ধোওয়া হ'ল? কচুরি ক'খানা যে পান্তো হয়ে গেল! জলটল খেয়ে গপ্‌পো করিস না বাছা।'

হ'ল তো?' বলে স্বামীর দিকে একটা সরোষ কটাক্ষ হেনে দ্রুতপদে সরে গেল মনোরমা।

পঙ্কজ দাওয়ায় উঠে চা জলখাবার খেতে বসল।

খেতে দেওয়ার ভার মহামায়ার নিজের হাতে। বৌ দিলেও তাঁর তৃপ্তি হয় না! ওদের ধরন-ধারণ জানতে তো আর বাকি নেই মহামায়ার! হয়তো খাওয়ার সময়ই এমন হাসাহাসি জুড়ে দেবে যে, যে খাবে সে টের পাবে না কী খেলাম, যে দেবে সে জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাবে 'কেমন খেলে'?

বহু যত্নে বহু চেষ্টায় 'প্রাণ কুটে' তৈরী জিনিসের এমন অপব্যয় সহ্য হয় না মহামায়ার। তিনি কাছে বসে খাওয়াবেন, কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করবেন, আর একটু নেবার জন্য সাধ্যসাধনা করবেন, তবে তো তৃপ্তি!

মাছটা মহামায়া ছোঁন না, রবিবার দিন মাছ আছে, মনোরমাই রাঁধে। মহামায়া দাঁড়িয়ে পরিবেশন করান। একদিন খলশে মাছের টক দিতে ভুলে গিয়েছিল মনোরমা, সেই অপরাধে তাকে ন ভূতো না ভবিষ্যতি করেছিলেন মহামায়া। এমনিতে তিনি বৌয়ের প্রতি স্নেহশীলাই, কিন্তু ছেলের ব্যাপারে নয়।

পঙ্কজ জুত ক'রে বসে বলে, 'কচুরি আর আলু-মরিচ? দি গ্রাণ্ড! আজকের জলযোগটি যে রীতিমত রাজসই!'

মহামায়া বিগলিত স্নেহে বলেন, 'কচুরি তো নামেই! কপালগুণে আজকেই ঘিটা গেছে ফুরিয়ে, তেলেই ভাজলাম। বলি গরম গরম খাবে, মন্দ লাগবে না।'

'মন্দ?' পঙ্কজ এক কামড় খেয়ে চরম পরিতৃপ্তির স্বরে বলে, 'হুঁঃ! তেলে ভাজারই তো তার বেশি গো মা! এই তো আমাদের মেসে কড়া কড়া ঘি উড়িয়ে রাঁধছে, পারুক দিকিনি একদিন এমন একখানা দি গ্র্যাণ্ড কচুরি ভাজতে? সত্যি বলতে মা, ক'দিন থেকেই তেলেভাজা ছোলার ডালের কচুরি খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল।'

মহামায়ার চোখের জল অসংবরণীয় হয়ে ওঠে। কষ্টে বলেন, 'ওরে, সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে—মায়ের প্রাণ! কথায় আছে—"ছেলে হাঁকে এপারে, মা কাঁদে ওপারে।" নদীর ওপার থেকে মায়ের প্রাণ কাঁদে!'

অতঃপর কাঁসিতে অবস্থিত বাকী কচুরিগুলি ছেলের পাতে পড়তে বিলম্ব হয় না।

এবার পঙ্কজের রাগের পালা।

'ব্যস ব্যস! সবগুলো ঢেলে দিলে? নাঃ তোমাদের কাছে ভালো বলবার জো নেই! এই আট ন'খানা আমি এখন খাবো?'

'কেন খাবি না? রাতের রুটি কম করছি!'

'আর তোমরা খাবে না? দু'খানাও তো রাখতে হয়?'

'বৌমার ভাগ ঘরে আছে, পিতুকে দিয়ে দিয়েছি, আবার কার জন্যে রাখবো? আমি কি রাতে ডালের জিনিস খাই?'

পঙ্কজ ক্ষুব্ধভাবে বলে, 'ছি ছি! তা'হলে আজ করলে কেন? কাল সকালে করলেই হত।'

মহামায়া সস্নেহ হাস্যে বলেন, 'শোন কথা! ভারি তো পদাত্থ জিনিস, দুখানা তেলেভাজা

কচুরি! তার আবার না খেলো না, হ্যানো হল না—আমি কি খাচ্ছি না? বৌমা আমার যখন তখনই ত' খাবার করছে। এই আজই বলছিল, ''মা, দশমীর দিন আপনাকে পেটভরে ডালপুরী খাওয়াবো।'' খাবার করা বৌমার এক বাতিক।'

'হ্যাঁ! তোমার বৌ নইলে আর এত গুণের কে হবে! হ্যাঁরে পিতু, রোজ খাস কচুরি ডালপুরী?'

'রোজ।'

পিতু যেন একটা মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে দিশেহারা হয়ে তাকায়। কোথায় সেই দুর্লভ বস্তু? ...দৈনন্দিন ভাত আর রুটিকে কেন্দ্র করে যে দু-একটি বাহুল্য বস্তুর দর্শন মেলে, সে হচ্ছে কচুর শাক, ওলের ডাঁটা, অথবা পাড়ার লোকের প্রীতি উপহার লাউটা কুমড়োটা। বাবা আলু আনে, সে-আলুর প্রায় সব ক'টিই তো তোলা থাকে পরবর্তী শনি-রবিবারের জন্যে। তাতে অবশ্য পিতু দুঃখিত নয়। শনি-রবিবার উৎসবের দিন, পিতুও জানে।

কিন্তু এত কথা ভাবতে এক সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগে না, পিতু ঢোঁক গিলে বলে,...'রোজ নয়, পেরায় পেরায় খাই।'

অবোধ পিতু মিথ্যা বলবে না, এটা নিশ্চিত। পঙ্কজ পুলকিত বিস্ময়ে বলে, 'আশ্চর্য! তোমরা এত কম খরচে কেমন চমৎকার করে সংসার চালাও আর আমাদের মেসে! হুঁ!'

মহামায়া সন্দিগ্ধভাবে বলেন, 'তবে যে বলিস, তোদের খাওয়া দাওয়া খুব ভালো।'

'আহা, তেমনি পয়সাটাও তো ভালো গো, তোমাদের তিনজনের যা খরচ না হয় আমার একার তাই খরচ।'

'ষাট্ ষাট্, তা হোক। পুরুষ বেটাছেলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়। তার একটু দরকার বৈকি!'

পিতু মহোৎসাহে বলে, 'এখানে যে সব জিনিস সস্তা বাবা। তোমাদের কলকাতার মত তো না! আমরা কত খাই! ঠাকুমা তো নিত্যি পায়েস রাঁধে, তোমার জন্য আমার মন কেমন করে। কাল আবার রাঁধবে ঠাকুমা?'

মহামায়া ভাঁড়ারের চিনির কথা স্মরণ করে ইতস্তত করে বলেন 'দেখি, গয়লা মুখপোড়া যদি ভালো দুধ দেয় তবেই। জলঢালা দুধ হলে করছি না।'

পঙ্কজ গেলাসের জলটা সব শেষ করে চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিয়ে বলে, 'খুব জল ঢালে বুঝি?'

নিছক গোয়ালার নিন্দে করতে মহামায়ার বোধ করি বিবেকে একটু বাধে। কারণ গোয়ালাটা অবিবেকী নয়। তার কাছে নানা বর্ণের দুধ মেলে।

মহামায়া যদি টাকায় আড়াই সের দুধের খদ্দের হন, দুধের রং নীল না হয়ে উপায় কোথা?

ছেলের কথাকে তাই এড়িয়ে গিয়ে মহামায়া বলেন, 'বাড়তি নিতে চাইলেই ঢালবে। সব তো খদ্দের-ঘর বাধাঁ। এক ছটাক দুধ পড়তে পায় না। কী দেশের কী অবস্থাই হয়েছে!'

অতঃপর প্রসঙ্গের পরিবর্তন ঘটে।

দেশের পুরনো দিনের আলোচনা চলে। যে আলোচনায় বর্তমানহীন ভবিষ্যৎহীন হতাশ জীবনের সবচেয়ে আনন্দ।

হৃতসর্বস্ব জাতি অতীত গৌরবের গাথা গায়, অভাবগ্রস্ত মানুষ অতীত সচ্ছলতার গল্পে বিভোর হয়।

'পিতু। পান নিয়ে যা।'

ঘর থেকে মনোরমার ডাক আসে। দু'খিলি পান মেয়ের হাতে দিয়ে মনোরমা চাপা ভর্ৎসনার সুরে বলে—'পায়েস টায়েস অত কথা বানাতে কে বলেছে তোমায়?' পিতু অপরাধীভাবে মাথা হেঁট করে।

মা, ঠাকুমা দু'জনকেই বাবার সামনে শূন্যে প্রাসাদ নির্মাণ করতে দেখে ও ভাবে, এ বুঝি ভারি এক মজার খেলা।

মনোরমাও অবশ্য মিথ্যাচারেব জন্য মেয়েকে বেশি তিরস্কারের জোর পায় না। তাই ক্ষমার সুরে বলে,'আচ্ছা যাও, পানটা দাও গে। বেশি আজে-বাজে কথা বোল না। পড়া দেখে নাওগে না একটু। লেখাপড়া শিখতে হবে না? আর এই এক মানুষ! মেয়েটাকে পড়ানো যে একটা কর্তব্য, সে জ্ঞান নেই।'

লেখাপড়া না কচুপোড়া!

লেখাপড়া শিখতে দায় পড়েছে পিতুর। বাবার সঙ্গে কত ভালো ভালো গপ্‌পো হবে এখন, তা নয় লেখাপড়া। ছিঃ।

পঙ্কজের অবশ্য পিতৃকর্তব্য পালনে বিশেষ গা দেখা যায় না। পিতাপুত্রীতে গল্পই চলে।

তা সে গল্পেও শূন্যে স্বর্গ-রচনা। বলা যেতে পারে গল্পের শিরোনামা হচ্ছে 'যখন অনেক টাকা হবে।'

লটারিতে টাকা পাওয়াটা নিশ্চিত, তারিখটাই যা এখনো জানা যাচ্ছে না। সে যাক, টাকাটা কী ভাবে খরচ করা হবে সেইটাই হচ্ছে আসল কথা। বাপে মেয়েতে সেই কথাই হয়।

জামা কাপড়, খাওয়া দাওয়া খেলনা পুতুল, ঠাকুরমার ঠাকুরঘরের রুপোর সিংহাসন, সোনার 'ঝারা', মনোরমার গাদা গাদা গয়না, পঙ্কজের হাতঘড়ি আর চশমা, এ সমস্ত ব্যাপারেই পিতা কন্যার একমত। মতের বৈষম্য একটি ব্যাপাবে।

পঙ্কজের ইচ্ছে—সকলে মিলে কলকাতায় চলে যাওয়া, পিতুর তাতে দারুণ অনিচ্ছে! এই বাড়ি, এই গ্রাম, লাবি আর অন্যান্য সঙ্গী-সাথীরা, গোসাঁইদের পোড়োবাড়ির ইঁটের স্তূপ সরিয়ে অতি কষ্টে তৈরি খেলাঘব, উঠোনের আমড়াগাছের ডালে বাঁধা দোলনা—এই সমস্ত ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না পিতু।

পঙ্কজ অফিসের কথা তুলে কলকাতার স্বপক্ষে যুক্তি দেখায়; পিতু ভটচাজ্ জ্যাঠার ছেলের উদাহবণ দেয়। যে ছেলেটি ডাক্তার হয়ে নিত্য দু'বেলা কলকাতায় যাবার জন্য মোটর কিনেছে। যখন অনেক টাকা হবে, তখন গাড়ি কিনতেই বা বাধা কী!

কথার মাঝখানে পিতু বলে বসে—'বাবা, তুমি গরীব লোক?'

পঙ্কজ মুহূর্তের জন্য থতমত খায়...পরক্ষণেই হা হা করে হেসে উঠে বলে, 'কে বলেছে এ কথা?'

বাবার হাসিতে পিতু বুকে বল পায়। তাই অগ্রাহ্যের সুরে বলে, 'আবার কে? ওই লাবি?'

'লাবি না হাবি!' পঙ্কজ লাবি সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি করে নিজের বুকের উপর একটা থাবড়া মেরে বলে, 'আমার মতন বড়লোক এ-গাঁয়ে কেউ নেই বুঝলি? কেউ না।'

এ হেন ঘোষণায় পিতু বেশ একটু অবাক হয়ে বাপের দিকে তাকায়। কথাটায় সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়া শক্ত, অথচ বাবার হাস্যোজ্জ্বল মুখ ঘোষণা সপক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে। আবার হাসিটাও কেমন যেন রহস্য রহস্য!

সন্দেহমোচনার্থে পিতু বলে,—'তা'হলে তোমার জুতো ছেঁড়া কেন?'

'জুতো!'

জুতোর ছেঁড়াটুকু চোখে পড়ে গেছে মেয়েটার! জামা কাপড়ের মত জুতোকে অল্পে ভদ্র চেহারা দেওয়া যায় না।

তবু তো আঁধার ঘেঁষে রোয়াকের নীচে রেখে দিয়েছে জুতোটাকে।

কিন্তু মেয়ের কাছে তো কথায় হারবে না পঙ্কজ, তাই অম্লানবদনে বলে,—'জুতো ছেঁড়া কেন তাই জিজ্ঞেস করছিস? নতুন জুতো কিনব কখন? দোকানে যাবার সময় আছে! এই তো শনিবার হলেই এখানে? শনি-রবি দুটো দিন গেল। অন্য দিন আপিস। কখন কিনব? টাকা পকেটে নিয়ে তো ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

শুনে পিতু অবাক।

সময় নেই!

পৃথিবীতে কত সময়! অগাধ অফুরন্ত! দিনের উন্মোচন আর রাত্রির অবতরণে আবর্তিত হইতে চলেছে বিরতিহীন একটানা এক সময়ের স্রোত। অনন্তকালব্যাপী সেই তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে দিন আর রাত্রিগুলো। ভট্‌চাজ্ জ্যাঠা উদয়াস্ত তামাক খাচ্ছেন আর হুঁকো নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চৌধুরীদাদু চব্বিশ ঘণ্টা চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে আছেন। লাবুর পিসি একফালি লাউ কুমড়ো নিয়ে উপহারের ছুতোয় পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও কোন ছুটোছুটি নেই। সব স্তিমিত। সব নিস্তরঙ্গ।

অথচ বেচারী বাবা!

সময়ের অভাবে টাকা পকেটে নিয়ে ছেঁড়া জুতো পরে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে তাকে।

এরা যেন অভিনব এক শব্দগঠনের খেলা শিখেছে। সে খেলায় সবাই মশগুল। প্রথমে কে এই খেলা আবিষ্কার করেছিল সে এখন বলা শক্ত।...পঙ্কজ? মহামায়া, মনোরমা? নাঃ, সে কারো মনে নেই! তবু কেউ ভেস্তে দেবে খেলা। খেলা ভেস্তে দিলেই হঠাৎ একেবারে গরীব হয়ে যাবে ওরা। সে দারিদ্র্যের উপর তখন আর কোন আব্রু থাকবে না।

তা হলে মহামায়ার ভাঁড়ারের হঠাৎ ঘি ফুরিয়ে যাওয়ার রহস্য যাবে ভেঙ্গে! পঙ্কজের 'সময় অভাবের' গল্প ফুরিয়ে যাবে।

তার চেয়ে এই ভালো!...এই মধুর মিথ্যার জাল!

কাজেই পঙ্কজ অনায়াসেই মহোৎসাহে শুরু করে, 'শুধু জুতো? সময়ের অভাবে কত জিনিস হয়ে উঠছে না জানিস? টাক পড়ে যাচ্ছে, একটা ভালো তেল কেনা হচ্ছে না! তোর মা এত সোয়েটার বুনতে জানে, তবু পশম কেনা হচ্ছে না। আর তোর তো কত জিনিসেরই দরকার তার ঠিকই নেই। সে সব কিছু হচ্ছে না...শুধু সময়ের অভাবে।'

শিশুর কাছে মিথ্যাভাষণে পঙ্কজের বিবেক আহত হয় না। 'সময়ের অভাব' এ কথা কি মিথ্যা? সময়ের অভাবেই তো কিছু হচ্ছে না।

তবু 'সময়' একদিন আসবেই, এ পঙ্কজের স্থির বিশ্বাস।

'অসাচ্ছল্য', 'অনটন' এ যেন নেহাতই সাময়িক একটা অবস্থা মাত্র! ও ঠিক হয়ে যাবে। যখন সময় আসবে তখন শুরু হবে সত্যকার জীবন। যে জীবনের প্রতিটি ছবি পঙ্কজের মখুস্থ।

টাকা পকেটে করে বেড়ানো?

সেও মিথ্যা নয়। পকেটটা জামায় নেই, আছে মনে। এই যা।

বাবার কথায় হৃষ্ট পিতু হঠাৎ আপনমনে ভেঙচানির সুরে বলে ওঠে,'লাবি না হাবি।'

হো হো করে হেসে ওঠে পঙ্কজ। হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মনোরমা এসে দাঁড়ায়।

রান্না সাঙ্গ হয়েছে, মহামায়া এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে সন্ধ্যাহ্নিকে বসলেন। এবার মনোরমাও একটু নিশ্চিন্ত হয়ে স্বামীর কাছে বসতে পারে।

'এত হাসি কিসের শুনি?'

পঙ্কজ গম্ভীরভাবে বলে, 'যারা বসে না আমরা তাদের কিছু বলি না। এই পিতু খবরদার! বলবি না কেন হাসছিস।'

'এই বসলাম। হ'ল তো?'

পঙ্কজ আরো গম্ভীর মুখে বলে, 'তার আগে বলতে হবে তুমি কেন হাসছ। কেউ তো তোমাকে কোন রহস্য কাহিনী বলেনি। এসে বসলে, আর হাসতে লাগলে। এর মানে?'

'কোথায় আবার হাসছি? হ্যাঁরে পিতু, হাসছি আমি?' মনোরমা রীতমত গাম্ভীর্য আনতে চেষ্টা করে। পিতু মায়ের মুখের দিকে তাকায়। উজ্জ্বল শিখা হ্যারিকেন লণ্ঠনটার ঠিক সামনা সামনিই বসেছে মনোরমা, তার ঈষৎ আনতমুখের রেখায় আলোর আভা।

কিন্তু এ-আভা কি শুধুই হ্যারিকেনের আলোর? হ্যারিকেনের আলো-লাগা মার মুখ তো আরও অনেক সময় দেখেছে পিতু। বাবা যেদিন আসে সেদিন সন্ধ্যাবেলা বই পড়ার সময়, কিংবা পিতুকে পড়ানোর সময়! সে শুধুই বাইরে থেকে গিয়ে পড়া আলো, ভিতর থেকে ঠিকরে উঠছে এমন আলো তো নয়! এ যেন অজানিত, এ যেন অলৌকিক।

পঙ্কজ মেয়ের অবাক-হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বলে, 'শোন পিতুর হাবি বন্ধু লাবি বলেছে, পিতুর বাবা গরীব! কথাটা হাসির যোগ্য কিনা?'

'তা আবার নয়।' আলোয় ঝলসে ওঠে মনোরমা 'গরীব কি বল? সম্রাট।'

'এই শুনলি তো পিতু? বলিনি আমি? বলিনি আমার চেয়ে বড়লোক এ গাঁয়ে আর নেই?'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে পিতু। আশ্চর্য! অবাক কথা। বাবার মুখেও সেই একই আলোর উদ্ভাসন!

পিতুর মনে হয়, এদের এই সাধারণ কথাগুলো যেন সাধারণ নয়। হাসিটা তো নয়ই। এই কৌতুকভরা মুখের রেখায় রেখায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে আরো অন্য কিছু—যা পিতুর বুদ্ধির বাইরে।

তবু কী অপূর্ব। কী সুন্দর!...আনন্দে হঠাৎ চোখে জল এসে যায় পিতুর।

এখন যদি লাবিকে ডেকে এনে দেখাতে পারত! এখন দেখলে পিতুর মা'র গায়ে গয়না নেই বলে ঠাট্টা করবার সাধ্য হত লাবির? গয়না আছে কি না, মনে পড়ত?

ত্যাগ।। আশালতা সিংহ

গৃহস্বামী সেদিন একটু দেরি করিয়া তাঁহার আপিস হইতে ফিরিয়াছিলেন। গৃহে পৌঁছিয়া দেখেন বন্ধুরা ইতিপূর্ব্বে চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া আসর সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন। বিজয়নাথ হাতের ছড়িটা দেয়ালের কোণে রাখিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? তোমাদের গলার আওয়াজটা তর্কের উত্তেজনাবশতঃই বোধ করি কিঞ্চিৎ উত্তাল হয়ে উঠেছে। আস্তে অস্তে মোড় থেকে শুনতে পেলাম। ভাবলাম এতক্ষণ নিশ্চয়ই হিটলার কিংবা মুসোলিনীকে সমালোচনার চোখা চোখা বাণে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে কিংবা জাপানীদের বর্ব্বর নৃশংসতার কাহিনী বর্ণনা করতে করতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছ। মন্দ না। আমরা বাঙালীরা পুঁইশাকের চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাই, মাঝে মাঝে গৃহিণীর নথনাড়া যে না খাই তাও নয়। আর আফিসে যাই কলম পিষি, এবং বড় সায়েবের সবুট পায়ে খোসামোদের কিঞ্চিৎ তৈল বর্ষণ করি। আমাদের এই নিরানন্দ বৈচিত্র্যহীন জীবনের অবসানে সন্ধ্যাবেলায় এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে যদি রাজা-উজির না মারতে পাই তাহলে আর জীবনের স্বাদ থাকে কোথায়! আজ কি নিয়ে চলছিল তোমাদের?" প্রমথ হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আরে শুনেছ ভুলু আর গণেশ দুজনে এক সঙ্গে মিলে যে 'গণেশ এণ্ড বসাক' নাম দিয়ে কারবার খুলেছিল সেটা যে ফেল পড়েছে। আমরা এইমাত্র খবর পেলাম। পাওনাদারের হাত এড়াবার জন্যে যত রকম ফন্দিফিকির আছে দুনিয়াতে তার কোনটাই ওরা বাদ দেয়নি। আমি জানতাম না, আজই হঠাৎ সতীশের কাছে সমস্ত ব্যাপার শুনলাম। জোচ্চোর ব্যাটারা! অনেক লোককেই ঠকিয়েছে।" সতীশ পাশেই চেয়ারে বসিয়াছিল, সে বলিল, "বাস্তবিক বিজয়, এই বাঙালি জাতটার মত অলস, স্বার্থপর এবং হিংসুটে জাত আমি আর একটাও দেখতে পেলাম না। হিট্‌লার, মুসোলিনীর জবরদস্ত নীতি নিয়ে আমরা সমালোচনার স্রোত বইয়ে দিই, কিন্তু একবার মনে করে দেখ দিকি জাতির উন্নতির জন্যে সে দেশের প্রত্যেকটি লোক কতখানি স্বার্থত্যাগ করেছে, নিজেদের কত কঠিন নিয়ম কত সুকঠোর নিষ্ঠার অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। ভেবে দেখলে মনে গভীর শ্রদ্ধা হয় না কি? আর বাঙালি? নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু জানে ওরা? পারে কোন ত্যাগ করতে?"

বিজয়নাথের শুনিতে রীতিমত কষ্ট হইতেছিল। ভৃত্য রেকাবিতে করিয়া জলখাবার এবং চায়ের পেয়ালা আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে, পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "সতীশ, তুমি কি ঠিক জান বাঙালী ত্যাগ করতে জানে না? আমি তোমাকে একটি কথা মনে করিয়ে দিই। কথাটি বাঙালীদের মধ্যেই যিনি শ্রেষ্ঠ সত্যদ্রষ্টা সেই রবিবাবু গোরার মুখ দিয়ে বলিয়াছেন, "নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ এবং স্বজাতির মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে খুব অল্পই আছে।" কোন জিনিস যথার্থ না জেনে সমালোচনা করতে নেই। বিশেষ করে সমস্ত জাতির নিন্দা-ব্যাপারে।" সতীশ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল. "আমি কি বলেছি বাঙালীদের মধ্যে স্বার্থত্যাগ করতে কেউ জানে না? না, তেমন করে খুঁজে দেখলে দু'চার জন মহান ব্যক্তির নাম মনে পড়ে না? কিন্তু সেটা হল দৃষ্টান্ত। প্রতি দিনে আমাদের আশেপাশের জীবনে ঠিক সেই দৃষ্টান্তের উল্টোটাই কি আমরা দেখতে পাইনে?"

বিজয়নাথ গভীর স্বরে বলিলেন, "না তা নয়। আমি ত তোমাদের মত বক্তা নই। গুছিয়ে দু-চার কথা বলতেও পারি নে, কিন্তু আমি অনুভব করতে পারি বাঙালীরা তাদের রোজকার জীবনেই যত ত্যাগ করে তাদের সে তিল তিল আত্মত্যাগের পরিসীমা নেই। কত জায়গায় কত ছলে দেখেছি তাদের। অজ্ঞাত অখ্যাত তারা, তাদের কথা এ চায়ের আসরে বললে বেমানান শোনাবে। আর বলবার ভাষাও নেই আমার। কিন্তু আমি এটুকু নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি ত্যাগ করবার ক্ষমতা তাদের কি অসীম! যখন তাদের ডাক আসবে তখন এ অক্ষমতার দোহাই তাদের কেউ দিতে পারবে না। জগতে তারা প্রমাণ করবেই এক দিন, এত দিন যে-অপবাদ তাদের নামে সবাই দিয়েছিল, তারা তার অনেক উর্দ্ধে। দেখে নিও তোমরা।"

সতীশ আর তর্ক না করিয়া একটুখানি অবজ্ঞার হাসি হাসিল। বিজয় যে ভাবপ্রবণ সেকথা তাহারা সবাই জানিত। তাহার সকল কথাই যে বিশ্বাসের যোগ্য এমন কেহই মনে করিত না; আজও করিল না। তথাপি প্রসঙ্গটা বদলাইয়া বন্ধুরা চা এবং বাড়ীর তৈয়ারী শিঙ্গাড়া কচুরির সহিত অন্যবিধ চর্চ্চায় লিপ্ত হইলেন। কিন্তু যাহাদের কথা চায়ের আসরে নিতান্ত বেমানান হইবে বলিয়া বিজয়নাথ, সঙ্কোচে বলিতে চাহেন নাই, তাহাদেরই একজনের জীবনের করুণতম অধ্যায় যে সেই দিনই তাঁহার চোখের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইবে এ আশাও বোধ করি তিনি করেন নাই। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটিল তাহাই।

বন্ধুরা বিদায় লইবার পর বিজয়নাথ অন্তঃপুরে আসিয়া সবেমাত্র বসিয়াছেন। গৃহিণী একটি তোলা-উনুনে স্বামীর রাত্রির আহারের জন্য লুচি ভাজিতেছিলেন। এমন সময় বহির্দ্বারে একটা ছেকড়া-গাড়ী দাঁড়াইবার আওয়াজ পাওয়া গেল। এত রাত্রিতে কে আসিল দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া বিজয়নাথের স্ত্রী মন্দা বারান্দার রেলিং ঝুঁকিয়া মুখ বাড়াইল। গাড়ীর মাথায় অনেক মোটঘাট, পোঁটলাপুঁটলি। একটি অবগুণ্ঠনবতী বিধবা আধময়লা কাপড় পরিয়া নামিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছোট ছোট তিন-চারিটি ছেলেমেয়ে।

সিঁড়ির মুখে আসিয়া তাহারা সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল। মন্দা লুচি ভাজা রাখিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আপনার ছোট ননদ মাধুরী, আমি তারই খুড়তুতো জা। আমাকে হয়ত আপনি চিনবেন না, কখনও দেখেন নি। আমি কিন্তু মাধুরীর মুখে অনেকবার আপনার গল্প শুনেছি। আমরা যাচ্ছি রংপুরে। সঙ্গে ঠাকুরপো আছেন, আপনার নন্দাই। ট্রেনটা লেট ছিল, গাড়ীবদল করে ছোট-লাইনের গাড়ী ধরবার আর সময় মিলল না, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। তাই ঠাকুরপো বললেন, সেই কাল বেলা ন-টার আগে যখন আর গাড়ী নেই তখন আজ রাত্রিটার মত আপনাদের এখানে থেকে যেতে। তিনি স্টেশনে আটকা পড়েছেন, আসছেন।"

মন্দা তাহাদের সমাদর করিয়া কহিল, "তবু ভাগ্যি যে ট্রেন ফেল হয়েছে। নইলে ত আর আমাদের আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হত না। আসুন আসুন, উপরে চলুন। তা আপনার ঠাকুরপো নরেশ আসুক, সে এলে তার সঙ্গে ঝগড়া করব। ট্রেন ফেল হোক বা না হোক এই যখন পথ, তখন তার একটা খবর দিয়ে আপনাদের এখানে নামিয়ে অন্ততঃ দিন-দুই জিরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপনার নামটি কি ভাই? চলুন, দাঁড়িয়ে কেন।"

"আমার নাম সুহাস"—সিঁড়িতে উঠিবার পথে মেয়েটি বলিল, বলিয়া একটু ম্লান হাসিল। সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিতে আসিতে বিজলীবাতির উজ্জ্বল আলোর নীচে তাহার মুখখানি বড় ম্লান ও করুণ দেখাইল। একমাত্র পথশ্রমকেই হয়ত অতখানি বিষণ্ণ করুণতার জন্য দায়ী কার যায় না। তাহার পরিধানের বৈধব্য-বেশের দিকে চাহিয়া মন্দা ব্যথিত চিত্তে মনে মনে কহিল, আহা বেচারীর এই ত বয়স, এরই মধ্যে কপাল পুড়েছে! উপরে আনিয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের জন্য চাকরকে বিছানা করিতে বলিয়া সুহাসকে হাতমুখ

ধুইবার জন্য স্নানের ঘরটা দেখাইয়া দিতেছে এমন সময় নীচের তলায় নরেশের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, ''বৌঠান কোথা!''

বাক্স খুলিয়া স্বামীর একখানা ধোয়ানো নরুন-পাড়ের ধুতি বাহির করিয়া সুহাসকে গাড়ীর কাপড়খানা ছাড়িবার জন্য অনুরোধ করিয়া এবং স্নানের ঘরটা দেখাইয়া দিয়া মন্দা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

বাড়ীতে স্ত্রীলোক-অতিথির অভ্যাগমে বিজয়নাথ উপরতলা ছাড়িয়া বাহিরের বৈঠকখানায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। নরেশ ততক্ষণ সেখানে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়াছে এবং পাখার অভাবে পকেট হইতে রুমালটা বাহির করিয়া পাখার মত করিয়া সঞ্চালন করিতে করিতে ক্লান্তিবিনোদনের কিছু চেষ্টা করিতেছে। মন্দাকে দেখিয়া বলিল, ''বৌঠান! তুমি ওদের চিনতে পেরেছ ত? আমার দূরসম্পর্কের একজন খুড়তুতো ভাইয়ের স্ত্রী। আমার সঙ্গে আসাই উচিত ছিল কিন্তু লগেজগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে এত দেরি হয়ে গেল।'' বলিয়া বারান্দার এক-পাশে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা জিনিসপত্রের রাশি নির্দ্দেশ করিল। বাসনের সিন্দুক, ভাঙা কেম্বিসের খাট, পিঁড়ি, জলচৌকি হইতে শুরু করিয়া গৃহস্থালীর টুকিটাকি সমস্ত প্রকার জিনিসই কতক চটে আচ্ছাদিত হইয়া কতক বা এমনই গাদা করা ছিল। সেই দিকে চাহিয়া মন্দা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, ''এত জিনিস! ওঁরা কি গোটা একটা সংসার তুলে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি?''

নরেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ''অনেকটা তাই। আজ সাত দিন হল সুহাস-বৌদির স্বামী মারা গেছেন। কলকাতায় সামান্য ভাড়াবাড়ীতে থাকতেন, বাসাতে আর দ্বিতীয় অভিভাবক নেই। কোথায় কার কাছে কেমন করেই বা থাকবেন, তাই আপাততঃ আমাদের ওখানেই নিয়ে যাচ্ছি।'' মন্দা ব্যথিত হইয়া বলিল, ''মোট সাত দিন ওঁর স্বামী মারা গেছেন! আহা, কি হয়েছিল?''

নরেশ কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ''কি হয়েছিল সে কথা বলতেও কষ্ট হয়, শুনতেও তোমার কষ্ট হবে। তাঁর আজ ছ-মাস হল যক্ষ্মা হয়েছিল। শুধু শেষের মাসটাই আপিস যান নি আর বোধ করি দু-এক মাস অর্দ্ধেক মাইনেতে ছুটিও মঞ্জুর করেছিলেন। তার পরে আর কি, এক দিন আস্তে আস্তে সব শেষ হয়ে গেল। বেশী কিছু ব্যাপার না, আয়োজন আর বিস্তৃতিও খুবই সামান্য। পাছে রোগটা প্রকাশ পেলে চাকরি যায়, পাছে সংসার অচল হয়ে যায়, তাই নেহাৎ শেষ অবস্থা অবধি প্রকাশ-দা না নিজের কাছে না পরের কাছে কিছুতেই স্বীকার করে নি যে তার কিছু হয়েছে।''

মন্দা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, ''কি চাকরি করতেন তিনি?''

নরেশ উত্তর করিল, ''চাকরি খুব সামান্যই। সকাল বেলায় উঠে ছেলে পড়াতে যেত। ফিরে এসে পাড়ার একটা লাইব্রেরিতে বই সরবরাহ করতে যেত। সেখানকার লাইব্রেরিয়ানের কাজ করে মাসে বুঝি গোটা দশেক টাকা পেত। সেখান থেকে এসে তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজে আপিস যেত। কোন দিন স্নান হত, কোনদিন বা সময়াভাবে হত না। একটা আপিসে ত্রিশ টাকার কেরানীগিরি করত। ফিরে এসে সন্ধ্যা নাগাদ আবার একজায়গায় টিউশনি করতে যেতে হত। কলকাতার পঞ্চাশ-ষাট টাকা আয়ে তিন-চারটে ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী নিয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতে হলে তাকে যে ঘরে বাস করতে হয় এবং যা-খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়, তার উপর ঐ খাটুনির বহরটা যোগ করে সহজেই বুঝতে পারছ, প্রকাশ-দার কেন যক্ষ্মা হয়েছিল। তার সঙ্গে প্রকাশ-দার আরও একটা দুর্ব্বহ চিন্তা ছিল। গত বৎসর ছোট বোনটির বিয়ে দিতে হাজার খানেক টাকা দেনা করতে হয়, সেই ঋণের বোঝাও তার এ-জীবনের মেয়াদকে আরও সংক্ষেপ করে আনলে। সুহাস-বৌদির কাছে শুনছিলাম, মাসে মাসে সুদ

এবং আসল টাকার কিছু করে দিতেই হত। তাই প্রকাশ-দা খাটুনির উপরে আবার একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড টাইপ-রাইটার কিনে রাত্রি জেগে সস্তায় টাইপের কাজ যোগাড় করে তাই করত। তাতেও সামান্য কিছু আয় হত।''

মন্দা উত্তেজিত হইয়া কহিল, ''কিসের জন্য করতেন? এই যে অকালে মারা গিয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁর ছেলেমেয়েকে একেবারে অনাথ করে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন, এখন তাদেরি বা কি হবে? আর তাঁর ঋণেরই বা কি হবে? একথা ভেবেও তাঁর অমন অতিরিক্ত পরিশ্রম করা উচিত হয়নি।

নরেশ একটুখানি হাসিল, ''তাকে আমি দোষ দিতে পারি নে বৌঠান। ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়াগুলো সারাদিন চাবুকের মার খেয়ে আর আধপেটা খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যেবেলায় মরিয়া হয়ে ছোটে শেষ আশায়। তাদের সে উন্মাদ গতি কখনও দেখ নি। তাই এমন কথা বলতে পেরেছ। একটু আগে ট্রেনে আসতে আসতে তুমি আমাকে এই মাত্র যা প্রশ্ন করলে আমি নিজেকে নিজে ঠিক্ সেই প্রশ্নই করছিলাম, কেন প্রকাশ-দা এমন অসম্ভব অতিরিক্ত পরিশ্রমের তলায় নিজেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেললে?...চোখ ফিরিয়ে দেখি সুহাস-বৌদির চোখে জল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,—কাল রবিবার নয়? বললাম,—কাল রবিবারই বটে; কিন্তু হঠাৎ একথা কেন? সুহাস-বৌদি নিজেকে সংযত করে বললেন,—প্রত্যেক বারই রবিবারে উনি কাঙালের মত বলতেন, ''আজ রবিবার নয়? আজ দুপুরে একটু ঘুমুতে পাব।''

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সুহাস-বৌদির ঐ একটি কথায় আমি আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম। দিনের শেষে শুধু বোধ করিবা একটু ঘুমাবার আশাতেই সে প্রাণপণ করে চলেছে। চলা যখন ফুরোল তখন ঘাড় গুঁজে সেইখানে শুয়ে পড়ল। এর পরেও কি হবে বা হতে পারে তার অবর্ত্তমানে তার সংসারের চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে—এসব ভাববার মত সামর্থ্য তার আর ছিল না। মন্দা অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছিল, তথাপি কৌতূহলবশত এ প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইতেও পারিতেছিল না। বলিল, ''সংসারে আর কি তাঁহার কেউ ছিল না? মা বাবা? তোমাদের জানালেও ত একটা উপায় হয়ত হতে পারত শেষ পর্য্যন্ত।''

নরেশ কহিল, ''দরিদ্রের আত্মসম্মান জিনিসটা বড় তীব্র ও অসহিষ্ণু। ঘুণাক্ষরেও সে আমাদের কাছে তার অভাব-অভিযোগের কথা কখনও বলে নি। সংসারেও তার বিশেষ কেউ নেই। বাবা ছোট বেলায় মারা গেছেন। মা আছেন, কাশীবাস করেন। তাঁকে মাসে দুটি করে টাকা প্রকাশ-দাকেই নিয়মিত পাঠাতে হত। গাঁয়ে যা হোক একটা ভদ্রাসন ছিল, মেজবোনের বিয়েতে বাঁধা দিয়ে বিয়ের খরচ যোগাড় হয়। সে-বাড়ী আর প্রকাশ-দা ছাড়াতে পারে নি। অনেকটা সেই ক্ষোভেই খুড়ীমা কাশীবাসিনী হয়েছেন—ছেলের সঙ্গে রাগারাগি করে।''

মন্দা বলিল, ''যাই বল ভাই প্রকাশবাবুর অবস্থা যখন এত খারাপ তখন তোমার খুড়ীমার কিছুতেই তার ঘাড়ে তাড়াতাড়ি একটি বৌ চাপিয়ে দেওয়া উচিত হয় নি। অত অল্প আয়ে ঐ সর্ব্বনেশে বোঝা তাঁকে বহন করতে না হলে হয়ত এমন ঘটত না।''

নরেশ হাসিল, ''হায় রে, বাঙালী-ঘরে তেমন আর নেই বলে মা-বাপে ছেলের বিয়ে দিতে দেরি করছে এমন দৃশ্য কোথাও কখনও দেখেছ বৌঠান? সংসারের এই যূপকাষ্ঠে বাঙালীর কতখানি গেছে আর রোজ কত যাচ্ছে সে তিল-তিল ত্যাগের খবর কেউ রাখে কিনা জানি নে। কিন্তু কোন একটা বড় শক্তি, বড় প্রতিভা এই নিরর্থক পঙ্গু, ত্যাগের ক্ষেত্র থেকে টেনে যদি তাদের তুলতে পারে, তাহলে এই বিরাট শক্তি দিয়ে অনেক কিছু কাজই হওয়া সম্ভব।''

বিজয়নাথ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ''তুমি ঠিকই বলেছ নরেশ। এই কথাটা আমি আমার

জীবনেও অনেকবার অনেক রকমে দেখেছি। আজ আরও একবার নূতন করে দেখলাম। এই নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় এই ঘরে বসেই আমার বন্ধুরা তর্কে তর্কে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের বোঝাতে পারছিলাম না ঠিক, কিন্তু তোমার কথাগুলি যা এইমাত্র বললে ব্যথার সঙ্গে স্মরণ করছিলাম।"

নরেশ হাতের রুমালটা রাখিয়া বলিল, "সারাদিন যা শ্রান্তি গেছে, এক পেয়ালা চা দাও বৌঠান। এইত তার নিয়ে যাচ্ছি, বাড়ীতে আবার কি রকম অভ্যর্থনা পাব জানি নে। মধ্যবিত্ত বাঙালী-ঘরের অনিবার্য্য অভাব ও সেইহেতু সঙ্কীর্ণ অনুদারতার কথা, সব না জানো কিছু কিছু তো জানই। কিন্তু সে পরের কথা, যাই হোক, এখন উপস্থিত এক পেয়ালা চা না পেলে কিছুতেই ত চাঙ্গা হতে পারছিনে। মন্দা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত অবরুদ্ধ ক্লেশ সবলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাই আমি এখনই চা তৈরি করে পাঠিয়ে দিই। দেখি সুহাসের বোধ হয় এতক্ষণ কাপড় ছাড়া হয়েছে। ওর ত অশৌচ যাচ্ছে, ফল আর দুধ ছাড়া বোধ হয় কিছু খাবে না।"

বিচিত্রা ॥ শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

১

সাধারণ হইতে ইন্দুর প্রকৃতি যে কিছু ভিন্ন রকমের ছিল তাহা শিবনাথ ভালরূপেই জানিয়াছিল; কিন্তু মানুষ সকল সময়েই ধৈর্য্য রাখিয়া চলিতে পারে তাহা নহে, তাই যেদিন কথায় কথায় একটু উত্তেজিত হইয়াই সে বলিয়া উঠিল,—"আমি তো তোমার সব কথা সব সময়ে শুনে চলতে প্রস্তুত নই ইন্দু, যখন তোমার বাপ্‌মা তোমায় আমার হাতে দিয়েছিলেন তখন এমন কোন প্রতিজ্ঞাও করিয়ে নেন্ নি—" সেদিন মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়ে ইন্দু যেন বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিল, তাহার পরে নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া আপনার কক্ষে ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিয়া দিল।

সে রাত্রে প্রতিদিনকার মত শিবনাথ আর তাহাকে সাধিয়া দ্বার খুলাইল না, ইন্দু নিজেও বাহিরে আসিল না। নিঃশব্দে অনাহারে জাগিয়া ভোরের সময় ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ভাঙ্গিয়া যখন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে।

ভৃত্য বলিল,—"চা আনি দিদিমণি?"

গম্ভীরস্বরে ইন্দু উত্তর দিল,—"না।"

ভৃত্য ছক্কু ইন্দুর অন্য আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু ইন্দু অন্য কোন আদেশ করিল না, শুধু প্রশ্ন করিল, "বাবু কোথায়?"

ছক্কু জানাইল,"ডাকে বাহির হইয়াছেন।"

ইন্দু আর কোনও প্রশ্ন করিল না, তোয়ালে হাতে লইয়া নিঃশব্দে বাথরুমে গিয়া প্রবেশ করিল।

ইন্দুর সহিত শিবনাথের বিবাহ হইয়াছিল একটু আশ্চর্য্য রকমে;—ঘটনাটা এই—

যে মেসে থাকিয়া শিবনাথ ডাক্তারি পড়িত তাহার পাশেই ছিল ইন্দুর পিতা সূর্য্যবাবুর ছোট বাসাবাড়ীটি। বাড়ীটি যেমন অন্ধকারে ঢাকা তেমনি সেঁতসেঁতে, চুণ বালি খসা।

সূর্য্যবাবু ব্রাহ্ম, কিন্তু আর্থিক অবস্থা তাঁহার একদিন সচ্ছল থাকিলেও বর্ত্তমানে ছিল না; মাসিক ত্রিশটাকা আয়। একটি মেয়ে, স্ত্রী এবং নিজে এই তিনজনের ভরণ-পোষণ ও বাড়ীভাড়া ইত্যাদির খরচ চালান যে কতদূর কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগীর অজ্ঞাত নয়।

তাই একদিন যখন শরীরের অসুস্থতার দোহাই দিয়া সূর্য্যবাবুর সহিত শিবনাথের পরিচয় হইয়া গেল, সেইদিন হইতেই শিবনাথের জন্য প্রায় প্রতিদিন চায়ের নিমন্ত্রণ সূর্য্যবাবুর ব্যসা হইতে যখন আসিতে লাগিল, তখন মেসের অন্য বাসিন্দারা শিবনাথকে ঐ বিষয় ইঙ্গিত করিয়া পরিহাস করিলেও শিবনাথ সে নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া দিতে পারিল না।

দিন দিন কিন্তু সূর্য্যবাবুর মেয়ের নামের সঙ্গে শিবনাথের নামে যে বিশ্রী সম্বন্ধটার আলোচনা ক্রমশঃ পাড়া হইতে অন্য পাড়াতেও চলিতে লাগিল, তাহা উপেক্ষা করিয়া সূর্য্যবাবুর বাড়ী আর শিবনাথের যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না, সে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল।

স্কুল হইতে কিন্তু ফিরিবার পথে যে দিন তাহাকে দেখিয়া, ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া

ইন্দু তাহার এই না যাওয়ার জন্য হাসিয়া কৈফিয়ৎ চাহিল, সেদিন সে সহসা তাহার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারিল না, পরে বলিল,—"সময় পাই নে,—তাই।"

চলিতে চলিতে থামিয়া ইন্দু প্রশ্ন করিল,—"কি এত কাজ আপনার?"

"কাজ?"

শিবনাথ ক্ষণকাল কি ভাবিয়া আরক্ত মুখে উত্তর দিল, "না, কাজ বিশেষ কিছু নয়, তবে—"।

ইন্দুর উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল; উত্তর দিল, "যাব।"

ইহারই তিনমাস পরে যে দিন ইন্দুর সহিত শিবনাথের হিন্দু মতে বিবাহ হইয়া গেল এবং একথা যখন সকলেরই কানে পৌঁছিল, তখন কেহই বিস্মিত হইল না, বরং হাসিয়া শিবনাথকে "বন্ধুভোজ" দিবার জন্য চাপিয়া ধরিল।

২

পিতার পত্রখানা যখন শিবনাথের হাতে না পড়িয়া ইন্দুর হাতে আসিয়া পড়িল, তখন তাহা পড়িয়া ক্ষোভে দুঃখে ও ক্রোধে ইন্দুর অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল।

শিবনাথ যে ধনীর সন্তান তাহা সে জানিত, কিন্তু সে যে তাহাকে পিতামাতার অমতে বিবাহ করিয়াছিল তাহা সে জানিতে পারে নাই, তাই শিবনাথের পিতার পত্রখানা যখন পড়িল তখন প্রথমে শিবনাথের উপরে, তাহার পরে নিজের উপরে ক্রোধে ক্ষোভে ও দুঃখে সে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল।

সমস্ত দিনের পরে গৃহে ফিরিয়া আহারাদি শেষ করিয়া শিবনাথ যখন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল, অন্যদিনের মত ইন্দু তখন ঘুমায় নাই, চেয়ারে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল।

হাসিয়া শিবনাথ প্রশ্ন করিল,—"আজ এখনও ঘুমোও নি যে? কিন্তু রাত তো কম হয় নি।"

ইন্দু সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না, হাসিলও না; গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমার একখানা চিঠি এসেছে।"

অন্যমনস্কভাবে একখানা খবরের কাগজ টেবিলের উপর হইতে টানিয়া লইয়া শিবনাথ উত্তর দিল,—"চিঠি তো রোজই অনেক জায়গা থেকে আসছে, এখানা কোথাকার?"

পূর্ব্ব বৎসরে ইন্দু উত্তর দিল,—"তোমার দেশ থেকে তোমার বাবা লিখেছেন।"

শিবনাথ যেন একটু চমকিয়া উঠিল,—"বাবা পত্র দিয়েছেন? তুমি দেখেছ সে পত্র?"

মাথা নাড়িয়া ইন্দু জানাইল "হাঁ।"

শিবনাথ কোনও কথা বলিল না, কিন্তু ইন্দু তাহাকে নীরবেও থাকিতে দিল না, বলিল—"কিন্তু বাপমায়ের অমতে যে তুমি আমায় বিয়ে করতে অগ্রসর হয়েছিলে, একথা তখন আমায় জানাও নি কেন? তা হলে তো তোমাকে শুধু নয়, আমাকেও এভাবে জ্বলতে হত না।"

শিবনাথ ইন্দুর একথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না, শুধু বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শিবনাথের হাতের কাগজখানা টেবিলের উপর পড়িয়া গিয়াছিল, ইন্দু সহসা দুই হাতে তাহার সেই হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—"চুপ করে রইলে যে আমার কথার উত্তর দেবে না?"

অভিভূতের মত শিবনাথ বলিল,—"উত্তর—কি উত্তর দেব?"

ইন্দু বলিল, "যা তোমার ইচ্ছে।"

শিবনাথ বলিল,—"তাই বল্লেই তুমি সুখী হবে?"

"সুখী"—ইন্দু একটু হাসিল।

"সুখী হই না হই সে কথা তোমায় ভাবতে হবে না।"

"বটে?"

শিবনাথ ইন্দুর হাতের মধ্য হইতে আপনার হাত ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া লইল। পরে একটু ভাবিয়া বলিল, "যদি বলি আমাব ইচ্ছায় বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু সে ইচ্ছা যদি তোমার পছন্দ না হয়ে থাকে তাহলে তুমি তোমার মনোমত পথ খুঁজে নিতে পার? যাতে তুমি সুখী হও তা কর্‌তে পার?"

এক মুহূর্ত্তের জন্য ইন্দুর মুখের সমস্ত রক্ত যেন কে শুষিযা লইল, তাহার পরে ধীরস্বরে উত্তর দিল,—"আচ্ছা তাই হবে।"

শিবনাথ কোনও উত্তর দিল না, তাহার মুখের উপরে বিরক্তির ঘনছায়া ভাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গিয়া সে আপনার শয্যায় শুইয়া পড়িল, আর ইন্দু চেয়ারের উপরে আড়ষ্ঠ হইয়া একাকী বসিয়া রহিল। খোলা জানালা দিয়া তখন হাঃ হাঃ শব্দে নিদাঘের বাতাস গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল; বহু দূরে বসিয়া একটা ঘুম-হারা পাখী থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল,—"বউ, কথা কও,—বউ, কথা কও—"

পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ কবিয়াই শিবনাথ শুনিতে পাইল ইন্দু সেইদিনই ভোরে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে, যাইবাব সময় কিছু বলিয়া যায় নাই।

শিবনাথ ইন্দুকে আনিতে গেল না; এক কাপ চা খাইয়া নীরবে রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গেল।

৩

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

ইন্দুকে ভুলিতে, পিতামাতার আদেশে শিবনাথ দ্বিতীয় বার যাহাকে বিবাহ করিযাছে সেও ইন্দুর মতই স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিদিন সযত্নে আপনার প্রসাধন সম্পূর্ণ করে, শিবনাথের সহিত হাসে, গল্প করে। কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার উপর শিবনাথের অন্যমনস্কতা দেখিয়া বীণা গম্ভীব হইযা উঠে, কিন্তু কোনও প্রশ্ন স্বামীকে সে করে না।

শিবনাথও পুরাতন দিনের কথা ইচ্ছা করিয়াই তুলে না,—ইচ্ছা করিয়া ইন্দুর খবরও লয় না, কিন্তু, তবুও কানে আসে তাহারই সংবাদ; সে কোন দূর দেশে শিক্ষা-বিভাগের কাজ লইয়া চলিয়া গিয়াছে।—তাহারও দিন চলিয়া যায়, শিবনাথের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে না। পুরাতন দিনের কথাগুলি ভুলিতে শিবনাথ চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

পুত্র, কন্যা, স্ত্রীর কাছে, সহস্র বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও তাহার একটা নাম মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া তাহাকে বিচলিত করিয়া তোলে। চমকিয়া সে আপনাকে সংবরণ করিবার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বীণার শরীরের অসুস্থতার জন্য হাওয়া বদল করিতে লইয়া শিবনাথ পুরীতে আসিয়াছিল।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় সুমদ্রতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে অনেক কথা হয়, কিন্তু শিবনাথ তাহাতে যেন সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয় না, বিরক্ত হইয়া বীণা প্রশ্ন করে "কি ভাব্‌ছো বল তো?—"

স্বামী শুষ্ক হাসির সহিত জবাব দেয় "কৈ? কিছু নয় তো!"

স্বামীর উপর অভিমানে বীণার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু সে অভিমান ভাঙ্গাইবার লোক কোথায়? শিবনাথ শুধু একটু হাসে, সে হাঁসি বড় করুণ।

সেদিনও শিবনাথ বীণাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সমুদ্রোপকূলে হঠাৎ যাহাকে সম্মুখে দেখিয়া সে চমকিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিল, বীণা চাহিয়া দেখিল সে একটি নারী মূর্ত্তি। তাহার সর্ব্বাঙ্গ একখানি মোটা চাদরে ঢাকা, হাতে শাঁখা, সিঁথিতে উজ্জ্বল সিন্দূর।

শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বিরক্তি নিঃসৃত স্বরে বীণা প্রশ্ন করিল,—"দাঁড়ালে যে?"

শিবনাথ তাড়াতাড়ি অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিল, বোধ হয় একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করিয়া ধীরস্বরে উত্তর দিল, "না, চল।"

সেদিন যে শিবনাথ কেন তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিল তাহা বীণা বুঝিল না, কিন্তু, বুঝিল তাহার পরদিন, যখন, সমস্ত দিন একাকী পথে পথে ঘুরিয়া একখানা কাগজ হাতে লইয়া শিবনাথ ম্লানমুখে বাসায় ফিরিল, তখন।

বীণা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "শরীর খারাপ হয়েছে বুঝি?"

নীরবে শিবনাথ জানাইল "না"।

"তবে এত বেলা করলে যে?"

তাহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া শিবনাথ হাতের কাগজখানা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। কুড়াইয়া লইয়া বীণা দেখিল সে একখানা পত্র, মাত্র কয়েক লাইন লেখা ঃ—

শ্রীচরণেষু,

সামনে আস্‌ব না ভেবেছিলুম, কিন্তু তা হল না; যাক, আর কোনও দিন তুমি আমার এ মুখ দেখতে পাবে না; আজ এখান হতে চল্লুম।—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সুখী হও।

ইন্দু।

যে কালো পর্দাখানা বীণার দৃষ্টির সম্মুখে দুলিতেছিল, তাহা যেন এক নিঃশ্বাসে সরিয়া গেল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গপূর্ণ স্বরে সে প্রশ্ন করিল, "ইন্দু তোমার কে?—"

ক্ষণিকের জন্য অসহ্য যন্ত্রণায় শিবনাথের মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল, তাহার পরই স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দিল,—"আমার স্ত্রী।"

পাশের বাড়ীতে কে গান ধরিল—

মালঞ্চে আজ ফুল ফুটেছে
মান ক'রে থাকা আর কি সাজে
মান-অপমান ভাসিয়ে দিয়ে
আয় লো চলে কুঞ্জ-মাঝে।

গর্ভধারিণী।। প্রতিভা বসু

জায়গাটি সুন্দর। দূরে চোখ পাঠালেই ছোটো বড় পাহাড়ের চূড়ো আলোছায়া গায়ে মেখে নয়নমোহন। ধু ধু মাঠ, শাল মহুয়ার বন, একটু গেলেই জঙ্গলের মধ্যে দুটি প্রস্রবণ, উদাত্ত নির্মল আকাশ, সামনের বাঁধানো ঘাট, বাড়ীর মধ্যে এত বড় কম্পাউণ্ড, বাগান, দেয়াল ঘেঁষে—পাইনের সারি, সব মিলিয়ে নিটোল একটি ছবি।

বাংলোটিও ভারি সুন্দর। চারদিকে গোল বারান্দা ঘিরে রেলিং, বারান্দা পেরিয়ে সামনেই হল ঘর, এপাশে ওপাশে দুখানা দুখানা চারখানা শোবার ঘর, সংলগ্ন ড্রেসিংরুম আর বাথরুম। হলের সঙ্গে আর্চের ব্যবধানে খাবার ঘর, পিছনে কিচেন, তার পিছনে সারভেন্টস কোয়ার্টার।

গাড়ি ফটকে ঢুকেছে, সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়িয়েছে দারোয়ান, সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে, চমৎকার দেখাচ্ছে দূর থেকে, নিরঞ্জনের ভারি ভালো লাগলো। এই ডিহীতে মাত্রই অল্পদিন আগে এসে সে জয়েন করেছে। সে কয়লাখনির উপরতলার ম্যানেজার, শীগ্‌গিরই ডিরেকটার হবে এমন আভাস পাওয়া গেছে। বয়েস চল্লিশের কাছে, দেখতে সুন্দর, স্বভাবও সুন্দর, লোকে তাকে বুদ্ধিমান বলে। তার নিজেরও বিশেষ সন্দেহ নেই তাতে তবে যেটার অভাবে সে এত থেকেও ভালো না লাগা ব্যাধিতে ভোগে সেটা তার অসুখী অপ্রসন্ন স্বভাব। কেন যে কিছু ভালো লাগে না, সবেতেই বিরক্তি আর রাগ তা সে নিজেও বোঝে না সব সময়।

এই স্বভাবের জন্য সুজাতা একেকদিন ভীষণ চটে যায়, ভীষণ বকে, কতদিন কথা বন্ধ করে দেয়। তাতে কী হবে? যার যেমন চরিত্র।

আজকের এই অপ্রত্যাশিত ভালো লাগায় নিজেই তৃপ্তি বোধ করলো। যেন সব মেঘ ধুয়ে গেছে মন থেকে, যেন সব ভারমুক্ত। মন ভালো থাকলে কত ভালো লাগে, অথচ কেন যে ভালো থাকে না! মনের সঙ্গে তো মানুষের দেখা হয় না, কথা বলা যায় না, মনের তো কোন চেহারা নেই, মন আমাদের কল্পিত আত্মার মত, আছে অথচ নেই। এমন নিরাকার হয়ে কী জ্বালান জ্বালায়।

আজ সত্যি খুব ভালো লাগছে। একটা শিস দিল সে। দৌড়ে ছুটে এলো তিনটে কুকুর। হরিগোপাল, সিদ্ধেশ্বরী আর তারাময়ী। এগুলো পোষাকী নাম, ডাকনাম হরি, সিধু আর তারা। হরি ছেলে। বয়েস তিন, জাতিতে উচ্চবর্ণের কুলীন। গারোপাহাড় থেকে এসেছে। অরণ্যের ভেড়া রক্ষকদের বংশধর। সিধু আর তারা অনুগত স্ত্রী, একান্তই বর্ণসঙ্কর। মনিবকে তারা প্রাণতুল্য ভালোবাসে, মনিবেরও তারা প্রাণ। সুজাতা বলে,'একদিন তোমার চোখ ঠিক অন্ধ হয়ে যাবে। জানো, কুকুরকে চুমু খেলে লোক অন্ধ হয়?'

নিরঞ্জন বলে, 'ভালোই হয় অন্ধ হলে, এই জঘন্য পৃথিবীটাকে আর দেখতে হয় না, তা হলে।'

সুজাতার কাছে এই পৃথিবীটা খুব সুন্দর, খুব মনোরম। মহারাষ্ট্রের মেয়ে, অনেক বয়স অব্দি কলকাতায় থেকেছে, সেখান থেকে বি এ পাশ করেছে, আবার পিতা যেখানে বদলী হয়ে গেছেন চলে গেছে সেখানে। ভালো বাংলা জানে, কথা বলতে একটুও আটকায় না, মাছ-মাংসও খায়, মধ্যপ্রদেশে কোথায় কোন কলেজে পড়াতো, নিরঞ্জনের সঙ্গে সেখানেই আলাপ, অল্পদিনের আলাপেই প্রেম, তারপরেই বিবাহ। সব মসৃণ। বয়েস হয়েছিলো দুজনেরই, সুজাতার তিরিশ নিরঞ্জনের প্রায় পঁয়ত্রিশ। এখন সুজাতার পঁয়ত্রিশ, নিরঞ্জনের প্রায় চল্লিশ। মাত্রই পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবন। সব নতুন। নতুনের পালিশই আলাদা একটি দেড় বছরের গাবলুগাবলু বাচ্চা আছে, তার মোহও নতুন স্বামীর মোহের মতই ঘোর লাগা।

নিরঞ্জনের এই জবাবে সে ভুরু কুঁচকোয়, মহারাষ্ট্রীয়ান চেহারায় ঢেউ তুলে বলে, 'পৃথিবীটা খুব বিচ্ছিরি, না? পৃথিবীটা না হামি?' এইখানে আবেগে আমিটা তার হামি হয়ে যায়, সিঁদুর পরা ধবধবে কপালটা যেন আগুনের শিখা।

সেদিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন হাসে, 'তুমি আছ বলেই তো এত দিন চোখ দুটো বিশ্রাম পেয়েছে। তোমার দিকে তাকিয়ে সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়।'

''আহাহা-।''

নিরঞ্জন গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুকুরদের আদর করতে করতে দেখলো আয়া ধনপতিরা এসে দাঁড়িয়েছে কাছে।

মুখ তুলে তাকিয়ে বললো, 'মেমসাব কিধার?'

'পাত্তা নেই সাব, গিরধার বলতা কৌন এক আদমী খুন হো গিয়া, ঐ দেখনেকো গিয়া।'

'সেকি! আবার কে খুন হলো?' চিন্তিত হলো নিরঞ্জন, অবশ্য এইসব কোলিয়ারি অঞ্চলে খুন জখম যে খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা তা নয়, কিন্তু তাতে সুজাতার যাবার দরকার কি? সে কেন গেলো? কখনো তো যায় না। এরপরেই শুনলো পুলিশের লোক এসে নিয়ে গেছে জীপে চড়িয়ে। উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে তক্ষুণি আবার গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছিলো, সুজাতা এলো। পুলিশের জীপেই এলো, হাসতে হাসতে নামলো, 'আমার সহপাঠী সুভদ্র সেন, পুলিশের মস্ত লোক, তা-ও আবার গোয়েন্দা বিভাগের। খুনের তদন্তে এসেছে।'

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'কোথায় খুন হলো আবার। এখানে এইসব কুলি কামিনদের ব্যাপার—'

বসবার ঘরে এসে বসলো তারা। সুভদ্র সেন রুমাল বার করে মুখ মুছে বললো, 'এটা ঠিক কুলি কামিনদের ব্যাপার নয়, এক উটকো এসে আত্মগোপন করে নাম ভাঁড়িয়ে ছিলো এ অঞ্চলে—'

'কে? নাম কী বলুন তো?'

'আসলে বাঙালী, কিন্তু যেহেতু এটা বিহার, দিব্যি বিহারী নাম নিয়েছে। রামকিষাণ তেওয়ারী, বড় বড় চুল, বুক পর্যন্ত দাড়ি, সব ফলস—'

'বলছেন কী?'

'একটা ঘোর ক্রিমিন্যাল। সারাটা জীবন কেবল পাশ করে বেড়ালো। এর খবর আমরা অনেক আগেই পেয়েছিলাম, ধরতে পারছিলাম না, যখন ধরা পড়লো তখন আমাদের চেয়ে অনেক বড় দরবারেই তার ডাক পড়ে গেছে।'

'ঘটনাটা বলুন তো।'

সুজাতা বললো,'চলো চা দিই, খাবার টেবিলে বসেই শোনা যাবে।'

বসবার জায়গা থেকে খাবার জায়গায় এলো ওরা। পটভর্তি চা এলো, প্লেটভর্তি খাবার। তারপর নিহত মানুষটির বিষয়ে সুভদ্র যা বললো, তা হচ্ছে এই, লোকটি পাপিষ্ঠ। নিজের পরিচয় গোপন করে যে মহিলাকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে এখানে ছিলো সে ওর স্ত্রী নয়, স্ত্রীলোক। সেই স্ত্রীলোকটাই খুন করে পালিয়েছে। কী সর্বনাশ! প্রথম জীবনে একটি অতি সুন্দরী অতি গুণবতী মেয়েকে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিলো। মেয়েটি তার দাদার কাছে থাকতো, কলেজে পড়তো, বিয়ের জন্য তার বাবার দশহাজার টাকা ইনসিওর করা ছিল। বোধ হয় সেই লোভেই অথবা প্রেমেও পড়তে পারে জানি না, যে ভাবে পারে সে ভাবেই বিয়ে কবলো। মেয়েটির দাদার কাছেই শুনেছি, শেষে নাকি লোকটা বিষ খেয়ে আত্মহত্যায় উদ্যত হয় বলেই মেয়েটি বাধ্য হয়ে বিয়ে করে।

'মেয়েটি বুঝি প্রেমে পড়েনি?'

পড়েছিল নিশ্চয়ই নইলে বিষ খাওয়াখাওয়ি পর্যন্ত আর এগোয় কী করে। কিন্তু দাদার ইচ্ছে ছিল না। লোকটিকে তার একেবারেই পছন্দ হয়নি। নিজের বন্ধুর সঙ্গেই বরাবর ভেবে রেখেছিলেন, সে ছেলে ছিল সব দিক থেকেই যোগ্য। যাকে বলে একেবারে উপযুক্ত পাত্র। বরং তাদের পক্ষে চাঁদে হাত দেবার মতই উপযুক্ত। সবচেয়ে বড় কথা, সেই উপযুক্ততা নিয়ে সে-ই ছিল প্রার্থী। বিলেত থেকে এসে বন্ধুর বোনকে দেখে সে পাগল। মেয়েটি ম্যাট্রিক পাশ করে আই-এ পড়ছিল, কথা ছিল পরীক্ষা হয়ে গেলেই বিয়ে হবে। তার মধ্যেই এইসব বিপর্যয়। ডিটেলস বলে লাভ নেই, মোট কথা শেষ পর্যন্ত দাদাব মতেব বিরুদ্ধেই বিয়ে কবে মেয়েটি। বেশ একটা মন কষাকষির ব্যাপারই হয়েছিল। তবে দশহাজার টাকা আত্মসাৎ করার পরেই লোকটা স্ত্রীকে ছাড়েনি, স্ত্রীর প্রতি সত্যি সত্যি একটা ভালোবাসা ছিল প্রথমে। স্ত্রীরও জেদ ছিল স্বামীকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার। কিন্তু তা পারেনি। নতুন বৌয়ের মোহ কাটতে সামান্য সময় লাগলেও তা চিরস্থায়ী হলো না। মাঝখান থেকে তিনটি সন্তান হয়ে গেল, শেষ শিশুটির জন্ম দিয়ে মহিলা সম্ভবত কিছুকাল অসুস্থ ছিলেন, সেই সময়েই বাড়ির একটি দাসীর সঙ্গে মানে, বুঝতেই তো পারছেন।'

'বাঃ, একেবারে গুণের নিধি।'

একেবারে। ভদ্রলোকের পেশা ছিলো ওকালতি। বিয়ের পর জোচ্চুরি করে নিজের পৈতৃক শহরে এসে ওকালতিতেই বসেছিল। রোজগারপাতি ত ভালো না হলেও মন্দ ছিল না। ঐ দাসীর সঙ্গে লিপ্ত থাকতে থাকতেই আবার এক অল্পবয়সী বিধবা মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়। উকিল তো মহিলা বিপন্ন হয়ে একদিন ওর কাছে এসেছিল। অকালমৃত স্বামী যথেষ্ট বিষয় আশয় রেখে গেছে, ঠকাবার লোকও জুটেছে অনেক। সুতারং উকিল? লোকটির চেহারা সুন্দর ছিল, মন ভুলাবার কৌশল জানা ছিল, কয়েক দিনের মধ্যেই উপকারী বন্ধু হয়ে শুধু যে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করলো তাই নয়, মহিলার উপবাসী বুভুক্ষু যৌবনকে ও বেশ ভালোভাবেই আপ্যায়িত করলো। এবং এই পথে এগিয়েই সম্পত্তিটি হস্তগত করলো।

'সাংঘাতিক তো।'

কিন্তু স্ত্রী অন্তরায়। বলাই বাহুল্য ঝগড়াঝাটি, খিটিমিটি, স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা সব চলতে লাগলো সেই সঙ্গে। এর মধ্যে একদিন হঠাৎ দাদার সেই বন্ধু গিয়ে উপস্থিত। ঐ শহরে তার পিসির বাড়ি, আরো দু-চারবার গেছে কিন্তু দেখা করে নি, এবার করলো। মেয়েটির দাদাই দেখা করে যেতে বলে দিয়েছিল বিশেষ ভাবে। দাদাকে মেয়েটি সব কথাই গোপন করতো। তবু লোকপরম্পরায় নানা গুজব কানে যেতো তার। বোন তাকে কোনোদিন নিজের

বাড়িতে ডাকেনি, আট বছরের বিবাহিত জীবনে নিজেও বেশি আসেনি, এ নিয়ে ভিতরে ভিতরে কিছুটা রাগ অভিমান থেকেই যাচ্ছিলো কিন্তু উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও ছিল।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের জন্যই এই অনুরোধটি বন্ধুকে রাখতে বলেছিল।

'বন্ধুটি তখনো বিয়ে করেনি?'

না। কিন্তু বন্ধু এসে একটি ভীষণ ঘটনার মুখোমুখি পড়ে গেলেন। স্ত্রীকে হত্যা করতে গিয়ে লোকটা হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে, পুলিশে প্রতিবেশিতে বাড়ী ছাওয়া। গলা টিপে ধরেছিল, গোঁ গোঁ আওয়াজ পেয়ে ভৃত্য ছুটে আসে, দরজা বন্ধ ছিল, জোরে জোরে ঘা দিতেই ছিটকিনি হড়কে খুলে যায়, দেখা যায় বুকের উপর হাঁটু চেপে বসে গলা টিপে ধরেছে।

'বলছেন কী? ফাঁসি কাঠে ঝোলালেন না?'

'ঝোলানো গেল না। স্ত্রী আটচল্লিশ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন। ঐ সেই বন্ধু ভদ্রলোকই সব করলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সেবা করা ওষধ-পথ্য—শেষ পর্যন্ত কী হলো জানেন?'

'ভালো হয়ে মামলাতে সাক্ষী দিলেন স্বামী তাকে কক্ষনোই হত্যা করার চেষ্টা করেননি লোকেরা ভুল বুঝেছে। এই বলে নানারকম যুক্তি দিয়ে খালাস করে দিলেন স্বামীকে।'

'অদ্ভুত।'

'তারপর অবিশ্যি আর স্বামীর ঘর করেননি। কোর্ট থেকে এসেই বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় চলে যান। কাউকেই কিছু বলে যাননি।'

'ঐ ভদ্রলোক? সেই বন্ধু?'

'আমাদের ধারণা বন্ধুকে নির্ভর করেই গিয়েছিলেন। দাদার কাছে যে যাননি তা তো জানি।'

'এ যে প্রায় গল্প কথা?'

'গল্পের চেয়ে বড় । লোকটার দ্বিতীয় খুন সেই জমিদার গিন্নী।'

'সে কী! আর সেই দাসীটা?'

'মূল গল্পই সেটা। এঁরা সব ভদ্রমহিলা, এদের সঙ্গে পেরেছিল। দাসীর সঙ্গে পারেনি। সে ওকে টিট রেখেছে ব্ল্যাকমেইলের ভয় দেখিয়ে। পুরো একটা বছর গরু খোঁজা খুঁজে এতদিনে—'

'লোকটার আসল নাম কী?'

'সুখরঞ্জন রায়।'

'ক্-কী!'

'সুখরঞ্জন রায়।'

গল্প শেষ করলেন ভদ্রলোক, তারপর উঠলেন। কথা থাকলো যাবার আগে আর একবার আসবেন দেখা করতে।

বাচ্চার খাওয়া-দাওয়া ঘুম সাংসারিক কর্তব্য ইত্যাদি নিয়ে সুজাতা ব্যস্ত হয়ে পড়লো। নিরঞ্জন আলো নিবিয়ে চুপচাপ বসলো এসে বারান্দায়।

নিরঞ্জনের মা নার্স ছিলেন, তারা তিন ভাইবোন মায়ের সেই স্বল্প উপার্জনেই বড় হয়ে উঠেছে। সন্তানদের মানুষ করে তোলার প্রতি তাঁর যত্ন ছিল অপরিসীম। কলকাতার দক্ষিণতম অংশে ব্রহ্মপুর নামে একটা গ্রামে থাকতো, ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটি সুন্দর ছিল, বাবার মৃত্যুর পরে তাদের নিয়ে নিঃসম্বল মা এখানে এসেই উঠেছিলেন, বাড়ীটি নিশীথ-মামার।

নিশীথ মিত্র, মাকে যিনি সব বিষয়েই সর্বক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণই করতেন, পিতৃহারা হয়েও যাঁর জন্য তারা ভাইবোনেরা কখনো পিতৃহীনের বেদনা অনুভব করতে পারেনি।

দিদি সবচেয়ে বড়, শোনা যায় এখানে যখন আসে তখন তার ছ বছর বয়েস ছিল। তারপরে দাদা সুরঞ্জন, তার বয়েস ছিল চার, আর সে নিজে তো একান্তই ছোটো। বাবার বিষয়ে বলা যায় তিন ভাইবোনেরই কোনো স্মৃতি নেই, যা একটু দিদিরই ছিল। দিদি বলতো, বাবা খুব সুন্দর ছিল, এ ছাড়া আর সবই ধু ধু। মা এ বিষয়ে বড় একটা মুখ খুলতেন না, জিজ্ঞেস করলেও ভালো মত জবাব দিতেন না। কিন্তু তার খুব জানতে ইচ্ছে করত। বাবা নামক সংজ্ঞাটা তাকে যথেষ্ট আলোড়িত করত।

মায়ের চেহারা ছিল বিষাদের প্রতিমূর্তি। দেখতে সুন্দর ছিলেন। কী সুন্দর মোমের মত মসৃণ রং, কী লম্বা চুল, টানা টানা চোখে বেদনার উৎস। মাকে এত ভালো লাগতো নিরঞ্জনের। নিশীথমামাকেও খুব ভালো লাগতো। নিশীথমামার মুখেই হাসি সর্বদা অমলিন, নিশীথমামা সর্বদাই তাদের প্রতি যথেচ্ছ প্রশয়ে প্রস্তুত। দিদির পনেরো বছর বয়সে দিদি যখন টাইফয়েডে মারা গেল, মায়ের শোক আর নিশীথ মামার শোক অভিন্ন ছিল। দিদি ক্লাস টেনে পড়ত, মায়ের মতই সুন্দর ছিল, খুব ভালো একটা বিয়ে ঠিক করেছিলেন তিনি, এই সময়েই সংসার থেকে সব বন্ধন তার ছিঁড়ে গেল। আর এই সময়েই সে আর তার দাদা জেনেছিল যে বাবা মারা যায়নি, নিরুদ্দেশ।

মাকে দুঃখ দেবার জন্য তাঁর ভাগ্যেব একটা বড়রকমেব ষড়যন্ত্র ছিল। দিদির শোকই তাঁর শেষ শোক নয়, আই-এ পড়তে পড়তে তার দাদাও মারা গেল। সে তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। দেখতে দেখতে ভরাপুরা বাড়িটা খা খা হয়ে গেল। দিদির শোকে বালক নিরঞ্জন আর দাদার শোকে কিশোর নিরঞ্জন, এত জোরে জোরে দুটো ধাক্কা খেলো যে এক লাফে অনেক বছর পেরিয়ে এলো। সে গম্ভীর হয়ে গেল। চিন্তাশীল হল এবং বিষণ্ন হল। আর একটা নতুন ভাবনার পোকা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

তার বাবা কেন নিরুদ্দেশ হবেন? কোথায় গেলেন? কী তার কারণ।

মার চাপা স্বভাবের জন্য তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা সম্ভব ছিল না। নিশীথমামাও অন্যান্য বিষয়ে খোলা মেজাজের মানুষ কিন্তু এ বিষয়ে নয়। সুতরাং পোকাটা তাকে ক্রমাগতই উত্যক্ত করতে লাগলো। এক চিন্তা সব সময়েই অন্য চিন্তার সঙ্গ খোঁজে। সেই চিন্তা হল, এই নিশীথমামা ভদ্রলোকটিই বা তাঁর জীবনমন এই পরিবারে উৎসর্গ করেছেন কেন, কী তার কারণ? ভদ্রলোকটি অবিবাহিত এবং মস্ত কোনো ফার্মের হর্তাকর্তা বিধাতা। এবং রক্তের সম্পর্কের মামা নন। এ ছাড়া, আর কোন পরিচয়ই নিরঞ্জন জানে না।

একদিন সে মাকে বলল, 'তুমি এ কথা বল কেন যে বাবা মারা গেছেন?'

মা কাজ করতে করতে শান্ত স্বরে বললেন, 'বলিনি তো।'

সে বলল, 'আমরা তাই জানি।'

মা বললেন, 'তোমাদের পক্ষে হয়তো সেটাই সত্য।'

'কখনো না। সে রেগে গেল, মৃত্যু আর নিরুদ্দেশ কি এক?'

কাজ থামিয়ে মা তাকালেন, তাকিয়ে রইলেন, বললেন, 'না।'

'তবে?' তবে কেন আমাদের এরকম একটা ভুলের মধ্যে রেখে দিয়েছিলে?'

'কোনোদিন যাকে পাওয়া যাবে না তার আর এক নাম মৃত্যু।' মায়ের গলা ঠাণ্ডা কঠিন।

সে মাথা ঝাঁকালো, 'জীবিত মানুষকে মৃত বলাও মিথ্যে, কোনোদিন তাকে পাওয়া যাবে না বলাও ঠিক তাই।'

এ কথার কোনো জবাব দিলেন না মা। যা করছিলেন নিঃশব্দে তাই করতে লাগলেন।

মৃত্যুর ছায়া বাড়িটা থেকে কোনোরকমেই মুছে যাচ্ছিল না। নিরঞ্জনের একাকিত্ব নিরঞ্জনকে সব সময়েই গ্রাস করে থাকতো। মা তো বলতে গেলে থাকেনই না, সকাল আটটায় যান, রাত আটটায় ফেরেন। যতটুকু থাকেন শোকের পাথারে ডুবে থাকেন। মাঝে মাঝে নাইট ডিউটি থাকে তখন নিশীথমামা এসে বাড়ি পাহারা দেন, তাকে পাহারা দেন। ছোট্ট থেকে এই নিশীথমামার বুকের তলায় শুয়ে সে অভ্যস্ত, এই আশ্রয়ই তাদের আশ্রয়, তাদের নিরাপদে রাখার সব দায়িত্বই ইনি বহন করেন, খাওয়া পরা এবং লেখাপড়া সবেরই তিনি প্রতিপালক, যাকে ভালোবাসতে—বাসতেই এত বড় হয়েছে, তখন তাকে কেমন অবিশ্বাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, রাত বিনিদ্র হয়, পাহারাদারটিকে বলতে ইচ্ছে করে তুমিই অনর্থের মূল।

লেখাপড়ায় তারা তিন ভাইবোনই ভালো ছিল, দুজন তো চলে গেল, টিম টিম করছে সে একা, সেজন্য নিশীথমামার মনোযোগ একাগ্র হয়ে উঠেছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় বোঝা যাচ্ছিল না কার পরীক্ষা। আসছেন যাচ্ছেন, খাবার আনছেন, মাস্টার আসছেন, তাকে বোঝাচ্ছেন, মাকে বোঝাচ্ছেন, একেবারে পাগল। সুধা, তুমি ভেবো না সুধা, তুমি ভেবো না এই শুধু মুখের বুলি। সুধা, সুধা সুধা—সুধা তার সত্যি সুধা। সুধাকে সুখী করাই তার একমাত্র মন্ত্র জীবনের। নিশ্চয় সুধার জন্যই আজো তিনি সংসার পাততে পারলেন না। নিরঞ্জনের অন্তর্দাহ হয়। বাবার নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে এই লোকটিই যে ওতপ্রোত ভাবে জড়ানো এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। আর মা এমন পাণ্ডববর্জিত হয়ে এই অজানা জায়গায় এসে বিধবা সেজে আছেন কেন তারও একটা হদিস পাওয়া যায়। অনেক অন্যায় কথা মনে হয় তার।

আই এস সি পাশ করবার পরে নিশীথমামা তাকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি করে দিলেন। নিশীথমামার অর্থাভাব ছিল না; কিন্তু তাদের ছিল। মা যদ্দূর মনে হয় এঁর কাছ থেকে অন্য সব সাহায্য নিলেও-আর্থিক সাহায্য নিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন। নিশীথমামার বাড়িতে ভাড়া না দিয়ে থাকা ছাড়া সংসারের আর সব খরচা মা-ই বহন করতেন। এ নিয়ে মার সঙ্গে অনেক রাগারাগি করতে দেখেছে সে। মা শোনেননি। কিন্তু তাতে কী! উপহারে উপহারেই সব পুষিয়ে দিতেন। বছরে উপলক্ষ তো বড় কম হয় না। পূজো, ষষ্ঠী, জন্মদিন, পয়লা বৈশাখ—সব তারিখেই সব আসছে। মা আর কী করবেন।

পরীক্ষায় তার সব কৃতিত্বই এই মানুষটির। ম্যাট্রিকে জলপানি পেয়েছিল, আই এস সি-তেও প্রথম দশজনের একজন। অবশ্য এ বিষয়ে তার নিজেরও যথেষ্ট জের ছিল। সে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার অস্ত্র হিসেবেই গ্রহণ করেছিল এই জেহাদ। নিশীথমামার অক্লান্ত মনোযোগ আর তার চেষ্টা দুটো মিলে যেন ভাগ্য আর পুরুষকার। যদিও কৈশোর পেরোতে পেরোতে যে রকম একটা অদ্ভুত বিদ্বেষ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল লোকটির প্রতি তাতে তার এই সাহায্য তাকে একবিন্দুও সুখী করেনি, স্বস্তি দেয়নি। মায়ের জন্য এঁর এত টান তাকে রক্তাক্ত করেছে, নিজের পলাতক পিতার জন্য হাহাকারে ভরিয়ে দিয়েছে হৃদয়। তবু একান্ত স্বার্থপরের মতই শুনে নিয়েছে সব উপহার। কেবল মনে হয়েছে, এই সিঁড়িতে পা রেখেই উঠতে হবে তাকে।

নিশীথমামা খোলা গলাতেই বলতেন, 'সুধার জন্য আমি কী না করতে পারি।'

একদিন সে ধপ করে বলেছিলো, 'তা হলে তাঁর স্বামীকে খুঁজে এনে দিন না।'

জোরে জোরে মাথা নাড়লো, 'না, সেটা পারি না।'

তা যে পারেন না তা কি আর জানে না নিরঞ্জন? জানে। পারলে আর এখানে লোক-চক্ষুর আড়ালে বাসা বেঁধে থাকবেন কী করে? ছিঃ। আসলে মা হচ্ছে ওঁর প্রেয়সী। তবে মায়ের প্রেমিক উনি কিনা সেটা অবিশ্যি ধরা যেতো না। মা অসাধারণ ধীর স্থির শান্ত সংযত।

যুবতী মেয়ের নার্সের জীবন খুব মসৃণ ছিল না সে সময়ে। মাকে অনেক উৎপাত সহ্য করতে হয়েছে। নীরবেই সহ্য করেছেন। মুখ্যত ঐ নিশীথ মিত্র নামক ব্যক্তিটি তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকতেন বলেই হয়তো সেটা সম্ভব হয়েছে। সেই হিসেবে এর অস্তিত্ব নিশ্চয়ই তাদের জীবনে আশীর্বাদ। কিন্তু এই কিন্তুটিই সারা অন্তর অন্ধকারে ছেয়ে দিত। কখনো কখনো এমনও মনে হতো, মাকে উনি ভুলিয়ে ভালিয়ে বার করে আনেন নি তো?

জলপানি পেয়েছিল বলেই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হওয়া সহজ এবং সম্ভব দুই-ই হল। নইলে সেই খরচ মা দিতে পারতেন না, নিশীথমামার হাত থেকেও নিতে চাইতেন না। পরীক্ষার শেষে সে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল, মাকে বলেছিল অমুককে আমি বিয়ে করতে চাই। মা বলেছিলেন, 'বিয়ে।'

সে বলল, 'এক্ষুনি নয়। তোমাদের উপর চাপাবো না, তবে চাকরি একটা জুটবে বলেই আশা করছি দু-চার মাসের মধ্যে, তখন।'

মা বললেন. 'বেশ তো।' তারপরেই বললেন, 'মামাকে বলেছ?'

ভুরু কুঁচকে গেল তার, উদ্ধতভাবে জবাব দিল, 'তাকে বলবার কী আছে? সে আমার কে?'

মা অবাক নয়নে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তিনিই তো সব।'

নিরঞ্জন 'সে' বলেছিল, মা 'তিনি' বললেন। এটা ভাষার সংশোধন। নিরঞ্জন তৎক্ষণাৎ বলল, 'সে সব বলেই সম্ভবত আমরা আমাদের বাবাকে সব করতে পারিনি।'

মা বললেন, 'কৃতজ্ঞ না হও কৃতঘ্ন হয়ো না।' এই বলে স্থান ত্যাগ করলেন।

মার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য তর্ক করবার জন্য সে মরীয়া হয়ে উঠেছিল, মা সুযোগ দিলেন না। তবু সে পিছে পিছে গিয়েছিল, মা বেরিয়ে গেলেন।

এর কয়েকদিন পরেই একটা চরম ঘটনা ঘটে গেল। অসময়ে বাড়ি ফিরে সে মাকে আর নিশীথমামাকে নিভৃতে কথা বলতে শুনে কান পাতলো।

নিশীথমামা ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বলেছিলেন, 'আর কদ্দিন তুমি এভাবে আত্মগোপন করে থাকবে বলতে পারো? কেন? কার জন্য? কিসের আশায়?'

মার মৃদুস্বর ভেসে এল, 'আশা।'

'কীভাবে আমি তোমাকে সেদিন তোমাদের বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে এসেছিলাম—সুধা, তুমি আমার—'

তবে এই লোকটা তার বাবাকে বঞ্চিত করে ঠিকই বার করে এনেছিল তার মাকে? ঝাৎ করে সমস্ত শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে এল নিরঞ্জনের। তার কান পুড়ে গেল। তার এতদিনের এত সন্দেহ এত জ্বালা যন্ত্রণা অশান্তি সব এক সঙ্গে আগুনের শিখা হয়ে দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। লাফিয়ে ঘরে ঢুকল সে, আক্রোশে অন্ধ হয়ে নিশীথ মিত্রেরই আদরে যত্নে লালিত পালিত সুস্থ শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিশীথ মিত্রেরই সার্টের কলার এমন জোরে চেপে ধরল যে তার চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইল। মা 'এ কি! এ কি!' বলে বিহ্বল গলায় চিৎকার করে ছুটে এলেন। তার চেয়েও প্রবল শক্তিতে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'যত ভালোভাবেই মানুষ কর নিশীথ, সুখরঞ্জন রায়ের রক্ত যাবে কোথায়!'

'আমার বাবার নাম তুমি উচ্চারণ করবে না, তোমাকে আমি মা বলে মানি না। তোমাদের দুজনকেই আমি ঘৃণা করি।'

নিশীথ মিত্র উঠে দাঁড়ালেন, 'কী পাগলামি করছ। শোন, তোমাকে সমস্ত ঘটনাটা জানানোই উচিত ছিল। তোমার মায়ের সব বিষয়েই এত গোপনতা যে—' তিনি সস্নেহে হাত ধরেছিলেন, মনের উত্তাপটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। নিরঞ্জন এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে

এক দলা থুতু ছিটিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল, দেখল মা মূর্ছাহতের মত পড়ে গেলেন মেঝেতে।

'কী হল কী হল' বলে নিশীথমামা ঝুঁকে পড়লেন, সে বাইরে থেকে দরজাটা ছিটকিনি বন্ধ করে দিল। বার করে আনা স্ত্রীলোক নিয়ে এবার নিশীথ মিত্র যত খুশী প্রেম করুক।

তারপর থেকে এই এতগুলো বছর কেটে গেছে। দেশে দেশান্তরে নিরুদ্দেশ পিতাকে খুঁজেছে বৈকি। প্রত্যক্ষভাবেও খুঁজেছে, পরোক্ষেও খুঁজেছে। অন্যমনস্ক উদাসীন দেখলেই সুজাতা জিজ্ঞাসা করে, 'মাঝে মাঝে তোমার কী হয় হয় বল তো? যেন সংসার থেকে সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কি ভাবো।'

সুজাতাকে বলতে পারে না, তার মনপ্রাণ জুড়ে নেপথ্য সঙ্গীত হয়ে কত দুঃখের আগুন তুষ হয়ে জ্বলছে। মাকে ক্ষমা করতে পারুক না পারুক, ভালোবাসা যে মরে না। নিথীথমামাকে ঘৃণা করতে চাইলেও বারে বারে ঐ একই ভালোবাসার জোয়ার ধুয়ে দিয়ে যায় সব। যত বেদনা পিতার জন্য, ততধিক বেদনা ঐ অপরাধী মানুষ দুটির জন্যে। এ বিষয়ে সে যে কত অসহায় কেমন করে জানাবে সুজাতাকে? সুজাতা জানে তার পিতামাতা দুই-ই মৃত। জগতে একা মানুষকেই সুজাতা মাল্যদান করেছে।

আস্তে আস্তে কখন যেন নিবে এসেছিল আগুন, কখন যেন হতাশার অন্ধকার ছিঁড়ে আলোর উদ্ভাস স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। চাকরিতে উন্নতি হয়েছে, বিয়ে করেছে সন্তান জন্মেছে। আর সুখ? অবচেতনের গভীরে যা থাকে থাক, চেতন মন তার এক ধরনের তৃপ্তিতে প্রায় ভরে উঠেছিল। আর তারপরে কিনা এই?

নিরঞ্জন হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেলো না। ভেবে পেলো না এখন সে কোথায় যাবে, কী করবে। গভীর যন্ত্রণায় দৈহিকভাবেই কেঁপে উঠল। বুকের উপর দিয়ে একটা কান্নার ঢেউ প্রচণ্ড হয়ে গড়িয়ে ভেঙেছিল পাঁজরা। পরাজয় আর অপমানের তীব্র কশাঘাতে কে যেন তাকে চুলের মুঠি ধরে তুলে দিল চেয়ার থেকে। সে উঠল, অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আচ্ছন্নের মত পার হয়ে গেল কম্প্যাউণ্ড। বাড়িটাকে পিছনে ফেলে হাঁটতে লাগল। কোন দিকে? পূবে না পশ্চিমে? উত্তরে না দক্ষিণে? ডাইনে না বাঁয়ে? এদের লাশকাটা ঘরটা কোথায়?

তারার আলোয় পথ দেখতে দেখতে অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'হায়রে আমার হতভাগ্য গর্ভধারিণী।'

অন্তঃসলিলা ॥ সাবিত্রী রায়

বহুদিন পরে দেবব্রত আজ আবার ধীরে ধীরে পা চালায় কফি হাউসের দিকে। ঝাড়াপোঁছা ঝক্‌ঝকে পরিচিত সিঁড়িটার মাথায় পা দিতে না দিতেই ভিতর হতে প্রসন্ন চোখে আহ্বান আসে, "এই যে দেবব্রত। খবর কি। আজকাল যে তোমার দেখাই পাওয়া যায় না।"

একটা চেয়ার মৃদু ঠেলে দেয় পুরানো লেখকবন্ধু, শিবনারায়ণ ব্যানার্জী। "তারপর. তোমাদের কাগজের কদ্দুর। নূতন কোনও বই বের হচ্ছে নাকি রাধারাণী থেকে।" শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

"একটা নূতন কনট্রাক্ট হচ্ছে শীগগীরই—শকুন্তলা দেবীর উপন্যাস।"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঠাট্টার সুরে বলে শিবনারায়ণ, "মেয়েদের লেখা আবার উপন্যাস! নির্ঘাত 'লস' দিতে হবে রাধারাণী পাবলিসারকে। তাছাড়া আনকোরাও নিশ্চয়ই, নাম তো শুনিনি কখনও।"

"ওঁর তো আরও খান দুই বই বেরিয়েছে ছোটগল্পের।"

"ও আবার গল্প নাকি। টেকনিকের কোনও বৈশিষ্ট্য আছে তাতে?

দেবব্রত দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়, "একমাত্র টেকনিকটুকুই তো গল্পের প্রাণ নয়—আত্মাও নয়।"

এবার তর্ক শুরু হয়। শকুন্তলা সেন কোন অতলে ডুবে যায় তর্কের জোর ঘূর্ণিপাকে। একেবারে উপকথা রূপকথার যুগ হতে আটচল্লিশ মাসের পুজো সংখ্যায় এসে ভেড়ে তর্কের পালতোলা তরী।

আরও জনা-দুই বন্ধু এসে বসে ছোট্ট টেবিলটি ঘিরে। বেয়ারা নূতন করে কফি দিয়ে গিয়েছে দ্বিতীয়বার। ধোঁয়া উড়ছে। কফির বাষ্পীয় উগ্র গন্ধ ধোঁয়ার সাথে মিশেছে সিগারেটের কড়াগন্ধ, বাষ্পহীন ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

কাচের বড় বড় জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মেঘলা আকাশের বেশ খানিকটা বড় অংশ। হাওয়াটাও ভেজা ভেজা। বলা চলে, প্রায় কণ্টিনেণ্টাল পরিবেশ। তর্ক তীব্র হয়ে উঠছে।

শিবেশ রায় সিগারেটের ছাইটুকু টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলে শেষ টান দিয়ে নেয়। তারপর প্রথম কথা বলে এতক্ষণ পর, "তবে আশার কথা এই যে, আজকাল সাহিত্যিকদের কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে। কলমে কালী যখন আছে লিখে যাই যা খুশি—এ স্বেচ্ছাচারিতার যুগ কেটে যাচ্ছে। এইতো সেদিন ৩১/এ-তে বেশ একটা ভাল আলোচনা হল। ছোটগল্প লেখার কায়দা সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা বলেছেন আমাদের সাহিত্যিক মহারাজ। লেখার মস্ত একটা প্রয়োজনীয় কায়দাই হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কথাগুলো ছেঁটে ফেলতে শেখা।"

"অতি ঠিক কথা। আগাছা নিড়ান না দিলে ফুলচারার সৌন্দর্যই আড়াল হয়ে যায় বাজে গাছের চাপে।"

আরও একজন ঘরে ঢোকে। রঞ্জন রায় ডাক দেয়, "এই যে প্রফেসার, দূরে দূরে কেন। তোমার বৌ তো এনতার লিখছে হে। এরকম ঘষতে ঘষতেই হাত পেকে যাবে।"

দেবব্রত লজ্জিত বোধ করে শকুন্তলা সম্বন্ধে এ ধরনের উক্তিতে। শকুন্তলার লেখার একজন উৎসাহী পাঠক সে। ব্যথিত হয় সে এতটা রূঢ় মন্তব্যে।

সাহিত্যিকদের কফির আসর শেষ হয়। রাস্তায় নেমে পড়ে সবাই। প্রফেসার যায় না—কারও জন্য অপেক্ষা করছে। দেবব্রতও উঠে না—বসে বসে সিগারেট পোড়ায়। চোখের সামনে বিচিত্র মানুষের বিচিত্র বেশভূষা, হাসি ও চিন্তার রেখা আলতোভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সিগারেটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে। এও এক ধরনের রঙ্গমঞ্চই। হালকা সবুজ রংয়ের দেওয়ালে দেওয়ালে সুন্দর ছবি আঁকা—শাখায় শাখায় কুজনরত বিহঙ্গ বিহঙ্গী। ঘরভর্তি সাজান চক্‌চকে চেয়ার টেবিল—উর্দিপরা মানুষের ত্রস্ত ছুটোছুটি।

নূতন আরেকটি দল এসে দখল করছে সাহিত্যিকদের পরিত্যক্ত চেয়ারগুলি। উগ্র এসেন্সের গন্ধ।

একটা মোহময় রেশ বিস্তার করছে দেবব্রতর চিন্তামগ্ন মনে। সাহিত্যিকদের কথাই ভাবছে সে। বয় এসে শূন্য পেয়ালা-পিরিচগুলি সরিয়ে নিয়ে যায়। চমক ভাঙে দেবব্রতর—এবার উঠতে হয়।

প্রফেসারও বেরিয়ে আসে একসঙ্গে।

"আচ্ছা, নমস্কার।"

"নমস্কার। কাল কিন্তু আপনার বাড়ীতে যাচ্ছি। একটা লেখা দেবার কথা আছে এ বারের সংখ্যায়।"

ঠিকানাটা আবার একটু মিলিয়ে নেয়।

পরের দিন ঠিকানা পকেটে নিয়ে বের হয় শকুন্তলার লেখা আনতে। ঘুরতে ঘুরতে সরু একটা আবছা অন্ধকার গলির ভিতরে এসে পড়ে। এই রাস্তাই কি? রোয়াকে বসা একটি লোকের কাছে একটু খোঁজ নেয়। এই গলিই। দেবব্রত এগিয়ে চলে। একটু অসর্তক হয়ে হাঁটলেই গায়ের জামাটার ছোঁওয়া লেগে যায় দুপাশের বাড়ীর দেওয়ালে। অসাবধানী পানের পিকের দাগে নানা আকারের চিত্র আঁকা দেওয়ালে দেওয়ালে। কোথায়ও বা সর্দি-বসা পাকা পাকা কফ লেগে আছে।

দেবব্রত চোখ বুলিয়ে চলে বাড়ীর নম্বরগুলিতে। মনটা বেশ কিছু দমে গিয়েছে এরই মধ্যে—এই গলিতে শকুন্তলা দেবীর আস্তানা!

একটা বহু পুরানো আমলের স্যাঁতসেতে বাড়ী সম্মুখে রেখে হঠাৎ থেমে গিয়েছে অপরিসর গলিটা। দেবব্রতকেও থামতে হয় অগত্যা। চোখের সামনেই জ্বলজ্বল করচে নম্বরটা—৮/৭বি। এই বাড়ীতেই থাকেন শকুন্তলা দেবী, নবীনা লেখিকা। শকুন্তলাকে দেখে নাই সে। চেহারাটা দেখে নাই, কিন্তু ভিতরটা দেখা হয়ে গিয়েছে। এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত মানুষ দশ বছরের পরিচয়েও হয় না। শ্রদ্ধা করে সে শকুন্তলা দেবীকে।

ভিতর হতে দুয়ারের খিলটা খুলে যায়। মস্ত এক শব্দ করে একটি মেয়ে মানুষ বের হয়ে আসে, কতকগুলি তরকারির খোসা আর কুচো চিংড়ির আঁশ এনে ঢেলে দিয়ে যায় গলির একধারে। ভিতরে ঢুকবার সময় লক্ষ্য করে দেবব্রতকে।

"কাকে চাই?"

"শকুন্তলা দেবী থাকেন এ বাড়ীতে?"

"ঐ দিকের বারান্দা ঘুরে সোজা চলে যান।"

নির্দেশ মত সোজাই চলে আসে সে। আবার একটা ভেজান দুয়ারের সামনে এসে আটকে যায়। একটু ইতস্তত করে কড়া নাড়ে।

বছর সাতেকের একটি ফ্রকপরা মেয়ে বের হয়ে আসে—"বাবা তো পড়াতে গেছেন। বসবেন কি একটু?"

"শকুন্তলা দেবী আছেন?"

"মা রান্না করছেন। আপনি ভিতরে এসে বসুন।"

ভিতরে ঢুকে একেবারেই দমে যায় দেবব্রত। আধো অন্ধকার ঘরখানার মাঝখান দিয়ে একটা প্রশস্ত পর্দা টানান—পার্টিসনের কাজ করা উদ্দেশ্য। আরেক দিকে দুইখানা তক্তপোশ জোড়া দেওয়া। তার উপর রাত্রির শয্যা গোছান রয়েছে—রং ওঠা একটা পুরু সুজনী দিয়ে ঢাকা। স্তূপীকৃত বালিশের বিপুল উচ্চতা বড় বেশী স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিচ্ছে যেন এ বাড়ীর জনসংখ্যা। একপাশে একটি নবজাত শিশুর শয্যা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিশ কাঁথা অয়েল ক্লথ। দেওয়ালে টানান অসংখ্য দেবদেবীর আর গুরুদেবের ছবি। উপরে জানালার তাকে তাকে বই খাতাপত্র, পুরানো পত্রিকার পাঁজা।

মেয়েটি ঘুরে আসে, "ওকি আপনি দাঁড়িয়েই আছেন। বসুন না লক্ষ্মীটি। মা এক্ষুণি আসবেন। পত্রিকা এনে দেবো?"

ছোট্ট মেয়েটির কথার আপন-করা-সুরে অনেকখানি হালকা হয়ে যায় মন। দেবব্রত তাকিয়ে দেখে, অপরিমিত যত্নে বেড়ে ওঠা কৃশ একটি ছোট্ট মেয়ে—কিন্তু সুস্থ একটি প্রাণ রয়েছে উজ্জ্বল চোখদুটিতে।

পর্দার ওপাশের প্রতিটি কথাই স্পষ্ট শোনা যায় এ পাশে আধাবয়সী মহিলাদের পরচর্চা— খানিকটা কুৎসা। ওপাশ হতে ডাক আসে "খুকী।"

"যাই ঠাকুর মা।" মেয়ে ছুটে চলে যায়। দেবব্রত অগত্যা পড়া-পত্রিকাখানাতেই চোখ বুলাতে থাকে। কিন্তু পর্দার আড়ালের কর্কশ কথাগুলিই কানে এসে ঘা মারতে থাকে বারে বারে। "মেয়েটাকেএকটু ধর দেখি, চালগুলো ঝেড়ে নি।"

পার্শ্বস্থিতা আত্মীয়ার নিকট মনের কিছু তিক্ততাও ঝেড়ে ফেলে বর্ষীয়সী মহিলা চাল ঝাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, "আগের মত কি আর ঝাড়তে পারি। কিন্তু কি করবো—রেশনের চাল। একে তো কাঁকড়, তার উপর পাঁচমিশালী।" সমবেদনা জানায় পার্শ্ববর্তিনী—"তোমার কি আর এখনও সংসারের কাজকর্ম করার বয়স আছে। এখন পুজো সন্ধ্যা নিয়ে দিন কাটাবার সময়।"

"অমন ভাগ্যিই কিনা। এখন মরতে পারলেই একমাত্র শান্তি।" অদৃষ্টকে বারে বারে ধিক্কার জানায়—

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকে শকুন্তলা, "আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।" লজ্জিত সুরে বলে সে, "কিন্তু লেখাটা তো টুকে রাখতে পারিনি। আপনি বরং একটু দেখে যান—কষ্ট করে এলেনই যখন।"

শকুন্তলা জানালার উপরের তাক হতে একপাঁজা পুরানো রং ধরা খাতা টেনে নামিয়ে একমনে খুঁজতে থাকে সদ্য লেখা গল্পটি। দেবব্রতর চোখ পড়ে একবার শকুন্তলার হাতের দিকে —সবেমাত্র মসলা পিষে এল, তারই চিহ্ন হলুদ রং-ধরা হাত দু'খানায়।

পর্দার ওপাশে শিশু কণ্ঠে কান্না শুরু হয়। কান্নাটা ক্রমেই চিৎকারে পরিণত হতে থাকে। মনে হয় যেন এখনই বুঝি লাঙ্গস্ ছিঁড়ে যাবে। মৃদু অধৈর্যের সাথে নীচু গলায় বলে শকুন্তলা, "পুড়িয়েই ফেললো নাকি ওরা উনুন ধরাতে?"

ওদিকে পর্দার ওপাশ হতে চাপা গলার কড়া ঝাঁজ এসে ধাক্কা খায় পর্দার গায়ে, "ডাক না তোর মাকে। মেয়েটা চেঁচিয়ে গলা ফেটে মরছে—কানেও কি যায় না। ছেলেপুলের মায়ের কি আর দিনরাত কলম নিয়ে বসে থাকলে চলে!" একটু স্বর নামিয়ে যেন স্বগতোক্তি করে

মহিলাটি, "বিদ্বান ছেলের বিদুষী বৌ। যত জ্বালা হয়েছে আমার।" নীচু গলায় বলা হলেও সবটুকু কথাই শোনা যায় পর্দার এপাশেও। একটা থমথমে চাপা শ্লেষে ভরে থাকে কোঠাখানা। দেবব্রত নিমেষের জন্য একটু তাকায় শকুন্তলার দিকে—একটা লজ্জার কালিমায় ছায়াচ্ছন্ন করে ফেলেছে মুখখানা।

একটু অপ্রস্তুতের মত বলে ফেলে সে, "আমি না হয়, আরেক দিন এসে নিয়ে যাব।"

"এইতো পেয়েছি। আপনাকে কষ্ট করে পড়তে হবে। এখানে-ওখানে ছড়ান রয়েছে লেখাটা।"

খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে চলে যায় সে। শিশুর কান্না তবু থামে না। আবার সেই একই ঝাঁজালো কণ্ঠস্বর, "বাবা মেয়ের কান্নায় তো আর পারি না। এক মেয়ে জন্মেছে, তায় রোগই ছাড়ে না। আর রোগ ছাড়বেই বা কি করে। এমন স্যাঁতসেঁতে বাড়ীতে ভাল মানুষেরও রোগ ঘরে যায়। রোগের বংশও নেই।"

দেবব্রত খাতাখানায় মন দেয়। পাঁচ বছর আগেকার পাঠ্যাবস্থার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা—রোমান ইতিহাসের ক্লাস নোট...ক্রীতদাস বিদ্রোহ...জুলিয়াস সিজারের হত্যা।

তারপরে নূতন লিখতে শেখা বড় বড় অক্ষরে প্রথম পাঠ—"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি।"

সবশেষে শুরু হয় গল্পের আরম্ভ—"ময়দানের দিকে এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার মানুষের মিছিল।"

দেবব্রত মন গুছিয়ে আনে গল্পে। বেশ বড় গল্প।

"চা, কাকু।" ছোট্ট মেয়েটি চায়ের পেয়ালা রেখে যায় চৌকির উপরে। মিষ্টি হাসির অজস্রতা কচি চোখে। যেন একটি সোনালী রোদের রেখা জোর করেই ঢুকে পড়েছে এ আবদ্ধ ঘরে। ওপাশে আবার অদৃষ্টকে কশাঘাত শুরু হয়ে যায়। "ডাল বুঝি পোড়া লাগলো। কি যে আমার বরাত। তোর মা বুঝি গেছে কলতলায় মেয়ের কাঁথা কাচতে। ডাক দে খুকী।" সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক পোড়া গন্ধ উড়ে আসে।

"কাঁথা কাচতে একটু পরে গেলে চলে না?" পার্শ্ববর্তিনী মৃদু মন্তব্য করে।

"না গিয়েই বা করবে কি। একটু বেলা হতে না হতেই যা ভীড় লেগে যায় কলতলায়। এক বাড়ীতে সাত ভাড়াটে। একখানা মাত্র ঘর, চল্লিশ টাকা ভাড়া। এইতো এরা সব খেয়ে গেলে এই ঘরটুকুকেই ধুইয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে বসাবে আমার রান্না। তারপর রাত্রিতে আবার এর উপরই বিছানা পড়বে। এইটুকু ঘরে মানুষ তো আর কম না। হারানের ছেলেরাও তো এখানে থেকেই পড়ে।"

"তোমার তো তবু বৌ-ই রান্নাটুকু করে দেয়।" পার্শ্ববর্তিনীর মনের জমানো খেদ বের হয়ে পড়ে হঠাৎ। কিন্তু গৃহস্বামিনী খুশি হয় না তার কথায়। অপ্রসন্ন সুরে বলে, "আমি তো বলি বৌকে, তোমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয়, আমার আতপ চালটুকু আমিই ফুটিয়ে নেই। আমরা মূর্খ মানুষ, আমাদের তো আর সময়ের মূল্য নেই তাদের মত।"

বিদ্বেষ চুয়ান প্রতিটি উচ্চারণে ধরা পড়ে অনুচ্চারিত বহু অনুযোগ।

দেবব্রত কানাভাঙ্গা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় সন্তর্পণে। ভিতর হতে আবার ডাক শোনা যায়, "খুকী তোর কাকার আসনটা পেতে দিয়ে যা।"

এইমাত্র স্নান করে আসা অল্প বয়সের এক ভদ্রলোক একবার পর্দা সরিয়ে একটু দেখে যায় আগন্তুককে। একটা অর্থভরা হাসির কণা চোখের কোণায়।

ওদিকে তদারক শুরু হয় ভিতরে, "কি রে সুকু, চচ্চরীটা কেমন হয়েছে। দেখতে তো তেমন ভাল মনে হচ্ছে না। ভাল আর হয়ই বা কি করে—রান্নার কি আর মন থাকে—"

তদারককারিণী ডাক দেয়, "ও খুকী, তোর মাকে বল, আর চারটি ভাত নিয়ে আসতে।"

ভাত নিয়ে প্রবেশ করে বধূ। শাড়ীর মৃদু শব্দ একটু। "কি বৌদি, গল্প লিখতে গিয়ে নিজেই আবার গল্পের নায়িকা হয়ে পড়ো না যেন।" বিষ-ঝরা রসিকতা। দেবর সম্পর্ক যখন রহস্য করার অধিকার তো আছে। অপর পক্ষ নিরুত্তর। পর্দার এ পাশের ভদ্রলোকের উপস্থিতিটাই হয়তো বিঁধছে তাকে।

অস্বস্তি বোধ করে দেবব্রত। গল্পটি পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে। গল্পের বলিষ্ঠ ইঙ্গিতময় রেশটুকু বারে বারে হোঁচট খায় লেখিকার পর্দার আড়ালের এ কুটিল ইঙ্গিতে।

প্রফেসার সেন ঘরে ফেরে টিউসান সেরে, হাতে একটি বাজারের থলি।

এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেবব্রত।

"নমস্কার। অনেকক্ষণ যাবৎ এসেছেন?" ঘামে ভিজে যাওয়া গায়ের সার্টটি অতি যত্নের সাথে খুলতে খুলতে বলে, "আমার আবার কলেজের সময় হয়ে এল। কিছু মনে করবেন না, আমি স্নানটা সেরে আসি।" দড়িতে ঝুলান একরাশ জামা কাপড়ের ভিতর হতে খুঁজে বের করে ধুতীখানা।

"আমিও এখন যাব।" হাতের খাতাখানা দেখিয়ে বলে, "এ গল্পটি রবীন্দ্র সংখ্যায় ছাপাতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন—" মুখের কথা শেষ না হতেই উত্তর দেয় প্রফেসার, "গল্পটল্প পড়ার কি ফুরসুৎ আছে।"

খুকী তেলের বাটি দিয়ে যায়। মাথায় তেল ডল্‌তে ডল্‌তে বলে, "এককালে ছিল ওসব সাহিত্য টাহিত্যের উৎসাহ। এখন কলেজ আর টিউসান। আর আছে কালোবাজারে ছুটোছুটি।" প্রফেসার চলে যায় স্নান সারতে।

ওপাশে প্রফেসারের গলা শোনা যায়, "ডাক্তার বাড়ী যাওয়ার সময় আর হল না। দেখি রাত্রিতে যদি পারি।"

"কিন্তু জ্বর তো বেড়েছে—কফও আছে বুকে," শিশুর মায়ের উদ্বিগ্ন উত্তরটুকুও কানে আসে।

শকুন্তলা ঘরে ঢোকে—কোলে কাঁথায় জড়ান রুগ্ন শিশুটির চোখে জ্বরের ঘুম।

ভাল করে লক্ষ্য করে দেবব্রত শকুন্তলার মুখের দিকে। গভীর বেদনার ছায়া চোখের গভীরে।

মমতায় ভিজে ওঠে মনটা—কি চিন্তা করে বলে সে, "খাতাখানি নিয়ে যাই, টুকে নেবার ব্যবস্থা আমি করবো।"

এ ঐকান্তিকতার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠে চোখদুটি—অসংখ্য ধন্যবাদ সে চোখে। একটু সংকোচের সাথে বলে, "আমি একবার চোখ বুলিয়ে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি। আমারই উচিত ছিল লেখাটা ঠিক করে রাখা। কিন্তু মেয়ের জ্বর হয়ে পড়ায় আর পেরে উঠিনি।"

দেবব্রত অপেক্ষা করে। বসে বসে নতমুখে দেখে সে ঘরের মেঝেটা—বহুস্থানে সিমেণ্টই উঠে গিয়েছে। দেওয়াল হতে সর্বক্ষণের জন্য একটা ভ্যাপসা গন্ধ বের হয়ে আসছে। আরেকটি ছেলে ঘরে ঢোকে। দেবব্রত চেনে তাকে—শকুন্তলার ভাই সুব্রত। কোনও ভূমিকা না করেই বলে সে, "দিদি তুমি যে কিছু টাকা দেবে বলেছিলে আমাদের সেটা আজ পেলে উপকার হয়।"

এক মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায় শকুন্তলার মুখখানা। অপরাধীর সুরে বলে, 'টাকা তো দেব বলেছিলাম। ভেবেছিলাম—গতবারের লেখাটা দিয়ে বুঝি কিছু টাকা পাব। কিন্তু আমাদের মত নূতন হাতের লেখা নাকি কাগজে ছাপানটাই যথেষ্ট মূল্য দেওয়া।"

দেবব্রত তাকিয়ে দেখে আবার একটু লেখিকাকে। দুই হাতে দুই গাছা শাঁখের চুড়ি, পরিধানে মিলের মোটা শাড়ী—আভরণহীন কানের দুই পাশে চূর্ণ কুন্তল। "দশটি টাকাও দিতে পারবে না? আমি ওদের আশা দিয়ে এসেছি—দিদির কাছে ঠিক পাব—কথা যখন দিয়েছে সে।" ব্যথিত সুরে বলে সুব্রত। "অরুণদা যে থাইসিস নিয়ে বেরিয়েছিলেন জেল থেকে তোমাকে বলিনি কি? ইমিডিয়েটলি তাকে স্যানিটোরিয়ামে পাঠান দরকার চাঁদা তুলে।" শকুন্তলার বিবর্ণ, মৌনী মুখের দিকে তাকায় দেবব্রত। ভাষাহীন বেদনার নীরব আর্তনাদে বুঝি ছিঁড়ে পড়ছে কোমল আত্মা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ান একজন অ-দেখা কর্মীর প্রাণের মমতায় আর, স্নেহের ভাইয়ের আশাভঙ্গের ব্যথায় বিদীর্ণ দৃষ্টি।—তবু দশটি টাকাও দেবার শক্তি নেই তার!

অনুমান করে দেবব্রত হয়তো আরও কত বাকি টাকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীওয়ালা, দুধওয়ালা, হয়তো বা ধার দেওয়া বন্ধুরাও।

সুব্রত চলে যায় ম্লান মুখে।

দেবব্রতও উঠে পড়ে। আবার সেই অপ্রশস্ত নোংরা গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তন্ময় হয়ে ভাবে দেবব্রত, এই মধ্যবিত্ত সংগ্রামের আড়ালেই কি বয়ে চলেছে লেখিকার জীবনের অন্তঃসলিলা প্রাণের প্রবাহ।

বোঝা॥ শ্রীমতী বাণী রায়

পরীক্ষার হলে বসবার যুগ শেষ হয়ে যাবার পরে এমন করে আর কারুর প্রশ্নের জবাব দিতে হয়নি। প্রশ্নতালিকার সহজ-শক্ত বেছে নিয়ে উত্তরের সুযোগ পাইনি। কফিহাউসের দোতলার বারান্দার মুখোমুখি বসে মূর্ত্তিমতী কৌতূহলের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় অনুশোচনার অন্ত ছিল না।

আমার মধ্যে কেমন একটা খেলো সামাজিকতার আধিক্য আছে দেখেছি। হঠাৎ পথে চেনা-লোক কুড়িয়ে তাকে নিয়ে অযথা সময় কর্ত্তন করি। গায়ে পড়ে অন্তরঙ্গ হই, হৃদ্যতায় যেন মাখনের মত গলে পড়ি। সামাজিকতার রুচীতে তুলে নিলেই ধন্য হবো। কি করে টম-ডিক-হ্যারীর সঙ্গে টম-ডিক-হ্যারী হতে পারব ক্ষণকালের জন্যও, এই আমার দুরন্ত সাধনা। তারপরে হয়তো টম-ডিক-হ্যারী থাকবে পথে পড়ে, দৃষ্টির অগোচর হওয়া মাত্র ভুলে যাব আমি। তবু, দেখা হওয়া মাত্র মাতামাতির শেষ থাকে না।

জনতা-কণ্টকিত শ্যামবাজারগামী বাস থেকে নামলাম কলেজ স্ট্রীটে। সেই কলেজ স্ট্রীট! প্রতিভার পলাশী প্রাঙ্গণ। কত প্রতিভা জীবিত থাকে, কত প্রতিভার দিনমণি অস্তমিত হল পাঠকের চাওয়া-না-চাওয়ার মানদণ্ডে। প্রতিভা দুশো থেকে আটশো পাতায় বাঁধা পড়ে প্রকাশকের ঝকঝকে কাউণ্টারে হাহাকার করতে থাকে—

"শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণেক হেসে,
আমার সোনার ধান কুলেতে এসে"—

এইখানে আপাতদৃষ্টিতে নির্লিপ্ত ক্রেতা খোঁজে নিত্য-নূতন আবিষ্কার। সার্কাসের অ্যাক্রোবাটের মত প্রতিমুহূর্ত্তে যে লোক যত দড়ির খেলা দেখাতে পারেন তাঁর তত জয়। জনমানস চায় মারাত্মক খেলা। 'Slow but steady wins the race'—অন্তত কলেজ স্ট্রীটের মত নয়।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ কে যেন কনুইয়ের খোঁচা দিতে দিতে বলে উঠল, "এই এই!"

চেয়ে দেখি একদা সহপাঠিনী রাধারাণী স্বয়ং! বহু দিন পরে দেখা। সরস কোনদিনই ছিল না রাধা, এখন ভাঁটির টানে অনুর্ব্বর কঙ্করক্ষেত্রে পরিগণিত হয়েছে। এক হাতে বিস্তর বইখাতা ধরা, অন্য হাতে রঙীন দড়ির পরিপূর্ণ থলে ঝুলছে। অগত্যা কনুইর সাহায্য ভিন্ন উপায় নেই ওর। এতই বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত ও।

চুল টেনে বাঁধা, ভ্রূকুঞ্চিত চক্ষে মোটা কালো ফ্রেমের গোল চশমা। লাট-পাট সাদা মিলের শাড়ী, নীল খদ্দরের জামা, পায়ে বাদামী চটী। অতি-ভব্য, সংযত-বন্ধন, শাসিত দিনযাত্রার ছাপ মুখে-চোখে। এই সব মেয়েরাই ভদ্রমহিলা নামের যোগ্য। পথে ঘাটে এদের লোক পথ ছেড়ে না দিলেও অবশ্যই শীষ দিয়ে অভ্যর্থনা করে না। বালিকা বিদ্যালয় এদেরই পত্রপাঠ নিয়োগ করে। সন্দিগ্ধা পত্নী এমন মহিলাকেই পুত্রকন্যার গৃহশিক্ষয়িত্রী বহাল করেন

স্বচ্ছন্দচিত্তে। পাত্র পছন্দ করুক না করুক, পাত্রের পিতামহী এদের যোগ্যতা স্বীকার করে নেন। এক কথায় এরা যে ভদ্রঘরের মেয়ে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সার্চ্চলাইটের তীব্রতায় চশমার কাঁচ দুটি আমার প্রতি নিবদ্ধ রইল। অপ্রতিভ হয়ে উঠলাম, বললাম, ''অনেকদিন পরে দেখা হল। ভাল আছ তো?''

আমার আপাদমস্তকে চোখ বোলাতে বোলাতে রাধা বলল, ''হ্যাঁ, বি-এ পাশ করবার পরে আর দেখা হয়নি। তা, তুমি তো বেশ ভালই আছ, দেখতে পাচ্ছি।''

মরমে মরে গেলাম। রাধার অতি-ভদ্র বেশভূষার পাশে আমার স্যামন-পিঙ্ক ক্রেপ্-ডি-সিন্ শাড়ী, জর্জ্জেটের কাঠগোলাপ জামা যেন আমাকে উপহাস করে উঠল ঃ একবয়সী তোমরা। দেখ তো ওর দিকে, আবার নিজের দিকেও দেখ। পড়ে মরতে বুড়ো বয়সে সিনেমা তারকার সাজ কেন? বলি, লিপস্টিক মাখাই বা ছাড়বে কবে? কলেজ স্ট্রীটে তুমি কতটা বেমানান, জানো কি?

ভাবলাম, সত্যই তো। কিন্তু, এসব বেশভূষায় এত অভ্যস্ত আমি যে অভাবে মন খারাপ হয়ে যায়। জুতো ব্যবহারের মত এসেন্স ব্যবহার মজ্জাগত হয়ে গেছে। নাঃ, নিজেকে সংশোধন করা উচিত।

আপাততঃ রাধার দৃষ্টিবাণ এড়াতে হৃদ্যতায় বিগলিত হয়ে উঠলাম। শ্রম-কঠোর—ঘর্ম্মাক্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেললাম, ''এতদিন পরে দেখা। এত ভিড়ের মধ্যে কি কথা হয়? খুব ক্লান্ত দেখছি তোমাকে। এস না কফি হাউসে।''

''স্কুলে পড়িয়ে স্কুল থেকে ফিরছি সোজা। তা, ওখানে কি যাওয়া উচিত?'' সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে রাধা আমার দিকে তাকাল।

রাধার বাধা অনুভব করে বললাম, ''আরে, সে ওপাড়ার কফি হাউস। এখানে শুধু ছাত্র ছাত্রী আর সাহিত্যিকের ভিড়। তাছাড়া, যাচ্ছ তো আমার সঙ্গে। আমি নিশ্চয় তোমার কাছে পরপুরুষ নই।''

রাধা কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, ''তবে চল, এত করে বলছ যখন।'' রাস্তা পার হতে হতে নিজের মনকেই প্রবোধ ছলে যেন সে বিড়বিড় করে বলল, ''আর, যখন এতদিন পরে দেখা।''

তারপরে রাধার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে জর্জ্জরিত হয়ে ভাবলাম এ কাজ না করলেই হত। ওর অনিচ্ছার সূত্র ধরে যদি ওকে বোঝাতাম, কফি হাউসে গো লোথারিয়ো আর ডন জুয়ানেরা গলাগলি করে বসে থাকে। বেকী শার্প আর অ্যাম্বার অহরহ চলাফেরা করে। তাহলে রাধা ভয় পেত, আমিও নিমন্ত্রণের দায় এড়িয়ে যেতাম। মুখোমুখি টেবলে বসে রাধার সন্ধানী দৃষ্টি ও প্রশ্নসায়কে আমি সম্পূর্ণ বিদ্ধ হলাম। দেখা হওয়া মাত্র মরমে মরে গিয়েছিলাম। এখন আমার অন্তিম-শয্যা আস্তৃত হল।

প্রথমে প্রশ্ন করল রাধা, ''এখন কি করছ?''

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিতে হল, ''কিছুই না।''

''জীবনের উদ্দেশ্য কি তোমার? কি করবে?''

সবিনয়ে আবার নেতিবাচক উত্তর দিলাম। রাধা সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে আমার জীবনের সম্পূর্ণ অসারতা দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলাম।

কফি শেষ করে রাধা চাঙা হয়ে আবার প্রশ্নজাল বিস্তার করল। প্রকৃতপক্ষে, আমার বয়স ছাড়া ও সব কিছুই জিজ্ঞাসা করল। বয়সটা জানা ছিল বলেই কি, অথবা তাহলে ওর নিজের বয়স নিয়ে টানাটানি চলবে চিন্তায় ও নিরস্ত হল জানি না। নিজের বাসা জানাল রাধা

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গাম্ভীর্য্যে। বি.এ. পাশ করে ওর স্কুলে কাজ নিতে হয়েছিল পিতার অসুস্থতার জন্য। এবারে ছুটি নিয়ে বি.টি. পাশ করেছে ভবিষ্যতে উন্নতির আশায়। বি.টি. পাশ করে মাইনে কিছু বাড়লেও রাধার আশা অনেক। এম. এ. পাশ করে কলেজে কাজ নিলে ভাল হবে বিবেচনায় আজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল খোঁজখবরে। স্কুলের পর এসেছে শ্যামবাজার থেকে কলেজ স্ট্রীটে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেশ। আমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই লাগছে। একঘেয়ে কাজ আর কর্ত্তব্যপালনে বাঁধা রাধা। ছোট বোন আছে বাড়ীতে, বাবা নামমাত্র পেনসনে রিটায়ার করেছেন। ভাইটি ছোট। দায়িত্ব অনেক রাধার। গোঁড়া বাড়ীর মেয়ে হলেও জীবিকার খোঁজে পথে নামতে হয়েছে। আমাকে সগর্ব্বে খবর দিল, ব্যাঙ্কেও কিছু জমাতে পারা গেছে। তবে, রাধার লক্ষ্য বহু ঊর্দ্ধে—উন্নতি তার আদর্শ, নিজের শক্তির বলে। মনে হল রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এদেরই কল্পনায় লিখেছিলেন ঃ

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার—"

আদর্শ নারী রাধা। গৃহে বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা, গৃহকর্ম্ম সবি সে করে। ছোট ভাইবোনের শিক্ষার দায়িত্বও তারি উপরে। পরিহাস করে বললাম, "রাধার কৃষ্ণটি এলেই এখন ভালো হয়।"

পরকলার ঝকমকে লক্ষ্য আমার দিকে ফেলে রাধা বলে উঠল, "ও কি কথা বলছ? আমি বিয়ে করলে সংসার চলবে কি করে? আমার ওপরে কত ভার!"

সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম রাধার কর্ত্তব্যময়ী মূর্ত্তির সম্মুখে। নিজের প্রজাপতি জীবন হীন মনে হল। নিজে আছি নিজেকে নিয়ে, আর রাধা বাঁচছে অন্যের প্রয়োজনে। স্থির করলাম, একটা ভদ্রগোছের কাজ করবার চেষ্টা করব, বেকার সাহিত্যচর্চ্চা ছেড়ে।

রাধা রুমালে মুখ মুছে বলল, "বরঞ্চ, ছোট বোনটার বিয়ে পাত্র ভাল পেলে দিতে পারি। দাও না, একটা দেখে-শুনে।"

"পাত্র কোথায় পাব?"

আমার দিকে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টি হেনে রাধা বলল, "কেন? তুমি কি ছেলেদের সঙ্গে মেশো না? শুনি সাহিত্যিকেরা অবাধ মেলামেশার ভক্ত।"

রাধার কণ্ঠস্বরে 'সাহিত্যিকেরা' ক্রিমিনাল বনে গেলেন। স্বজাতির লজ্জায় বিষণ্ণ কণ্ঠে বললাম, "যাঁদের সঙ্গে মিশি তাঁরা তো বোনের পাত্র হিসাবে লোভনীয় নয়। তা, তুমি কাজকর্ম্ম করছ, তুমিও কি কথাবার্ত্তা বন্ধ করে থাক নাকি পুরুষজাতির সঙ্গে?"

রাধার মাথা ইঞ্চিখানেক উচ্চ হয়ে উঠল, "আমি পারতপক্ষে কারুর সঙ্গে কথাটিও কই না। আমার নামে এ পর্য্যন্ত একটা কথাও কেউ বলতে পারেনি।"

ম্রিয়মাণ হয়ে উঠলাম, কারণ আমার নামে একটা ছেড়েএকশোটা কথা যে লোকে বলে বেড়ায় তা আমি জানি। কারণ না জানলেও, ঘটনাটা জানা আছে। মাথা নামিয়ে বিলটা মিটিয়ে দিলাম।

রাধা হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, "ওঃ, কত বেলা হয়ে গেল! বাড়ী গিয়ে দেখব মা রান্নাঘরে ঢুকে বসে আছেন।"

"কেন, মা রান্না করেন না? তুমি তো বাইরের কাজ করো।" তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি আমার দিকে হেনে রাধা উত্তর দিল, "মা কি দু'বেলাই আমার জন্য রাঁধবেন? শরীর খারাপ ওঁর। রাঁধবার লোক যতদিন না রাখতে পারি, নিজেই একবেলা রান্না করি।"

"তোমার বোন তো পাবে?"

"বেশ তুমি! আমি থাকতে ও রাঁধবে কি? পড়াশুনো নেই ওর?" নিজের স্বার্থপরতায়

বিমূঢ় হয়ে গেলাম। ক্রমেই রাধার পাশে নিজেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। সুযোগ পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সম্পূর্ণ বিলীন হ'বার পূর্ব্বেই পালাই। বললাম, "যাই এবার। তোমার অনেকটা সময় নষ্ট হল। কাজের লোক তুমি।"

রাধাও উঠে দাঁড়াল, "আজ কাজ হবে না। মাসকাবারের টাকাটা পেয়ে জিনিসপত্রও কিছু কিনতে কিনতে দেরী হয়ে গেল এমনিই। তুমি এখন যাবে কোথায়?"

অনেক জায়গা ছিল যাবার। বল্লেই রাধার প্রশ্নবাণ বর্ষিত হবে আশঙ্কায় রাধার হাতের পূর্ণ থলিটার দিকে চেয়ে প্রথমেই যা মনে এল, স্বচ্ছন্দে বলে দিলাম, "আমারও কটা জিনিস কেনবার আছে। নিউমার্কেটে যাব ভাবছি একবার।"

রাধা বলল, "আমি বহুকাল নিউ মার্কেটে যাই না। না হয় চলো তোমার সঙ্গে আজ যাওয়া যাক। বোনের জন্যে না হয় তোমার মত দুটো পাশ চিরুণী কিনে নেব। অনেক দিন ধরে চাইছে বেচারী।"

ব্যাকুলভাবে বললাম, "তোমার সময় নষ্ট হবে না? অত কাজ বলছিলে।"

একটু ভেবে রাধা বলল, "আজকের দিনটা এমনি গেল। ভাই-বোন দুটোকে বাড়ী ফিরে পড়া বলে দেবখন। আজ ক'টা জামা সেলাই করবার ছিল, তা থাক। মা রান্নাঘর থেকে আর বেরোতে চাইবেন না। যাই তোমার সঙ্গেই। এতদিন পরে দেখা হল। তুমি তো চিরকালই কাজ পণ্ড করবার পাণ্ডা!"

কুকুরের মত রাধার পেছনে পেছনে ট্রামে উঠে বসলাম। পথে রাধা কামানের গোলা বর্ষণের মত প্রশ্ন বর্ষণে আমাকে হয়রান করে তুলল। তার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের প্রভেদ এতই বেশী, আমার উদ্দেশ্যহীন জীবনকে বুঝবার তার এতই অক্ষমতা, যে কৌতূহল তার পক্ষে স্বাভাবিক। রাধা নিজের ভবিষ্যতের কথাও বলল—ব্লেমলেস্ লাইফের স্বর্ণচিত্র একখানি। বিবাহের কথা যে সে একেবারে না ভাবে তা নয়। ছোট ভাই মানুষ হলে তবে রাধার ছুটি। রাধার ভাই প্রবেশিকার ছাত্র। তার মানুষ হতে হতে রাধার আদৌ ও ভাবনার ক্ষেত্র থাকবে না, চিন্তা করে নিরস্ত হলাম। রাধা আরও জানাল এম.এ. প্রাইভেট পড়ে পাশ করবার পরে কলেজে কাজ নেবে ও। ভাইকে গাড়ী চালানো শিখিয়ে একখানা ছোট সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ী যদি কোনমতে কিস্তিবন্দীতে কেনা যায়, তাহলেই রাধার সর্ব্বোত্তম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। সর্ব্বদা ট্রামে বাসে দৌড়োদৌড়ি করা বড় কষ্টকর, যে-সে গায়ের সঙ্গে গা লাগায়।

কত বছর পরে রাধার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাহনরূপ-পর্ব্বত লঙ্ঘন করবে জানি না। আপাততঃ তো গতি তার খঞ্জ।

নিউ মার্কেটে রাধা একটু বিমনা হয়ে পড়ল, "সত্যি বলতে কি, এখানে এলেই জিনিসপত্র কিনতে ইচ্ছা করে।"

রাধার স্বীকারোক্তিতে সচকিত হয়ে তার দিকে তাকালাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন তরুণী সাজ ও হাসির ঝলক তুলে মোড়ের দোকান থেকে এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

বজ্রাহত ব্যক্তির মত রাধা ফিস্ ফিস্ করে জানাল, "আরে, এ যে সুমিতা!"

সুমিতাই বটে। কাঁধ পর্য্যন্ত কাটা চুল শ্যাম্পুস্ফীত। কোমর উদঘাটিত চোলি জামায়। নখে, ঠোঁটে, গালে লালে-লাল। ভুরু আঁকা। দেহের গঠন সরবে হাল্কা সিফনের নীচ থেকে অস্তিত্ব জাহির করছে। বি.এ. ক্লাশের সুমিতার সঙ্গে এ সুমিতার অনেক প্রভেদ।

পাশে সুবেশ তরুণ, গায়ে গা লাগিয়ে। সুমিতা আমাদের জড়িয়ে ধরল, "চিনতে পারছিস না?"

রাধা ক্ষীণস্বরে বলল, "তুমি না কাজ কর কি"—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, করি তো। তাই কি ?" হাতের ও কানের হীরক ঝল্‌সে উঠল সুমিতার, "ভারী কাজ! ছেড়ে দেব ভাবছি।"

সুমিতার সম্পর্কে সব তথ্য আমরা জানতাম। ইতিপূর্ব্বে আজ রাধাও জানিয়েছিল সুমিতা অধঃপতনের শেষ সীমায় গেছে, ওর চেয়ে সুমিতার মরণ মঙ্গল। এখন অতর্কিত ভাবে মুখোমুখি সুমিতার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করলাম। বিশেষতঃ, রাধার চারিত্র্য কঠোরতা স্মরণ করে।

আমার পা থেকে মাথায় চোখ বুলিয়ে সুমিতা বলে উঠল ঃ "হ্যালো, খুব তো গরম গরম লেখ। নিজে এমন নরম কেন? চুলগুলো অমন বিশ্রীভাবে রেখেছ কেন? কেটে ফেল না আমার মত। It would at least give you a modern look. এখন ক্রেপ-ডি-সিন্? Horrible." রাধার বিষয়ে সজ্জার উপদেশ সুমিতা অপাত্রে ন্যস্ত করল না। দ্বিতীয়বার মরমে মরে গেলাম। পাশাপাশি আয়নায় ছায়া পড়েছে দোকানে। 'পিতার হোটেলে' যথেচ্ছা আহারের ফলে দেহ স্থূল। অবিরত শুয়ে-বসে লেখাপড়ার ফলে মধ্য-বয়সসুলভ মেদ-ভারে পীড়িত আমি। পাশের তরুণীটি যেন ছিপ্‌ছিপে কঞ্চি। চলন-বলনে কোথাও ভার নেই ওর। আশ্চর্য্য, অধঃপতন কিন্তু সুমিতাকে চমৎকার মানিয়েছে। রূপ ছিল না যার, আজ সে রাতারাতি রূপসী হয়ে উঠেছে। শুধু ধার করা নয়; চোখের দীপ্তি, হাসির উজ্জ্বলতা, দেহের সুষমা তো অকৃত্রিম।

রাধার সঙ্গে সুমিতার তুলনা চলে না। নিজের কর্ত্তব্যপালনে রাধার সান্ত্বনা আছে। আমার সান্ত্বনা কোথায়? রাধা এক প্রত্যন্তদেশে, সুমিতা অন্য এক প্রত্যন্তদেশে। দুজনের মধ্যে ত্রিশঙ্কু আমি। হায়, হায়!

সুমিতা আমাদের হাত ধরে টানল, "এস না, কোথাও আইসক্রীম খাই। এতদিন পরে দেখা হ'ল। রজট্, শোন এঁরা আমার কলেজবন্ধু।"

রজত নামধারী ভদ্রলোক নমস্কার করলেন এগিয়ে। সুদর্শন যুবক, সুমিতার প্রতি তদ্‌গত, সহজেই বোঝা যায়।

আমাদের কিছুতে আইসক্রীমে রাজী করাতে না পেরে সুমিতা শেষে বলল, "কোথায় যাবে? চল, ড্রপ করে দি।"

"গাড়ী কিনেছ নাকি?" রাধা আর্ত্তনাদের মত সুরে জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, তা আমি না কিনলেও বলতে গেলে আমারি। এস না।"

কুলী ঝুড়িভর্ত্তি জিনিসপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমি অক্ষমতা জানালাম, "আমাদের কাজ আছে।"

"ও, তোমরা যে কাজের লোক, ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি অকেজো মানুষ, কাজের ধার ধারিনে। এসো রজট্।" রজতের হাত ধরে টেনে ক্ষিপ্র-গমনে সুমিতা রওনা হ'ল, পেছনে বোঝা নিয়ে কুলী।

রুদ্ধস্বরে রাধা বলল, "সুমিতা গরীবের মেয়ে ছিল। এত টাকা হ'ল কেমন করে ওর?"

"কেমন করে মেয়েদের টাকা হতে পারে, তা তো তুমি জান, রাধা। নিলর্জ্জের একশেষ! তোমাকে যা নিজে অর্জ্জন করে নিতে হচ্ছে ও তা উপহার পাচ্ছে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অপ্রত্যাশিতভাবে রাধা বলে উঠল, "কে বলবে আমাদের বয়সী? দেখে দশবছরের ছোট মনে হয় না?"

নিঃশব্দে দু'জনে বেরিয়ে এলাম বাজার থেকে।

"তাহ'লে যাই রাধা। বাস আসছে। তোমার রূট তো উল্টো দিকে।"

রাধা পরিপূর্ণ ঝোলা সামলে সম্মতি দিল। বিদায় জ্ঞাপন করে উঠে বসলাম বাসে। ওপাশ দিয়ে সুমিতার ঝকঝকে গাড়ী ছুটে চলে গেল পালকের মত।

রাধা মাথা উঁচু করে রাস্তায় ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে যাবে সে-ও ভাল, বাসের সার্ব্বজনীন ঠেলাঠেলি ওর অসহ্য। কত বোঝা ওর হাতে! কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'বে কে জানে? সুমিতার নিমন্ত্রণ নিলে ভাল করত রাধা।

বাস ছেড়ে দিল। চলে যেতে যেতে রাধার কথাই আবার ভাবলাম। সৎচরিত্রের বোঝা শেষ পর্য্যন্ত টেনে রাধা চলতে পারবে তো?

প্রার্থনা সাঁপুই ।। মহাশ্বেতা দেবী

"প্রার্থনা" নাম রেখেছিল মায়ের মনিবগিন্নি। তিনি ইস্কুলে পড়াত, বিয়ে হলেও ছেলেপিলে হয় নি। অনেক মালসামানত করত, ঢিল বাঁধতে যেত থানে। কিন্তু দেবদেবতা তুষ্ট হন নি। তিনিই মায়ের কোলে মেয়ে দেখে বলেছিল, কি সব ভেন্তি মেন্তি নামে ডাকো মেয়েদেরে। এর নাম দিলাম 'প্রার্থনা'।

ওই গিন্নি নাম দিল। গিন্নি জানল, আর মা শুনল। ও নামে কোনদিন ডাকেনি কেউ। মা বলত, "আন্না"। বলত, গাচ শুকোচ্চে, ফল ধরবার বিরেম নেই, কেমন করে বা অ্যাতোগুলো মুকে রন্ন দিই, আর সন্তান চাই না ঠাকুর।

মায়ের ঘরে নাম ছিল আন্না।

শওরে মেয়ের বর জুটবে নে। শওরে থাগলে মেয়েও ঝি খেটে সোয়ামিকে ট্যাকা দেবে, এমত সব বিবেচনায় আন্নার মা মনে করত, শহরের চেয়ে গ্রাম ভাল। তখনো "শহর ভাল, না গ্রাম", "গ্রামের কি ভাল, কি মন্দ" এ সব বিষয়ে রচনা লেখার চল হয়নি ইস্কুলে। আন্নার মায়ের শহর-বিরোধিতার কারণ একটাই। ভেন্তি এক প্যাডলারকে বিয়ে করে ঝি খাটছিল। তা জেনেশুনেই মেন্তিও জামাইবাবুর গলায় মালা দেয়। দুজনেই এক বাড়ীতে থাকত, শুম্ভনিশুম্ভের লড়াই করত, মায়ের কাছে সালিশ করতে আসত।

কালে আন্না বা কি করে বসে, সেই ভয়ে আন্নার মা পনেরো না হতে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিল শিমূলবেড়া, মাতলার ওপারে। বলেছিল, জামাই চাষীবাসী গেরস্ত, বাড়িতে নিজেদের সজনা, প্যায়রা, কলা গাচ। খাটবে, খাবে, থাগবে।

পনেরোতে সিঁতেয় সিঁদুর, ষোলতে প্রাণকৃষ্ণর মা। বে' হতে "আন্না" নামটিও মুচে যায়। সে সময়ে সে ডেগো বা ডমরুধরের বউ। আর পয়লা বিয়ানেই ছেলে। সেই হতে মানুর মা।

মায়ের মত আন্নাও ফলন্ত গাছ। তাই বিশ না হতে দেবী আর বাসন্তীর মা হয়েছিল। বাসন্তীর বয়স ছ'মাস। আবার পোয়াতি হবার সময় আসন্ন, এমন সময়ে শরিকী বিবাদ ফুলে ফেঁপে ওঠে।

ডেগোর কাকা বলছিল বটে, তোদের প্যায়রা গাচের গোড়া কেটে নিমূল করব ডেগো। শেকড়বাকড়ে আমার ঘরের কাঁথ ফেটে যাচ্চে।

দোষের মধ্যে ডেগো বলেছিল, আজ প্যায়রা গাচ, কাল বলবে কলা গাচ! ক'বচর মাওলা করে নাবো জমিটা জেতার পর থে আবার দেকি বুড়োর প্যাকনা গইজেচে। মত্তে মত্তে হাসপাতালে থে ফিরেই...

ভরা শরৎকালের প্রসন্ন সকালে এটুকু মাত্র সংলাপকে কেন্দ্র করেই ঘুমন্ত ঝগড়া জেগে উঠেছিল, আর হৈমন্তিক ধান ঘরে তুলে, যখন অবসর সময়, সে সময়েই ঝগড়া বাড়তে বাড়তে মারদাংগার দিকে চাচ্ছিল। গ্রামের মানুষ বড়ই আনন্দ পাচ্ছিল, কেননা এমন মারদাংগা মানুষকে আনন্দ দেয়। কথার কাজিয়া চলছিল। পুরুষে পুরুষে, নারীতে নারীতে।

এ কথাও সত্যি যে খুড়শাওড়িকে গরু বাঁধার খোঁটা তুলে ছুঁড়ে মেরেছিল পানুর মা।

আচে সগল কতা মনে আচে গো।

আমার ঘরে শাউড়ি নি। তাতেই বুড়ী ওটোনে দাঁইড়ে ছেলেমেয়েদের শাপমন্যি দিতু।

কৎ আর সইতে পারি? ছেলে জ্বরে গুসচে, উনি বলল কি না, অপুত্তুক হবে, ডেগো!

মট মট করে আঙুল মটকে বলল, তে'রাত্তির পোয়াবে না। আমার ঘরে মেয়ের চাষ। ছেলের গরবে এত গরম হয়েছে। সব্যদা মটমট কচ্চে ঝেমন। নইলে হেঁসেলের ছাই আমার ঘাটের পতে গাদা করে?

পেথ্যমে ভয়, তা' বাদে রাগ! ছেলেকে মরো মরো ব'ে যাবে এত বড় আস্পদ্দা?

ছেলের বাপ থাগলে দা বইসে দিতু, আমি তো খেঁটেটা বাইগে ধরে ছুঁড়েছিলাম শুদু।

কি করে ঝানব তাতে মহাসব্যনাশ হবে?

কপাল ফেটে চোক ফেটে অমন অক্তগঙ্গা হবে?

বুড়ী কানী হয়ে ঝাবে, চক্ষু হাইরে?

এক চোক কানা, মনসা বুড়ী ঝেমন!

মানচি জোয়ান বয়স আমার রাগও হইছিল বেস্তর। কিন্তুক মাল্লাম মাতায়, ডানদিকের কপাল আর চোক ফেটে গেল। আচাড় খেয়ে বুড়ী কোমরও ভাঙল।

কি ঝে বাদল তা' বাদে। লোকে লোকারন্ন রতদোলের ভিড় ঝেমন। খুড়তো ভাসুর চেঁইচে বলল, খুনে মেয়েছেলে, আমার মা'রে খুন করেচে।

খুন আমি করি নি। মরার মনিষ্যি সে নয়। একনো না কি লাটি ভরে ল্যাংড়া পা টেনে টেনে এক চোকে গাঁয়ে পাক মারে।

মল্যে পরে ভাল হতু।

জেলের দিদিরা বলে, তোর যে যাবজ্জীবন হতু?

আমি বলি, এ তার চে' কম কিসে?

সেই তো থানাপুলিশ হল, আমারেই ধরে নে' গেল পুলিশ। ছেলেমেয়ে যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি। খুড়তো' জা চেঁচাচ্চিল, আমার বোনরে বে'কত্তে বললাম, ছোঁড়া বলল মুক দেখলে গা বিরোয়, তারে বে' করব না। না কল্যি, কোতাকার খুনে মেয়েছেলে দেকে এনিছিলি? সোন্দর মুক হলে হয় না রে ডেগো, লক্যন-অলক্যন মানতি হয়।

আমার তো ঝা হবার তা হল। দশ বচরের জেল। কেঁদেকেটে বন্নু, একনে ঝগড়া কেজে মিট্যে নাও, ঘরে তো কেউ নেই।

পানুর বাপ চোক লাল করে বল্যে, আগে সে কতা ভেবিছিলি?

—নিত্যনিত্যি ছেলে মরুক, মরুক—মা শুনতে পারে?

—সোমসার ঝে জ্বলে গেল। আমার বংশে ককনো মেয়েছেলে জেল খাটে নে। একলে দুদের ছেলে ফেলে ঝে যাচ্ছিস, আমিও সব ক'টারে মাতায় কোপ মেরে আত্তঘাতী হব।

—অমন কাজও কোর না।

কত দোইথোই করিচি তখন! দারোগা বলো, উকিল বলো। হাকিম বলো! কত বলিচি, নিত্য শাপমন্যি দে ঝায়, খেঁটো ছুঁড়ে মেরিছিলাম। কেমন করে ঝানব অমন সব্যনাশ হবে?

না, পানুর বাপ উকিল দেবে কোত্থেকে? সরকার উকিল দিইছিল, তা তিনি বলে, দশবার কবুল যাচ্চ তুমি মেরেচো, তাতেই উনি আচড়ে পড়েচে। তোমারে বাঁচাব কেমন করে বাচা?

মিচে বলব নি। তিনি বলিছিল, বোল, কুকুরাটকে ছুঁড়ে মাল্লাম, ওনার লেগে গেল।

মাথা চাপড়ে হো হো করে কেঁদে পানুর বাপ বলল, সে পত রেকেচে মাগী? থানা ঝেয়ে কবুল করেচে সগল কতা।

আমার ঝা হবার হল। শরিক এমন শত্তুর, দিদি গো! খুড়শউরে বলে, মেয়েছেলের শাস্তি হলে তো আমার কাজ্যি হবে নে। পানুর বাপরে জেলে পুরতি পারলি তবে ঝাল মিটত।

তোমরা বলচো, কোলের মেয়েটারে আনতেই পাত্তে। হেতা এসে বা কি হত? হেতা তো দেকচি, ছেলে নে সবিতার, মেয়ে নে মদিনার, কত খোয়ার, কত খোয়ার!

বলচো, সোয়ামি আসে নে কেন?

আগে আগে তো এয়েচে। একনে সোমসার, ছেলেমেয়ে, আর পারে নে বোদ করি। শুনিচি আমার মায়ের কাচে মেয়ে দুটোরে ফেলে দে এয়েচে।

—তোর মা খাওয়াতে পারবে?

—তাই পারে? মা ঝেতা ঝেতা করতু সেতা সেতা দেবী আর বাসুকে দিয়েচে খাওয়া-পরা কাজে। দুদের মেয়েরা গো! শওরে কেমন করে বা কাজ করচে...

সোশাল অফিসার দিদি বলেন, তোমার স্বামীর তো জমিজমা আছে শুনি। ভাতেরও অভাব নেই।

—চাল বলো, মুড়ি বলো, সব ঘরের।

মদিনা কাটছাঁট কথার মানুষ। সবাই বলে, জন্মকালে মা কি বিষ দিইছিল মুকে?

—দিলে তো ফিনিশ দিদি! ল্যাটা চুকে যেতু। আগুন খাইয়েছিল, আগুন! তাতেই আগুন ঢালি। আন্না ঝেমন ন্যাকাবোকা, বুজেও বোজেনে।

—কি বুঝব লা?

—তোর বর মেয়ে দুটোরে ঘাড় হতে লাইমে দিল কেন তা বুজিস না?

—কি বুজব?

—আবার বে' বসবে কি বসেচে।

—কি ঝানি, মা এলে শুদোব। আসতে তো সেই আসে।

আসে। সেপাইদের তুষ্ট করতে করতে জেল গেটে পৌঁছয়। মেয়েকে দেখে কাঁদে। শওর থে' গেরাম ভাল জেনে গেরামে বে' দে' তোরে আমি ভাস্যে দিইচি আন্না।

—আমার কপাল! তা, মেয়েদেররে আন না?

—তাদের মনিবরা ছাড়বে?

—ওদের বাপ বা এমন নিমায়া হল কেন?

—বলে পাল্যে বে দাও, নয় ভাস্যে দাও।

—খুনী মায়ের মেয়েদের বে' করবে কে?

—সে বে' বসেচে, নয় গো মা?

—ঝানি না মা। জামাই বলছিল, শরিকে শরিকে দা-দেইজি মিটে গেচে। তোর খুড়তো জায়েরা সাত বোন। তাদেরি একঝনারে বে' করচে ডেগো।

—সত্যি বলচ?

—কেমন করে ঝানচি সত্যি না মিথ্যে? কতায় কতা রটে, ঝানা কতা। ঝাক, খালাসের দিন তো দেরি নেই।

—খালাস! ভাবলে ভয় করে মা!

—শওর মন্দ বলে গেরামে বে' দিলাম। তা শওরে ভেন্‌তি আর মেন্‌তি নোকের বাড়ী কাজ করচে, ঝগড়া কেজে করচে, ছেলেপুলেও হচ্চে, জামাই ঝা হোক, ঘরেই থাকে।

—গ্যাঁজা খায় নে?

—খায়। রেকশা বের করে না রোজ। তবু তো...

—খালাস হয়ে ঝাব কোতা বলতে পারো?

—আর কোতা! আমার কাচেই ঝাবি, লোকে ক'দিন কতা কইবে, তা বাদে ভুলে ঝাবে। বসে তো খাবি নি মা! খাটবি, খাবি।

—আমার মেয়েরা ঝি খাটচে, আর তাদের বাপের সোমসারে চাল রে, মুড়ি রে, কত কি!

—কে বলে সে কতা?

—কেস কল্যে খোরপোশ পাব, দিদি বলেচে।

—কোতা উকিল? কারে ধরবি? গরিবের কে আচে? নে, ·রবেশ দুটো খা, জদ্দার কৌটো এনিচি।

মায়ের আন্না, পানু-দেবী-বাসন্তীর মা, ডেগোর বউ বড় মন গুমরে থাকে।

অফিসার দিদি বলে, অত মন খারাপ কেন গো?

—ভাবচি।

—কি ভাবছ?

—ঝাব কোতা!

—স্বামী কি আসছে না?

—সোয়ামিরা ক'দিন আসে দিদি?—সবিতা বলে। বলে, আসতে আসে মা!

আন্না ভাবে আর ভাবে। তার স্বামী তো আসত। এসে কান্নাকাটিও করত। খুন না করেও সাজাভোগী বউকে দেখতে না আসো, মেয়ে দুটো কি ভার বোঝা হয়েছিল?

দশ বছর হয়ে গেল। দেবীর বয়স তেরো হবে, বাসন্তীর দশ বছর। খাওয়াপরা কাজ করছে, ভাবলে রাগে রি রি করে শরীর। আমার মা বুড়ো হাড়েও ঝি খাটছে, তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে? পানুর কথা মা বলে না। তারও বয়স এখন হবে পনেরো।

কিন্তু খালাস পেয়ে যাব কোথা?

জেল হতে ভেবেছিল থাকব কেমন করে?

"খালাস" শুনলে এখন ভয় করছে।

মদিনা বলল, গতর আছে, খেটে খাবি। সোয়ামি জেল খেটে ঘুরে আসতে পারে। বউ জেল খেটে ঘুরে গেলে কোন সোয়ামি ডেকে নে' ঝায়?

—বউ তবে যায় কোথা, তাই বলো!

—ভেস্যে যায়।—বলে মদিনা আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল। বলল, নোকের বাড়ি খাটবি, তারা ঝানলেও তাইড়ে দেবে।

—তুই কোতা ঝাবি দিদি?

—টেনে চাপব, ঝেতা ঝায় সেতা ঝাব। ভিক্কে করে খাব, ভিক না জুটলে মরে যাব।

আন্না কি করে বলো। তার তো জানাচেনার পরিধি কোমোরপাড়ার বস্তি, তারপর ক্যানিং লাইনের ট্রেনে চেপে ক্যানিং, মাতলা পেরিয়ে শিমূলবেড়া ষষ্ঠীতলা। গরুর গাড়ি চেপে যেতে যেতে, যেতে যেতে...সে তো শেয়ালদা অথবা হাওড়াও দেখেনি। ঘরসংসার, গরুগোহাল, ছেলেমেয়ে, স্বামী, এই ছিল তার পৃথিবী।

মায়ের কাছেও তত আসে নি।

এখন মায়ের ঘাড়েই চাপবে, জেল খাটার কথা গোপন করে পরের দোরে খাটবে, নিজের একটা সংসার যার ছিল? ভাবে আর ভাবে আন্না।

খালাস যদি না হত?

ওই তো নেপালী মেয়ে কমলা। কে বলবে এমন নরম, চাপা মানুষ খুন করতে পারে। করেছিল তো। স্বামী আর সতীনকে কেটে এসেছে, কে বলবে।

কমলা নাকি অনে—ক বছর থাকবে।

তারপর কি করবে?

কমলা জবাব দেয় না, ভুরু কুঁচকে চুপ করে থাকে।

মদিনা বলে, একনে তো নিশ্চিন্দি। ঝবে বেরুবে তবে দেকা ঝাবে। তোর ভাবনা কি?

মীরা বলে, নয় লাইনে যাবে। গা-গতর থাকলে মেয়েছেলে লাইনে যায়।

আন্নার মন শিউরে ওঠে। খালাস মানে লাইন? গা-গতর বেচে খাওয়া?

রাগ হয়, রাগ হয় মনে। সবচেয়ে রাগ হয় পানুর বাপের ওপর। তোমাদের শরিকে-শরিকে ঝগড়া, তা হতেই তো লঙ্কাকাণ্ড বেদিছিল। একনে শুনছি যে খুড়শাশুড়িরে ঠ্যাঙা ছুঁড়ে আমি জেল খাটচি, তার বেটার শালীকে বে' করচ। মেয়ে দুটোরে ফেলে দে' গেচ। এ বয়সে নোকের বাড়ি খাটচে, খাচ্চে, ওদের কি হবে তা ভেবোচো?

আর আমি বা ঝাব কোতা? "খালাস" শুনলে ঝে গা শিউরে উটচে। আমারে কাজ বা দেবে কে ? "খুনে মেয়েছেলে" শুনলেই তাইড়ে দেবে।

এক ঝরঝর মুখর বাদল দিনে মুক্তি পায় প্রার্থনা নস্কর। সবিতা, মদিনা, কম্‌লা ভগ্‌বতী সহায়, এদের ছেড়ে যেতে ওর যে কষ্ট হবে,—ওরাও যে ভিজে চোখে চেয়ে থাকবে, আগে তো বোঝেনি ও।

সবাই বলে, ভাল থাকিস। দেখে যাস আমাদেরে।

—শওরে থাগলে...আসব।

মা বলে, চল ঝেয়ে বাসে উটি।

—কেন? পয়সা আচে আমার কাচে।

—হোতা পয়সাও দেয়?

—মুজুরি দেবে নে কাজ কল্যে?

—এই কাপড়...

—ওয়েলফ্যার দিদি দিয়েচে।

মায়ের ঘর ঘুপসিঝুপসি লাগে। পড়োশিনীদের কৌতূহল অসহ্য ঠেকে। বড়দি ঈর্ষাভরা গলায় বলে, চ্যায়রা ভাঙিনি তেমন...কে বলবে জেলে ছিলিস!

—মেজদি...এল নে মোটে?

—আন্না কাজ...ভাত রুটি করতে করতে...

আন্না সতৃষ্ণ চোখে চায়।

—মেয়েদেরে আনো নি মা?

—না বাচা! একঝনা গোলপাক্যে, আরঝনা রততলা...মনিব বা ছাড়বে কেন? আর আন্না! ওদেরেও বলিচি, মায়ের বেত্তান্ত বলিস না কারেও।

বড়দি বলে, বলার কতাও তো নয়। মা আমার তো জ্ঞাতঠাগমাকে মেরে ধরে কানা করে জেল খাটচে, ই কি বলার কতা? আমরাই বলে...

—ও!

আন্না চুপ করে যায়। বুকে যত বিঁধে যাক, কথা তো সত্যি।

মা বলে, ওদের সাতে ঘাপেঘোপে দেকা কইরে দোব।

—মেয়েদেরে নে আমি থাগতে পারি না?

—কোতা থাগবি? ঘর পাবি? কাজ পাবি? তুইও বুড়ো হোস নি, মেয়েরাও বচর-দু'বচরে স্যায়না হবে, কোতা হতে কি হয়ে যাবে...

বুঝেছে, আন্না বুঝেছে।

—বেটাছেলে জেলে যায়, ফেরে, ঘোরেফেরে, কাজ করে। মেয়েছেলে হলে তার...

—অ্যানেক দোষ!

—ঝা বুজিস। একনে চাট্টি খেয়ে নে' শুয়ে পড়। আমি বরঞ্চ খেটেখুটে এসে ভাত জলটা পাব। আর পাঞ্জাবী বউ এট্টা, সে বলচে, লোক দাও, দিল্লী নে যাব, পাঁচশো টাকা মাইনে দোব, কাপড়জামা...ও দেশে নোক পায়নে মোটে।

কোমোরপাড়া—শিমুলবেড়ে—আলিপুর প্রেসিডেন্সি—দিল্লী!

আন্না বলে, মেয়েদেরে না দেকে আমি নড়ব না।

—দেকাব। বললাম তো। মেয়েরা কষ্টে নি' তোর। ঝকঝকে ঘরদোর রে...টি.ভি. রে...সব্যদা ফ্যান ঘুচ্যে, গিন্নীরাও নানানিদি পোশাকে সাজ্যে রাকে, ভালই আচে। বে'থা হলে মনিবরা সাহায্য করবে বলেচে!

—কোতা বে' দেবে মা? শওরে না গেরামে? বে' কল্যে বা কি সুক হয়!

—সুকে তো ছিলে মা! যদি অমন কাজটা না কত্তে...সম্পক্যে তো শাউড়ি হয়। তারেই... মেয়েছেলেকে সুজেসামলে চলতে হয়, ঝানো না?

ভেন্‌তি বলে, ঝা হবার হয়ে গেচে। একনে ওরে একটু জিরোতে দাও। বুজলি আন্না! মা ঝা ঠিক করেচে, সেই ভাল।

—কি ভাল?

—পাঞ্জাবী বৌয়ের সঙ্গে দিল্লী গেলে পরে...

—হেতা কাজ জোটে নে?

—হেতা...নোকজানাজানি তো কম হইনি। দূরে গেলেই তো ভাল।

—কার ভাল?

—তোর...আমাদের...মায়ের...তোর মেয়েদের...

আন্না মাথা হেলায়। বুঝেছে, ও বুঝেছে। জেলে থাকতে ভেবেছিল, বেরোতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু পরের দিকে তো বুঝত, সে কত অবাঞ্ছিত। মায়ের মুরোদ নেই, স্বামী হাত ধুয়ে ফেলে দিয়েছে। মনে হত "খালাস" শব্দে ভয়।

এখন বুঝছে, ও খালাস হয় নি। জেলগারদে নেই বটে, কিন্তু মা, দিদি, মেজদি, মেয়েরা, সবার কাছে ও একটা অবাঞ্ছিত উপস্থিতি। এদের বা কি বলবে? এই আমার মেয়ে...জেলে ছিল...শাউড়িকে...এ কথা বললে কে মেনে নেবে?

মা বলল, বাড়িঅলাই বলছিল, তোমার খুনে মেয়ে থাকলে...—কোমোরপাড়ায়...তুমিই তো বলেচ, কত বেটাছেলে জেলে যাচ্চে, ফিরে আসচে...

ভেন্‌তি বলল, বাবা! সে আর বলতে? চুরিচামারি, পাত্তি চালান, মেয়েছেলে নে খুনোখুনি...কয়েকটা হয়ে গেল না? খুব বেড়েচে এ সব।

—তাদের বেলা দোষ নি?

মা বলে, সে কতা ভেবে লাভ? দিনে দুপুরে পাতা খেয়ে চোক পাকিয়ে ঘুরচে সব...শওর বলে কতা!

ভেন্‌তি বলে, দিয়েছিলে তো গেরামে! বরকে ঘড়ি, আন্নারে কানে-নাকে সোনা, থালাবাসুন, কি দাওনি?

—সেতাও জায়গা হল না। ঝা আন্না! বচর দুই কামিয়ে নে, টাকা জইমে মেয়েদেরে বে' দিতে পারনি। মা তোকে ফেলেনি, তুই তাদেরে ফেলতে পারবি?

—কে কাকে ধরে রাখে দিদি!

—নে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়। চুনোচাপটা দে' ঝাল করে এনিছিলাম, খাস। কি ঝোঁকানি বিষ্টি বল দিকি? আর ঘরে তো জল পড়বেই। বিরেম নেই।

আন্না আর মা খেতে বসে। মা বলে, নে' ভাত নে' আর দুটো।

—নোব। মা! দেবী আর বাসন্তীর ট্যাকা কি করো?

—আমি ঝানি না মা! ভেন্‌তি কাজ করে দিয়েচে, মাইনেপত্তর ওই তোলে। না কি খাতায় রাখচে, আমি ঝানি না।

—তা হলে পেটভাতায় আচে।

—ঝা পেরিচি, করিচি বাছা! একনে তুমি ঝেমন বোজো, করো। তবে ঘর ভাড়া অত সওজে মিলবে না।

—করব কি, বলতে পারো?

—ক্ষ্যামা দে আন্না। সবে তো বেরুলি। যা হয়েচে, তা হয়েচে। একনে নোকজানাজানি না হতে টাটকাটাটকি কোতাও কাজে ঢুকে গেলে...

মা চুপ করে। আন্না বোঝে, খুব বোঝে। আজ-কাল-পরশুর ব্যাপার নয়। যাকে বলে যাবজ্জীবনটা বাঁচবে কি করে। সেই কথা।

—হেতা হতে চলে গেলিই ভাল।

—ঝেতে বলিচি?

—না মা! থাগলে সবারি বেপদ...

—কি কপাল মা! বিয়োলাম ন'টা বাঁচল চাট্টে। তা ছেলে তো বাপের ধারা ধরেচে। কবেই বউ নে' কোতা শিবপুরে চলে গেচে...

—দাদারে আমার মনেই নেই।

—দেকলে তো মনে থাগত।

—আমার বে'র সম্মন্দ...

— সেই শত্তুরের শউর এনিছিল।

— নাও, ঘুমোও।

চোখ বুজলেও ঘুম আসে না আন্নার। জেলে গিয়ে সে যেন পৃথিবীর বাইরে চলে গেছে। সে থাকলে মায়ের অসুবিধে, দিদিদের অসুবিধে, দেবী-বাসন্তীর অসুবিধে।

সোয়ামি? সে যখন মেয়েদের ফেলে রেখে গেল, তখনি তো বুঝিয়ে দিল যে মেয়েদের মাকেও হাত ধুয়ে ফেলে দিল।

পরদিন মা যখন বলে, মেয়েদের রেখে গেছে অমুক সময়ে, আন্না বোবা হয়ে যায়।

—ঠিক বলচ?

—নয় তো কি মিছে বলচি?

তারপরে, তারপরে তো ডমরুধর এসেছিল।

অন্তত একবার।

বলেছিল, আসাযাওয়া বেস্তর খরচ! আর ছেলেমেয়ে রেখে আসি বা কি করে?

সময়টা, সেই সময়টা! মা যখন ক'মাস আসতে পারে নি। যখন অসুখ হয়েছিল মার। এসে বলেছিল, মেয়েদেরে চাইপে দিল ঘাড়ে।

মেয়েদের রাখতে এসেছিল বলে কি বা মনে করে দেখা করে গেল। একবারও বলল না যে মেয়েদের রেখে দিয়ে এলাম।

এ সব অনেকদিনই হয়ে বয়ে গেছে, কিন্তু আন্নার মনে এখন শ্মশানের ধোঁ। ভিজে কাঠে আগুন যত, ধোঁয়া তার চেয়ে বেশি।

কবে বর্ষা আসবে বলে পানুর মা কাঠ-কুটো-নারকেলের ডেগো-বাঁশপাতা মাচাতে গোছ করে রাখত।

জ্ঞাতিরা বলত, ডেগোর বউয়ের হাতেপায়ে লক্ষ্মী।

ঝড় উঠলে আগে রান্নাশালে উনোন নেভাত।

সাতপ্যাঁজা উলিধুলি কাপড়ে ঘনঘন ফোঁড় তুলে কাঁথা সেলাই করত।

কে করত?

সে আন্না নয়। অন্য মেয়ে।

এই খড় কাটছে, এই ছেলে সামলাচ্ছে, এই ধান ভাপাচ্ছে, এই গোয়াল কাড়ছে।

কত উপোস-মানত, কত ঘর গোছানো, সবাই বলত, শউরে মেয়ে এমন হয়?

কে করত সে সব?

আন্না দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বসে ভাবে।

মা বলে, গতিক তোর ভাল দেকি না আন্না, কি ভাবিস?

—এই, কপালের কতা।

—পশ্যু কাজের ঠেঙে কতা বলতে ঝাবি তো?

—ঝাব মা, ঝাব, বসে বসে খাব কেন?

—আমিও যে অক্ষ্যামতা মা! বাড়িউলি সমানে বলচে...

—আমায় বলে নে' কেন?

—ভয় পায়!

—ঝদি মেরে বসি?

—থাগ ও সব কতা। ঝ্যামন চোক পাকিয়ে বসে থাকো মা...

—তোমারও ভায় করে?

—থাগ ও সব কতা।

—বলো না মা?

—ভয় সবাই করে।

তাতেই এমন সদাসমীহ ভাব দিদি-মেজদি, পাড়া-পড়শির। টিউবওয়েলে জল আনতে গেলেও সরে যায় সবাই। যা ঘটেছিল, সেটা যে দুর্ঘটনা, তা মনে বিশ্বাস করে না কেউ।

ভয় পায় সবাই!

এখন আন্না নিশ্চিত বোঝে, সে এদের পৃথিবী থেকে বহিষ্কৃত। কেননা তাকে সবাই ভয় পায়। মায়ের আন্না, বা ডেগোর বউ বা পানুর মাকে ভয় পেত না কেউ। কিন্তু পুলিশের খাতায় প্রার্থনা নস্কর যে, তাকে সবাই ভয় পায়। সে জেলে ছিল, সে মেয়াদখাটা আসামী।

দেবী-বাসন্তীও ভয় পাবে।

—কি ভাবচিস? ঠোঁট নড়চে বা কেন?

—না, ভাবি নি কিচু। আমার ঝন্যি তোমার কত দুভ্যোগ, তাই ভাবচি, কত ভাবনা!

—ভাবিস নি মা! কাজে জইন্ হলি অন্য রকম লাগবে। আর দিল্লী গেলে...

—ঝা বলেচো। দেকি, ব্যাগটা দাও তো? এগবার বাজারটা ঘুরে আসি।

—ঝাবি?

—সাদ মিটিয়ে মাচ খাই এগদিন। তোমারে খাওয়ানোটা তো কত্তব্য কাজ!

—ম্যাদ-খাটা পয়সা তোর...

—থামো তো!

চুনোচাপটার চচ্চড়ি, ছোট পোনার ঝাল, স-ব রাঁধে আন্না। খেয়েদেয়ে নিদ্রা যায়। বিকেল না হতে চুল বাঁধে, কাপড় ছাড়ে।

স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক আচার-আচরণ। দিদিমেজদিকে ডেকে গল্প করে, গড়িয়ে গড়িয়ে হাসে, মা বাড়িউলিকে পরে বলেছিল, কেমন করে বুজব মা, ঝে মনে অন্য কিচু মৎলব সেঁটেচে? মেয়েদেরে দেকতে চাইল না। বলে, দেকে কি হবে? ম্যাদখাটা মায়ের মেয়েদের কাজে রাখবে কে?

এ সব প্রথমদিনের রূপকথা।

আর সেদিন ভরবিকেলেই সে লোক নিখোঁজ।

নেই, নেই, কোথাও নেই।

সেই যে নিখোঁজ হয়ে যায় আন্না, আর সে ফেরে না। মা বলে, খুঁজে বা কি হবে, বেঁচে থাগলে ফিরত। মায়ের কথাটি ফুরোয়।

শিমূলবেড়ার ডেগো, ওরফে ডমরুধর নস্করকে কে বা কাহারা গলায় কোপ দিয়ে চলে যায়। বাজারের লোকজন বলে, ডেগো একটা মেয়েছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে যাচ্ছিল বটে, কে জানবে কেন? এখন জানতে গেলেও তো বিপদ হয়।

গ্রামের লোকজন কিছুই বলতে পারে না। সন্ধ্যার পর চেঁচামেচি বা আর্তনাদ বা ভয়ার্ত চীৎকার শুনলে ছুটে বেরোবে কে?

ডেগোর কথাও ফুরোয়।

নতুন করে শুরু হয় প্রার্থনার কথা।

সে পায়রাডাঙ্গা বস্তিতে থাকে, ঘুঘুডাঙা বাজারে চাল বেচে।

অত্যন্ত সতর্ক সে, বেজায় মুখরা। কাউকে যেন বিশ্বাস করে না, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ। দেখেই বোঝা যায় সে নবাগত।

মাসে একদিন ও আলিপুরের জেলে কাদের যেন দেখতে যায়, কে জানে কে।

নাম জিগ্যেস করলে বলে, পরাথ্যনা সাঁপুই।

একা ওর কথাটি শুরু হচ্ছে।

উত্তরপুরুষ ।। রাজলক্ষ্মী দেবী

অরিত্রকে নিয়ে ভাবনা কেউ করে, অরিত্র তা চায় না। অরিত্র নিশ্চিন্ত ও নির্ভার থাকতে পছন্দ করে। পড়াশোনা, ও একটা ব্যাপারই নয়। চালিয়ে তো যাচ্ছে মোটামুটি। জামাকাপড়ে দোরস্ত। দিদানের কাছে আবদার করে ইদানীং একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড মোটরবাইক কিনে ফেলেছে এবং নিজেই নানান খুটখাট করে সেটাকে পথযোগ্য অর্থাৎ 'রোড-ওয়ার্দি' বানিয়েছে। ওটার চেহারারও ভোল ফিরিয়েছে, কে বুঝবে বাইকটা নতুন নয়?

অরিত্রর ঝকমকে আত্মবিশ্বাসী চেহারা। নিশ্চয় তার বাহনটিকেও একটা অন্যরকমের শোভা-আভা দিচ্ছে। আজকাল যখন-তখন হুশ করে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে ইচ্ছাসুখে।

দিদানই তার সব থেকে কাছের মানুষ। এক সময়ে দিদানকে আঁকড়ে ধরে ঘুমোত। কিন্তু একটু বড় হবার পরে একা বিছানায় শোয়াই পছন্দ করছে। ওর ঘুম হালকা, দিদান রাতে উঠে খুটখাট করলে, আলো জ্বালালে ঘুম ভেঙে যায়।

'না, তুমি অন্ধকারে হাঁটবে না। পড়েটড়ে যাবে। আমার বিছানা পড়ার ঘরেই নিয়ে নিচ্ছি।'

আজকাল একটা চাদরকে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে নিজেকে প্রায় বর্মাবৃত করে অরিত্র ঘুমোয়।

দিদান একা বিছানাতেও একাকিত্ব বোধ করে না। অরিত্র তাঁর সমগ্র অস্তিত্বই তো জুড়ে রয়েছে। যখন থেকে অরিত্রকে দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর ওপরে বর্তেছে, তখন থেকেই নির্মলা আবার ফিরে গিয়েছেন দ্বিতীয় যৌবনে, কর্মব্যস্ত মধ্যজীবনে। মধ্যজীবন তো ঘেরা ছিল নিজের দুই সন্তানকে কেন্দ্র করে—সুশোভন, শতরূপা। যত্ন নিয়েই বড়ো করেছিলেন তাদের। কর্তা চিরকাল বাইরের কাজকর্মে জড়িয়ে, ছেলেমেয়ের শরীরস্বাস্থ্য, লেখাপড়ার বরাবর তদারক করেছেন নির্মলাই। সুশোভন ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট করে বিদেশে পড়তে গেল, আর চাকরি নিয়ে সেখানেই থেকে গেল। বিয়ে-থা কিছুই করল না। শতরূপাও তো ভালো ছিল লেখাপড়ায়, ব্যাঙ্কের চাকরিতে টপাটপ উন্নতি করছিল। যে ছেলেকে পছন্দ করল, তার সাথে বিয়ে দিতে কর্তা একটু খুঁতখুঁত করেছিলেন। নির্মলাই তাঁকে বোঝালেন, জাতে-গোতে মিল নাই বা হল, নাই বা থাকল ছেলেপক্ষের বনেদিয়ানা, আসল মিল তো ওদের মনের মিল।

মনের মিল? কে ভেবেছিল কৌশিক আর শতরূপা দু'দিনেই নিজেদের মধ্যে একরাশ গরমিল খুঁজে পাবে? নির্মলা তো ভাবতেন ওরা সুখেই আছে। ছেলে অরিত্র পেটে এল, শতরূপা দিব্যি হাসিহাসি মুখে মায়ের যত্ন-আদর উপভোগ করছিল, আর কৌশিকের ব্যবহার তো ছিল আগের মতোই হৃদ্য। ভাবা যায়, দু'জনেই নাকি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, ছেলের ছয় মাস পূর্ণ হবার আগে বিচ্ছেদটা করে নেওয়াই ভাল! শিশু তো শিশুই যত কম বুঝতে পারবে, ততই সে থাকতে পারবে স্বাভাবিকতার ঘেরাটোপে। সম্প্রীতিপূর্ণ বোঝাপড়ার পরে অরিত্রর কাস্টডি পেল শতরূপাই। শতরূপা তো তার প্রাক্-বিবাহ স্বাধীন জীবন ছেড়ে

দিতে রাজি হয় নি বিয়ের পরেও। চাকরি, মিটিং, টুরে যাওয়া ছাড়াও বন্ধুবান্ধব নিয়ে উইক-এণ্ড।

'এতো ভালো চাকরি কেউ ছাড়ে?' এই কথা শতরূপার মুখে শোনার পরেও নির্মলা বিশ্বাস করতে পারেননি, আখেরে শতরূপা স্ত্রী, গৃহিণী এবং জননী হবার মধ্যেই নিজেকে পুরোপুরি ডুবিয়ে' দেবে না। কিন্তু শতরূপা অন্য ধারার মেয়ে, অন্য প্রজন্মেরও মেয়ে। বছরকয়েক বিয়ে করেনি আর, কিন্তু অরিত্রকে ধীরে ধীরে দিদানের কাছেই ঠেলে দিয়েছে। সারাদিন মা বাইরে, দিদানকেই তো বেশি সময় ধরে পেত অরিত্র। ও যে দিদানেরই হয়ে যাবে, তা তো শতরূপা মেনেই নিয়েছিল।

আজকাল অরিত্র মজা করে বলে,—'আমার কেমন দুটো বাবা, দুটো মা! গ্রেট্—কিন্তু 'বাবা' ডাকটা একজনকেই মানায় আর অন্য মাকেও আমি 'আন্টি' বলেই ডাকি।'

কৌশিক , তার স্ত্রী সীমা, অরিত্রকে ভালবাসে, প্রায়ই ডাকাডাকি করে। ওদের বাচ্চা মেয়েটা, নাম বুঝি রঞ্জিতা, অরিত্রকে দাদা' বলতে অজ্ঞান। মোটরবাইক হস্তগত হবার পর থেকে ওদের বাসায় যখন-তখন চলে যায় অরিত্র।

আগে এরকমটা ছিল না। কৌশিকের বিয়ের খবর পেয়ে গুম হয়ে গিয়েছিল শতরূপা। বিবাহবিচ্ছেদের সময়ে কৌশিকের মধ্যবিত্ততার প্রতি কৃপা করে কোনও দাবিই তার ওপর চাপায়নি শতরূপা। তাই কৌশিকও যেন অরিত্রর ওপর দাবী বসাতে পারত না। মাঝেমধ্যে ছেলেকে দেখতে আসত, কিন্তু নিজের বাড়িতে ছেলেকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়নি একবারও। বড় হবার প্রক্রিয়ার মাঝপথে অরিত্র স্থির করে নিল, বাবাকে বাদ দিয়ে তার অস্তিত্বটা ঠিক সুষম হতে পারছে না। তখন থেকেই যাওয়া-আসা শুরু। শতরূপা অসন্তুষ্ট হত, বলত না কিছু। তখন তার দ্বিতীয় প্রস্থ মন-বিনিময় শুরু হয়েছে, তাও আবার দিল্লীবাসী ডাক্তার কোঠারীর সঙ্গে। কোন বন্ধু মারফৎ চেনা। কোঠারী বিপত্নীক, সুপুরুষ, ব্যক্তিত্বগর্বী। নরম স্বভাবের কৌশিকের বিপরীত মেরু।

শতরূপা এখন দিল্লীতে ট্রান্সফার নিয়েছে। আগের মতোই চাকরি নিয়ে সদাব্যস্ত। তবে শতরূপার মতে,—'ডাক্তারদের তো ব্যস্ততার সময়-অসময় নেই। ও-ও কাজপাগল, আমিও তাই। আমার তো মনে হয়, এ-ই ভালো।'

সন্তান ওরা চায় না। কোঠারীর প্রথম পক্ষের বড় বড় ছেলেমেয়ে এখন কলেজে। আর শতরূপার অরিত্র তো দিদানের কাছে দুধেভাতেই আছে।

অরিত্রকে কোনোমতেই শাসন করতে চান না নির্মলা। কী-ই বা পেয়েছে ছেলেটা তার বাল্যজীবনের কাছ থেকে? বাবা-মাকে যুক্তভাবে ভোগ করতেই পারেনি আর পাঁচটা বালক-বালিকার মতো। কিন্তু অরিত্র এ কথা হেসে ওড়ায়—'আমি একা এরকম নাকি? আমার বন্ধুদের মধ্যেও আছে ডিভোর্সী বাবা-মা। হয় মায়ের কাছে থাকে, নয় বাবার কাছে, আর নয়তো কদিন এখানে কদিন ওখানে। আমার তো মনে হয়, ওরা আন্‌লাকি। ওদের তো দিদান নেই!'

নির্মলা আপ্রাণ চেষ্টা করেন যাতে অরিত্র অভাববোধে না ভোগে। চেষ্টাটা একটু অতিরিক্ত হয়ে যায় হয়তো, আর তাই স্বসম্পূর্ণতার দিকে পাল্লা ভারি হয়ে গিয়েছে অরিত্রর। সদাই সে আশাবাদী, অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী। জীবন যেন একটা সোনার খনি, হাত দিলেই মুঠি মুঠি সুযোগ-সুবিধা উঠিয়ে আনবে সে। মনে মনে 'বালাই ষাট' উচ্চারণ করে নির্মলা দৈবকে তোষণ করতে চান।

ক্লাস নাইনেই অরিত্র ঘোষণা করেছিল,—'বুক্‌-ওয়ার্ম হতে চাই না আমি। ফার্স্ট সেকেণ্ড

হয়ে কী লাভ আছে বলো? সবাই হিংসে করে, অথবা তুচ্ছ করবার অভিনয় করে। ওই মাঝামাঝি রেজাল্টই ভালো, আমার পপুলারিটি কমবে না।'

খেলায়, গানে, ব্রেক-ডান্স কম্পিটিশনে অরিত্র, অরিত্র, অরিত্র! চোখে পড়বার প্রচেষ্টাই অরিত্রর নীতি। আর চোখে পড়বার মতো চেহারাও আছে তার। সৌন্দর্য জন্মসূত্রে আসে। তাই কেউ ওকে ওর মুখশ্রীর প্রশংসা করলে অরিত্র হেসে বলে,—'এ তো আমার ভাগ্যে পাওয়া। আমার কী কৃতিত্ব আছে এতে?' অথচ নির্মলা জানেন, সৌন্দর্যকে শাণিত করবার জন্যে অরিত্র রীতিমত সচেতন। তার চুলের ছাঁট মুখের ভঙ্গিমা, সব কিছু আয়নায় বার বার দেখে সে একটা পছন্দসই চেহারা তৈরি করে নিতে চায়। এক প্রগাঢ় আত্মপ্রীতি, যাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'নার্সিসিজ্‌ম', আয়নাকে অরিত্রর অভিন্নহৃদয় সখা বানিয়ে রেখেছে। শতরূপা এতটা পছন্দ করেনি। একবার প্রশ্ন করেছিল, 'এই বয়সেই এত চেহারা বাগাবার চেষ্টা কেন রে? ফ্যাশন-মডেল হতে চাস্ নাকি?''

অরিত্রর তুড়ুক জবাব,—'ফ্যাশন-মডেল হতে পারলে তো বরাত খুলে যাবে! মডেলরা কী রকম রোজগার করে তা জানো?'

ভ্রূকুটি করেছিল শতরূপা। সে চায় ছেলে হবে কৃতী, নামজাদা। অথচ মামা সুশোভন বা বাবা কৌশিকের মতো লেখাপড়ায় দুর্ধর্ষ হবার পরিকল্পনা অরিত্র করে না। হ্যাঁ, মামা বিদেশে একটা জাঁদরেল পোস্ট নিয়ে বসে আছে, কিন্তু বাবা তো সেই মামুলি অধ্যাপক। এদেশে লেখাপড়ার কোন 'মার্কেট ভ্যালু' নেই। অরিত্র নিজেকে এবং অন্যদেরও বাজার-মূল্যে যাচাই না করে পারে না। ব্যাঙ্কে উচ্চপদস্থ মা অথবা ডাক্তারীতে সফল কোঠারী সাহেবের বাজারদর যে দাদু দিদান বা কৌশিকের থেকে বেশ খানিকটা ওপরে, তা মানতেই হয়। তবু কৌশিকের প্রতি এক বিচিত্র আকর্ষণ বোধ করে অরিত্র। এই একটিমাত্র জায়গায় সে 'মার্কেট ভ্যালু'র উপযোগ করে না। দাদু-দিদান তো এসব যাচাইয়ের বাইরে। তা ছাড়া বেঁচে থাকতে দাদু নেহাৎ হেঁজিপেজি ছিলেন না, রেখে গেছেন যথেষ্ট টাকাকড়ি, প্রকাণ্ড বাড়ি,—দিদান তো বেশ বড়লোক। আর অরিত্রর খরচ হিসেবে শতরূপাও মোটা অঙ্ক মাসে মাসে মাকে পাঠায়।

শতরূপাকে অরিত্র নিজের মতন করে ভালবাসে। দিল্লীতে বন্ধুবান্ধব নেই, ভীষণ 'বোর' লাগে, তবুও দিন দশেকের জন্যে গিয়ে মায়ের কাছে থেকে আসে প্রত্যেক ছুটিতেই। শতরূপা কাজ বানিয়ে 'টুরে' আসে কলকাতায়। খুবই কম সময় সে দিতে পারে ছেলেকে। তবু সেই সময়টুকু অরিত্র মায়ের কাছেকাছেই থাকে।

পরে দিদানকে বলে, 'মা কিন্তু ঠিক সুখী নয় দিদান। ছেলে অন্য এক জায়গায়, স্বামী (মানে ঐ ডাক্তার কোঠারী) বেশ নিরাসক্ত টাইপের। অথচ মায়ের প্রয়োজন ছিল গভীর ইমোশনাল সাপোর্ট-এর।'

নির্মলা হেসে ফেলেন—'খুব মনস্তত্ত্ব বুঝতে শিখেছিস্ তো!'

অরিত্র দমবার পাত্র নয়, 'জানি তুমি মান্‌বে না। মা-ও মান্‌বে না। তার কারণ, তুমি যে যুগের, সে যুগে ভুলকে কেউ সংশোধন করতেই জানত না। আর আমাদের যুগে? একটা ভুলকে রবার দিয়ে ঘষে ওড়ানোই ছিল যথেষ্ট। আমাদের তো ইলেক্‌ট্রনিক যুগ, আমরা ভুল বার বার করব তো বার বার ওড়াব।'

কৌশিক একজন স্ত্রীকে অন্তত সুখী করেছে। একটি সন্তানকে পূর্ণ পিতৃত্ব দিয়ে লালন করছে। মা কখনো এসব দিক্‌টা এমনভাবে করে নি তো। সুতরাং বাবার প্রতি ঝুঁকছে অরিত্র। ও-বাড়িতে তার আদর সকলের কাছে।

দিদানকে এসে বলে,—'জানো, রঞ্জুটা বলছিল তুমি কি সাহেব? তোমার রং অতো ফর্সা কেন? ঠোঁটে কি তুমি লিপস্টিক লাগাও? এসব শুনে আণ্টি তো হেসে কুটিপাটি!'

'হুঁ, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।'

'তার মানে? বুঝতে পারলাম না তো।'

'বুঝবি কী করে! এ হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা। তোমাদের মত সাহেবি ইস্কুলে পড়া বাঙালীরা বুঝতে পারবে না।'

ব্যাখ্যা করে মোটামুটি বুঝিয়ে দেন নির্মলা।

'সুন্দর মুখ হলেই হবে না দিদান,' অরিত্র নিবেদন করে, 'ফ্যাশনমডেল কি ফিল্মি হীরো হতে হলে সুন্দর শরীরও চাই। পুরুষ্ট 'মাস্‌ল',—বাইসেপ্স্‌, ট্রাইসেপ্স, বুকের ছাতির আয়তন।'

আরেকটু ভেবেচিন্তে যোগ করে—'এখন আমার আঠারো পেরিয়ে উনিশ চলছে, 'হাইট' তো মাত্র পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। অন্তত ছয় ফুট 'হাইট' চাই মডেল হবার জন্যে। তবে ফিল্মে অনেক বেঁটেখাটো হীরো-ও জমিয়ে নিয়েছে। রিশি কাপুরকে বাচ্চা বয়েসে একটা হীরোর পার্ট করিয়ে মহা গল্‌তি করেছিলেন রাজকাপুর। একটা 'বেবি' ইমেজ হয়ে গেল ওর। আমির খান কি সল্‌মন খান ওর থেকে খুব বেশি লম্বা হবে না, কিন্তু দারুণ 'ম্যাচো'।

'ফিল্মে ঢোকা বুঝি এতোই সহজ?'

'কে বসে আছে ফিল্মে ঢোকার আশায়। আজকাল কতোরকমের সুযোগ আছে না টিভি সিরিয়ালে, অন্য প্রোগ্রামে! চেহারা আর স্মার্টনেস থাকলে ভি. জে. হওয়াও যায়।' টেলিভিশন লাইনে কাকে কাকে ধরাকরা যেতে পারে, তারও মোটামুটি প্ল্যান ছকে ফেলেছে অরিত্র।

'আমাদেরই এক বন্ধু ঢুকেছে টিভিতে, ঐ ভি.জে. হয়ে। তার ল্যাজে ল্যাজে থাকছি। লেগেও যেতে পারে কিছু একটা।'

লাগে তুক, না লাগে তাক। জীবনের ধনুকে সর্বদাই দু'তিনটি তীর চড়িয়ে রেখেছে ঐটুকু ছেলে। টাকার অংক দিয়েই সে জীবনের শরসন্ধান করতে চায়। চোখ ধাঁধানো কোনও লাইনে সুবিধা না হলে সে হতে রাজি আছে বড় কোম্পানির বাজার-সরকার, এরোপ্লেনের পার্সার কিংবা মোটরবাইক কেনাবেচার কারবারী রূপ বা ট্যালেন্ট-এর মূলধন কাজে লাগল কি না লাগল, এ নিয়ে ভাবতে রাজি নয় সে। আসল উদ্দেশ্য রূপা, অর্থাৎ মোটা উপার্জন। মোটা টাকা হাতে না এসে জীবনকে উপভোগ করাই যাবে না যে।

'এতো টাকা টাকা করিস কেন? আবার পাশপোর্ট বানিয়ে বসে আছিস? তুইও কি হঠাৎ বিদেশে পাড়ি দিতে চাস্‌ নাকি?'

অরিত্র শুধু হাসে। নির্মলা শঙ্কিত হন—'তোর মায়ের চেনাজানা আছে, তোর বাবার ছাত্রেরাও আছে উঁচু পজিশনে, চেষ্টা করলে একটা ভাল চাকরি পেয়েই যাবি।'

'আগে গ্রাজুয়েশন, তার পরে আরেক পরীক্ষা। উত্‌রে গেলে দশটা থেকে পাঁচটা গাধার মতো বেকার খাটুনি। সব সময়ে বড় কর্তাদের মন জুগিয়ে চললে তবে তো হব পার্মানেন্ট, তবেই না পাব প্রমোশন! বলে দিচ্ছি দিদান, ও সব মালগাড়ি লাইনে আমি নেই। জীবন চলবে এরোপ্লেনের গতিতে—হুউশ!'

অরিত্রর জীবিকা সম্পর্কেই শুধু আশঙ্কা থাকে না, তার জীবনযাপন নিয়েও থাকে। বাড়িতে তো একটা আড্ডাখানা বানিয়েছে। তবু নির্মলা কিছু বলেন না। ভাবেন, অন্তত চোখের ওপরে তো রয়েছে।

যেসব ছেলেরা আসে, তাদের অনেককেই রীতিমতো 'মাস্তান' দেখাতে। কেউ কেউ সঙ্গে

নিয়ে আসে মেয়ে বান্ধবীদেরও। মেয়েগুলিকে সহন করাই যেন বেশি মুশকিলের ব্যাপার। মেয়েদের একটা দোষ—নাকি গুণ আছে। তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের মতন থাকতে পারে না। 'দিদা দিদা' বলে নির্মলার সঙ্গেও গল্প জমাতে চায়। ওদের সাথে যে কী কথা বলবেন, তা-ই ভেবে পান না নির্মলা। তাঁর রান্নাঘর ওলোট-পালোট করে মেয়েগুলি চা বানায় কফি বানায়। বিশৃঙ্খলার একশেষ। তবু এসবে বাধা দিয়ে অরিত্রর মনে দুঃখ দেবার কথা চিন্তাই করতে পারেন না নির্মলা।

দিদানের কাছে লুকোছাপা নেই অরিত্রর।

'না, আমি এখন কোন গার্লফ্রেণ্ড চাই না। আগে তো মোটা টাকা রোজগার করি। অবশ্য মোটরবাইক কেনার পর থেকে আমার 'মার্কেট ভ্যালু' আপ। অনেক ক্যাণ্ডিডেট কাছে ঘেঁষতে চায়, আমি ওদের সরিয়ে রাখি।'

অরিত্র আরও বলে, 'মেয়েগুলো হাম্‌লে পড়ে, জানো? দেখো না, সুকুমারেব ওই গার্লফ্রেণ্ড মাধবী, ওকে মোটেই সুকুমার বেছে নেয়নি। নিজেই বারবার চিঠি লিখে, ফোন করে সুকুমারকে ধরেছে। এখন অবিশ্যি সুকুমারও জমে গেছে। আর রবিনের ওই রীণা! ওর তো প্রথম 'চয়েস' ছিলাম আমি, অনেক 'হিন্ট' দিয়েছে। কিন্তু বড্ড ভোঁতা দেখতে তো। রবিনের সাথে আমিই ওকে ভিড়িয়ে দিয়েছি। রবিনটা যা চুপচাপ, ওর দ্বারা কাউকেই জোগাড় করা হত না।'

অরিত্র যেন সকলকেই জীবনের রহস্যভাণ্ডারের এক এক চাবি জোগাচ্ছে। ও নিজে কি জানে, কেমন করে ভালোবাসতে হয়, মেয়েদের মন জিনে নিতে হয়? সে এক সময় ছিল, দিদানকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে ছোট্ট অরিত্র বলত, 'তুমি তো আমার গার্লফ্রেণ্ড, আমার 'হানি', আমার 'সুইটহার্ট'। এ-সবই ওর দাদু শিখিয়ে দিতেন। আপাতগম্ভীর মানুষটির পেটে পেটে বেজায় দুষ্টুমি ছিল।

ওর 'হানি', 'সুইটহার্ট' এই বুড়ি দিদানকে কী করে আঙুলে নাচাতে হয় তা তো অরিত্র জানে। কিন্তু তাতে কি কাজ হবে? এই যুগের মেয়েদের ভাবনা কেমন? পছন্দ-অপছন্দ কেমন?

নির্মলা আগে থেকেই লক্ষ্য করেছেন মেয়েগুলোর বেহায়া ভাবসাব। সে বটে এক যুগ ছিল, যখন মেয়েরা থাকত লজ্জাভয়ের কবচকুণ্ডলে আবৃত আর ছেলেরা চেষ্টা করত সে-সব প্রতিরোধ ভেঙে কাছে আসবার। এখন অরিত্রকে দেখে দেখে মনে হয়, এ-যুগে ছেলেরাই করছে ঋষ্যশৃঙ্গের সাধনা। এই সাধনা 'মার্কেট ভ্যালু' বাড়াবার। এ-উচ্চাশা এ-স্বপ্নের কাছে মেয়েরা, মেয়েদের বাসনাকামনা কিছুই না। তবে মেয়ের মত মেয়ে যদি পাওয়া যায়, গার্লফ্রেণ্ড থাকাও মার্কেট-ভ্যালু বাড়ায় বই কি!

'তেমন মেয়েই বা কোথায়? ওই যারা আসে, মেশে, কাউকেই কি আমার যোগ্য বলে তোমার মনে হয় দিদান? গল্পগুজব, দল বেঁধে সিনেমায় কি কফিহাউসে যাওয়া—ও সব ঠিক আছে।'

তবু কিন্তু মেয়েরা আসে। ঝাঁক বেঁধে আসে। সেজেগুজে, এক দঙ্গল রঙিন প্রজাপতির মতন তারা আসে ছেলেগুলোর মন ভোলাতে। এ যে কী ধরনের পূর্বাতিপূর্বরাগ, ভেবে ভেবে নির্মলা কূলকিনারা পান না।

যতক্ষণ না অরিত্র একটা 'গার্লফ্রেণ্ড' জোগাড় করছে, ততক্ষণ দিদানই তার সাথী, তার মনের কথার দাবীদার। রাস্তায় দিদানকে কেমন সামলে হাঁটে। সন্তর্পণে হাত ধরে ট্যাক্‌সিতে বা বাসে চড়ায়।

রাজপুত্রের মত সুন্দর নাতিটার সঙ্গে বাইরে বেরুতে নির্মলার ভালই লাগে। একটু গর্বও হয়। তাঁরই তো রক্তমাংস। তাঁরই তো জীবনকেন্দ্র। আবার ভয়ও করে এই সুন্দর টগবগে ছেলেটাকে কেউ নজর দেবে না তো? কোন মন খারাপ এসে ছায়া ফেলবে না তো এর ওপরে? যদি এমন হয়, অরিত্র এক মনের মত মেয়ে খুঁজে পায় আর সেই মেয়ে তার দিকে ফিরেও তাকায় না?

'হয়েছিল তো এরকম। স্কুলেই ঊর্মির সাথে চোখে চোখে ভালো লাগা। তারপরে কলেজ। ক্লাস পালিয়ে আড্ডা দিতাম দুজনে। কিন্তু ভেতরে ভিতরে ঊর্মি যে এত পড়ুয়া, তা স্কুলে তো বুঝতে পারিনি। অথবা হয়তো মেডিকেল-এ ঢুকবার গোঁ ওর পেটে পেটে ছিল। হায়ার সেকেন্ডারীতে ও পেল ৯০% আর আমার য়্যাজ ইউজুয়াল, মোটামুটি। এর পরে দুজনেই কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেলাম।' অরিত্র হাসে। বলে, 'মেডিকেল তবুও হয়নি ঊর্মির। কম্প্যুটার-সায়েন্স নিয়ে পড়ছে। আমাদের কলেজেই। মনে হয়, আবারও ভাব জমাতে চায় আমার সাথে। কিন্তু না, নেভার। ওভার মীন্‌স্ ওভার।'

'দিদান, তোমাদের যুগে কি মেয়েরা ছেলেদের সাথে কথাবার্তা বলত?'

নির্মলা হেসে ফেলেন, 'আমাদের যুগ অতটা ব্যাকওয়ার্ড ছিল না ভাই। আমি তো কো-এডুকেশনেই পড়েছি তবে সে যুগে ছেলেরাই মেয়েদের দিকে এগোত, মেয়েরা এগোত না। আর ভালোলাগা ব্যাপারটা মনে মনেই থেকে যেত বেশির ভাগ। তোমাদের মত এমন ঘনিষ্ঠতা—।'

'এই দিদান, আমি কোন মেয়ের সাথে ঐ 'ঘনিষ্ঠ' না কী বলছ হইনি। হতেও চাই না এক্ষুণি। আগে তো বড় হই, কিছু একটা লাইন ধরি।' তারপরেই অরিত্র একটা চমকপ্রদ প্রশ্ন করে, 'দাদু কি তোমার বয়ফ্রেণ্ড ছিল বিয়ের আগে?'

'পাগল! আমাদের বিয়ে হয় সম্বন্ধ করে!'

'সম্বন্ধ মানে 'ম্যাচ-মেকিং'? অন্যেরা বাছবে, ছেলেমেয়ে তাই মেনে নেবে? দিদান, তুমি না কো-এডুকেশনে পড়েছিলে, একটা বয়ফ্রেণ্ড-ও জোগাড় করতে পার নি?'

নির্মলা চোখ পাকিয়ে বলেন, 'মারব টেনে এক থাপ্‌পড়!' কিন্তু মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপেন। হঠাৎ তাঁর মন ছল্‌কাতে শুরু করে। মনে পড়ে যায় এক বেচারাকে, তাঁরই ক্লাসে পড়ত। কয়েকবার ফেল করেছিল, তাই বয়সে নির্মলার থেকে কিছুটা বড়। হ্যাঁ, চেহারা ছিল বটে ছেলেটার। অতটা সুন্দর বলা যায় কি অরিত্রকে? দৈর্ঘ্যে তো অরিত্রর বাঞ্ছিত ছয় ফুটের কিছু বেশিই ছিল সেই ছেলের। প্রকাণ্ড বড়লোক-বাড়ির ছেলে। কিন্তু ভীষণ বোকা, সরল। কাছে আসবার প্রচেষ্টাতে যে ধারার সূক্ষ্মতা মেয়েদের মন টানে, তা জানত না সে। হাসি টিটকিরি ছাড়া কিছুই তাই দেওয়া যায়নি তাকে।

অন্য কোনো পুরুষ দিগন্তে আসার আগেই মাত্র আঠারো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

অরিত্র কিন্তু প্রসঙ্গের জের টেনে চলেছে, 'দিদান, তোমার কি মনে হয় না, সেযুগে তোমাদেরও বাছাই হত 'মার্কেট-ভ্যালু'র মানদণ্ডে। শুধু বাছবার কর্তা তোমরা নিজেরা ছিলে না, ছিলেন তোমাদের গার্জেনরা। আর বাবা-মায়েদের যুগে এসেছিল মার্কেট-ভ্যালু ভুলে গিয়ে প্রেম, হৃদয় ইত্যাদি ভ্যালু-র বাড়াবাড়ি।'

নির্মলা এখনও ঠিক হৃদয়ঙ্গম করেন নি, 'মার্কেট-ভ্যালু' বলতে অরিত্র কী বোঝাতে চায়! অরিত্রর ভাষাজগতে তাঁকে বারেবারেই নতুন প্রবেশপত্র নিতে হয়। 'ম্যাচো' মানে পুরুষালি। 'ফ্লিপ করা' মানে প্রেমে পড়া? না না, ফ্লিপ তো প্রেমের প্রথম পাতা মাত্র!

অরিত্র বলে,—'তোমরা জানতে, জীবনের পার্টনার বেছে নেওয়া একটা

ট্রানজ্যাক্শন—মানে যেমন হয় দুটো কোম্পানির মধ্যে। দেনাপাওনা, ডাউরি—এ সবের কথা বলছি না, ওগুলো তো অসভ্য ব্যাপার। বলছি ভালো কী, মন্দ কী, সাফল্যের আশা কত পার্সেন্টি, কী ছাড়তে হবে কী হাতে রাখতে হবে, এসব তোমাদের সময়েও চিন্তা করা হত? মা-বাবাদের যুগে ছিল, না ভেবেচিন্তে প্রাণ যা বলে, তাই মেনে নেওয়া? তাতে কি খুব একটা সুবিধে হত? বাবা কিন্তু সীমা আন্টিকে অনেক বেছে বেছে বার করেছে, আর মা-ও কোঠারী আঙ্কল-এর সঙ্গে ঠিক হাবুডুবু প্রেমে পড়েনি। রেজাল্ট্ স্যাটিস্ফ্যাক্টরি!'

'আবার দেখ, তোমরা সে-যুগের মেয়েরা ভালো চাকরি বেছেছিলে—'

'চাকরি? আমি আবার চাকরি করলাম কবে?'

'কেন? গিন্নিপনার চাকরি, যার লাইফ অর্থাৎ এক্সটেন্সন মামুলি চাকরির থেকে অনেক বেশি। কেমন গুছিয়ে রয়ে সয়ে এই চাকরি করলে, কারও কোন সমস্যা হল না।'

'তোর বৌকে কি গিন্নিপনার চাকরি করাবি? সে মানবে?'

'আমরা নতুন জেনারেশন দিদান। প্রথমতঃ, এ-যুগে সংসার বলতে নানান রকম গ্যাজেট, যা ছেলেমেয়ে দুজনের হাতেই চালু থাকে। শ্রমও কমিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ আমি তো বাঁধা চাকরিতে যাবই না, ওতে লাইফ এন্‌জয় করা যায় না। তাই দিনের খানিক সময়ের জন্য গিন্নিপনা টেক-ওভার করতে পারব। আমার বৌকেও এইভাবেই জীবনকে গোছাতে হবে। আগে থেকেই করে নেব বোঝাপড়া।'

'বোঝাপড়াই আসল? মনের টান চাই না?'

'এই দেখ, তুমি মা-বাবাদের জেনারেশনের মত কথা বলছ! তোমরা যে স্বর্গীয় টান-ভালবাসার স্বপ্ন দেখতে, মা-রা তো হাতে হাতে তা পেয়েছিল, খুব একটা তফাত হল কি?'

'যাক গে, তোর সাথে বকতে পারিনে। এখন কবে তুই রোজগেরে হবি, কবে ভাবী নাতবৌ এসে তোর সাথে বোঝাপড়া শুরু করবে, এই আশায় বসে আছি।'

'দিদান তুমি অপেক্ষা করতে থাকো। তোমাদের মনগুলি অপেক্ষায় ভরা, নানা প্রশ্নে কণ্টকিত। আমরা সব প্রশ্নের উত্তর আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে নিই।'

তাই কি অরিত্রকে দিদান বলেন 'উত্তরপুরুষ'?

পূর্বপুরুষের ছবি ।। নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়

বিষ্টুকাকার সাদার্ন এভিনিউ-এর তেরোতলার ফ্ল্যাটে চা তৈরী করছিলুম। দর্জিপাড়ার তিনমহলা গোলকধাঁধার মত বাড়িতে—অন্ধকার প্রকাণ্ড রান্নাঘর থেকে সিমেন্ট খোবলানো উঠোন পেরিয়ে তিনতলায় যে চা আসতো—তাতে গুচ্ছের মিষ্টি দেওয়া আর আধ-ঠাণ্ডা। বিষ্টুকাকা নিজের ফ্ল্যাটে এসে চায়ের সাজসরঞ্জাম পাল্টে দিয়েছেন।

চা ঢালতে না ঢালতে বিথোফেনের এলিসের জন্য রচিত কম্পোজিশনের প্রথম কলিটি কলিং বেল্-এ ধ্বনিত হল। রাধানাথ দরজা খুলে দিলো। ঢুকলো হ্যারি অ্যাণ্ড ড্যাশ কোম্পানীর হরিদাস। ঠাকুর্দার আমলের খাজাঞ্চি কালিদাস মাইতির ছেলে হরিদাস। দর্জিপাড়ার সিঁড়ির ঘর আর মামার বাড়িতে মিলিয়ে বড়ো হয়েছে। প্রি-ইউ পড়তে পড়তেই ব্যবসায় নেমে পড়েছে। হরিদাস বাঙালী কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। লক্ষ্মীর সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাতিয়েছে।

মাঝে অনেকদিন হরিদাস আসেনি। লোহালক্কড় ভাঙা গাড়িটাড়ি নিয়ে হরিদাসের ব্যবসা শুরু হয়েছিল—তারপর ঠিকেদারি। মাঝে মাঝে দর্জিপাড়ায় আসে জেঠিমার পায়ের ধুলো নিতে।

বিষ্টুকাকা বলেন—হরি, তোর ব্যবসা চলছে কেমন?

—আজ্ঞে ঐ একরকম আপনাদের আশীর্ব্বাদে। কোন রকমে চেষ্টা-চরিত্তির করে একখানা সেকেন্-হ্যাণ্ড ফিয়েট কিনিচি।

বিষ্টুকাকা তখন কোম্পানীর গাড়ি চড়তেন। তাঁর খাজাঞ্চির ছেলে এই পঁচিশ বছর বয়সেই নিজের গাড়ি করে ফেললো। হ্যাঁ, প্রশংসার কথাই বটে!

গলায় নিশ্বাস আটকে বললেন—কথায় বলে পুরুষস্য ভাগ্যং!

বিনয়ে মাখামাখি চকচকে মুখ হরিদাসের হাসিতে উদ্ভাসিত। বিষ্টুকাকার মতো পুরুষের ভাগ্যে মার্কন্‌টাইল ফার্মের চাকরির জন্য ও লজ্জিত।

বিষ্টুকাকা এখন দক্ষিণ কলকাতায় ফ্ল্যাট সাজিয়েছেন। দর্জিপাড়ার চারতলার গুদোমঘর থেকে অ্যান্টিক পেটমোটা চীনে-ভাস্, কাজকরা রুপোর ফর্সী আর টি-সার্ভিস বার করে এনে হারানো শৈশবের গন্ধ শুঁকছেন।

হ্যারি অ্যাণ্ড ড্যাশ কোম্পানীর হরিদাস ফুরফুরে পাঞ্জাবিতে উডস্ অব উইনসরের গন্ধ ছড়িয়ে এসেছে।

বিষ্টুকাকা বললেন—বসো হরিদাস। অনেকদিন পরে এলে, সেই এয়েছিলে বছর আষ্টেক আগে, ঝাড়লণ্ঠনের খোঁজে। পেয়েছিলে কিনা জানাওনি। আমাদের গুনো তো জানই—পাঁচভূতে লুটে খেয়েচে, আমরা কেরানীগিরি করে মরচি!

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম—সেই ঝাড়লণ্ঠনের, কাটগ্লাসের ছেঁড়া ঝুরিগুলো নিয়ে কত খেলা করেছি—মনে আছে বিষ্টুকাকা? জীবনে টাঙাতে আর পারলুম না।

হরিদাস আগে বিষ্টুকাকার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতো। যখন সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ফিয়েট কিনে এসেছিল—তখনও দাঁড়াত। আজ হৃষ্টচিত্তে বড়োলোকের কায়দায় সোফায় হেলান দিয়ে বসলো।

বলল—পেইছি। রাসেল স্ট্রীট থেকে কিনিচি।

—তা টাঙালে কোথায়?

—সেও কিনিচি; গ্রে স্ট্রীটের রাজা মণীন্দ্র চৌধুরীর বাড়িখানা প্রোমোটাররা নিয়েচে পেছোনের আধখানা। বাকিটা আমি নিয়ে নিলুম। পঙ্কের কাজকরা থাম; ভাঙা লাল-নীল কাঁচবসানো দালান—মস্ত উটুন, পেল্লায় সিঁড়ি, খড়িখড়িওলা শার্সিওলা জাঁন্নাদর্জা—অমনি রেকে দিইচি। ঘরের মাতার আর্চগুনো সবুজে আর লাল কাঁচ দিয়ে সারিয়ে নিইচি। সেকেলে ল্যাজারাসের ফার্নিচার জোগাড় করে সাজিইচি সব। একদিন নিয়ে যাবো আপনাদের। যাবে তো তুমি?

আমি অবাক হয়ে ঘাড় নাড়লুম।

বিষ্টুকাকা বললেন—কাঁচবসানো দালানই হলো আসল মোজেক করা—বুয়েচো? তাছাড়া বাঘের মুখ, মার্বেলের টেবিল, বেলোয়ারী আয়না, ঢাল-তরোয়াল, বন্দুকটন্দুক এসব করেচো তো?

—সে সব আপনাদের কৃপায় করে ফেলিচি।

—প্লাস্টিকের বাঘ-মুখ নয় তো?

—রাম রাম! প্লাস্টিকে কি বনিদিয়ানা আচে?

বিষ্টুকাকা আমার দিকে চেয়ে বললেন—অনেকটা তোর মতো। তুই যেমন তোর মলিদিদির কাচ থেকে সোসাইটিতে ওটার তালিম নিস, তেমনি আর কি?

এবারে তাহলে একটা রোলস্-টোলস্ কিনে ফেলো হরিদাস!—বলেই সামনের ক্যাবিনেটে চোখ দিলেন—যেখানে পূর্বপুরুষের রোলস্-এর বনেট থেকে পড়ে থাকা পরীটা সাজিয়েছেন।—আমার বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠলো। হরিদাস কোথায় উঠে গেল!

—রোলস্ না। তবে এখন একখানা কনটেসা-ক্লাসিক রেকিচি—নিজে ব্যবহার করি; আর একখানা ভিনটেজ বেনট্‌লে কিনিচি বালিগঞ্জের কানারিয়াদের কাচ থেকে। সেখানা রংচং করে গাড়িবারান্দার নিচে রেকেচি; কেউ ধরতে পারবে না রোলস্ কিনা।

বলে হরিদাস আত্মপ্রসাদের খোলা হাসি হাসলো।—ধরতে পারবেই। দুটো লালরঙের 'আর' লেখা থাকে পুরোনো রোলসরয়েসে।

বিষ্টুকাকা মাথা নাড়লেন। তা বেশ! ভালোই করেচো। তাহলে বাকি কি রইল?

—বাকি? একটা পূর্বপুরুষেব ছবি! হ্যাঁ ছোড়দা ঐ ঐকটা জিনিস হলেই হয়। ওটাই আপনার কাচে চাইতে এলুম। দর্জিপাড়ার চারতলার ঘরে যদি কিচু পড়েটড়ে থাকে! তা বড়ো বৌদি বললেন—কি আচেটাচে দ্যাকো—তারপর বিষ্টুকে বলো। ওসবে হাত দিলে বিষ্টু বড়ো রাগ করে আজকাল।

আমি গুদোমঘরে গিয়ে দেকি একখানা 'শান্তনু ও গঙ্গা'—কাঁচভাঙ্গা হয়ে রয়েচে। আর একখানা ছবির মাতার পাগড়ি ঝেপ্‌সে গ্যাচে, কোমরের তলোয়ারখানা উইয়ে খেয়েচে। খালি ছ'ঞ্চি ফ্রেমের কাজগুলো ইদিক-উদিক থেকে ঝরে গ্যাচে। কার ছবি বুজলুম না।

—অর্থাৎ কতখানি ভূতপূর্ব তা বোঝা যাচ্ছে না!

—নাঃ ছোড়দা, আমার বড় শখ বনিদি হবার। সব হলেও পূর্বপুরুষ পাওয়া যাচ্ছে না।

—হুঁ। তা তোমার বাবা মা ঠাকুর্দার ছবিতে পাগড়ি এঁটে একখানা আঁকিয়ে নাও না কাউকে দিয়ে?

—আজ্ঞে সেকি আর বাদ রেকিচি? তা আর্টিস্ট বললে একটা স্যাম্পেল দিতে; ঝাপসা হলেও হবে। আসল বনিদি পূর্বপুরুষের ছবি সে দ্যাকেনি বলেই দেখতে চাইচে। একখানা ছবি এঁকেছিলো যাস্সেতাই হয়েচে! গয়নাগুলোর হীরেপান্নার রংই আনতে পারেনি। ঠিক যাত্রাদলের রাজার মতো। সাতচল্লিশের পর কোলকাতায় এয়েচে কিনা; তিনশো বচরের বনিদি কোলকেতায় পূর্বপুরুষেরা কেমন ছিল বুঝতে পারচে না। তা আমি ভাবচি কি—ওখানা যদি বেচে দ্যান তো কিনি!

আমি চমকিত হয়ে বলি—আর্টিস্টদের বরং আইডিয়াটা বিক্রী করে দাও। ছবিখানা একবার দেখিয়ে দাও। তারপর এই ছকে ক্রমাগত পূর্বপুরুষের ছবি আঁকতে আঁকতে তারাও বিখ্যাত হবার সুযোগ পাবে; যারাই অ্যারিস্টোক্র্যাট হতে চাইবে—তারা কিনবে।

হরিদাস শান্ত ঠাণ্ডা হাসি দিয়ে বলল—না—তা হবে না; এ ছবি অরিজিন্যালই থাকবে। সবাই বনিদি হলে জনগণ কারা হবে বল তো? আর্টিস্টকে এ আইডিয়া আমি দোবোই না!

বিষ্টুকাকা সামনের দেয়ালের কনটেম্পোরী ছবিখানার দিকে তাকিয়ে উদাসীনভাবে প্রশ্ন করলেন—বাগানবাড়িটাড়ি করেচো তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের পাণিহাটির-খানা তো আমিই নিইচি বেনামীতে। গৃহপ্রবেশের দিনে ক্লাসিকাল গানের জলসা দিইচি। বড়দা আর বড়বৌদিকেও বলেছিলুম। ওঁয়ারা কেউ যেতে পারেনি।

বুকের ভেতরের হাড়গুলো পর্যন্ত ক্ষোভে টনটনিয়ে উঠল। লোকটার টাকা হয়েছে বলে কি স্পর্ধা!

বিষ্টুকাকারও যেন গলা শুকিয়ে গেছে। বললেন—তাই নাকি? তাহলে রক্তটক্তও তো পাল্টাতে হয়!

—না না, রক্ত ভেতরে থাকে—কেউ দেখতে পাবে না।

নিজের গোলাপী হাতখানা চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন বিষ্টুকাকা; চিবুকে হাত বুলিয়ে বললেন—তা ঠিক। আজকাল নীল রক্ত কোনো গ্রুপে ফেলা যায় না। সব ভেজালে ভরে গ্যাচে।

আমরা মন ভারী করে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। বিষ্টুকাকা নৈঃশব্দ্য ভেঙে বললেন—পূর্বপুরুষের ছবিটা হলেই তোমার বনিদি ছাপটা সম্পূর্ণ হবে? অ্যারিস্টোক্রেসীটা তাহলে কিনেই ফেলবে স্থির করেচো?—বিষ্টুকাকার কণ্ঠস্বরে যেন একটা আর্তনাদ। একটা হতাশা।

—আজ্ঞে তা যা বলেন! কেনা ছাড়া আর উপায় কি?

ছোটবেলায় একতলার দালানে হরিদাসকে কাঁচের গেলাসে চা খেতে দেখতুম। আজ বোন্-চায়নার কাপে সোনালী দার্জিলিং চা ঢেলে দিলুম কাজ-করা রুপোর টি-সার্ভিস থেকে।

—ক' চামচ?

—চামচ? ওঃ না, ব্লাড-সুগার এখন সপ্তমে!

আঁৎকে উঠল হরিদাস।

—যাঃ, হরিদাস, ওটাও কিনে ফেলেচো?

—আজ্ঞে, এসব কিনতে তো পয়সা লাগে না। কিন্তু পূর্ব্বোপুরুষের ছবিখানা কিনতে যা লাগবে—তাই দেবো।

—ভালো দাম পেলে দিয়ে দাও না বিষ্টুকাকা! কার ছবি—ক'পুরুষ আগেকার তা তুমি

নিজেও জানো না। এই ভাঙাচোরা জিনিসগুলো রেখেই বা কি করবে? গুদোম খালি করার দায়টা জ্যাঠামশাই তোমার উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন তো। বড় বড় অয়েলপেনটিংগুলোর একখানাও নেই, সব উইয়ে খেয়েছে। মা কিছু কিছু শিশি-বোতলওলাকে বিক্রী করেছেন! ছবির ফ্রেমের কারুকার্য খসে যাচ্ছে; যাকে তুমি চেনো না—নিজের ফ্ল্যাটেও খাতির করে সাজাওনি; ভূতের বোঝা বয়ে কি হবে?—যুক্তিপূর্ণ কথা বলে আমি বিষ্টুকাকার অনুমোদন পাবার চেষ্টা করি।

—তবেই বলুন। উদ্‌গ্রীব হয়ে বলল হরিদাস। বলেন তো টাকাটা আমি ক্যাশই দোবো।

—ক্যাশ! টাকা? মানে কালো টাকা?—বিষ্টুকাকার কথায় ব্যঙ্গ।

হরিদাসের মোলায়েম হাসি—আজ্ঞে ছোড়দা, ফর্সা টাকায় কি হবে? ফর্সা টাকায় বনিদিয়ানাই ফর্সা হয়ে যায়!

পূর্বপুরুষের ছবির ঘুণ এতোক্ষণে বিষ্টুকাকার হৃদয়ে সংক্রামিত হয়েছে। রুপোর ফর্সীর নল হাতে তুলে নিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন আলতো করে। সোফায় কাত হয়ে পরাজিত রাজ্যচ্যুত রাজার মতো ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—না, কিছুতেই না! ঐ পূর্বপুরুষের ভূতটা যদি একেবারেই চলে যায়—তাহলে আর কিস্‌সু থাকে না রে! ঐ ভূতটাই যে আমাদের সম্বল।

করমণ্ডলে হিরা ।। মীরা বালসুব্রমনিয়ন

হঠাৎ খবর এল যে, মেজকা ও পুল্লা রেড্ডিকে ওঁদের অফিসের কাজে মাদ্রাজ যেতে হবে। মেজকা বললেন, "রেড্ডি, ওই সঙ্গে দু'চারদিন ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে নিই না কেন? কাজ সেরে একটু ঘোরা যাবে। মাদ্রাজের আশপাশটা মোটে দেখাই হয়নি আমার।"

রেড্ডি বললেন, "উত্তম প্রস্তাব। রণ্টুও চলুক আমাদের সঙ্গে।"

"রণ্টু!" মেজকা বললেন, "রণ্টু কী করে যাবে, ওর কলেজ আছে না? আর আমরা যখন মাদ্রাজে ব্যস্ত থাকব, তখন ও কী করবে?"

আমি প্রতিবাদের সুরে বললাম, "কেন মাদ্রাজ শহরে কি দেখার কিছু নেই নাকি? আর দু'চারদিন কলেজ কামাই হলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।"

তিনজনের মধ্যে আমি আর পুল্লা রেড্ডি একদিকে। অর্থাৎ মেজরিটি। অতএব মেজরিটির ভোটে ঠিক হল, মেজকাদের সঙ্গে আমিও যাব। মেজকা করমণ্ডল এক্স্প্রেসের টিকেট কিনে নিয়ে এলেন। এ. সি. স্লিপারের।

যাবার দিনে স্টেশনে এসে রিজার্ভেশান চার্টখানা পড়ে আবিষ্কার করা গেল যে, আমাদের খোপটার চতুর্থ যাত্রী হচ্ছেন জনৈক এ. চৌধুরী। "ইনি আবার কোন মূর্তিমান হবেন কে জানে," বললেন মেজকা, "লম্বা জার্নিতে নাক-উঁচু সহযাত্রী হলেই চিত্তির।"

"ভাবছ কেন," আমি বললাম, "আমরাই তো রয়েছি গল্প করার জন্য।"

গাড়ি ছাড়ার তিন-চার মিনিট আগে ছুটতে ছুটতে উঠে এলেন মিঃ চৌধুরী। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা। সঙ্গে একজন কনেস্টবল ওঁর অ্যাটাচি আর ব্রিফকেস নিয়ে এল।

পুল্লা রেড্ডি এতক্ষণ কাগজ পড়ছিলেন। এবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরে মিঃ চৌধুরী, আপনি?"

মিঃ চৌধুরী ওঁর বার্থে অ্যাটাচি ব্রিফকেস এসব গুছিয়ে রাখছিলেন। রেড্ডি কথা শুনে ওঁর দিকে ঘুরে বললেন, "মিঃ রেড্ডি! হোয়াট এ সারপ্রাইজ! মাদ্রাজ যাচ্ছেন তো?"

"হ্যাঁ, আপনি?"

"আমিও তাই। অন্তত আশা করছি।"

রেড্ডি মেজকাকে বললেন, "বোস তোমার প্রবলেম সল্ভড্। ইনি আর্য চৌধুরী, পুলিশ অফিসার, আবার ফাইন জেন্টলম্যান। আমার সঙ্গে আলাপ বেশ কিছুদিনের। ভালভাবেই আড্ডা দিয়ে যাওয়া যাবে। মিঃ চৌধুরী, বোস আমার কলিগ। আর এ হচ্ছে রণ্টু, বোসের ভাইপো।"

চৌধুরী বললেন, "অর্থাৎ আপনাদের ট্রিনিটি, তাই না?"

মেজকা বললেন, "আমাদের কথা পুলিশ ডিপার্টমেণ্টেও ছড়িয়েছে তা হলে! মিঃ চৌধুরী, যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি..."

"বেশ তো।"

"একটু আগে রেড্ডি প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে, আপনিও মাদ্রাজ যাবেন, অন্তত আশা করছেন। কথাটার অর্থ ঠিক্ বুঝতে পারলাম না। যদি মাদ্রাজ যাবেন বলে টিকিট কেটে থাকেন, এবং মাদ্রাজ যায় এমন ট্রেনে চড়েন, তবে নেহাত অ্যাক্সিডেণ্ট না হলে মাদ্রাজ পৌঁছবেন, সে-রকমই তো কথা। এর মধ্যে আশা করার কথা আসে কেন?"

রেড্ডি চমৎকৃত হয়ে বললেন, "বাঃ বোস, তুমি তো জেরার কায়দাকানুন বেশ রপ্ত করে ফেলেছ!"

মিঃ চৌধুরী বললেন, "তবে পয়েণ্টটা উনি ভালই তুলেছেন। আসলে আই অ্যাম অন ডিউটি। যদি দরকার হয়, মাঝপথেও নেমে যেতে হতে পারে।'

"আমিও সে-রকমই একটা কিছু আন্দাজ করেছিলাম," বললেন রেড্ডি। "আপনার অ্যাসাইনমেণ্ট কি একান্তই গোপনীয়?"

"আপনাদের বলতে অসুবিধা নেই," বলে গলাটা নামিয়ে আনলেন আর্য চৌধুরী, "আমাদের পাশের খোপটা দেখেছেন তো? ওটাতে চারটে বার্থেই লেডিজ। ওঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মিসেস ললিতা লাখোটিয়া। নামকরা শিল্পপতি ধনীরাম লাখোটিয়ার স্ত্রী। উনি মাদ্রাজ যাচ্ছেন কোনও নিকট-আত্মীয়ের বিয়েতে যোগ দিতে। সঙ্গে অন্যান্য গয়নাগাঁটি ছাড়াও রয়েছে একখানা বহুমূল্য হিরের নেকলেস। আজ সকালে মিঃ লাখোটিয়া ফোন করে জানালেন যে এই নেকলেসখানা নাকি এর আগেও কয়েকবার চুরির চেষ্টা হয়েছে। ওঁর সন্দেহ, একটা কুখ্যাত গ্যাং এই চুরির চেষ্টার পেছনে আছে। মিঃ লাখোটিয়ার ধারণা ট্রেন জার্নিতে ওটা চুরির চেষ্টা হতে পারে। ওটা পাহারা দেবার জন্যই আমার আসা।"

"মিসেস লাখোটিয়া প্লেনে গেলেন না কেন? তা হলে তো এসব ঝামেলা হত না?" প্রশ্ন করলেন রেড্ডি।

"গত বছর দিল্লি থেকে যে প্লেনখানাকে লাহোরে হাইজ্যাক করেছিল টেররিস্টরা, উনি সেই প্লেনে ছিলেন। সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পর ঠিক করেছেন, জীবনে আর প্লেনে চড়বেন না।"

"কিছু মনে করবেন না," মেজকা প্রশ্ন করলেন, "আপনি যে ইউনিফর্ম পরে যাচ্ছেন, তাতে তো সবাই জেনে যাবে যে, আপনি পুলিশ অফিসার।"

"যাক না। বরঞ্চ জেনে গিয়ে যদি চোরেরা নেকলেসের দিকে হাত না বাড়ায়, তা হলেই তো আমার কাজ হাসিল। এই উদ্দেশ্যই তো ওঁদের পাশের খোপে সিট নিয়েছি। এছাড়াও বলে রেখেছি মিসেস লাখোটিয়াকে কিছুক্ষণ পরপর আমায় এসে জানিয়ে যেতে যে, নেকলেস যথাস্থানে আছে।"

এর পর হিরের নেকলেসের প্রসঙ্গ বন্ধ করে আমরা অন্য গল্পগুজব শুরু করলাম। আর্য চৌধুরী কিছুদিন সি. আই. ডি.তে ছিলেন, কয়েকটা ইন্টারেস্টিং কেসের বিবরণ শোনালেন উনি। এরই মধ্যে একবার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলেন গোলগাল চেহারার মিসেস লাখোটিয়া। জানিয়ে গেলেন, সব ঠিক আছে। অর্থাৎ নেকলেস যথাস্থানে। বলার সময়ে নিজের হ্যান্ডব্যাগ যে ভাবে তুলে ধরলেন উনি, তাতে আমার মনে হল নেকলেসখানা ওটাতেই আছে।

সন্ধেটা ভালভাবেই কাটল। রাত্তিরের খাওয়া একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিলাম আমরা। শুয়ে পড়লাম তারপর।

মিঃ চৌধুরী নিজের বার্থে উঠে বললেন, "শুলাম বটে, কিন্তু ঘুমোনো চলবে না।"

মেজকা বললেন, "ট্রেনের দুলুনিতে আমার কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘুম আসে।"

রেড্ডি বললেন, "একটা কথা খেয়াল হল মিঃ চৌধুরী। এই ট্রেনগুলোতে তো করিডর

দিয়ে অনায়াসে এক কামরা থেকে অন্য কামরায় চলে যাওয়া যায়। ভগবান না করুন, কোনও চুরি-ছিনতাই হলে চোর ধরা মুশকিল হবে আপনার।''

''কথাটা আমিও ভেবেছি। তাই কণ্ডাক্টর গার্ডকে বলে ব্যবস্থা করেছি যে, রাত সাড়ে দশটার পর এই কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়ার দরজাগুলো বন্ধ থাকবে।''

''ভালই করেছেন।''

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ির গতিও বেড়ে চলেছে। তবে গাড়ির দুলুনিটা বেশ আরামপ্রদ। তারপর গা জুড়োনো ঠাণ্ডা। আরামে চোখ আপনা থেকেই বুজে আসে। ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগে মনে হল, মিঃ আর্য চৌধুরী যাই বলুন, জেগে থাকা ওঁর পক্ষে সহজ হবে না।

মিঃ চৌধুরী ঘুমিয়ে ছিলেন কি না জানি না, তবে আমি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা ঠিক। ঘুম ভাঙল হঠাৎ বিরাট একটা চেঁচামেচিতে। চোখ কচলে চেয়ে দেখি, চারদিকে আলো জ্বলছে। পুল্লা রেড্ডি ও মেজকা দাঁড়িয়ে। পাশের খোপে আর্য চৌধুরীর গলা শোনা যাচ্ছে, আর শোনা যাচ্ছে নারীকণ্ঠে উত্তেজিত কথাবার্তা। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি, আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে।

মেজকাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''মেজকা, অত চেঁচামেচি কিসের?''

''মিসেস লাখোটিয়ার হিরের নেকলেস চুরি গেছে।''

''চুরি গেছে? কখন?''

রেড্ডি বললেন, ''পাশের খোপ থেকে চৌধুরী না-ফেরা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।''

মেজকা বললেন, ''চলো না, রেড্ডি, গিয়ে দেখি, ব্যাপারখানা কী।''

''মন্দ বলোনি কথাটা। চৌধুরী বন্ধুস্থানীয়, ওঁকে মদত দেওয়া দরকার।''

মিসেস লাখোটিয়ার খোপের সামনে বেশ বড় জটলা। ভিড় সরিয়ে আমরা ঢুকলাম। পর্দা সরাতেই একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। রেড্ডির দিকে চেয়ে দেখি, উনিও নাকটা কুঁচকে রেখেছেন। আমি ওঁর কানে ফিসফিস করে বললাম, ''রেড্ডিকাকু, একটা গন্ধ পাচ্ছেন?''

''হ্যাঁ। ঘুমের ওষুধ ছড়িয়েছে কেউ। তবে অল্প। দেখি মিঃ চৌধুরী কী বলেন।''

মিঃ চৌধুরীর অবস্থা দেখলাম কাহিল। মিসেস লাখোটিয়া ও তাঁর তিন সহযাত্রিণী চেপে ধরেছেন ওঁকে। চারজনই একসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন। মিঃ চৌধুরীর গলা সেই গোলমালে শোনাই যাচ্ছে না। মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আসা কনেস্টবলটি একেবারে বোকার মত তাকিয়ে আছে।

মিঃ রেড্ডি এগিয়ে এসে বললেন, ''মিঃ চৌধুরী, চুরিটা কীভাবে, কখন হল?''

জবাবে চার ভদ্রমহিলা একসঙ্গে কলকলিয়ে উঠলেন। কিন্তু তা মিনিট খানেকের জন্য। রেড্ডি হাতজোড় করে ওঁদের বললেন, ''আপনারা দয়া করে একটু থামবেন কি? প্রশ্নটা আমি মিঃ চৌধুরীকে করেছি।''

হাতজোড় করলেও রেড্ডির হাবভাবে একটা নো-ননসেন্স ভাব ছিল নিশ্চয়ই, যাতে চার ভদ্রমহিলাই একসঙ্গে চুপ করে গেলেন। ফাঁক পেয়ে চৌধুরী বলে উঠলেন, ''থ্যাংকস্ মিঃ রেড্ডি। এসে অবধি এঁদের চেঁচামেচিতে ব্যাপারখানা বুঝতেই পারছি না।''

''মিসেস লাখোটিয়াকে বলতে দিন না। নেকলেসখানা তো ওঁরই।''

''গুড আইডিয়া। তবে এঁদের জেরা করার কাজটা আপনিই করুন না কেন?''

রেড্ডি কিছু বলার আগেই মিসেস লাখোটিয়া উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, ''মিঃ চৌধুরী,

আপনি আপানার ডিউটি করছেন না। নেকলেসটাকে তো বাঁচাতে পারলেনই না, এখন তদন্ত করার ব্যাপারেও গড়িমসি করছেন।''

মিঃ চৌধুরী কটমট করে মিসেস লাখোটিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আপনারা চারজনে যদি তখন থেকে কোরাস গাইতে শুরু না করতেন, তা হলে এতক্ষণে তদন্ত অনেকদূর এগিয়ে যেত। আর মিঃ রেড্ডির রেপুটেশন আপনি জানেন না, তা না হলে বুঝতেন যে, তিনি এবং ওঁর বন্ধুরা যে এখানে উপস্থিত আছেন সেটা আপনার সৌভাগ্য।''

মিসেস লাখোটিয়া মিইয়ে গেলেন কথাটা শুনে। একটা ঢোঁক গিলে বললেন, ''উ...উনি কি ডিটেকটিভ?''

রেড্ডি বলে উঠলেন, ''না, না, সেসব কিছু নয়। এই দু'চারটে প্রশ্ন করব আর কি। তদন্তটা আসলে মিঃ চৌধুরীই করবেন। কিন্তু প্রশ্ন করার আগে আপনার সহযাত্রিণীদের পরিচয়টা জানতে পারলে ভাল হত।''

জানা গেল, দুজন হচ্ছেন মিসেস পারুল চক্রবর্তী ও তাঁর মেয়ে পলি। পারুল চক্রবর্তী কলকাতার এক নামকরা কলেজের প্রোফেসরের স্ত্রী। পলিকে ভারতনাট্যম শেখার জন্য কলাক্ষেত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করাতে মাদ্রাজ নিয়ে যাচ্ছেন। চতুর্থজন হলেন মিস্ লীনা লাকড়াওলা। উনি একটা বড় মার্কেন্টাইল ফার্মের পাবলিক রিলেশন অফিসার, ছুটিতে মাদ্রাজ যাচ্ছেন।

রেড্ডির প্রশ্নে জানা গেল যে অন্য গয়না একটা অ্যাটাচিতে থাকলেও হিরের হারখানা নিজের হ্যান্ডব্যাগেই রেখেছিলেন মিসেস লাখোটিয়া। ভুবনেশ্বরে যখন গাড়ি থেমেছিল, তখনও উঠে হ্যান্ডব্যাগ দেখেছেন, নেকলেস যথাস্থানেই ছিল। ভোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে যথারীতি হ্যান্ডব্যাগ খুলে দেখেন, নেকলেস উধাও। রেড্ডি বললেন, ''ভুবনেশ্বরের পর এখনও পর্যন্ত যখন গাড়ি থামেনি এবং দুই বগি থেকে অন্য বগিতে যাওয়ার রাস্তা যখন বন্ধ, তখন নেকলেসখানা এখানেই আছে।''

''কিন্তু কোথায়?''

''সেটা বার করতে হবে। এই বগির সবাইকে সার্চ করতে হবে। মালপত্রও। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় দেখছি না। কিন্তু মিঃ চৌধুরী মেয়েদের সার্চ করার ব্যাপারটা—''

দেখা গেল, এ-ব্যাপারটাও আগেই ভেবে রেখেছেন মিঃ চৌধুরী। বললেন, ''একজন মেয়ে পুলিশ সাদা পোশাকে থ্রি-টিয়ার কামরায় আছে। আর পুরুষদের জন্য আমার এই কনেস্টবলই যথেষ্ট।''

রেড্ডি খোপ থেকে বার হয়ে অপেক্ষমান যাত্রীদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, ''আশা করি সার্চের ব্যাপারে আপনারাও কোনও আপত্তি করবেন না। ''

সবাই তখন নেকলেস-চুরির মত রোমাঞ্চকর ঘটনার পরিণতি দেখার জন্য উদ্গ্রীব। আপত্তি-টাপত্তি কেউ করলেন না।

চৌধুরী গিয়ে সেই মেয়ে-পুলিশটিকে ডেকে নিয়ে এলেন। অবশ্য যাবার আগে সবাইকে বলে গেলেন, যার যার জায়গায় বসে থাকতে।

সার্চ শুরু হল। প্রত্যেকের মালপত্র গা সব আঁতি-পাঁতি করে খোঁজা হল। কিন্তু নেকলেস পাওয়া গেল না।

চৌধুরী এসে চিন্তিত মুখে বললেন, ''কী করি বলুন তো। কোথায় যে উবে গেল নেকলেসটা।''

''এই বগি ছেড়ে চোর পালিয়ে যায়নি তো?''

"ইমপসিব্‌ল্‌। রাত সাড়ে দশটার পর দু'দিকের দরজা লক্‌ করিয়ে চাবি নিজের কাছে রেখিছি। এই যে..."

"তা হলে তো নেকলেসখানা এই বগিতেই থাকার কথা। আচ্ছা, মিসেস লাখোটিয়ার সহযাত্রিণীদের আপনার কেমন মনে হয়?"

"মিসেস ও মিস চক্রবর্তীর মালপত্র ঘেঁটে দেখেছি, কলাক্ষেত্র ইউনিভার্সিটির চিঠিও ওঁদের সঙ্গে আছে। ওঁরা জেনুইন। তা ছাড়া শিক্ষা-জগতে প্রোফেসর চক্রবর্তীর যথেষ্ট সুনাম আছে। ওরকম একটা ফ্যামিলির কেউ নেকলেস চুরি করবে এটা বিশ্বাস হয় না।"

"আর মিস লাকড়াওলা?"

"উনি অবশ্য একটা বড় ফার্মের নাম করেছেন, কিন্তু উনি যে ওখানকার অফিসার তার কোনও প্রমাণ বা কাগজপত্র ওঁর সঙ্গে নেই।"

মেজকা বলে উঠলেন, "ছুটিতে গেলে কেউ কি অফিসের কাগজপত্র নিয়ে বেরোয়?"

"তা অবশ্য ঠিক। তার ওপর ওঁর মালপত্রেও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।"

রেড্ডি বললেন, "মিঃ চৌধুরী আমায় একটু ভাবতে দিন।"

চোখ বুজে চিন্তা করতে লাগলেন রেড্ডি। কয়েক মিনিট পর বললেন, "চলুন, মিসেস লাখোটিয়ার সঙ্গে আর একটু কথা বলে নিই।"

ওঁদের খোপে গিয়ে দেখি মিসেস লাখোটিয়া ওঁর বার্থের একধারে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছেন। সেই বার্থের অন্য ধারে বসে মিসেস ও মিস চক্রবর্তী নিচু গলায় কী সব আলোচনা করছিলেন।

মিস লাকড়াওলা নিজের সুটকেস গোছাচ্ছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, "দেখুন আপনাদের সার্চ-পার্টি জামাকাপড়ের কী হাল করেছে। মাদ্রাজে পৌঁছেই ইস্ত্রি করাতে হবে সব কিছু।"

চৌধুরী বললেন, "সরি।"

মিস লাকড়াওলা সুটকেস বন্ধ করে নিচে নামিয়ে রাখলেন।

দেখলাম রেড্ডি একদৃষ্টে মিস লীনা লাকড়াওলার সুটকেসের দিকে চেয়ে আছেন। ব্যাপার কী রে বাবা, উনি কি সন্দেহ করছেন যে, মিস লীনার সুটকেস ভাল করে খোঁজা হয়নি?

না, দেখলাম যে একটু পরেই রেড্ডি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। লক্ষ্য করলাম এবার উনি চেয়ে আছেন মিসেস লাখোটিয়ার সুটকেসের দিকে। রেড্ডির সঙ্গে সঙ্গে আমিও মিসেস লাখোটিয়ার সুটকেসের দিকে ভাল করে তাকালাম। আর তখনই ব্যাপারটা নজরে এল।

মিসেস লাখোটিয়া ও মিস লাকড়াওলার সুটকেস দুটো দেখতে হুবহু এক। একই কোম্পানির তৈরি, একই রঙ, এমনকী সুটকেসে নিজের নিজের নামের আদ্যক্ষর (এল.এল.) দুটিও এক।

কয়েক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে রেড্ডি বললেন, "মিঃ চৌধুরী, এই সুটকেস সার্চ করা হয়েছে?"

"ওটা কেন সার্চ করতে যাব? ওটা তো মিসেস লাখোটিয়ার সুটকেস।"

"তা হোক, ওটাও সার্চ করাতে হবে। খোলান ওটা।"

মেজকা বলে উঠলেন, "রেড্ডি, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? যাঁর গয়না চুরি গেল, তাঁর সুটকেসই সার্চ করতে বলছ?"

মিঃ চৌধুরী কিন্তু রেড্ডির কথামতো খুলে ফেললেন সুটকেসটা।

সুটকেস খোলা হতেই তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন রেড্ডি। দু'চারখানা শাড়ি সরাতেই ঝলমলিয়ে উঠল হিরের নেকলেসটা। সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম, "আরে, নেকলেস তা হলে চুরি যায়নি!"

মিসেস লাখোটিয়া দেখলাম বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন নেকলেসটার দিকে।

চৌধুরী রাগে প্রায় ফেটে পড়েন আর কি। মিসেস লাখোটিয়াকে বললেন, "নেকলেস নিজের সুটকেসে রেখে সবাইকে বাঁদরনাচ নাচাচ্ছেন? ভেবেছেন কী? পয়সা আছে বলে যা খুশি তাই করবেন?"

মিসেস লাখোটিয়া কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, "কিন্তু আমি তো নেকলেস সুটকেসে রাখিনি!"

"তবে কি ওটা হ্যান্ডব্যাগ থেকে উড়ে এসে সুটকেসে ঢুকে গেছে?"

"উত্তেজিত হবেন না মিঃ চৌধুরী। ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকমই" বললেন রেড্ডি। তারপর হঠাৎ ঘুরে বললেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন মিস লাকড়াওলা?"

দেখলাম মিস লাকড়াওলার মুখের রং ছাইয়ের মতো হয়ে গেছে। আমতা-আমতা করে বললেন, "এই একটু বাথরুমে যাচ্ছিলাম আর কি।"

"বেশ তো, যান মেয়ে-কনেস্টবলটি সঙ্গে যাবে'খন। কিন্তু হাতের ব্যাগখানা দিয়ে যান।" বলে ছোঁ মেরে মিস লাকড়াওলার হাত থেকে কেড়ে নিলেন ব্যাগটা।

"ও কী করছেন আপনি?" জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস লাকড়াওলা। কিন্তু ততক্ষণে রেড্ডি সিটের ওপর ব্যাগটা উপুড় করে ফেলেছেন।

ব্যাগ থেকে বার হল একাগোছা দশ টাকার ও খানকয়েক পাঁচ টাকার নোট। এ ছাড়া ট্রেনের টিকেট, পাউডার-কমপ্যাক্ট, লিপস্টিক, ছোট চিরুনি। এ-সবের সঙ্গে বার হল দুটো চাবির রিং। তার মধ্যে একটাতে শুধু দুটো চাবি। দেখেই বোঝা যায় ওগুলো চাবিওলা দিয়ে তৈরি করা চাবি। রেড্ডি সেই চাবি দুটো চৌধুরীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "দেখুন তো, এই চাবি দিয়ে মিসেস লাখোটিয়ার সুটকেস খোলে কি না।"

ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল যে, আমরা কেউই 'কী, কেন' এসব প্রশ্ন তুলছিলাম না। মিঃ চৌধুরীও তাই বিনা বাক্যব্যয়ে মিসেস লাখোটিয়ার সুটকেস লক করলেন ও তারপর রেড্ডির দেওয়া চাবি দিয়ে চট করে খুলে ফেললেন সুটকেসটা।

তা দেখে রেড্ডি হেসে বললেন, "মিঃ চৌধুরী, আপনি যে গ্যাং-এর কথা বলছিলেন, তাদের একজন প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত আছেন। মিস লীনা লাকড়াওলা। যদিও মনে হচ্ছে ওটা ওঁর আসল নাম নয়।"

মিস লাকড়াওলা একবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "কী যা তা বলছেন আপনি। আপনার নামে মানহানির কেস আনব।"

"স্বচ্ছন্দে। কিন্তু কোর্টে বলবেন নিশ্চয়ই যে, মিসেস লাখোটিয়ার সুটকেস খোলে এমন চাবি আপনার হ্যান্ডব্যাগে কী করে এল? আর ওই রিংটার অন্য চাবিটায় যে মিসেস লাখোটিয়ার গয়নার অ্যাটাচিটা খুলবে না, এটাও কি আপনি হলফ করে বলতে পারেন?'

মিস লাকড়াওলা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন।

চৌধুরী এবার এগিয়ে এসে বললেন, 'ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট!"

মিসেস ও মিস চক্রবর্তী এতক্ষণে চিত্রার্পিতের মত সব কিছু দেখে যাচ্ছিলেন। এবার এগিয়ে এসে বললেন, "মিঃ রেড্ডি, ব্যাপারটা কী হল বুঝতেই পারলাম না।"

"বলছি। মিঃ চৌধুরীর কথাই ঠিক। একটা গ্যাং এর পেছনে আছে। ওরাই হয়তো মিসেস লাখোটিয়ার কাজের লোকদের কাউকে টাকা দিয়ে বশ করে ফেলেছিল, এবং ওঁর সুটকেসের চাবির ডুপ্লিকেট তৈরি করিয়েছিল। তারপর ওঁর স্যুটকেসের মত হুবহু আরেকটা সুটকেস জোগাড় করেছিল।"

মিসেস লাখোটিয়া বললেন, "বুঝেছি। আমার নতুন আয়া। মাত্র তিন মাস হল রেখেছি।"

"ওদের প্ল্যানটি ছিল চমৎকার। নেকলেসটা কোনওক্রমে সরিয়ে মিসেস লাখোটিয়ারই সুটকেসে রেখে দেওয়া, যা সার্চ করার কথা কেউ ভাববে না। পরে মাদ্রাজে নামার সময় কোনওভাবে সুটকেস পালটে নেওয়া।"

চৌধুরী বললেন, "প্ল্যান চমৎকার ছিল ঠিকই, কিন্তু ভেস্তে গেল। ওরা তো জানত না যে, এই ট্রেনেই মিঃ পুল্লা রেড্ডি অ্যাণ্ড কোং যাচ্ছেন!"

মিসেস লাখোটিয়া এগিয়ে এসে বললেন, "সত্যি মিঃ রেড্ডি, আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব..."

মেজকা বললেন, "ধন্যবাদের বদলে, আমি বলি কি ম্যাডাম, এই বগির সবার জন্য চা জলখাবারের বন্দোবস্ত করুন। এত বেলা হল, সবার গলাই শুকিয়ে কাঠ।"

মিসেস লাখোটিয়া বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ডাকুন না, ডাইনিং কারের বেয়ারাকে।"

বেজোড় ॥ গৌরী আইয়ুব

আসানসোলের চিঠিখানা বালিশের তলায় রেখে চশমা খুললেন সতী। চশমাটি খাপে বন্ধ করে রেখে কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন হাই তুলে ঃ সারাটা জীবন বোঝা বয়ে বয়েই কাটলো, কখনো নিজের কখনো পরের কিন্তু আর কত পারা যায়—এখন বয়সও তো হয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের না আছে কাণ্ডজ্ঞান, না বিবেচনা। অপ্রসন্ন মুখে তাকিয়ে থাকেন গরাদের ডোরাকাটা চারকোণা ফ্যাকাশে আকাশটুকুর দিকে, রোজকার মতো ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে না আর আজ।

এই ছ-সাত মাস ছেলেদের আপিসের আর কলেজের ভাত নামিয়ে দিতে যত কষ্টই হোক বুড়ো হাড়ে তাকে কষ্ট বলে মনে করেন নি, নীলিমাকেও দোষ দেন নি। মায়ের অসুখের বাড়াবাড়ি শুনে গেছে সেই মাঘের শেষে আর এখন ভাদ্র। মা মারা যাওয়ার পরও এই পাঁচ মাস ধরে নিজের ঘর-সংসার ফেলে বাপের দেখাশোনার নাম করে পড়ে আছে ওখানে। তার জন্যও অভিযোগ করেন নি! বাপের সচ্ছল সংসারের সুখ মেয়েকে আটকে রেখেছে তা কি আর উনি বোঝেন না? কোনো কোনো শনিবার ছেলে চলে যায় আসানসোল, ফেরে সোমবার সকালে। বার-কয় সুভাষকে বলেছেন বটে সতী,

'তোর বৌদির আক্কেলটা একবার দেখ,—মা আর কার চিরকাল বেঁচে থাকে? তাই বলে নিজের ঘর ফেলে রেখে বাপের সংসার আগলানো এমন তো কখনও শুনি নি।'

দাদার যদি আপত্তি না হয় তো তোমার কিসের মাথা ব্যথা? আর বেশ তো আছ নির্ঝঞ্ঝাট—বৌদি ফিরলেই তো অষ্টপ্রহর আবার খিটিমিটি শুরু হবে।'

'ও—আমি বুঝি অষ্টপ্রহর খিটিমিটি করি!'

'তুমি কর কি বৌদি করে তার আমি কী জানি?—আমি তো দেখি দুজনে মিলেই কর আর বার বার নালিশ শুনতে পাই, 'দেখো তো ঠাকুরপো—দেখ্ তো সুভাষ'এই আর কি?'

অবশ্য নীলিমার এবার বাপের বাড়ি থাকাটা আরেক দিক থেকেও ভালোই হয়েছে। বাপেরও দেখাশোনা করল মেয়ে, মেয়েরও এই বিশেষ সময়ে ভালোরকম আরাম যত্ন লাভ হল। প্রথম বারের মত ঝক্কি সব তো একাই পুইয়েছেন সতী—বেয়ান চিররুগ্না, সেখানে কী ভরসায় পাঠাবেন? এবারও আসল ধকলটা ওঁর ওপর দিয়েই যাবে অবশ্য। সেটাই গতর দিয়ে খরচ দিয়ে সামলাতে তাঁর আর সময়ের শ্বাস উঠবে। তার ওপর কোন্ আক্কেলে এই সময়ে বাপকে নিয়ে আসছে নীলিমা? যাক গে, সতী রাগ করে কি করবেন, রাগ করবেনই বা কোন্ অধিকারে? তিনি নীলিমার আশ্রিতা বই তো নয়। নিশ্চয়ই সময়ের সঙ্গে আগেই তলায় তলায় সব পরামর্শ হয়ে গেছে, এখন শেষমেষ চিঠি লিখে শাশুড়ি বুড়িকে ছুঁয়ে রাখা আর কী! মন সতীর অপ্রসন্ন হবে না কেন?

বাপ নাকি এবার এখন থেকেই আয়া রেখে দিয়েছেন, খুকির জন্যও কোনো ভাবনা থাকবে না তাঁর, যে ক'দিন নীলিমা হাসপাতালে থাকবে আয়াই নাকি দেখাশোনা করতে

পারবে মেয়ের। তারপরও দু'জনকেই আয়া সামলাতে পারবে—এক্‌স্‌পার্ট আয়া! পারবে আবার না? ঐ যে বুড়ো হার্টের রুগী এনে তুলছে সতীর মাথায় তাঁকেও বোধ হয় আয়াই দেখবে! আর এই তিনটে মাত্র ঘরে কোথায় থাকবে ওরা নিজেরা, কোথায় ওর বাপ, কোথায় দেওর আর শাশুড়ি! তার ওপর আবার থাকবে চব্বিশ ঘণ্টার আয়া! সতী আর ঘুমুতে পারেন না দুর্ভাবনায়। সুভাষের টেবিলে টাইমপীসে সাড়ে তিনটা। অবশ্য ঘড়িটা কোনদিন আধঘণ্টা, কোনদিন বা চল্লিশ মিনিট ফাস্ট থাকে। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেয়ে, পাখাটা আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে আর একবার শুলেন সতী। কী পচা গরম বাবা—আজ নিশ্চয়ই ঢল নামবে সন্ধে থেকে—ছেলে দুটো তার আগে ফিরলে হয়। দুটোরই সমান বারমুখো স্বভাব। নীলিমা কতদিন তাঁর সামনেই খোঁটা দিয়েছে তবু সময়ের অভাব যায় নি। এখন তো মায়ের রাজত্বে দুজনেরই পোয়া বারো—অর্ধেক দিন বিকেলে চায়ের পাট নেই সতীর, সোজাসুজি রাত্তিরের রান্না চাপিয়ে দেন।

আজ শুক্কুর, ওরা আসবে বুধবারে। সব ঠিকঠাক আগে থেকেই—এখন শুধু দোষ কাটাতে শাশুড়ির মত চাওয়া! 'আপনার যদি বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ হয় মা, তাহলে অবশ্যই জানাবেন—বাবাকে নিয়ে আসব না। বাবা নিজে মোটেই যেতে চাইছেন না, আমি সাধাসাধি করে নিয়ে যাচ্ছি—বাবা এখানে একা থাকলে আমার ভাবনার শেষ থাকবে না এখন। তাই নিয়ে যেতে চাই। মা, আপনি অবশ্যই আপনার মতামত জানাবেন।'

আমার মতামত! বেশ তো তোমাদের মনোমত কথা দুছত্তর লিখে দেব। তোমাদের সংসার...আমিই হলাম গিয়ে বোঝা। আমার আবার মত নেওয়া?—অমন বাইরের ঠাট বজায় রাখবার জন্য ব্যস্ত নন সতী। সাতাশ বছর বয়সে তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা হবার পর থেকে কম তো দেখেন নি এই আরও সাতাশ আটাশ বছরে। পাঁচজনের বেগার খাটার কপাল নিয়েই আসে না একেকটা মানুষ? সতীও তেমনি! ছেলে, মেয়ে, বৌ, ভাসুর, জা, ভাসুরপো, ভাসুরঝি—কত জনের না ঝামেলা পুইয়েছেন, এখন বাকি ছিল বেহাইয়ের পরিচর্যা করা। তাই বা বাকি থাকে কেন? বড়লোক বেহাই। সতীর মনটা বিরস হয়ে রইল ক'টা দিন।

'এলাম বেয়ান আপনাকে জ্বালাতে—'

'আমার আর কী জ্বালাবেন, নিজের রাজপ্রাসাদ ফেলে এসে কুঁড়ে ঘরে উঠেছেন।'

'রাজপ্রাসাদ যে শ্মশান হয়ে গেছে বেয়ান। বুড়িমাকে তাই এ্যাদ্দিন আটকে রেখেছিলাম। যখনই ফিরবার কথা তুলত তখনই যেন আমার হৃৎকম্প হতো। আমায় একা একা ওখানে ফেলে আসবে ভাবতে—'

'ফেলে আসবে কেন আপনাকে ? ছেলেমেয়ে তো এই বুড়ো বয়সের জন্যই।...মানিক ফিরবে কবে?'

'মানিক তো ফিরতেই চায়, ওর মেমসাহেবের যে মন ওঠে না এদেশে!—'

'ঐ তো জ্বালা।'

'সে তো জানতামই যে চাইবে না। কিন্তু তবু তো 'না' বলতে পারি নি ছেলের মুখ চেয়ে। ওদের সুখেই আমাদের সুখ কি বলেন বেয়ান? আমরা আর ক'দিন? আর এখানকার মেয়ে বিয়ে করলেই যে আমার বোঝা বইত তারই বা ঠিক কি? তখনও হিল্লী-দিল্লী কোন্ মুল্লুকে ছেলের চাকরি হত কে জানে?'

'তা বই কি? আপনার জল গরম হয়ে গেছে—যান, চান করে নিন গে। আমি যাই আপনার ঝোলটা নামিয়ে ফেলি—'

'গোড়া থেকেই বেশি আদর দেবেন না কিন্তু—শেষে হয়তো নড়তে চাইব না এখান থেকে।'

'কে আপনাকে নড়তে দিচ্ছে এখান থেকে, একি আপনার নিজের ঘর নয়?'—

ঝোলটা নামাতে নামাতে সতীর মনে নিজের মুখের কথাটাই ঘুরে ফিরে এল। যার জোরে জোর মানুষের সে জোর তো বেহাইয়ের অনেক বেশি। সেদিক থেকে যে এই সংসারেও তাঁর অধিকার সতীর চেয়ে বেশি বই কম নয় সে কথা কি বেহাই বোঝেন না?

বাইরের বসবার ঘরেই খাট পেতে বিছানাপত্র, ·ই ওষুধ সব গুছিয়ে বসলেন রমেশ নন্দী। প্রৌঢ়া নেপালী আয়া রাতে শোয় সতীর ঘরের মেঝেতেই। সুভাষ বেশি রাত পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে রাখলে আবার সে উঃ আঃ করে বিরক্তি জানায়। সুভাষ চটে মাকে বলে, "মহারাণীকে বলো-না বারান্দায় ওর শয্যা পাততে—"

সারাদিন বিনে মাইনের চাকরি করে এইটুকু লাভ সতীর যে বিছানায় গা ঠেকাতেই দু চোখ বুঁজে আসে। এবং চোখ মেলেই উঠে "দুগগা দুগগা" করে বালিশের তলায় দেশলাই হাতড়ান। ঐ সাতসকালে উঠে উনুনে আঁচ দিয়েও আপিসের ভাত, ডায়বেটিস আর হার্টের রুগীর পথ্য, তাছাড়া পোয়াতীর পছন্দসই এটা-সেটা সেরে নিজের নিরিমিষ হেঁসেলে হাত দিতে বেলা দুটো বেজে যায়।

এমন কি সমরও বিরক্তি প্রকাশ করে আজকাল, "কী দরকার তোমার অত বাড়াবাড়ি করার মা? সকালে তাড়াহুড়োর সময়টা না হয় তুমি করলে, বাকিটা তো নীলিমাই করতে পারে।'

নীলিমা কিন্তু এগোয় না। সমর আপিস যাওয়ার আগে পর্যন্ত যা-ও রান্নাঘরে একটু ঘুরঘুর করে—কি আপিসের ভাতটা বেড়ে দেয়; ও বেরুতেই জলখাবার সামনে নিয়ে বাপের ঘরে বসে দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোশ গল্প চলে।

পথ্য হলেও যখন পঞ্চব্যঞ্জন সামনে সাজিয়ে দেন সতী রমেশ ভদ্রতা করে বলেন, 'আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন বুড়ির। একা হাতে এত সব করেছেন আপনি, আর ওকে কুটোগাছটিও নাড়তে বলেন না।'

মুখ ঘুরিয়ে যথাসম্ভব বিরক্তি চেপে সতী জবাব দেন, 'আমি খাব বলে কি ওর মাথার খুব কিছু বাকি রেখে পাঠিয়েছিলেন আপনারা?'

'তা বটে! মা ছিল কিনা ওর চিররুগ্না, হাতে ধরে কিছুই শেখানো হয় নি। ঝি চাকরে চিরকাল সব করেছে—ওর দরকারও পড়ে নি। কিন্তু আপনি কেন ওকে বসিয়ে রেখে একা একা হিমসিম খাচ্ছেন সকাল থেকে?'

সতী জবাব দেন না। কী জবাব দেবেন? বাপ যা দেখতে পাচ্ছেন মেয়ে কি তা দেখতে পায় না? কিংবা বাপ যা বলছেন মেয়ে কি তা শুনতে পাচ্ছে না? না কি বাপের কথায় ও আরও প্রশ্রয় পাচ্ছে? 'ঝি চাকরে চিরকাল সব করেছে।' এখন স্বামী যদি তিনটে ঝি চাকর রাখতে না পারে তো শাশুড়ি বেটিই সই! দেড়মাসেই হাঁপ ধরে গেল সতীর। নেপালী আয়াটারও আবার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কত যে বায়নাক্কা। একদিন সবাইকেই শুনিয়ে বললেন সতী, 'নীলিমা হাসপাতাল থেকে ফিরতেই এবার আমি বড়দির কাছে নবদ্বীপ যাব ছ'মাসের জন্য।'

কেউ-ই জবাব দিল না কিছু। নীলিমার কানে সে কথা গেল বলেই মন হল না।

ভোররাতে উঠে ট্যাকসি করে ছেলে আর বৌ-এর সঙ্গে শিশুমঙ্গলে গেলেন সতী। সদ্য

কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই দেখে আবার আপিসের ভাত নামাতে ছুটলেন বাড়ি। এগারোটায় নিজেই ছটফট করে গেলেন খোঁজ করতে—ছেলে তো আপিসে। তখনও কিছু হয় নি। ফিরে এসে চান করে নিজের রান্না চাপিয়ে গালে হাত দিয়ে বসেছেন, এমন সময় একটা মোড়া নিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন রমেশ। সকাল থেকে ছটফট করছেন।

'গতবার তো দূরে ছিলুম, বুঝতে পারি নি। সব ঝামেলা চুকিয়ে সুখবর পাঠিয়েছেন আপনারা।'

'ভাবনার কিছু নেই বেহাই। কোনরকম অস্বাভাবিক তো কিছু নেই ওর। তবু যতক্ষণ না চুকে যায় ততক্ষণ ভাবনা থাকে বটে।'

'আপনি যা করছেন ওর জন্য তা ওর মা-ও কোনদিন করে নি—'

'আমি কি ওর মা নয়?'

রমেশ চুপ হয়ে গেলেন। সতীর মনে হল লোকটিকে যতখানি দেমাকী আর আত্মসুখী মনে করেছেন এতদিন তা বোধহয় নয়।

'আপনার ঘর সংসার করা দেখে মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে যাই বেয়ান। এইটুকু মানুষটি আপনি...সারাদিন দেখছি কিছু-না-কিছু করছেন। আমার গিন্নীকে কিনা দেখেছি চিরকাল শুয়ে আছেন; শরৎ চাটুজ্যে, রমেশ দত্ত নিয়ে। রোগে জর্জর হলে হবে কি। দেহ দেখে তো বোঝা যেত না, দুটি সমত্থ ঝি লাগত তুলতে..আপনার হাতে যে যত্ন পেলুম এ দুমাস, নিজের সংসারে কোনদিন তা পাই নি, জানেন?'

সতী উনুন থেকে চোখ দুটি তুলে সহানুভূতি ঢেলে দিলেন প্রায় সমবয়সী অথচ অকালবৃদ্ধ লোকটির মুখে। মনে মনে কেমন কুঁচকে গেলেন, তাঁর এতদিনের সেবায় হৃদয় দেন নি বলে।

'আজ আপনি কি খেলেন না খেলেন দেখতে পাই নি—আয়াটা বা ঠিকমত গুছিয়ে দিল কি না সব আপনাকে—হাসপাতালে বসে মনটা খচ্‌খচ্ করছিল।'—এখন সতীর মনে হল খচ্‌খচ্ করাই উচিত ছিল, আসলে কিন্তু ট্রামে যেতে যেতে ভেবেছিলেন, 'বেশ বুঝুন একবার রোজ কতখানি করতে হয় আমাকে এমন করে জামাইয়ের বাড়ি জামাই আদরে রাখতে।' সেই বিরক্তিটা কোথায় উপে গেল এখন মুহূর্তে!

'আমার জীবনে এত আদরযত্ন সত্যি আমি কখনও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। আমার চিরকাল মনে থাকবে।'

সতীর মনটা লজ্জায় নুয়ে গেল—আদর যত্নে ফাঁকি কোথায় ছিল সত্যি কি তা রমেশের চোখে পড়ে নি? চুপ করে বসে থেকে থেকে আবার ভাবলেন, কই মেয়ের সামনে তো এসে কোনদিন বলেন নি এমন করে? কিন্তু এই নিভৃত স্বীকৃতিটুকুও বড় মধুর মনে হল সতীর। তবু অস্বস্তি কাটিয়ে উঠবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন ঃ

'কীই বা করতে পারলাম আপনার জন্য...কতটুকুই বা সামর্থ্য !...সে যাক্ যান আপনি একটু গড়িয়ে নিন গে। আমি এ-দিকটা গুছিয়ে নিই, ওবেলা আবার মেয়েকে দেখতে যাবেন তো?'

'যাব? নিয়ে যাবেন আমাকে?'

'যাব বই কি? ট্যাক্‌সি আনিয়ে নেব ওদের গৌরাঙ্গকে দিয়ে। আয়া খুশিকে নিয়ে বসে বাড়ি আগলাবে।' মোড়া থেকে উঠে দাঁড়িয়েও আবার বসে পড়লেন রমেশ।

'নাঃ একটু বসি; দেখি, আপনি কি খান। রোজ দুপুর বেলায় শুয়ে শুয়ে ভাবি, আপনি আমাদের এটা-সেটা কত কিছু নিজের হাতে তুলে দিয়ে যত্ন করে খাওয়ান—অথচ আপনি কী খান না খান কেউ দেখে না। বুড়িটাকে বলেছি কতদিন। ও বলে, মার কেমন অস্বস্তি হয় খাওয়ার সময় সামনে ঘুরঘুর করলে, তাই যাই না। সে কি একটা কথা হল? আমরা কিছুই শেখাতে পারি নি ওকে বেয়ান্।'

সতী হেসে বললেন, 'ভাবছেন বুঝি ভালো ভালো যা কিছু সবই সরিয়ে রেখেছি নিজের জন্য—আর সব আজ ধরে ফেলবেন আপনি?'

'তা যদি ধরতে পারি তবে আর ভাবনা কিসের? তবে ভয় হচ্ছে ধরতে পারব না।'

সতী সসঙ্কোচে তাঁর সামান্য আয়োজন নিয়ে রমেশের সামনেই বসতে বাধ্য হলেন। অথচ সত্যি খারাপ লাগল না তাঁর। নানা কথায় সমস্তটা অস্বস্তি কাটিয়ে দিলেন রমেশ। কিন্তু কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় নি, 'কী যে খেলেন বেয়ান, শেষপাতে একটু দুধ পর্যন্ত নিলেন না কিছুই।'

'ওসব যে আমার আবার তেমন সয় না।'

'সয় না একটা কথা হল? সয় না বললেই শুনব? সওয়ালেই সয়। কী খাটুনিটাই খাটেন আপনি সারাদিন, ওটুকু নইলে চলে? সমরকে আজ বলতে হবে দেখছি।'

'আপনার মতলব ভালো নয় বেহাই। দুধ-দই খাইয়ে বেশিদিন খাটিয়ে নিতে চান এই তো? একটু যে দু'দিন বিছানায় পড়ে আরাম করব তা করতে দেবেন না।'

'আপনার কপালে এ জন্মে যে খুব আরাম লেখা আছে তা তো মনে হয় না আমার।'

সতী হেসে উঠে পড়লেন।

ষাট হয় নি, তবু কেমন নড়বেড়ে হয়ে গেছেন রমেশ। ট্যাক্সি থেকে হাত ধরে নামাতে হল সতীকেই। কেমন যেন আরও মায়া বেড়ে গেল অক্ষম মানুষটার ওপর। ভিজিটরদের ভিড় ঠেলে ঠেলে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে হাঁপাতে লাগলেন রমেশ। 'নাঃ ভুল হয়ে গেল, না ভেবে চিন্তে একে নিয়ে আসা' সতী আফসোস করতে লাগলেন মনে মনে। ক্যাবিনে এসে দেখেন নীলিমা নেই। খানিক বাদে স্টাফ নার্সের মুখে খবর পাওয়া গেল আধ ঘণ্টা আগে খোকা হয়েছে একটি—ভিজিটিং আওয়ারের ভিড় সরে গেলে তবে ওদের ক্যাবিনে নিয়ে আসবে। দুজনে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সতীর মুখ খুশিতে ভরে উঠল।

'যেমনটি চেয়েছিলাম, বিশ্বনাথ তেমনটিই দিয়েছেন।'

'আজ আমাদের একসঙ্গে ফুর্তি করার দিন বেয়ান।'

'আমার একটু বেশি—' চোখে কৌতুকের ঝিলিক দিল সতীর।

তা হোক আমারই বা কম কিসে?—'

'আপনার ছেলের ঘরের সাহেব নাতি থাকতে মেয়ের ঘরের কালোকোলো নাতি কি মনে ধরবে?'

'সাহেব নাতিকে এ জন্মে চোখে দেখব বলে তো ভরসা হচ্ছে না। তার চেয়ে হাতের কাছে যা আছে তাই ভালো।'

সতীর মনটা কেমন ছল্‌কে গেল। লোকটার সব থাকতেও যেন কিছুই নেই।

সুভাষ এল সাড়ে পাঁচটায়, ঘরে প্রত্যাশিত কিছু দেখতে না পেয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাতেই একগাল হেসে সতী বললেন, 'ভাইপো হয়েছে যে, যা, বৌদির জন্যে গোলাপ ফুল নিয়ে আয় আর সন্দেশ। হয়তো আজ রাতে ওকে একটা খেতে দেবে। একটু বাদেই ওদের নীচে নিয়ে আসবে।'

সুভাষ ফুল আনতে চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যেই সমর এল। সতী বললেন, 'এবার কিন্তু আমি বিশ্বনাথ নাম রাখব, আপত্তি করবি না। অবশ্য শঙ্কর নামটা আরও ভালো।'

'ভোম্বলটা তার চেয়েও ভালো।' সমর উদাসীন ভঙ্গীতে মন্তব্য করল।

নব জাতককে অভ্যর্থনা জানিয়ে একই ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরল সবাই। সারাদিনের ছুটোছুটির পরও সতীর কেমন প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিল রান্নায়। সেকি শুধুই নাতি হওয়ার

আনন্দে? মাংস আনতে পাঠালেন সুভাষকে; সমর খবরের কাগজ নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল নিজের খাটে। খুশিকে কোলে করে বেয়াইয়ের ঘরে সসঙ্কোচে গেলেন সতী।

'একটু শুয়ে থাকুন আপনি, রান্না হয়ে গেলে ডাকব'খন আপনাকে—খুব ধকল গেছে আপনার ওপর দিয়ে আজ।'

'সেই ভোর রাত থেকে ছুটোছুটি করছেন আপনি, আর ধকলটা গেল বুঝি আমার ওপর দিয়ে? এখন আর শোব না এই ভর সন্ধ্যায়। তার চেয়ে বসুন না ঐ চেয়ারটায়, একটু গল্প করি।'

'আমার যে আবার রান্না রয়েছে—'

'সে-সব আজ একটা দিন চালিয়ে দিক না আয়া।'

'দিচ্ছে অবশ্য। ডাল ভাত নামিয়েছে ও-ই। মাংসটা চাপিয়ে এসেছি। ওটা সময় নেবে একটু। বসি না হয় ততক্ষণ—'

মেঝেতেই গুছিয়ে বসলেন সতী, খুশিকে ঘুম পাড়াবার জন্য। মা বাড়ি নেই বলে খুনখুন করছে। ঘামে ভেজা কপালে চুল এসে পড়েছে। কোঁকড়া নরম চুলগুলি কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে মনে পড়ল সবাই বলে খুশি চুল পেয়েছে ঠিক তার ঠাকুরমার মত। মুখ-মাথা আঁচলে মুছে দিতে গিয়ে খুশির থুত্নির মাঝখানে চাপা টোল-পড়া-মতো অংশটুকু চোখে পড়ল; অমনি রমেশের দিকে চোখ তুললেন—হুবহু একরকম! রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন সতী।

'দেখুন বেহাই খুশির থুত্নির টোলটুকু একেবারে যেন উল্টো আপনার।'

'বাকিটুকু কিন্তু ওর ঠাকুমার—নইলে কি অমন সুন্দরী হত?'

সতীর হাসিমুখ নত হল। এমন কথা কতদিন কেউ বলে নি!

পাঁচজনের সংসারে তাঁর রূপ, তাঁর যৌবন সব কবে একটু একটু করে নিঃশেষ হয় এল সে কি তাঁর নিজেরই খেয়াল ছিল? খুশির ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপন মনে ভাবলেন কী আশ্চর্য লীলা ভগবানের! সবাই বলে খুশির মুখে যেন ঠিক ওঁর মুখখানিই বসানো। সেই মুখে আবার বেয়াই-এর থুত্নির টোলটুকু ঠিক এসেছে! কেমন করে হয় এমনটা? হঠাৎ কেমন পুলকিত হয়ে উঠল ওঁর শরীরটা? কেমন করে ওঁরা দুজনে মিলে গেছেন ছোট্ট মুখখানায়?

সতী চুপ করে বসে রইলেন। রমেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে থেকে শেষটায় বললেন, 'এবার সংসার থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে চলুন-না আসানসোলে—আপনারও একটু হাওয়া বদল হবে, আমার তো সবটাই লাভ।'

আসানসোলের উল্লেখে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা সতী। আবার বুড়ো মেয়েকে নিয়ে ফিরে যেতে চায়, সোজাসুজি তা বলতে পারছে না—এ তারই ভণিতা। আসলে সতীর প্রয়োজন, কলকাতার প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে—শুধু ভদ্রতা করে সতীর কথাটাও তোলা! মনটা তার বিরস হয়ে গেল। হয়ত সেই রসহীনতা তাঁর গলাতেও ফুটে উঠল।

'আমি আর কেন? আর আমার পায়ের বেড়ি তো আর অমন চট করে খুলে ফেলে চলে যাওয়া যায় না?'

'আপনার আবার বেড়ি কোথায় পায়ে? ইচ্ছে করলেই যেতে পারেন, ইচ্ছে নেই তাই বলুন...ওসব আপনার অজুহাত বেয়ান!'

রমেশের গলায় অভিমান শুনলেন যেন সতী? একটু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। টেবল ল্যাম্পের মস্ত বড় শেডখানা রমেশের মুখটি অস্পষ্ট করে রেখেছে। এবার মৃদুকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করলেন।

আমিও গেলে ছেলেদের দেখবে কে? চাকর-বাকরের হাতে তো খেয়ে অভ্যেস নেই ওদের।

'কেন নীলিমা?—পারবে না ওদের দেখাশোনা করতে?'

'নীলিমা?'—এবার অর্থটা স্পষ্ট হল না সতীর কাছে। 'নীলিমা থাকবে এখানে হেঁসেল সামলাতে আর উনি যাবেন বেয়াই বাড়ি বেড়াতে—এই কি রমেশ বোঝাতে চান?'

'সে কি হয়?'

'কেন হয় না? সুভাষের এম. এ. পরীক্ষা হয়ে গেছে তো এখন লম্বা ছুটি তার। ওকে নিয়ে চলুন, দু-মাস ওখানে জিরিয়ে আসবেন। অবশ্য ওখানে গিয়েও পুরো ছুটি পাবেন না, মাঝে মাঝে আপনার হাতের সুক্তো আর ধোঁকার ডালনা আমার চাই-ই। আর ঐ যে পাঁচরকম সব সবজি দিয়ে মুগের ডাল করেন ওটি আমার রাঁধুনিকে শিখিয়ে দিয়ে আসবেন। আমার গিন্নী আবার ওসব মোটেই জানতেন না...খোট্টার দেশে মানুষ হয়েছিলেন কি না ছেলেবেলায়।'

'আব কি দরকার পড়েছিল তাঁর জেনে? ভাগ্যবতী সিঁদুর মাথায় নিয়ে স্বর্গে গেছেন...ওঁর কী দায় ঠেকেছিল নিরিমিষ রান্না শিখতে শুনি?'

'সে যাই হোক্ আপনি চলুন...দেখবেন আপনার ফুল, বেলপাতা, তুলসী পাতার অভাব হবে না, নিজের হাতে বাগানের ফল পেড়ে দিতে পারবেন আপনার ঠাকুরকে—সন্ধেবেলায় বাগানে বসেই আপনার গল্প শুনব।—'

সতী আনন্দিত চিত্তে চুপ করে রইলেন; কলকাতার এই খাঁচা থেকে অমন সুখের মুক্তি কি সত্যি তাঁর হবে?—দু'মাসের জন্যও!—ভাবতেই খুশি হয়ে ওঠে মন।

'আমি তখন থেকেই ভাবছি বলব বলব—কেমন ভয় করছে, আরজি পেশ করতে না করতেই বুঝি আপনি না-মঞ্জুর করে দেন।'

'কী যে বলেন বেয়াই—যাই, মাংসটা নামাই গিয়ে...কথায় কথায় এত রাত হয়ে গেল...আপনার আজ ওবেলাও ভালো করে খাওয়া হয় নি'—সতী দ্রুত পায়ে যেন উড়ে বেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে শুনলেন,

'সমরকে আমিই বলব বুঝিয়ে...তখন কিন্তু আবার না করতে পারবেন না আপনি।'

রমেশ আবছা অন্ধকার হতে গাঢ় অন্ধকারে তাঁর মিলিয়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, 'কী স্নিগ্ধ এই মানুষটি। সংসারটায় এখন অসমবয়সীর ভিড়, তাদের সঙ্গে না যায় দুটো কথা বলা, না যায় তাদের মন বোঝা। এমন সময়েই তো বেয়ানের মত সমবয়সী একজনের দরকার—পাশে বসে কথা বললে মনে হবে না পিছিয়ে পড়েছি কিংবা অকেজো হয়ে পড়েছি সবার কাছে।'

আর একটু হলেই মাংসটা ধরে যেত। তবু তা নিয়ে বিচলিত হলেন না সতী, অভ্যস্ত হাতে চট্ করে ওটা নামিয়ে নিয়ে বেগুন ভাজার জন্য কড়া চাপিয়ে দিলেন। কেউ তাঁকে কোনদিন এত আগ্রহ করে কাছে ডেকেছে বলে তো মনে পড়েনা সতীর। তিনিই তো যেচে সেধে পড়ে থেকেছেন পরের সংসারে, প্রাণপণ সেবা দিয়ে সেই আশ্রয়ের মূল্য চুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। আর আজ শুধুই সঙ্গ দেবার জন্য, কেবলই গল্প করবার জন্য এমন সাদর নেমন্তন্ন? সতীর প্রসন্ন মুখখানা আরও সুন্দর হয়ে উঠল! তাঁর গল্পের, তাঁর সঙ্গের এত দাম হল কবে থেকে?

রাত্রে তিনজনে একসাথে খেতে বসলে রমেশ গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই সোজাসুজি বললেন,

'এবার বুড়িমা হাসপাতাল থেকে ফিরলে পরে তোমার মাকে কিন্তু একটু ছুটি দেবে সমর।'

শ্বশুরের ভারিক্কী গলার আদেশে একটু বিস্মিত হলেও মৃদুকণ্ঠে সমর জবাব দিল, 'বেশ তো।' তারপর মায়ের মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করবার চেষ্টা করল। হঠাৎ আবার ছুটির কথা তুলবার মত অপ্রিয় কিছু ঘটনা তো আজ ঘটে নি—বরং আজ তো মা-র সংসারের টান আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। সতী ছেলের বিব্রত ভাবটা বুঝতে পেরে হেসে বেয়াই-কে বললেন—

'একি আমার পরের বাড়ির চাকরি যে ছুটি চাইব?'

'তা যদি হোত তবে তো ভাবনাই ছিল না। এক্ষুনি ইস্তফা দিতে বলতাম। যাকগে সে কথা। ছুটি বলতে না চান, বিশ্রাম বলুন। সুভাষ, তোমার পরীক্ষা হয়ে গেলেই এবার মাকে নিয়ে চল আমার সঙ্গে—তোমাদের দুজনেরই বিশ্রাম চাই।'

সুভাষও মৃদু হেসে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একবার ভুরু নাচালো। তারপর মাথা নীচু করে খেতে খেতেই বলল, 'মায়ের আবার এই বিরাট রাজত্বের চার্জ কাকে দিয়ে যাবেন সেই হল সমস্যা। এই বোতল বোতল আচার, আমসত্ত্ব কাসুন্দির তদারক করা কি বউদির কাজ? তা ছাড়া এই যত হাঁড়ি ভরা পুরনো আতপ চাল, চিনি কিংবা তেঁতুল জমানো রয়েছে সে সব পাহারা দেবে কে? জ্ঞানদা তো দুদিনে লুট করে নিয়ে যাবে মার রাজ্যপাট।'

'হাঁ গো হাঁ, মার রাজত্বি নিয়ে ঠাট্টা যতই কর অমন অল্প অল্প করে তুলে জমিয়ে না রাখলে চলে কখনও এই র‍্যাশানের কালে? যেই যা ফুরুলো, বলে দিলুম 'নেই' আর অমনি ছুটে এনে হাজির করলে তেমনি পাত্র কিনা তোমরা? গুছিয়ে রাখি বলেই সময়ে অসময়ে বিপদে পড়তে হয় না তোমাদের—'

'ওদের কথা বাদ দিন বেয়ান। আজকাল যে-সব ছেলেরা ঘর-সংসার করছে তাদের ক'জন জানে কত ধানে কত চাল? ওরা যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসছে আর কেবল নাই নাই, কেবল হাপিত্যেশ। নইলে আমরাও তো কেউ আর কুবেরের ভাণ্ডার নিয়ে সংসারে ঢুকি নি। তিল কুড়িয়েই তাল হয়েছে ক্রমে...'

সুভাষ চট করে আর একবার মার দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে মাথা নামিয়ে নিল—যার অর্থ—'এবার আর তোমায় পায় কে?'

সুভাষ আর সমর গেল নীলিমাকে বাড়ি আনতে। কালো পাড় একটি গরদ হাতে রমেশ এসে বললেন,

'কাল সমরকে দিয়ে এটা আনালুম দেখুন তো বেয়ান পছন্দ হয় কিনা! নাতি কোলে নেবার জন্য একটু সেজেগুজে বসুন দেখি নইলে হয়তো নাতির আবার মনে ধরবে না। আজকালকার ছেলে তো?'—

সতী সলজ্জভাবে হাতে নিলেন গরদটি,

'এ আবার কেন বেয়াই? কত যে মিছিমিছি খরচ করতে পারেন আপনি সত্যি!'

'মনে হচ্ছে সময় থাকতে সৎকাজে খরচ করে না ফেললে শেষে ঠকতে হবে। বেশি কিছু যে সঙ্গে করে ওপারে নিয়ে যেতে দেবে তেমন তো মনে হয় না।'

'আপনার ঐ এক কথা হয়েছে মুখে—আমার সামনে ওকথা আর কখনো মুখে আনবেন না।'

'\[illegible\]শ তো, তাতে করে যদি আটকায় শেষ যাত্রাটা তবে মন্দ কি? আমি কি আর তাতে অখুশি হ[illegible]? কিন্তু বেশিদিন ও ভাবে ঠেকানো যাবে বলে কি মনে হচ্ছে আপনাব?'

সতী জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। রমেশ গলা তুলে বললেন, 'আমার কথা রাখুন বেয়ান, ঐটি আজ পরে নিন ওরা ফি[illegible]ার আগেই।'

বেলা দশটা নাগাদ ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই সতী ছুটে গেলেন বাইরে, রমেশও গেলেন পিছু পিছু, আয়া গিয়ে দাঁড়াল খুশিকে নিয়ে। নাতিকে কোলে নিতে নিতে সতী বললেন,

'এই দেখ বৌমা, পাছে ঠেটি পরে নাতিকে কোলে করলে পাড়ার লোকে আমায় আয়া মনে করে তাই বেয়াই আমায় আবার গরদ দিয়েছেন।'

'তাই বুঝি? বেশ তো—' নীলিমা সামান্য একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করে সবিস্ময়ে বাপের মুখের দিকে তাকালো। রমেশ তা লক্ষ্য করলেন না, নাতির মাথাভরা চুলে দুটি আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সতী চট্ করে বাচ্চার মাথাটি সরিয়ে নিয়ে সহাস্যে বললেন,

'থাক, অমন আলগোছে আদর চলবে না। চলুন...বসুন এসে ঘরে। দেখব তো কেমন নাতিকে কোলে করে সামলাতে পারেন।'

নীলিমা শাশুড়ি ও বাপের হাস্য-পরিহাসে যোগ না দিয়ে ক্লান্ত পা টেনে টেনে নিজের ঘরে চলে গেল। বাপের দিকেও আর তাকালো না। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে সমরও গেল ওর পিছনে! সুভাষ বয়ে নিয়ে গেল সামান্য কিছু কাপড়-চোপড় আর প্লাস্টিকের ঝুড়িখানা।

খানিক বাদে নাতি কোলে করে বারান্দায় বসলেন সতী, তেলের বাটি সামনে নিয়ে। উরুর ওপর উপুড় করে ফেলে ছোট্ট পিঠটি ডলাই মলাই শুরু করছেন দেখে রমেশও এসে বসলেন মোড়ায়,

'আপনার নাতির রঙ মনে হয় খুকীর চেয়ে একটু চাপাই হবে—তাই না?'

'চেপে দিয়েছেন আপনিই—হোত আমার মতো...'

'সে আর বলতে? তবে কিনা নিজের মুখে নিজের বড়াই করতে নেই, ওটা যে আমাদের বলবার কথা—'

সতী সত্যিই লজ্জা পেলেন। বাবা ওর ঘরে গিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন না দেখে নীলিমাই বার হয়ে এল বারান্দায়,

'কেমন আছ বাবা? বুকের ধড়ফড়ানিটা কি কমেছে একটু আজকাল? সেদিন যে তুমি কোন্ বুদ্ধিতে হাসপাতালে গেলে...আমি শেষে ভেবে মরি।...'

সতী শুধু একটু মৃদু হাসলেন। রমেশ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বোস এখানে—তোর চোখের কোলে যে কালি পড়ে গেছে দেখছি। ঘুমুতে পারিস নি বুঝি এই ক'দিন?'

নীলিমা মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ল শাশুড়ির পাশেই, একটু ঠেস দিয়ে বলল, 'নাতির বেলায় দেখছি মা-র অশৌচের বাছবিচার আর তেমন নেই।'

'সত্যি বলতে কি বেয়ান ক্রমে আধুনিকা হচ্ছেন—ওসব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলছেন এবার—'

'ঝেড়ে না ফেলে উপায়? কোথায় কলকাতার এইটুকু ফ্ল্যাটে আঁতুড়ঘর হবে—কোথায় বা কি। ষষ্ঠিটা বাদ দিলে নেহাৎ খুঁৎ-খুঁৎ করবে তাই ওটা—'

'তুমি কেমন আছ বললে না বাবা?'

'কেমন দেখছিস বল্ তো?'

'দেখে কি আর হার্টের খবর বোঝা যায়?'

'যায় না?—দেখছিস না বেশ ভালো আছি? বেয়ানের যা যত্ন ভালো না থেকে উপায় আছে?'

নীলিমা একটু শুকনো হাসি হাসলো। পরমুহূর্তেই যেন মুখটা একটু ভার হল। ছেলের রাঙা পায়ের তলায় আঙুল বুলোতে বুলোতে বলল,

'যাক এতদিনে তাহলে স্বীকার করলে যে কলকাতারও গুণ আছে—অথচ, তখন রাজি করাতে, শুধু আমার মাথা খোঁড়া বাকি ছিল।'

'কুটুমবাড়ি আসবেন একটু সাধাসাধি করতে হবে বই কি মা, তাছাড়া মানী লোক তো—'

সতীর কথার ভঙ্গীতে ঠাট্টার ভাব মোটেই নেই। রমেশ হেসে বললেন, 'কেন মিথ্যে খোঁটা দিচ্ছেন আমায়? কুটুমের মত ব্যবহার কিছু করেছি কি?'

'আসলে বাবার ভয় ছিল আমাদের এই পায়রা খোপের মতো বাড়িতে পা ফেলতে জায়গা পাবেন না, নিশ্বাস নেবার হাওয়া থাকবে না।'

'কী যে বলিস বুড়ি? তোরা সবাই যেখানে আছিস আমি সেখানে এসে থাকতে পারব না? রমেশ নন্দীর তেমন চালিয়াতি কখনও ছিল না—হবেও না।'

'না, না, তোমার কিনা এভাবে থাকা অভ্যেস নেই, তাই বলছি।'

'এতে আবার অভ্যেস কিসের দরকার? ভালো খাওয়া-দাওয়া আর আদরযত্ন তো দুদিনেই অভ্যেস হয়ে যায়। বরং এখন গিয়ে ঐ শ্মশানপুরীতে একা একা থাকার অভ্যেসটাই নতুন করে করতে হবে।'—

এরপর স্বভাবতই কথা থেমে যায়। রমেশ উঠে যান চান করতে—নীলিমা উঠে গিয়ে বিছানায় শোয় একটু।

সেদিন সকালে ছেলেরা বেরিয়ে যাবার পর বাকি কুটনোটুকু নিয়ে বসেছিলেন সতী। রমেশ তেমনি মোড়ায় বসে গল্প করে চলেছেন মহা উৎসাহে—বাগানে কোন্ কোন্ ফলের কলম লাগিয়েছিলন কবে, কোন্টায় ফলন কেমন ইত্যাদি। সতীর স্পষ্টতই ঐ গল্পে সমান উৎসাহ—প্রশ্ন করে করে তাঁর বাগান সম্বন্ধে গর্ব আরো বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া নিজের প্রথম জীবনের গ্রাম্য অভিজ্ঞতার সাহায্যে তুলনামূলক মন্তব্য করে রমেশের নানা কৈশোর স্মৃতি জাগিয়ে তুলছিলেন।

নিজের ঘরে খাটের মাঝখানে ছেলে কোলে নিয়ে বসে নীলিমা দুজনের কথাবার্তা শুনে কেমন যেন একটা বিরক্তি বোধ করছিল। কী যে আজকাল হিজিবিজি গল্প করেন বাবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যত মানুষ বুড়ো হয়, তত বোধহয় বক বক করা বেড়ে যায়। হাসপাতালে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত বাপের সঙ্গে বসে রোজ সকালে চা খাওয়ার যে আড্ডাটা জমত এখন সে কথা বাবার মনেও পড়ে না। বাবা নিজের ঘরে আজকাল আর থাকতেই চান না যেন মোটে—আর কী যত মেয়েলী গল্প অষ্টপ্রহর। বাবার সেই গাম্ভীর্য ও দূরত্বের অভাব মেয়ের চোখে মনে হল, কুটুমবাড়িতে নিজেকে খেলো করা!

রাত্তিরে যখন খেতে বসেছেন তিনজনে সেদিনও, রমেশ সেই প্রসঙ্গটা আবার তুললেন,

'তোমার পরীক্ষা কবে শেষ হবে সুভাষ?'

'২৩শে নভেম্বর—যদি না ছেলেরা কোন পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেয়—'

'তাহলে তো আর দেরি নেই—'

নীলিমা সামনেই বসেছিল গালে হাত দিয়ে। এখনও পরিবেশনের দায়িত্ব সে নেয় নি, কোমরে নাকি ভীষণ খোঁচা খোঁচা লাগে ঝুঁকতে গেলেই। তাই সামনে বসে থেকে খাওয়া-দাওয়া তদারক করে। রমেশ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'এবার খুড়িমা তাড়াতাড়ি সেরে উঠে নিজেব সংসার নিজের হাতে নিয়ে বেয়ানকে একটু ছুটি দাও।'

স্পষ্টতই নীলিমা অবাক হল, ভ্রূকুঞ্চিত করে বাপের মুখের দিকে তাকালো। সমরের যে এ প্রসঙ্গটা তাকে জানাবাব কথা মনেও পড়ে নি তা বোঝা গেল।

'মা বুঝি আবার নবদ্বাপ যাবার তাল তুলছেন?'

'নবদ্বীপ আবার যাবেন কি করতে?'

'আমার বাপু এখানেই নবদ্বীপ, এখানেই বৃন্দাবন যেখানে তোমরা—'

'ওসব নবদ্বীপ টবদ্বীপ নয়। আমি বেয়ানকে বলে কয়ে রাজি করেছি কিছুদিন আসানসোলে গিয়ে থাকতে—'

নীলিমার বিস্ময়ে এবার বিরাগের ছোঁয়া লাগল। তবু সে নির্বিকার মুখে চুপ করেই রইল। রমেশ কিন্তু থামলেন না।

'আর কতকাল বেয়ান এমন করে সামলাবেন বল? এবার তোমার সংসার তুমি বুঝে নাও বুড়িমা।'

সতী পুত্রবধূর আঁধার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রমাদ গুনলেন। ছেলেরা ব্যাপারটা উপভোগ করছে মনে হল—কিন্তু তাঁর আর উপভোগের অবস্থা রইল না। উনি আড়চোখে লক্ষ্য করলেন, নীলিমা ঠোঁট চেপে চুপ করেই আছে। কিন্তু রমেশ যেন আজ নাছোড়বান্দা, 'কি বলিস বুড়িমা? চুপ করে আছিস যে?'

'আমি আর কী বলব? তোমরা সবাই মিলে যা ঠিক করবে তাই যখন আমায় দাসী-বাঁদীর মতো মেনে নিতে হবে তখন আর—'

মেয়ের গলার ঝাঁজটা রমেশের কানে বেখাপ ঠেকল, 'বলিস কি তুই? তোর সংসারে তুই যদি দাসী-বাঁদী মনে করিস নিজেকে তবে তো—'

মেয়ে তাকে কথা শেষ করতে দিল না ঃ

'তা নয়তো কি? আজকালকার দিনে দাসী-বাঁদীরও শরীরের কথা ভাবতে হয় আমাদের। ইচ্ছেমত তারা ছুটি নেয়। সে যা হোক্, আমার যখন সংসার তখন আমাকে তার বোঝা বইতে হবে বই কি—আমার শরীর যেমন থাকে থাকুক, তোমাদের কার কী এসে যায়—'

সতী মর্মাহত হয়ে নীলিমার দিকে এক পলক তাকিয়ে রান্না ঘরে চলে গেলেন। হাসপাতাল থেকে ফিরেছে ও আজ তেত্রিশ দিন, আজ অবধি এক গেলাশ জল তাকে নিজে হাতে নিয়ে খেতে হয় নি। চারবেলা নিজের হাতে ভোগ সাজিয়ে দিচ্ছেন সতী, তা নিশ্চয়ই এ বাড়ির কারুরই চোখ এড়ায় নি। পরশু একাদশীর দিনেও বেলা দুটোর আগে ছুটি পান নি।

রমেশ মেয়ের মেজাজের গতিবিধি দেখে বিরক্ত হয়ে চুপ করে গেলেন মনে হল। খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়ে গেল বাপের ঘরে। হেঁসেল তুলতে তুলতে চাপা গলায় ক্ষুব্ধ আলোচনা সতীর কানে আসছিল অস্পষ্ট। বুঝতে পারছিলেন তখনকার অসমাপ্ত বোঝাপড়াটা এখন সমাপ্ত করা হচ্ছে—কথা কানে না গেলেও ঝাঁজটা টের পাওয়া যাচ্ছিল।

পরদিন রমেশকে একটু গম্ভীর আর বিমর্ষ দেখাল—নীলিমার চোখ রাঙা। বোঝা গেল কাল রাতে বাপের কাছে, স্বামীর কাছে অনেক দুঃখের বোঝা সে নামিয়েছে।

নিজের বাপকে সতীর মনে পড়ে না—স্বামীর মুখও ক্রমে আবছা হয়ে এসেছে। সতী ঠোঁটের তিক্ত হাসিটুকু যথাসম্ভব গোপন করে রান্নাঘরের দিকেই রইলেন বেশির ভাগ। বহুদিন থেকেই দুঃখে অপমানে অশান্তিতে রান্নাঘরটিই তাঁর মস্ত বড় আশ্রয়। সেখানে তিনি আত্মগোপন করেন। সকালে রমেশ যতক্ষণ বারান্দায় বসে চা খেলেন, নীলিমা সারাক্ষণ মুখ ভার করে সামনে বসে রইল। তখন চুপ করে থেকে দুপুরবেলা কথাটা বললেন রমেশ, 'আর তো ভালো দেখাচ্ছে না বেয়ান। এবার লোকে বলতে শুরু করবে জামাইয়ের কাঁধে ভর করেছে বুড়ো।'

সতী ব্যথিত চোখে রমেশের মুখে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, 'লোকের বলায় কি আসে যায় যদি আপনার জামাই তা মনে না করে?'

'না, না জামাই আমার যে তেমন নয় সেকি আর আপনাকে বলে দিতে হবে? সে যাই হোক্ এবার ভাবছি—নিজের ঠাঁই ফিরে যাই—'

ফিরে যাওয়ার তাড়াটা রমেশের গলায় তেমন ফুটে ওঠে নি। আসলে যে তাড়াটা কার সে কী আর সতী বোঝেন না? জামাইয়ের বাড়ি আর বেশি দিন থাকাটা ভালো দেখায় না সেটা বুঝি মেয়েকেই জানিয়ে দিতে হয়! তা না হলে আর মেয়ে। সতী চুপ করে রইলেন—তাঁর আর কি বলার আছে?

'বুড়িটা বলছে ওর শরীর নাকি এখনও তেমন সারে নি, উঠে দাঁড়াতে একেক সময় মাথা ঘুরে যায়। যদি অনুমতি দেন ক'দিনের জন্য ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।'

এই অনুমতি পাবার জন্যও খুব একটা ব্যাকুলতা দেখলেন না সতী। নাকি অনিচ্ছাই শুনলেন রমেশের আবেদনে? তবু সতী ব্যস্ত হয়ে বললেন,

'ওকি কথা বেয়াই? আপনার মেয়েকে আপনি নিয়ে যাবেন তার জন্য আবার অনুমতি কিসের?'

ক'দিন ধরে যে সকাল ধরে রাত পর্যন্ত ছুটির বাঁশি শুনছিলেন সতী হঠাৎ সেটা থেমে গেল। আসানসোলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে মনটা তাকে আবার কলকাতার ফ্ল্যাটে বন্দী করা হল। 'বাঃ তা কি হয়? আপনার অনুমতি ছাড়া কি আপনার ছেলের বৌকে আমি নিয়ে যেতে পারি?'

রমেশের গলার স্বর করুণ শোনালো। কেন?

'বেশ তো যদি একান্তই অনুমতির দরকার তবে দিলুম আমি অনুমতি।'

অনুমতি পেয়েও তেমন কিছু উৎফুল্ল দেখাল না রমেশকে।

আনমনে ভাতগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ঘরে-পাতা দইয়ের বাটিখানা আনতে উঠে গেলেন সতী। রমেশও উঠে পড়লেন সেইসঙ্গে। সতী ফিরে এসে অবাক হয়ে গেলেন,

'ওকি, এক্ষুণি উঠে পড়লেন যে বেয়াই?'

'নাঃ আর পারছি না। অনেকটা খাওয়া হয়ে গেছে। শরীরটাও তেমন জুত নেই আজ। কাল সারা রাত ঘুম ভালো হয় নি।'

সতী পুত্রবধূর ঘরের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে বোধ হয়।

আসানসোল যাবার আগের দিন নীলিমা সমরকে নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে। সুভাষ ফেরে নি—পরীক্ষা হয়ে গিয়ে ছেলে এখন আরো লাগাম ছাড়া হয়েছেন। সতী তাঁর প্রতিসন্ধ্যার অভ্যস্ত জায়গাটুকুতে বসে রুটি বেলছিলেন। রমেশ ক'দিন পর আবার এসে সামনে বসলেন নিজের মোড়াটি টেনে নিয়ে,

'একটু গল্প করি বেয়ান, কাল থেকে তো আবার মুখ বন্ধ—'

'তা কেন হবে? মেয়ে যাচ্ছে সঙ্গে—নাতি-নাতনিও যাবে—গল্প করবেন, খেলা করবেন—'

'মেয়ে কি আমার জন্য যাচ্ছে বেয়ান?'

'আপনার জন্যও যাচ্ছে। জানেন না তো ওখান থেকে প্রতিটি চিঠিতে আপনার জন্য দুশ্চিন্তা করত, লিখত, বাবাকে যে কি করে এখানে একা ফেলে যাব ভেবে পাচ্ছি না।'

রমেশ সে কথার উত্তর না দিয়ে ছেলেমানুষের মতো ঝুঁকে পড়ে চাকির পাশে ছড়িয়ে পড়া গুঁড়ো আটায় আঙুল দিয়ে এলোমেলো লাইন টানতে লাগলেন।

'এখনই যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? এত বারণ করলুম। কিসের এত তাড়া আপনার?'

'মেয়ে যে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কলকাতায় নাকি শরীর সারছে না ওর। ওখানে

খোলামেলায় ক'দিন থাকলে হয়তো—' রমেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে কথাটা আর শেষ করলেন না।

'আবার যখন নীলিমা ফিরবে আপনিও চলে আসবেন—আমি সমরকে বলে দেব।'

'ক'মাস পর আবার আসবার মতো অবস্থা কি আমার থাকবে বেয়ান? থেকে থেকে এমন বুক ধড়ফড় করে আজকাল!'

'ও-সব কথা ভুলে যান তো—এগুলো মনের অসুখ '

'ভুলতে চাইলেই কি আর ভোলা যায়? আর কী করে ভুলব বলুন? সারাদিন নিজের অসুখের কথা ভাবা ছাড়া কি-ই বা করার আছে ওখানে?'

'নাতি-নাতনির সঙ্গে খেলা করবেন—নাতনিকে গল্প বলবেন—'

'ও-সব সাজানো ছেলেখেলা আর ভালো লাগে না। আশেপাশে একটা সমবয়সী লোক নেই যে এসে কাছে বসে আমার সঙ্গে দুটো কথা বলবে। শুধু বুড়ো মালিটা এসে বসে। এক কোপ মাটি কাটে আর আমার কাছে এসে বসে জিরোয়। ওকে ছাড়াই না—তবু তো একজন কাজ করার নাম করে এসে গল্প করে সকাল-বিকেল। জানি না ও আগে যাবে, না আমি—'

'ফের সেই কথা!' সতী ক্ষুব্ধ হয়ে বাধা দিলেন।

'অন্য কী ভাবব বলুন? আর কিসের যে অপেক্ষা করব তাও তো বুঝি না।'

সতী রুটি বেলা শেষ করে খানিকক্ষণ থেকেই উঠব উঠব করছিলেন—উঠতে পারছিলেন না গল্প ছেড়ে।

'এই ক'মাস যে কী আনন্দ পেলাম বেয়ান। তা বাকি ক'টা দিন আর ভুলব না—'

'একটু আনন্দ দিতে আমাদের তো অসাধ নয় বেয়াই—থেকে যান না আরো ক'টা দিন।'

কাল থেকে সতী নিজেও কী নিঃসঙ্গ বোধ করবেন!

'আপনি কাল তো আমার ঘর উজাড় করে নিয়ে চললেন, তারপর আবার আমাকে দোষী করে যাচ্ছেন—'

'লোক দিয়েই কি শুধু ঘর ভরে ওঠে বেয়ান?'

'তবে?'

'তবে আর কি? তাছাড়া কোন্ লোকটা এই বুড়োর কাছে পড়ে থাকবে বলুন তো?'

'মেয়েই তো থাকবে—'

'মেয়ের বুঝি বন্ধুবান্ধবের অভাব আছে ওখানে? হয় পাড়া বেড়াবে, নয় গাড়ি নিয়ে বেরুবে। কত হইচই, কত পিকনিক। আয়া তো আছেই—ভাবনা কিসের?'

সতী চুপ করে রইলেন। কে নালিশ জানাবে কার কাছে? দুজনেই চুপ—সতীর বাঁ হাতে বেলনটা ধরা—ডান হাতটা রুটির থালায় এক্ষুণি উঠে পড়বেন মনে হচ্ছে—কিন্তু উঠছেন না। অনেকক্ষণ থেকেই ঘরের অন্ধকার ছলকে ছলকে এসে পড়ে বারান্দায় গাঢ় হয়ে জমেছে। এবার আলো জ্বালানো দরকার।

'বড় ইচ্ছে ছিল আপনাকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে—সকাল সন্ধ্যা এমনি প্রাণ ভরে গল্প করব দুজনে?'

সতীর বুকটা হা হা করে উঠল। আ-হা এত বড় মান্যগণ্য লোকটার এইটুকু একটা ইচ্ছা! প্রসঙ্গটা আর বাড়তে দিতে চান না বলেই সতী এবার উঠে পড়লেন হাঁটুতে ভর দিয়ে। রুটিগুলি রান্নাঘরে তুলে রেখে রারান্দায় আলো জ্বেলে দিয়ে দেখেন রমেশ ঠায় বসে আছেন নির্বিকার মুখে।

'কি হল বেয়াই?...আসুন রান্নাঘরের দোরগোড়ায় এবার মোড়াটা নিয়ে বসুন, আমি রুটিক'টা সেঁকে নি।'

রমেশ উঠতে গিয়ে কেমন দিশেহারার মত বসে পড়লেন।

'ও কি? অমন করছেন কেন?'

'পারছি না,—পা দুটো কেমন কাঁপছে—একটু ধরবেন আমায় বেয়ান?'

সতী তাড়াতাড়ি এসে হাত ধরলেন। সতীর বাঁ কনুই ধরে প্রায় ঝুলে পড়ে কোনমতে উঠলেন রমেশ।—উঠে দাঁড়িয়ে দুহাতে সতীর ডান হাতটি ধরে বললেন,

'নাঃ আর ওখানে বসব না—আমায় না হয় ঘরেই নিয়ে চলুন—একটু শুয়ে থাকব—'

ঘরে নিয়ে গেলেন সতী। ভয়ে তাঁর নিজেরই হাত-পা হিম হয়ে গেল। হার্টের রুগী যে। ডাক্তারের জন্য পাঠাবেন নাকি?

শুইয়ে দিতে গিয়ে দেখেন, ঘেমে নেয়ে উঠেছেন রমেশ।

'জামাটা খুলে ফেলুন দিকি, আমি পাখাটা চালিয়ে দিই।'

'নাঃ থাক, এখন পারছি না' বলে কাৎ হয়ে আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন রমেশ, দুহাতে সতীর হাতটি কিন্তু তেমনি আঁকড়ে ধরে রইলেন! অনেক্ষণ চোখ বন্ধ করে পড়ে থেকে অস্ফুট গলায় বললেন,

'সারা জীবনে এমন করে নির্ভর করবার মত একটি মানুষ পাই নি বেয়ান।—আমি একটু ঘুমুই, আপনি কিন্তু চলে যাবেন না আমাকে একলা ফেলে।'

'নাঃ—না—সে কি হয়? আমি এখানেই আছি—আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন।'

সতী ডান হাতটি সমর্পণ করে অন্ধকারে বসে রইলেন। গরাদের ছায়া পড়ল মেঝেয়। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে।

রুটিগুলি হয়তো শুকিয়ে উঠল, উনুনটা বোধহয় জ্বলে জ্বলে ধ্বসে পড়েছে। সতী সম্ভবত এই প্রথম এমন করে নিজের কাজ ভুলে বসে রইলেন বিমনা হয়ে।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজ অবধি যত্ন তো কম লোককে করেন নি, কিন্তু সে যত্ন পাওয়ার জন্য এমন আকিঞ্চন আর দেখেন নি। সতী জানালার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। একটিও তারা দেখা যায় না ওটুকু আকাশে।

কাল এই ঘর শূন্য হয়ে যাবে, রমেশ চলে যাবেন। না কি এখনই চলে গেলেন রমেশ? এমন নিস্পন্দ কেন? চিন্তাটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল সতীর। পরমুহূর্তেই ভুল বুঝতে পারলেন সতী। রমেশের সবটুকু প্রাণমন দুটি হাত হয়ে সতীর ডান হাতখানা আঁকড়ে ধরে আছে, তা কি তাঁর শিরায় শিরায় অনুভব করছেন না? কে কবে এমন ভাবে নির্ভর করেছিল তাঁর ওপর?

❧

ভুবনডাঙার জাতখেলুড়ে ॥ গৌরী ধর্মপাল

এক ছিল পুতুল-গড়া বুড়ো। তার বাবা মরার সময় বলে গিয়েছিল, বাবা,

জাত-ব্যাবসা করতে চাও করো
পুতুল-টুতুল গড়তে চাও গড়ো

কিন্তু জেনে রেখো

রূপের কাটি শোনার কাটি
ভুবনডাঙার পাবন মাটি—
এ তিন না হলে সবই মাটি।

বুড়ো বাবার ঐ কথাগুলি ভাবতে ভাবতে দিনরাত খালি পুতুল গড়ে আর পুতুল গড়ে। দিন মানে বুড়ো গড়ে কায়াপুতুল—সাপ খেলানো সাপুড়ে, সাপের জিভ দুটি করে নিজের মাথার সাদা চুল কালো রঙে ছুপিয়ে; খোল-খঞ্জনী হাতে বোষ্টম, সোনা রং খঞ্জনীটি ঝকঝক করে যেন এইমাত্র মাজা হয়েছে; মাছ-বেচুনী মেছুনী, নথটি দিতে ভোলে না আর দুহাতে দুগোছা কাঁচের চুড়ি; মাথায় জটা ত্রিশূল হাতে সন্নিসি, দেখলে যেন ভয় করে; কলসী-কাঁখে বৌ, সিঁদুরটিপটি ডগডগ করে যেন ভোরেব আকাশে লাল সুয্যিঠাকুর; মাথায়-ঝুঁটি গুটিগুটি পড়ুয়া ছেলে, পাততাড়ি বগলেতে পাঠশালে যায়, যেতে যেতে মার পানে ফিরে ফিরে চায়; ঝগড়ুটে শালিক-শালিকনী, মাছ-হ্যাংলা দুধ-ক্যাংলা আপোষা বেড়াল, আরশোলা টিকটিকি ফড়িং প্রজাপতি এলাচ সুপুরি লবঙ্গ ফলের ঝুড়ি—এইসব। দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা জোঁকেরা এসে নামমাত্র দামে কিনে নিয়ে যায় এইসব পুতুল দেশ বিদেশের হাটে চড়া দামে বিক্রি করবে বলে। দেশ বিদেশে তার পুতুলের কেমন কদর কত কদর সে সব অবান্তর খবর বুড়োকে কে আর বলতে যাচ্ছে? বলতে গেলেই যদি বুড়ো বেশী দাম চেয়ে বসে! অথচ এদিকে

গণপতি প্রজাপতি ক্রোরপতি খান
বুড়োর পুতুল ছাড়া বসার ঘরে অতিথি বসাতে লজ্জা পান!
তা সে যাগ্‌গে।

সন্দে হলেই বুড়ো কিন্তু ঐসব হাটবাজারী পুতুলের পাট তুলে রেখে, গড়তে বসে ছায়াপুতুল আর মায়াপুতুল, যেদিন যেমন আসে যখন যেমন ভাসে—জুজুমানা, হাসতে-মানা রামগরুড়ে, একানোড়ে, কট্‌কটেটা, হট্টিমাটিম, মানুষমুখো মস্ত কাছিম, সিংগির মামা ভোম্বল দাস, টাগের জামাই জঙ্গলবাস, গোলাপ সুন্দরী, কিবা মেয়ের ছ্যারি, ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসি, ভাবতে পারো যার-যা-খুশি, গালফুলো গোবিন্দর মা, সাত কাকে দাঁড় বাইছে না,' খোকা ব'লে পাখিটি, শেয়াল পণ্ডিতের টিকিটি, যমুনাবতী সরস্বতী, দিগ্‌নগরের মেয়ে, নয়না-ঘাটের নেয়ে, কানকাটার মা বুড়ি, টিটিংটিঙের খুড়ি, বুই-বিলি-বঙ্কা, কঙ্কাবতী, ময়নামতী, ভবের হাটে হেতিহোতি, গেছো ব্যাঙের দাদাশ্বশুর, তালগাছেতে হুসুরমুসুর, ড্যামরাচোখো,

ঢ্যামনামুখো, ঝাঁকড়াচুলো রাক্কুসি আয়-না লাগাই এক ঘুঁষি—এইসব। সেসব পুতুল দেখে হেসে গড়াগড়ি যায়, ভয়ে ভিরমি খায়, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে পাড়ার যত সামলে-রেখো ডাকাবুকো, কোলতো-না-দূর বীর-বাহাদুর কচি-কাঁচা-কুচোর দল আর তাদের গল্পছড়ার যোগানদাররা।

প্রত্যেক বছর পুজোর সময় বুড়োর এইসব পুতুল দিয়ে মেলায় চমৎকার করে একখানা ঘর সাজায় পাড়ার বড়রা। সঙ্গে থাকে ছড়াই-দিদির ধানসরুসরু ছড়া আর রূপসী মাসির চিঁড়ে-চিলতে গপ্‌পো। দেখে শুনে ঝুঁকে পড়ে লোকের আর আশ মেটে না, বারে বারে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে আসে। মেলার শেষে সব পুতুল বুড়ো ছেলেমেয়েদের দিয়ে দেয় ওমনি-ওমনি, দাম কেই বা দিচ্ছে আর কেইবা নিচ্ছে। খিলখিল হাসি আর ঝিলমিল খুশির মধ্যে ওসব দামটামের কথা তখন মনেও থাকে না ছাই।

তা সে না হয় হল। রাত হলেই কিন্তু বুড়োর মন চলে যায় অন্য রাজ্যে। তখন আর তার আলো-আঁধার শব্দ-স্তব্ধ ভর্তি-ফাঁকা গড়া-আঁকা কিচ্ছু খেয়াল থাকে না। কোথায় আছে সেই রূপের কাটি শোনার কাটি ভুবনডাঙার পাবন মাটি সেই কথা ভাবতে ভাবতে বুড়ো ঘুমিয়ে পড়ে গভীর ঘুমে। স্বপ্ন দেখে কি দেখে না, উঠলে আর মনে থাকে না। কিন্তু উঠলেই মনে হয়, ঐ য্ যা ভেঙে গেল। মনটা ভারি হয়ে যায়, কাজের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে কাঁটার মতো কি যেন খচখচ করে; প্রথম পুতুলটা একবার গ'ড়ে একবার ভেঙে আবার ক'রে গড়তে অনেকখানি সময় লাগে।

এই রকম রোজ বোজ।

এইভাবে দিন যায়।

একদিন পুতুল গড়তে বসে বুড়ো ভাবলে, ধুত্তোরি ছাই, রোজই তো সেই—

আলতাপাটি হাতপা-তলা দাঁড়া বসা দেব্‌দেবতা
কিম্বা মানুষ লম্বা বেঁটে নাকচোখালো খ্যাঁদা ভোঁতা
জামতলাতে ছপণ কড়ি গুণতে-থাকা বুড়ি
ছয়বেহারা পালকি ডুলি, ছিঁচকাঁদুনে খুড়ি
সাপের ঝাঁপি সাপ সাপুড়ে ফুলনবাঁশি
কুডুল দড়ি কাঠ কাঠুরে ভুলন-হাসি
মস্ত পেখম বেশ-তো-ঝুঁটি ময়ূর
দুহাত তুলে নাচছে নিতাই-গৌর
রাখালছেলে কানাইবলাই
বেণু বাজাই ধেনু চরাই
ঢাউস ময়ূরপঙ্খী না'
দাঁড়ী মাঝির আদুড় গা
চালতা বনের বাদুড়
লেজের লাগাও লেজুড়
আতাগাছে তোতা
মুখখানা ভোঁতা
আয় চাঁদ টি
কিষাণের ঝি
ভরাভুঁড়ি

বুড়োবুড়ি
বাঘটা
কাগটা
মাছ
গাছ
মা
ছাঁ
হাঁ—

এই সব গড়ি। সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। আজ গড়ব নতুন কিছু, অন্য কিছু। না পারলে গড়বই না।

গড়ব না তো গড়ব না, বেলা যায় গড়িয়ে, বুড়োর হাতের মাটি হাতে শুকোয়, রঙের বাটি চচ্চড় করে, বুড়োর আর পুতুল গড়া হয় না। রামায়ণের পুতুলমেলা দেখিয়ে পয়সা করবে বলে এক ব্যাবসাদার মাসখানেক আগে বায়না দিয়ে গিয়েছিল, কাজ কেমন এগোচ্ছে দেখতে এসে সে তো হাঁ। ছেলেদের এক ব্যায়ামের আখড়া থেকে যৌগিক আসনের পুতুল গড়ে দেওয়ার ফরমাস এসেছিল, কাজটা বুড়োর বেশ পছন্দও হয়েছিল, কিন্তু এখন কোথায় কি! হাত যেন সরে না, মন যেন নড়ে না, হাঁটুতে থুতনি গুঁজে বুড়ো খালি দাওয়ার ধারে চুপটি করে বসেই থাকে আর বসেই থাকে।

মাসখানেক এইভাবে যাওয়ার পর একদিন বুড়োর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এই রে, সেই যে একরত্তি টিকলুমণি ঠোঁট ফুলিয়ে বলে গিয়েছিল,

রাজা নয়, রাজকন্যে নয়
হাতি নয় ঘোড়া নয়
চাইলুম একটা দেড়-আঙুলে
তাও দিলে না? আচ্ছা না-ই দিলে

আমি বাবার সঙ্গে পিসির বাড়ি যাচ্ছি, সেখান থেকে কিনে আনব, তখন দেখো—তার তো কিছু করা হল না। বুড়ো তাড়াতাড়ি ঝেড়েপুড়ে উঠে একখামচা মাটি নিয়ে গড়তে বসে গেল টিকলুমণির দেড়-আঙুলে খোকা। একটু করে গড়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, আর বলে, উঁহু হয় নি। আবার ভাঙে আবার গড়ে। এমনি করে ভাঙতে গড়তে ভাঙতে গড়তে সাতদিনে তৈরি হল দেড়-আঙুলে পুতুল-খোকা। গড়া শেষ করে রং-টং দিয়ে তুলি বুলিয়ে চোখ দুটি এঁকে বুড়ো ভাবছে, কি যেন বাদ পড়ল, ভাবতে ভাবতেই উঠোনের কোণে কাপাসগাছের বীচি ফট করে ফেটে গিয়ে তুলো এসে পড়েছে দেড় আঙুলের মাথায়, আর কাজল-কুচকুচে ফলের গাছে একটি পাকা-টুসটুসে ফল থেকে টপ টপ করে কালো রস এসে পড়েছে সেই তুলোর উপর। দেখতে দেখতে দেড়-আঙুলে খোকার মাথায় ফরফর করে উড়তে লেগেছে তিন হাত লম্বা চুল। বুড়ো তাড়াতাড়ি সেই চুলে বিনুনি পাকিয়ে ভারি খুশীমুশী হয়ে শুতে গেছে। আর শুয়েই নিঝুম নিথর অথৈ নিতল ঘুম।

পরদিন ভো—রবেলা ঘুম ভেঙে উঠে বুড়ো দেখলে শরীর যেন পালকের মত ফুরফুর করছে, মন যেন নাচে, আকাশ যেন অনেক অনেক অনে-কখানি কাছে। সেই দূরাকাশ নীলাকাশ মহাকাশ যেন হয়ে গেছে পুজোবাড়ির উঠোনটুকু। কে যেন সেই উঠোন ঝাড়ঝুড় দিয়ে পরিষ্কার-ঝরিষ্কার করে এককোণে একটু আগুন জ্বাললে। দেখতে দেখতে আগুনটা গনগন করে উঠল, তার আঁচ মায়ের গায়ের ওমের মতো বুড়োর চোখে মুখে এসে লাগছে। পুবের

পাড়ার জংলা ভিটের হাবুলের মা নিচুগলায় ডাক দিলে, 'ওরে অ হেবো, লাল সুয্যি সাদা হতে চলল, পাখিরা বাসা ছেড়ে কখন উড়ে গেছে, তোর কি ঘুম আজ ভাঙবে না রে?' সে-কথা বুড়ো এখানে বসে দূর থেকে ভেসে-আসা গানের আওয়াজের মতো পষ্ট শুনতে পেলে। বুড়ো বসে বসে দেখতে লাগল, ঘাসখুকুরা শিশিরের মালা পরে চিকমিক ঝিকমিক ফিকফিক করে হাসছে এ ওর গলা ধরে, গাছের আর পাহাড়ের বুড়ী ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাখিরা হাওয়ারা মেঘেরা লুকোচুরি খেলছে অন্তরিক্ষের ফাঁকা মাঠে, মাটিমায়ের সাধগুলি ইচ্ছেগুলি কল্পনাগুলি সব সূর্যের রঙে রেঙে বীজ গাছ ফুল ফল পোকা পাখি থল জল ঘর দোর মানুষ বাড়ি খেত খামার রাস্তা গাড়ি হয়ে ফুটে ফুটে উঠছে থাকছে মিলিয়ে যাচ্ছে। বুড়োর মনে হল, সবাই যেন তার চেনা, আপন, গলার ধুকধুকি, বুকের ধুকপুকি, রক্তের ছলছলানি, নিঃশ্বাসের ফিসফিসানি। এখন সে জলে ডুব দিলে ডুববে না, জল তাকে দোল দেবে। শূন্যে লাফ দিলে পড়বে না, শূন্য তাকে লুফে নেবে। আগুনে ঝাঁপ দিলে পুড়বে না, আগুন থাকে ঝেঁপে নেবে। বাঁশবাগানের শুকনো পাতায় পিঁপড়েদের চলার শব্দ সে শুনতে পাবে ঘরে বসে বসে। ধানীরং শাড়ি পরা খেত্‌নী মেয়ের রূপ দেখবে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে। তার চোখ যেন এখন সব-দেখা চোখ, কান যেন সব-শোনা কান, হাত যেন সব-গড়া হাত...

পিসির বাড়ি থেকে ফিরে টিকলুমণি পুতুল দেখাতে এসে অবাক। একটু হেসে তার হাতে দেড়-আঙুলেকে তুলে দিয়ে বুড়ো বললে, 'কী? পছন্দ?'

পরদিন থেকে বুড়ো আবার কাজে লেগে গেল। এখন বুড়োর হাতের মধ্যে মাটির তাল আপনা-আপনি নড়ে চড়ে পুতুল গড়ে। আঙুলগুলো তাদের ধ'রে আদর ক'রে রাঙায় সাজায় অপরূপের বাজনা বাজায়। বুড়ো তাদের কাণ্ডকারখানা বিভোর হয়ে দেখে আর আশপাশের বাতাসের কানে কানে ছড়া শোনায়—

চক্ষু দুটি কর্ণ দুটি
কার জাদুতে রাত পোয়ালেই রূপের কাটি শোনার কাটি।
সুয্যিছোঁয়ায় আলতা-রাঙা
এই পৃথিবী ভুবনডাঙা।
তার বুকে পা দিয়ে হাঁটি
সেই তো আমার সবার চেয়ে আপনতম পাবন মাটি।
বিশ্বজোড়া খেলাঘরে
কোন সে বুড়োর বুড়োর বুড়ো আকাশ ভ'রে পুতুল গড়ে!
তারার পুতুল চাঁদের পুতুল
উল্কা পুতুল সূর্যপুতুল।
পৃথ্বী-মেয়ে মাটির ঘরে
সে-সব নিয়ে খেলা করে।
মাঝে-মধ্যে খেলা ছেড়ে
খুঁজে বেড়ায় কোথায় আছে মনের মত
সাথ্‌-খেলুড়ে
জাত-খেলুড়ে।
না পেলে তার ভাল্‌ লাগে না।
খেলনাতে আর মন লাগে না।
তখন যত কলম-কালি

রঙের তুলি গল্প-ঝুলি
মনখারাপী রং মাখিয়ে
দেয় সে ফেলে হাত পাকিয়ে।
পৃথ্বীরানির মুখটি ভার
জগৎজোড়া অন্ধকার।
জগৎজোড়া অন্ধকারে
চাবি ঘোরায় কড়া নাড়ে ডাক দে' বেড়ায় দোরে দোরে
ও খেলুড়ে
অ খেলুড়ে—

ডাকতে ডাকতে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ একটি-দুটি দরজা খুলে যায়, ওমনি পাখি ডেকে ওঠে, গান গেয়ে ওঠে, আঁধারের বুকে ঝাঁপিয়ে নেমে আসে অফুরান আলোর ঝরঝর নির্ঝর। রাত ছাপিয়ে দিন ছাপিয়ে ঝরতে থাকে ঝরতে থাকে। সেই একটি-দুটি ঘরে ত্রিভুবন জড়ো হয়, খেলা সুরু হয়, খেলা চলতে থাকে চলতে থাকে।

লীলার গভীরে ।। কবিতা সিংহ

খুব চেনা একটু ভারী গলা। একটু ধরা ধরা। একটু স্ স্ উচ্চারণ। অনেককাল পরে যেন গলাটা শুনলাম। তারপর শুনলাম—ধেত্তেরি, কে আর এত কড়া নাড়ে— চেনাবাড়ি—ধেত্তেরি চল্ ঢুকে যাই।

মস্ত একটা গাদাবোটের মত, মাংসের লহরীতে ভাসতে ভাসতে, ঝলমলে রঙীন কাঞ্জীভরম পরা এক বিশালাকার মহিলা, সাটিনের চক্‌চকে ফ্রক পরা একটা বাচ্চা মেয়ের নড়া ধরে টানতে টানতে আমাদের বাড়ির ভিতরে ঢুকল।

বেরিয়ে এসে চক্‌মেলানো উঠোনের রকে দাঁড়িয়ে, ভালো করে ঠাহর করে দেখে অনেক স্মৃতির টালমাটালে খুশি হয়ে সানন্দে বলে উঠলাম—আরে লীলা! কতদিন পরে!

মানুষের জীবনের বেশির ভাগ গল্পই হয় আশাভঙ্গের। কিন্তু এই ছোট্ট দৃশ্য আমাকে যেন আশাপূরণের একটা বড় ছবি দেখিয়ে মন ভরিয়ে দিল।

আমি কি কখনো ভেবেছিলাম লীলার এই চেহারাটা দেখতে পাবো? এই সারা শরীরে আনন্দের খেলা—সুখ—সন্তান।

—এসো এসো, ভিতরে এসো।

—জানো দিদি, আমারও সংসার হয়েছে। সংসার স্বামী সন্তান।

উত্তর কলকাতার এক বনেদী পরিবারের বৌ হয়েছে। স্বামী দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসার। নিজের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আর লোহার তৈরি গতর খাটিয়ে স্বামী আর কন্যাকে হাতের মুঠোয় রেখে চালায়। আমার জন্য একটা কাশ্মীরী পেপারম্যাসের কৌটো এনেছে। বলল,—একটা মাটির পয়সা জমানোর ঘট করেছিলাম। তাতে ওই বাড়তি নোটটা আস্‌টা ফেলতাম। একদিন ঘট ভেঙে কর্তাকে বললাম, এবার ছুটি নাও, চলো কাশ্মীর বেড়িয়ে আসি! তা নোটে রেজকীতে মিলিয়ে খরচা উঠে গেল!

খুব খুশি হলাম। শুধু সংসার করছে স্বামীকে নিয়ে এমন ফুলকুমারীর মত মেয়েকে নিয়ে বড্ড ভালো লাগলো!

মেয়েকে আমার মেয়ের সঙ্গে খেলতে পাঠিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, ধেত্তেরি! তাই কি হয় নাকি? বরকে বলেছি বটে, আর ওখানে যাই না। কিন্তু যাই—রায় ফোন করলেই যাই। অবশ্য একেবারে আটকে না পড়লে রায় ফোন করে না। তারপর কাজ সেরে ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যে চলে আসি। ওই আয়া-টায়া বলে না আজকাল, আসলে দামী ঝি,—তাই একটা রেখেছি। এককালে বনেদী বেশ্যা ছিল। খুব বিশ্বাসী। মেয়েটাকে খুব যত্নে রাখে।

চা-মিষ্টি খেয়ে, আর একদিন আসবে বলে কথা দিয়ে লীলা চলে গেল।

সেই লীলা!

লীলাকে মনে পড়লেই লীলারই মত কত যে মেয়েকে মন পড়ে। মনে হয়, যেন মরণপণ করেছে—আসলে সমস্তটাই বাঁচার ভূমিকা। একসময়ে একটা স্কুলে পড়তাম। লাস্ট বেঞ্চে

বসে বখামি করত তারা। তারপর মাঝে দশবারো বছর গড়িয়ে গেছে। তাদেরই একজনকে দেখলাম এক অফিসে ভর-সন্ধ্যেবেলা। ঝাপ্‌সা পাউডারে, লিপ্‌স্টিকে রঙীন। শস্তা গোলাপী নাইলনের শাড়ির তলা দিয়ে নীল সায়ার ঝিলিক দেখা যায়। গলায় পুঁতির মালা। এমন একজন অফিসারের সঙ্গে গদ্‌গদ্ হয়ে কথা বলছে, যার মুখের মাংস ঝোলা, চুলের খানিকটা কলপকৃষ্ণ, বাকিটা সাদা।

পরে একসময়ে, ক্যাজুয়াল চাকরি পাবার পর সেই মেয়েটি ভয়ে ভয়ে আমার চেম্বারে এসেছিল। ধরুন মেয়েটির নাম রূপছায়া। বলেছিল, কি ক'রব দিদি, আপনি তো জানতেন, উদ্বাস্তুপাড়ার গরীব ঘরের মেয়ে। খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে এই অবস্থায় পৌঁছেছি। পৌঁছে দেখলাম শরীর দিলে কাজ পাওয়া যায়। তাই শরীরই দিচ্ছি। এমন আরো কত অভিজ্ঞতা হয়েছে। কখনো কখনো সুখের। কখনো বেদনার। কিন্তু কি করা যাবে? স্কুলের চার দেওয়ালের সুরক্ষায় তো সারাজীবন ধরে খিদে তেষ্টা লজ্জা এসব সরবরাহ করা যাবে না। তাই প্রার্থনা করি, যেভাবেই হোক যে কোন পথেই হোক মেয়েরা বাঁচুক। বাঁচার পর তারা ঠিক তাদের মইটা ফেলে দেবে। সে পথে আর পা দেবে না। কিন্তু তাই কি, সবাই কি অতিক্রম করতে পারে? ঠিক এমনি আর একটি মেয়েকে দেখেছিলাম আমেরিকা ফিরতি প্লেনে। পরে এয়ারপোর্টে। এয়ার-হোস্টেস যখন সযত্নে নামিয়ে দিল, তখনও পাথরের মত বসে আছে। আমেরিকা থেকে শুভার্থীরা নামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নিজে গিয়ে 'লাগেজ'টুকুও তুলে আনবার ক্ষমতা নেই। আত্মীয়রা এসেছেন, মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁদের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। চোখের পলকও পড়ে না, এতো স্থির। শ্যামলা চেহারা। দেহে আর কোন লাবণ্য বাকি নেই। মুখের ভাব নির্বোধ অবোলা জন্তুর মত। একদিন এই মেয়েকে দেখেছিলাম উচ্চশিক্ষিত উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে। অনেক স্বপ্ন নিয়ে স্বামীর ঘর করতে গিয়েছিল। তারপর ড্রাগ, সিগারেটের গরম ছ্যাঁকা, হুমকি, ফ্রি-সেক্স পার্টি, মারধোর, মদ্যপান। একা শেষ হয়ে যাচ্ছিল শূন্য একটা ফ্ল্যাটে। দৈবাৎ এক বাঙালী পরিবার এ-সব জানতে পেরে তাকে বাঁচায়। কলকাতায় ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সে মেয়েকে আমি আর কোনদিন জিত্‌তে দেখিনি।

কারণ বেশির ভাগ মেয়েই লীলা হয় না।

কেন লীলা হয় না?

আমার এক দিদির বন্ধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল ছাত্রীর কথা মনে পড়ে। মনে না পড়ে উপায় নেই। অনেকেই মনে করতে পারবেন, একসময় সেই পাগলিনীকে চৌরঙ্গির রাস্তায় প্রায়ই দেখা যেত। ধরুন মেয়েটির নাম ছিল সুযশা। এই সুযশা দিদিকে ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমরা দেখতাম নীহারিকামণ্ডলের একটা সবচেয়ে ঝক্‌ঝকে তারার মত। অধ্যাপকরা বলতেন সুযশা একটা 'একসেপ্‌শন'। সুযশার মত মেয়ে ক্বচিৎ জন্মায়।

ধনী পিতামাতার একমাত্র মেয়ে। শৈশব থেকে এক উঁচু পাঁচিলঘেরা বিশাল বাগানঅলা বাড়িতে বন্দিনী। কেবল টিচারের পর টিচার। পণ্ডিতের পর পণ্ডিত। বাড়ির গাড়িতে মেয়ে-কলেজে পড়তে যাওয়া আর আসা। একটু মেদ-মেদুর। কিন্তু মুখটা প্রতিমার মত।

এ হেন সুযশাদি, সদ্য ঈশান স্কলার পাওয়া সুযশাদি, হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের সঙ্গে পড়তে গিয়ে, পাগলের মত ভালোবেসে ফেলল মনোজ দত্তকে। সে-ও ঝকঝকে ছাত্র। মফঃস্বলের গরীব ঘরের ছেলে। ঠিক হয়তো প্রেম নয়, কিন্তু মনোজের দুর্বলতা ছিল আর একটি সহপাঠিনীর প্রতি। কিন্তু সুযশাদি তো প্রেমের পাকা খেলোয়াড়ের সূক্ষ্ম খেলা জানত না। সে মনোজের প্রতি আকর্ষণকে লুকোতে পারত না, লুকোতে চাইতও না। আসলে এসব দৃষ্টিকটু আচরণ, হয়তো তার আয়ত্তের বাইরেই ছিল। একটা নিঃসঙ্গ, অস্বাভাবিক জীবনযাপন করতে করতে সুযশাদি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। বলা যেতে পারে, সুযশাদির জীবনে একটা

ইলেকট্রিক শকের মত এসেছিল এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা। শেষ পর্যন্ত সুযশাদির বাবা-মা, —অবশ্যই যা মনে হয় টাকা দিয়েই কিনে নিলেন মনোজকে। বিয়ে হয় গেল তাদের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই আশা করেছিল যে ব্র্যাকেটে ঈশান স্কলারশিপ পাওয়া এই দুই ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্রছাত্রী নিশ্চয় আর একবার এম.এ পরীক্ষায় এক অসামান্য চমক জাগাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হল ছেলেটির? কি হল মেয়েটির? সুযশা কি পূর্ণগ্রাস করতে চেয়েছিল মনোজের পৌরুষ আর ব্যক্তিত্ব? মনোজ কি চেয়েছিল টাকার বিনিময়ে নিজের লেখাপড়া, লক্ষ্য ও আদর্শকে ভুলে যেতে? জানি না। কিন্তু বিয়েটা বাঁচল না। শেষ পর্যন্ত তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। সেই সুযশাদিকে আপনারা অনেকেই দেখেছেন। বিশেষ করে যাঁরা এস্‌প্লানেড্ অঞ্চলে ঘোরাফেরা করেন। বছর কুড়িক আগেও চৌরঙ্গীর রাস্তায় দেখা যেত সেই অদ্ভুত পাগলিনীকে। অদ্ভুত ভাবে পরা ভারী ধরনের সিল্কের শাড়ি। মাথা থেকে মোটা সিল্কের হুড্ জাতীয় একটা কাপড় ঝুলত। কখনো গলা থেকে ঝুলত বোরখা জাতীয় কিছু। মুখের রঙ সান্‌ট্যান্‌ড্। রোদে পোড়া। কিন্তু চকচকে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ট্রাফিকের ফাঁকফোকর দিয়ে একবার এ-বাসে উঠছেন, একবার ও-বাসে। আর পরে দেখা হয়েছিল মনোজ দত্তর সঙ্গে। দিল্লীতে পোস্টেড্। আই পি এস অফিসার। চক্‌চকে বৌ। হাতে রঙীন পানীয়। মুখে ফুরফুরে ফাঁকা বুলি।

বালিগঞ্জের সেই বিশাল প্রাসাদোপম বাড়িটার সামনে দিয়ে যাই। লাওয়ারিশ বাড়িটার জানালার কাচ ভাঙা। একটা ফাটল নীচ থেকে উঠে তের্‌ছাভাবে ওপরে চলে গেছে। একদিন ওই লক্ষ্মীশ্রী ভরা বাড়িটায় সুযশাদি আর তার বাবা মা থাকত। বলছিলাম লীলার কথা, অথচ ভেসে এল এমনি কত চরিত্র। অমলই লীলার কথা প্রথমে বলেছিল। বলেছিল,—অবিশ্বাস্য। সত্যি একটি মেয়ে কি ভাবে পারে। কথা নেই বার্তা নেই প্রস্তুতি নেই—যেখানে সেখানে শরীর দিতে...

—কে মেয়ে?

—তার নাম লীলা। আমার বন্ধু স্বপনকে তো দেখেছ তারই 'ছম্মকছল্লু'। স্বপন তো ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে করে। সত্যি মেয়েরা যে কি বাজে হয়!

—কিন্তু বাজে হবার জন্য তো একজন পুরুষও লাগে। কেবল মেয়েদেরই তাহলে দোষ কেন? অমলটা সত্যিই বড্ড একচোখো। অফিসেই আসত লীলা। অমলের ঘরেই বসাত তাকে স্বপন। তারপর বেরিয়ে যেত স্বপন এলে। কখনো কখনো অফিসেরই কোন নির্জন খালি কানাচে, যেমন ওল্‌ড্ রেকর্ড রুমে কিংবা দপ্তরীদের বিশ্রামঘরে,—যেখানে সেখানে। স্বপনের ক্রমশ সাহস বাড়ছিল। লীলার সঙ্গে পরে অমল আমাকেও আলাপ করিয়ে দেয়।

লীলার পরনে টাইট সাদা ব্লাউজ, হাফ্-হাতা। সাদা খোলের প্রিন্টেড্ পাড়ের শাড়ি। বেশ ভারিভর্তি থল্‌থলে শরীর। আকারহীন বিশাল স্তনের উর্ধ্বাংশ ব্লাউজ ও ব্রেসিয়ারের মানা না মেনে বেরিয়ে থাকত। পেটের কাপড় সরে গেলে ভাঁজে ভাঁজে দেখা যেত পলিত পেট। মুখটা গোল ধরনের। গলার নীচে থাক্। কোন এক প্রাইভেট নার্সিং হোমে একটা নাম-কাটা ডাক্তারের সঙ্গে কাজ করত। স্বপনের কাছে অনেকেই আসত—কারো বা বৌ, কারো বা বান্ধবী, লীলার কাজ ছিল বাড়তি ভ্রূণ ঝরানোব কাজে নাম-কাটা ডাক্তারকে সাহায্য করা।

লীলার দৃঢ় ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে স্বপন ওকে বিয়ে করবেই।

একবার স্বপনদের ক্যান্‌টিনে চা খেতে খেতে যখন আমি আর লীলা খুব ঘনিষ্ঠ পর্যায়ে চলে গেছি, তখন লীলা বলেছিল, কি করব দিদি, আমার যে একটা ভরা-ভর্তি সংসার চাই। সংসারের জন্য একটা স্বামী চাই। তাই তো দাদন দেওয়ার মত শরীর দিই। আগাম দাদন। তুমি দেখো স্বপন আমাকে ঠিক বিয়ে করবে। অতটা অকৃতজ্ঞ হবে না। মাস মাস ওকে আমি

কি কম টাকা দিই? বেহালায় বাড়ি করছে স্বপনরা। কাল ও আর আমি যাবো তিনতলায় আমাদের ঘরের সামনে যে চওড়া বারান্দাটা হবে তার গ্রীল্ পছন্দ করতে। অনেক পরে, একদিন লীলা আমাকে ওর ভবানীপুরের পি.জি হস্‌পিটালের কাছাকাছি সরু গলির মধ্যেকার তার আস্তানায় নিয়ে গিয়েছিল। দুশো বছরের পুরনো ড্যাম্প্ বাড়িতে আপাদমস্তক ভাড়াটে বসানো। তার জন্য এখানে সেখানে রান্নাঘর তুলতে হয়েছে, বারান্দা যোগ করতে হয়েছে, সিঁড়ি বসাতে হয়েছে। এমনি একটা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলে লীলার ঘর। ঘরের সঙ্গে একটা ছোট ঘেরা জায়গা, যেখানে লীলার রান্নাবান্না হবার কথা। ওর সব সময়েই একটা জোর খাটানো স্বভাব।

—না না, জুতোটা বাইরে খুলবে না। এখানে ঘরের মধ্যে খোলো। এই নাও বালিশ নাও, কুশন নাও, আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে বসো। তারপর দু'হাতে ঠেলে শুইয়ে দিয়ে ঘাড়ের তলায় দুটো বালিশ গুঁজে দিল। কড়িকাঠে চোখ পড়ল। ড্যাম্পে ভেজা লোহার বর্গায় হলুদ রঙ করা। রাবণের মাথার মত একটা পুরনো ডি.সি. পাখা ঝুলছে। ঝুলতে ঝুলতে ঘুরছেও। দেওয়ালের ইলেক্‌ট্রিক লাইন পুরনো। তাতে অনেক নাঙ্গা ইলেক্‌ট্রিকের তার। হিটারে চায়ের কেট্‌লি বসিয়ে লীলা আমার সামনেই জামাকাপড় ছাড়তে লাগল। লক্ষ্য করলাম সে ব্রা পরে না, বডিস্ পরে। চা তৈরির সময় কেৎলিতে একসঙ্গে দুধ চিনি চা ফেলে সেদ্ধ করে।

—খুব ঘুরে ঘুরে আসছ, না? ভাগ্যিস বাসে দেখা হল। নাহলে কি আর আমার এই আস্তানায় আসতে? ঘরজোড়া তক্তপোষ, জালের আলমারী, তিনচারটে বাক্সতোরঙ্গ। দড়ির আলনায় সব সময় পরার শাড়ি শায়া। আর দেয়ালে ঝুলছে পাঁচমিশেলী কয়েকটা ফ্রেমে বাঁধানো ফটোগ্রাফ। অল্প বয়সে মেলায় তোলা ছবি, লীলার গাঁইয়া চেহারা। লীলা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল—কোথা থেকে আসছিলে তুমি?

—আসছিলাম আত্রেয়ীদির কাছ থেকে। বয়সে আমার মায়ের চেয়েও বড়। ভাবনায় চিন্তায় আমাদের বয়সী অনেকের চেয়ে উদার।

—সে আবার কী। চায়ের মোটাসোটা বেঢপ কাপ এগিয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করল লীলা।

বললাম—আত্রেয়ীদি আজকে একটা গল্প বলছিলেন। সত্যিকারের ঘটনা। বড় মর্মান্তিক। তিনি যখন উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করছিলেন বাঙলাদেশ যুদ্ধের সময়, সেই তখনই দেখেছিলাম এক গ্রামের চাষী-বৌকে। নেতিয়ে পড়ে আছে আর অনর্গল কাঁদছে। আর তার বাঁচার বাসনা নেই। জীবনের কিছুই বাকি নেই। সে কেমন একটা মানুষ—একটা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হয়ে-যাওয়া মানুষ। যখন বাঙলাদেশে যুদ্ধের সময় খান সেনারা ঢুকে পড়েছিল তাদের গ্রামে, ধানক্ষেতে লুকিয়ে পড়েছিল তারা অনেকেই। তারপর ধানক্ষেতে তারা লুকিয়ে আছে জেনে সমস্ত শুকনো খড়ক্ষেত যখন খান সেনারা জ্বালিয়ে দেয় তখন আগুনের আগে আগে ছুটতে ছুটতে তারা সামনেই পেয়ে গিয়েছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত একটা ট্রাক। মিত্রপক্ষের ট্রাক। তখন আর ভাববার সময় নেই। একরাশ নারীশিশুকে গাদিয়ে নিয়েছিল গাড়িটা, তার মধ্যে ঠেলে তুলে দিয়েছিল তাকেও। যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রাক ছুটে যাচ্ছে ভারতবর্ষের দিকে, তখন ভয়ঙ্কর আতঙ্ক আর দ্বন্দ্ব কাটাবার পর মেয়েটি সজ্ঞান হয়ে ওঠে।

—নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও আমারে—আমি যে ঘরে আমার দশ মাসের পোলাডারে ঘুম পাড়াইয়া আইস্যাছি! বাচ্চার জন্য তখন সে পাগলের মত ট্রাক থেকে নেমে পড়তে চায়।

কিন্তু তখন আর কে তার কথা শুনবে? কে তার দুঃখ বুঝবে? ট্রাক চলেছে ঝড়ের বেগে বর্ডারের দিকে—ভারতবর্ষের দিকে।

লীলা তার চায়ের কাপটায় শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা পাশে রেখে বলল, তারপর?

তার দিন পনেরো বাদে আত্রেয়ীদি আবার মেয়েটিকে দেখেছিলেন। ক্যাম্পে দিব্যি জমিয়ে

নিয়েছে সে। অনেক সখি। অনেক বান্ধবী। শরীরে স্বাস্থ্যে আবার নতুন করে ঝলমল করে উঠেছে সে। আবার মাথার খোঁপায় একটি ফুলও গুঁজেছে—জীবনবোধের সত্য আর বাস্তবকে এই গল্পটার মধ্যে দিয়েই আত্রেয়ীদি—

ইতিমধ্যে লীলা চায়ের পেয়ালাগুলো রেখে এল। মুখোমুখি বসল। বলল, গল্পটা তুমি বিশেষ করে আজ আমাকে বল্লে কেন? তার কিছুটা হয় তো বুঝেছি। হয়ত আমাকে সবাই যে চোখে দেখে তার অনেকটাই তুমি বোঝো। তবু তুমি আমাকে আমার জীবনে মাথা নীচু হতে দেখনি বলে,—তুমি আমায়—

আচম্‌কাই একটু পরে বলে উঠল লীলা,—এক আধবুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। আমার একটা ছেলেও আছে। তার বয়স এখন চোদ্দ বছর। সে আমার মায়ের কাছে গাঁয়ে থাকে। ওখানেই পড়াশুনো করে। কলকাতায় আমার কাছে কখনো দু-চার দিনের জন্য থাকতে এলে ওকে আমার ভাই বলে পরিচয় দিই।

তারপর লীলা বলেছিল তার কর্মস্থলের কথা। তার অদ্ভুত পেশার কথা। চৌরঙ্গীর পুরনো কালের বাড়ির জঞ্জালে সেই নাম-কাটা কুশলী ডাক্তার রায়ের কাছে তার চাকরির কথা। লোকটা বিদেশ ফেরত নামকরা কুশলী গাইনি ছিল একসময়ে। একবার মধ্যরাতে ময়দানের প্রান্তে একটা অপরিণত ভ্রূণ ফেলতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। তারপর কেস হয়। বাতিল হয়ে যায় তার রেজিস্ট্রেশন। কিন্তু কি নিপুণ হাত ডাক্তার রায়ের! কি কুশলী গর্ভমোচন! ফুলসুদ্ধ নিখুঁতভাবে উপ্‌ড়ে আনেন ভ্রূণ। রক্তপাতের যতটুকু না হলে নয় মাত্রই ততটুকু। না, কেবল অবিবাহিতা মেয়েরাই নয়, আসে অপারগ বিবাহিতারাও! আসে অভিনেত্রীরা, নাচিয়েরা, গায়িকারা, আসে সন্তান চায় না যারা—সেইসব উবর্শী রম্ভারা। তিনমাস পর্যন্ত গর্ভপাত কিছুই নয়। কিন্তু তারপরই বিপদ।

যেসব শিশুদের কেউ চায় না, অথচ গর্ভপাতেরও সাহস বা সুবিধা নেই,—তাদের দু-একজনকে দেখিয়েছিলেন আত্রেয়ীদি। বলেছিলেন,—দোলনায় শোয়ানো ওই বাচ্চাটিকে দেখছ? ফরসাপানা? ওর একটা চোখ নেই আর নেই বাঁ পায়ের আধখানা। বনের মধ্যে পড়েছিল। শেয়ালে শকুনে খুবলে খাচ্ছিল। এক হৃদয়বান সাঁওতাল ওকে তুলে আনে। আর ওই শিশুটি—ওকে যখন একটা পোঁটলায় করে এক খুনখুনে বুড়ি গঙ্গায় ফেলতে যায়, তখন পাড়ার ছেলেদের কেমন যেন সন্দেহ হয়, তারা বুড়ির কাছে গিয়ে পোঁটলাটা দেখতে চায়। আমাদের এখানে যখন বাচ্চাটাকে নিয়ে এল ওরা, বাচ্চাটার সারা গায়ে পিঁপড়ে ধরে গেছে—লাল পিঁপড়ে।

আর একটি ক্ষেত্রে আমাদের পৌঁছাতে একদিন মাত্র দেরি হয়ে গিয়েছিল। একটি মফঃস্বলের হাসপাতালে এসেছিল একজন কুমারী মা। মেট্রনের কেমন যেন সন্দেহ হয় মেয়েটির হাবভাব দেখে। সে আমাদের খবর দেয়। ফোন করে বলে বাচ্চাটিকে আপনারা ওর মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিন। আমি যেন কেমন বিশ্বাস করতে পারছি না ওর মাকে। আমরা একদিন সময় নিয়েছিলাম ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য। মেট্রনকে বলেছিলাম, একদিন মাত্র চোখে চোখে রাখতে বাচ্চাটিকে। পরদিন নতুন জামাকাপড় কাঁথা তোয়ালে নিয়ে যখন বাচ্চাটাকে আনতে গেলাম, তখন মেট্রন বললেন, কাকে নিতে এসেছেন? সে আর এ জগতে নেই। কাল রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর সেই রাক্ষসী বাচ্চাটার মুখের ওপর ভারী বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে মেরে পালিয়ে গেছে।

যখন পৃথিবীর কুখ্যাত খুনের ইতিহাস পড়তে হয়, তখন মায়ের হাতে সন্তানের মৃত্যু—তা মায়ের নিজের বাঁচার পাগলপারা বাসনায়—খুব কম নয় সংখ্যা-গণনা করলে।

দুর্বল মন, অসহায় পরিস্থিতি, কামনা, বাসনার তৃষ্ণার শিকার মেয়েরা দারিদ্র্যের কবলে

পড়েও তো সন্তানকে গলা টিপে মারে, মুখে বিষ তুলে দেয়, কুয়োয় বা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দেয়। জীবন আমাদের সঙ্গে এই নিষ্ঠুর রসিকতা করেনি বলেই আমরা সমালোচনার সৎ-অসৎ বিচারের ধ্বজা তুলি। কিন্তু নিজেদের যদি এই যন্ত্রণার মধ্যে পড়তে হত? কি করতাম? আমি জানি না—কিন্তু মন্তব্যের চেয়েও, একজন লেখক হিসেবে ঘটনার দলিল অবশ্যই রেখে যেতে চাই।

সেদিন লীলা বলেছিল,—আমি ঘর চাই দিদি। ঘর-সংসার স্বামী-পুত্তুর সব চাই। এই নার্সের জীবন, এই অপারেশন টেব্‌লে স্ত্রীলোকদের ভিতর থেকে অপূর্ণ ভ্রূণ বের করে আনার কাজে ডাক্তারকে সাহায্য করতে আমার মন চায় না। কিন্তু সেদিন সেই দামী সিল্কের শাড়ি আর গয়না পরা, ফুটফুটে মেয়ে নিয়ে আহ্লাদী লীলাকে দেখে আমি বুঝেছিলাম সেদিন লীলা মিথ্যা বলেছিল। এখনও সে যায়, ডাক্তার রায় ডাকলেই যায়। এখনও সে ভ্রূণমোচনে তাঁকে সাহায্য করে। তারপর সেই রোজগার দিয়ে, তার বেঁচে থাকার নুন ভাত নয়, প্রথম শ্রেণীর কামরায় কাশ্মীর যাত্রার টিকিট বুক করে। লীলার কিন্তু আর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু লীলার লোভ যায়নি। তার লোভের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু মিথ্যে কথা বলেনি নীলিমা।

নীলিমাকে আমি লীলার কাছেই দেখেছিলাম প্রথমে। একটা জিতে যাওয়া মেয়ের পাশে একটা হেরে যাওয়া মেয়ে। নীলিমা থাকত লীলারই পাশের ঘরে। কখনো কখনো তারা দুজনে একসঙ্গেই রান্নাবান্না করতো। একটা প্রাইভেট নার্সিং হোমে নার্স সেজে থাকা, আসলে আয়ার কাজ করত নীলিমা।

নীলিমা লীলার রান্নায় সাহায্য করছিল। লীলার ইচ্ছে আমি সেদিন লীলার বাড়ি খাই। আগের দিন একটা রীতিমত ভয়ঙ্কর কেসে উৎরে গেছে লীলা। সাত মাসের গর্ভমোচন।

কেসটা ভালোভাবে উৎরে গেছে। মাংস কিনে এনেছিল লীলা। নীলিমা জনতায় সেই মাংস কষছিল। লঙ্কা, হলুদ, রসুন, হলুদ, আদা, পিয়াঁজ, দই মাখানো মাংস। লাল লাল চর্বিসুদ্ধ খাসীর মাংসের টুক্‌রো। কাঁচা সরষের তেল মাখানো। চক্‌চকে। আমি সেই মাংসের টুকরোগুলোর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম।

মাংসের টুক্‌রো। নীলিমা খুন্তি দিয়ে তলার মাংস ওপরে, আর ওপরের মাংস তলায় দিয়ে নাড়ছিল। নাড়ছিল আর গল্প করছিল।

নীলিমার কনুই খস্‌খসে। হাতদুটো পোড়া কাঠের মত। মুখটা মাংসহীন। লম্বাটে। গাল অসমতল। চোখ ঢোকা। মাঠ কপাল। খোঁপাটি চুলের অভাবে খুবই ছোট। এত রোগা যে তার বুকও যেন প্লেন হয়ে মিশে গেছে ব্লাউজের তলায়। বয়স কত হবে? আমি ঠিক ধরতে পারছিলাম না।

লীলা বলল—কিরে, গত তিনমাস ধরে তো তোর টিকিও দেখতে পাচ্ছিলাম না। অথচ পাশের ঘরে থাকিস। সেই যে কেঠো কেঠো চেহারার লোকটার সঙ্গে ঘুরছিলি কদিন, সেটাও কি কেটে গেছে?

নীলিমা চুপ করে রইল।

—এ লোকটার সঙ্গেও—

নীলিমার উত্তর নেই।

—আবার সর্বনাশ বাধিয়েছিস তো?

—হ্যাঁ।

—ওই কেঠো লোকটাও তোকে বিয়ে করল না? বলছিলি না আগের বৌ মরে গেছে।

দুটো ছেলে আছে। ছেলেপুলেসুদ্ধ সংসার। কিন্তু টেঁটিয়া লোকটা কিছুতেই নীলিমাকে বিয়ে করল না। এখন সর্বনাশ বাধিয়ে বসে আছে। কিরে নীলিমা, কমাস?

—বেশি নয়, দেড়মাস।

—একটি হাজার টাকা খসাতে হবে! ডাক্তার রায় আর কতবার তোমায় বিনাপয়সায় টেবিলে তুলবে?

নীলিমা কেমন সহজ স্বরে, যেন নুন নেই বা চিনি নেই এমনি সহজ স্বরে বলল, কিন্তু এখন আমার কাছে পুরো একশোও নেই।

—চমৎকার! চমৎকার! দ্যাখো দিদি, একে এনিমিয়াগ্রস্ত, গায়ে এক ফোঁটা রক্ত নেই। এই নিয়ে, তা বার ছয়েক হল, কেন অমন করিস নীলি?

নীলিমা কিছু বলল না। লীলা কোমরে হাত দিয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর সবজান্তার গলায় বলল, এরপর কি হবে তা আমি সব জানি। এখন রোজ রোজ আমার ঘরে আসবে। তারপর আসা যাওয়াই নয়, থেকে যাবে। তারপর পায়ে পড়বে। হাতে পড়বে। তারপর গলায় দড়ি দেবার ভয় দেখাবে। জানো তো দিদি, একবার জেলে পর্যন্ত গিয়েছিল। একটা বজ্জাৎ ডাক্তার লোভ দেখিয়েছিল বিয়ে করবে বলে। নীলিমা বোঝেনি যে ডাক্তার ওর বোকামি আর সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ওর হাত দিয়ে ওষুধ পাচার করায়। এভাবেই পাচার করতে করতে ধরা পড়ে গেল একদিন। ডাক্তার তো কেটে বেরিয়ে গেল। বলল,—আমি কি জানি? বিয়ের কথা শুনে হেসে বলল,—ওই পোড়াকাঠ প্রাইভেট সেবিকাকে বিয়ে করব আমি? আপনাদের বিশ্বাস হয়?

—আমাদের নীলিমা প্রেমে ডগমগ। আয়নায় নিজের চেহারাটাও কি দেখে না দিদি?—নে এবার তোর জন্য জগুবাজার থেকে বেশ ভালো মজবুত দেখে একটা দড়ি আমি আগে থাকতেই আনিয়ে রাখব।

লীলা সাবান তোয়ালে নিয়ে হাতমুখ ধুতে বেরিয়ে গেল।

মাথা নীচু করে ছিল নীলিমা। কোন কথা বলছিল না। আসলে কিই বা বলবে?

যতটা নরম করে বলা সম্ভব ততটা নরম করেই আমি বললাম—নীলিমা, এমন কর কেন? এমনটা বার বার? একই ভুল?

—কি করব বলো? বিশ্বাস করো, আমার ভালো লাগে না। আমি পুরুষদের কেন সহ্য করি জানো? কারণ ওদের জন্য না—আসলে আমার বাচ্চা চাই। দিনের পর দিন আমার কাজই হল মায়েদের পেট থেকে বাচ্চা বের করে আনা। অথচ আমার নিজের কোনও বাচ্চা নেই। সেই বাচ্চার জন্য কোনও বাবা নেই। আমি কখনো সংসার করিনি, সংসারে থাকিনি। কেবল দূর থেকে দেখেছি, লোকে কেমন করে সংসার করে।

—কেন, সংসারে মানুষ হওনি তুমি?

—না। অনাথাশ্রমে মানুষ হয়েছিলাম। ছাদে উঠে, আলসেয় বুক ঠেকিয়ে, ঝুঁকে ঝুঁকে নীচের মানুষের সংসার দেখতাম। মা বাবা ভাই বোন পর্যন্ত সম্পর্কগুলো বুঝতাম। দেওর, ননদ, বৌদি, ভাইঝি, ভায়রাভাই, এসব সম্পর্ক ঠিক বুঝতাম না। দাদাশ্বশুর দিদিশাশুড়ি এসব সম্বন্ধও গোলমেলে ঠেকত। এককালে আঠারো বছর বয়সে ওরা যখন আমাকে অনাথাশ্রম থেকে ছেড়ে দিল তখন আর কোথায়ই বা যাই? একবারে মানুষের সংসারে ভর্তি একটা নতুন জায়গা,—যার নাম পৃথিবী, সেখানেই গিয়ে হাজির হলাম।

সংসার বড় ভালো লাগে আমার। উটের কাঁটাগাছ চিবিয়ে রক্তঝরা ভালোবাসা। বাসনের মাজা গায়ে ঠিক্‌রে পড়া আলো। লক্ষ্মীর পট। দোল্‌নায় শোয়ানো কচি বাচ্চা। বিশেষ করে কচি বাচ্চা! তাই তো বাচ্চার বাবাকে পাবার জন্য ঘুরে মরি। আগাম শরীর দিয়ে সন্তুষ্ট

করতে চাই। সে যা বলবে তাই করব। সংসারে বিনাপয়সার বাঁদি হয়ে থাকার সুখ চাই। যে কোনও ভাবে সংসার চাই।

আজ লীলাকে দেখে সেই নীলিমার গল্পটা মনে পড়ল। অর্ধেকটা শোনা আর অনেকটা না-শোনা গল্প। কি হয়েছে? কি খবর নীলিমার?

লীলা হেসে বলেছিল, আমি সংসার পেয়েছি, আর নীলিমা সংসার কেড়ে নিয়েছে।

—কেড়ে নিয়েছে?

—হ্যাঁ, কেড়েই নিয়েছে।

—নীলিমার কথা বলো। আমি একটু শুনি।

—তোমার তো ডাক্তার রায়কে মনে আছে। তার একটা খেঁকুরে এ্যাসিসট্যাণ্ট ছিল। তার নাম গঙ্গাদা। রোগা, কালো, সিড়িঙ্গে। ডাক্তার রায়ের সঙ্গে ছায়ার মত থাকত। আমরা গঙ্গাদাকে অনেক সময়ে ঠাট্টা করেছি—এবারে তুমি একটা বিয়েটিয়ে লাগিয়ে দাও গঙ্গাদা। আমরা সব একটু পেটপুরে খাই।

নীলিমাকে নাম-কাটা ভ্রূণ জবাই কয়ার কারখানায় দেখতে পেলেই ফোড়ন ফেলা লঙ্কার মত চটে যেত গঙ্গাদা। বলত, ওই এসে হাজির হয়েছে! নাও বাচ্চাখুনীর মদৎ করো!

—শালা! বাচ্চায় বাচ্চায় ঘেন্না ধরে গেল। গঙ্গাদা বলত। উরিব্বাস বিয়ে বাচ্চা গড়ার র-মেটেরিয়াল! জানো আমার নিজের মা, দশ-দশটা বাচ্চা বিইয়েছিল। একটা না একটা কোলে কাঁখে আছেই। বাচ্চায় আমার ঘেন্না ধরে গেছে। সব্বনেশে ব্যাপার মনে হয়, সেই জন্যই আমার ঠিকমত বাড় হয়নি। এ জন্মটা তো বিয়ে বাচ্চা ছাড়াই চলুক। পরের জন্মে সব হবে'খন। লীলা বলল, নীলিমাকে যখন ডাক্তার রায়ের নার্সিং হোমে নিয়ে গেলাম, তখন গঙ্গাদা বলল, তুমি আবার এসেছ? তোমার লজ্জা করছে না?

নীলিমার তো জানোই সেই একটা ভাঙা রেকর্ড আছে। সেটাই গঙ্গাদার কাছে বাজাল আবার। তার বাচ্চা চাই। বাচ্চার জন্য একটা পদবী চাই। পদবীর জন্য একটা বাবা চাই। আর সব মিলিয়ে চাই একটা সংসার।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তারপর?

লীলা বলল, তারপর? অদ্ভুত ঘটনা ঘটল দিদি।

নীলিমাকে যখন অপারেশন টেব্‌লে তোলা হচ্ছে—তখন ডক্টর রায় এলেন। হাতে দস্তানা পরলেন। মাথায় সাদা ঢাক্‌নি। কোমরে এপ্রন। বিরক্ত কণ্ঠে বললেন,—নীলিমা, তোমার শরীরের ভিতরের যন্ত্রপাতিগুলোর জন্য অন্তত মায়া করো। কতবার তোমার জরায়ুর মুখ জোর করে খুলে ফিটাসটাকে সাঁড়াশি দিয়ে টেনে বের করব?

কিন্তু কি আর করবেন ডাক্তার রায়। নীলিমা তাঁর কাছেও তো কাজ করে। অত পয়সা সে পাবে কোথায়? তাই তো নীলিমার বিপদে আপদে ইচ্ছে না থাকলেও পয়সা না থাকলেও তাঁকেই দেখতে হয়। দায়িত্ব নিতেই হয়।

—সে এক অদ্ভুত ছবি। আমি কোনদিন ভুলব না দিদি। আর কারো কাছে বলতেও পারব না। নীলিমা তখন অপারেশন টেব্‌লে। পায়ের কাছে আমি। ডক্টর রায়। মাথার কাছে এ্যানাস্‌থেটিস্ট্‌ বলাইদা। হঠাৎ গঙ্গাদা ডক্টর রায়ের কাছে এগিয়ে এল। এমনটা গঙ্গাদা কখনো করে না। হঠাৎ গঙ্গাদা মিন্‌ মিন্‌ করে ডক্টর রায়কে কি যেন বলল।

ডক্টর রায় ধমকের সুরে বললেন, কি বলছ গঙ্গা? পরিষ্কার করে বল?

গঙ্গাদা বলল, ডাক্তারবাবু, আসলে আমি নীলিমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

ডক্টর রায় বললেন, করো।

গঙ্গাদা বলল, নীলিমা!

নীলিমা একবার এনাস্থেটিস্ট্ বলাইদার মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, বল গঙ্গাদা! গঙ্গাদা বলল, নীলিমা। তুমি আমায় বিয়ে করবে?

আমি নীলিমার পা দুটো ফাঁক করে বাঁধতে যাচ্ছিলাম। যাতে বাকি কাজটা করার সুবিধা হয় ডক্টর রায়ের। আমি ফিতে দুটো সরিয়ে রাখলাম। বলাইদা মেশিনটা একটু সরিয়ে দিল। ডক্টর রায়ের চোখদুটো ঝকঝক করে উঠল। হাতের দস্তানাটা খুলে ফেললেন তিনি। কোমরের এপ্রনের ফাঁসটাও। নীলিমা উঠে বসল।

সে বলল, তুমি কি বলছ তা ঠিকঠাক জান গঙ্গাদা?

—জানি!

—তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

গঙ্গাদা বলল,—পেটের বাচ্চাটাকে মেরো না নীলিমা, ওকে আমি আমার পদবী দেব।

লীলা বলল, দ্যাখো দিদি, চোখে আমার জল আসছে—

আমি বললাম—একটাই প্রশ্ন আছে। নীলিমা কেমন আছে এখন?

—সুখে আছে। ছেলের নাম রেখেছে গঙ্গাপদ। গঙ্গাপদ হালদার। গঙ্গাদা তো ছেলে-অন্ত-প্রাণ।

—আর তুমি?

—আমাদের বাড়িতে রেড্ করতে গিয়ে আমায় ধরেছিল। সুতরাং বুঝতে পারছ সবই জানে, ডাক্তার রায়ের কথাও জানে, আমার পুরোনো পেশার কথাও।

—কিন্তু তারপর?

—জীবনটা একটা অদ্ভুত জিনিষ দিদি, ইচ্ছে করলে রবারের মত ভালো ভালো ছবিও মুছে ফেলা যায়। যেমন আমি নিজের হাতে ঘষে ঘষে মুছেছি আমার ছেলেটার মুখ।

দেখলাম লীলার কাজলটানা চোখের কোলে অশ্রুজল উপ্‌চে আসছে।

আবার এসেছে আষাঢ় ।। নবনীতা দেবসেন

"Behold! The heavens do open, the Gods look down and the unnatural scene they laugh at–"

এ কি কাণ্ড! এ যে একেবারে থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম বানিয়ে ফেলেছিস অমন দারুণ বৈঠকখানাটাকে?"—ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাদামণি থমকে দাঁড়ান। এই দৃষ্টিটাকেই রবীন্দ্রনাথ বোধহয় বলেছেন 'নিমেষহত'। নিশ্বাস বন্ধ করে চোখ বুলোতে থাকেন ঘরময়। দৃষ্টিটা যেন পুলিশ সার্জেণ্টের হাতের টর্চ লাইটের মত থেমে থেমে প্রত্যেকটা জিনিস চেঁচেপুছে স্পর্শ করে যায়—আর লজ্জায় আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত (সংস্কৃতে বলে পা থেকে মাথা) ভারি হয়ে উঠতে থাকে। দাদামণির নজর ফলো করে আমিও ঘরটা নতুন চোখে দেখছি। ঝকঝকে ইতালীয় মার্বেল পাথরের মেঝে, কালো মার্বেল আর মাদার অব পার্ল বসিয়ে বর্ডার দেওয়া। সেই মেঝের ওপরে থাকার কথা সোফা-কৌচ-কার্পেটের—সাধারণত এঘরে তারাই থাকে—কিন্তু এখন আছে? (১) একগাদা লেপ তোশক, বেডকভারে পুঁটলি বাঁধা—পুঁটলির ফাঁক দিয়ে ময়লা মশারি উপ্‌ছে পড়ছে বাইরে। (২) তিনটি বিশাল পুঁটলিতে বহু বাতিল হওয়া জামাকাপড়—মাদার টেরিজা, রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রমের জন্য রাখা। (৩) সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা খুলে ফেলে তার ন্যাড়া ড্রয়ারগুলো পাশাপাশি দাঁড় করানো। তার ওপরে কিছু তাকিয়া, কুশন, আর ছ'সাতটা বক্সফাইল। টেবিলের মাথাটা বইয়ের তাকের গায়ে হেলান দেওয়া। তার ওপরে একটা শার্ট ঝুলছে। শার্টের ওপরে বেড়ালটা ঘুমোচ্ছে। আরামে। (৪) মেঝেয় একটা বিরাট বারকোশের ওপরে কয়েকটা তেলরঙের টিন, টার্পিন তেলে ভেজানো বুরুশ, বোতল, শিরিষ কাগজ, পুটিং-এর তাল। (৫) চতুর্দিকে সাত আটটা প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগে ভরা দরকারী কাগজপত্র, খেলনাপাতি, চিঠিপত্র, ফটো। (৬) একধামা শিশিবোতল (খালি)। (৭) একধামা সাদা গম। (৮) একটা বিশ লিটারের বৈয়ামে কেরোসিন। (৯) ঘরের মাঝখানে একখানা গদি—তাতে খাতা বই কলম চাবি চশমা। (১০) যে খাটের গদি সেই খাটটির কাঠের অংশগুলি খুলে উল্টোদিকের দেয়ালে হেলানো। তা থেকে ভিজে তোয়ালে ঝুলছে। (১১) মেঝের ওপরে হার্মোনিয়ামের বাক্সো। তার ওপরে টিভি। তার ওপরে একটি কাচের বাটির মধ্যে দুটো তাজা বেলফুলের গোড়ে মালা সুরভি ছড়াচ্ছে। (১২) একটি কার্পেটের ওপরে রাণীর মত সগৌরবে অচল টেলিফোন এবং তার পদতলে, মোসাহের মতো, ভূটানী সারমেয়ী কুতুল্ বসে আছে। কার্পেটটা আবার উল্টো পাতা। (১৩) বইয়ের তাক কিছু খালি করা হয়েছে—মেঝেয় বইয়ের স্তূপ—তারই ওপরে ইতস্ততঃ যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ, সুনীলমাধব সেন, দেবীপ্রসাদেরা শুয়ে আছেন, অজস্র রেকর্ডের দ্বারা পরিবৃত হয়ে। (১৪) দুটি বিরাট স্টিরিও স্পীকার মেঝের ওপরে পাশাপাশি রাখা। তার ওপরে

কিছু শূন্য চায়ের কাপ ও জলের বোতল। একপাশে অযত্নে পড়ে আছে তার রেকর্ড চেঞ্জারটা—তার ওপরে দুটি আম। এক প্লেট ঝুরিভাজা।

—"ছি! ছি! ছি!"—দাদামণির ক্ষোভে দুঃখে বাক্‌রোধ হয়ে যায়। "করেছিস কি! এ যে বন্যার্তদের শিবির!" হাতের ছাতাটা দিয়ে মেঝের কোণটা দেখালেন, যেমন ডেমনস্ট্রেটররা দেখায় ছড়ি দিয়ে— "এ সব কী? ঘরদোর ঝাঁটপাট দেওয়ার পাট কি তুলে দিয়েছিস?"

ঘরভর্তি কুতুলের লোমের সাদা সাদা বল উড়ছে। যত্রতত্র চুনবালি। দেওয়াল ও ছাদ থেকে খসে-পড়া। ঝুলের টুকরো ইতিউতি উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতির মত, পাখার বাতাসে ডানা মেলে।

—"ঈস্‌স্‌—চোখে না দেখলে, বিশ্বাস হতো না যে এ ঘরটার এই মূর্তি করা যায়। করা সম্ভব!"

লজ্জায় মাথা ঝুলিয়ে বসে আছি।

—"নাঃ তুই আর ভদ্দলোক হলি না খুকু! সংসারী জীব আর হলি না! দেখেছিলি, খবরের কাগজে বেগম অব আউধের ছবি? কেমন গুছিয়ে রাণীর মতই সংসার করছেন নিউ দিল্লির প্ল্যাটফর্মে? বেয়ারা বাবুর্চি ছেলে মেয়ে ৬টা শিকারী কুকুর ফুলের টব পার্সিয়ান কার্পেট চাইনিজ ভাস, সব সমেত। যে রাণী হয় সে প্ল্যাটফর্মকেও প্রাসাদতুল্য করে নিতে জানে। আর যে স্বভাব ভিকিরি সে প্রাসাদকেও প্ল্যাটফরম বানিয়ে ফ্যালেচ। ছোঃ।"

প্রথমে দাদামণির লেকচারটি হজম করি। তারপর ঝাঁজিয়ে উঠি।

—"দেখতে পাচ্ছো না? বাড়িতে মিস্ত্রী লেগেছে? ঘরে সোফা কৌচ নেই, শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, স্টাডি, সব ঘরের জিনিস এই ঘরে জড়ো করা? সব কিছু মেঝেতে নামানো? খাট টেবিল সবই খোলা? সব কিছু পুঁটলি বাঁধা? এমনিভাবে বুঝি আমি থাকি? এই একটি ঘরই নেয়নি—বাকি সবগুলো ঘরই যে মিস্ত্রীরা নিয়ে নিয়েছে! গুছিয়ে রাখবই বা কী করে, রেখেই বা কী হবে? আবার তো তুলতে হবে যথাস্থানে? এটা তো টেমপোরারি—"

—"নিয়ে নিয়েচে? নেবে কেন? কেন নেবে? তুমি দেবে তবে তো নেবে? তুমি দিলে কেন?"

—"ওরা সব ঘরে কাজ শুরু করে দিলে একসঙ্গে।"

—"বলি, একসঙ্গে সব ঘরে মিস্ত্রী লাগানোর কথা কে কবে শুনেছে? তুই দিয়েছিস কেন ঢুকিয়ে? একখানা ঘর করবে, সব শেষ করে সাজিয়ে দেবে, তারপর আরেকখানা ঘর। এ আবার কেমন ধারা কাজের ছিরি?"

—"আমি কী করব? রহমানকে কন্ট্রাক্ট দিয়েছি। সে যেমন ভাবে করবে তেমনি ভাবে হচ্ছে তো। সে একসঙ্গে দু তিনটে ঘর করছে। আমরা আর সাজিয়ে তুলতে সময় পাচ্ছি না। একে একে সবই এই বড় ঘরে এসে জমছে। ভাঁড়ার ঘর, শোবার ঘরগুলো, স্টাডি, সবই বেএক্তার হয়ে আছে যে।"

—"শোবার ঘর সব ক'টায় কাজ হচ্ছে?"

—"কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু সব আলো পাখা নষ্ট হয়ে গেছে তো। ও ঘরগুলোতে শোয়া যাচ্ছে না। এ ঘরে আলো পাখা ঠিক আছে।"

—"আলো পাখা নষ্ট হয়ে গেছে তো? কেন গেল?"

—"বলতে পারি না। হয়েছে এটুকু জানি। রহমান বলছে ব্রাশের টানে অমন হয়েই থাকে?"

—মোটেই হয়েই থাকে না। তোমাকেও পেয়েছে গাধা। তোদের ইলেকট্রিক মিস্ত্রী নেই?"

—"এনেছিলাম। সে বলল ঘড়াঞ্চি ছাড়া পাখা সারবে না। ঘড়াঞ্চি ওর কাছে নেই—অন্যত্র কাজ হচ্ছে। সেখানে আছে।"

—"ঘড়াঞ্চিওয়ালা আর কোন মিস্ত্রী নেই পাড়ায়?"

—"নাঃ আর অন্যরা সব মইওলা পার্টি। মইতে হবে না।"

—"তা শুচ্ছিস কোথায়? এ ঘরেই? খাট তো খোলা । এই মেঝের গদিতে তো একজন মাত্র—বড়জোর দু'জন—"

—"ঐ ফোলডিং খাটে আরেকজন। আর মাদুরের ওপর ডানলোপিলো পেতে আরেকজন, ঐ কর্ণারে। ভাগ্যিস ঘরটা বড় ছিল!"

—"এই ঝুলকালি-চুনবালির মধ্যে মাটিতে শুস্ কী করে? ঝাঁটপাট বন্ধ কেন? ঝ্যাঁটা নেই তোদের?"

—"ঝ্যাঁটা থাকবে না কেন? ঝি নেই। কাজ ছেড়ে দিয়েছে।"

—"দেবে না? ঘরদোরের যা ছিরি? থাকলে তো পাগল হয়ে যাবে।"

—"সে বলেছে মিস্তিরি না বেরুলে সে আর ঢুকবে না। তাই নিয়মিত সাফাই হচ্ছে না। ওই মজুরদেরই দুটো করে টাকা দিয়ে ঘরটর মুছিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু রোজা করছে বলে সব দিন ওরা বেশি খাটতে চায় না। কাল মোছেনি। কাল আগে আগে চলে গেছে। আজকে ঈদ কিনা। আজ ওরা ছুটি করেছে।"

—"আজ ঈদ, প্লাস রথ! কোথাও না কোথাও কেলেঙ্কারি হবেই মনে হচ্ছে। দু'চারটে ভালরকম হাঙ্গামার স্টোরি আজ না হলেই নয়।" ঘরের সুদূর কোণে একমাত্র চেয়ারটি দখল করে বসে কাগজ পড়তে পড়তে দীপু এতক্ষণে পরিতৃপ্ত সুরে কথাটা বলল, পায়ের কাছে মেঝে ভর্তি সিগারেটের ছাই, দেশলাই কাঠি, পোড়া সিগারেটের টুকরো, শূন্য প্যাকেট। হাত-খানেক দূরেই শূন্য অ্যাশট্রে-টি ঝকঝকে হাসছে। দাদামণি দেখলেন। এবং হুঙ্কার ছাড়লেন।

—"ওঠ্ ব্যাটা হিপ্পি! তোল সিগারেটের টুকরো! কেন, ঐ অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতে পারো না? পাশেই রয়েচে?"

জগতে সবই নশ্বর, ছাইই বা কী, ছাইদানিই বা কী—এমনি একখানা মুখের ভাব করে দীপু পা দিয়ে টুকরোগুলো একত্র করতে থাকে। দেখে দাদামণি খুশি হন। তারপরেই ভুরু কুঁচকে যায়। কান খাড়া করে শুনতে থাকেন। কোথায় একটা ঘস্ ঘস্ ঘস্ ঘস্ শব্দ হচ্ছে। অনন্ত।

—"ব্যকগ্রাউণ্ড মিউজিকটাও তো মন্দ দিসনি? ও কিসের শব্দ?"

—"পালিশ মিস্ত্রী। বাথরুমের পাথর পালিশ করছে।"

—"পা-লিশ?" দাদামণি হেসে ফেলল। "বাড়ির তো এই অবস্থা, এর মধ্যে পালিশ?"

—"না না, বাথরুম রিপেয়ারিং পেন্টিং কমপ্লিট। পালিশ হলেই এর ঘর শেষ। পঞ্চু এসেছে, ওর তো ঈদ নেই।"

এমনি সময়ে, ঠিক মাথার ওপরে অকস্মাৎ ঠঠাং ঠঠাং করে একটা বিকট শব্দ শুরু হয়। প্রচণ্ড শব্দ। বাড়ি কাঁপে।

—"ও বাবা!" দাদামণিও দৃশ্যত কেঁপে ওঠেন। "ওটা আবার কীরে? কী পেটাচ্ছে ওটা? লোহার কিছু?"

—"ও কিছু না। ট্যাঙ্কটা ভাঙছে বোধ হয়।"

—"ও কিছু না? ট্যাঙ্কটা ভাঙছে বোধ হয়? কিসের ট্যাঙ্ক? কে ভাঙছে? কার হুকুমে ভাঙছে?" দাদামণি ক্ষিপ্তপ্রায়।

—"মানে ঐ জলের বড় ট্যাঙ্কটা খুব পুরনো হয়ে ফুটো ফুটো হয়ে গিয়েছিল তো? ওটা

বদল করেছি। এক পুরনো লোহাওলা সেটা কিনেছে। সে-ই এসেছে ট্যাঙ্কটা কেটে টুকরো করে নিয়ে যাবে বলে।''

—''ওহ! তাই বল্! যাই বলিস খুকু বাড়িটাকে সত্যি সত্যি ইস্টিশানে পরিণত করেছিস। ভদ্দলোকে থাকতে পারে এতরকম শব্দের মধ্যে? কাকিমাকে কি ভয়ঙ্কর কষ্ট দিচ্ছিস ভেবে দেখেছিস? ভাগ্যিস আর নিচে নামতে পারেন না—এ ঘরটা দেখলেই সিওর হার্টফেল, কিংবা সেরিব্রাল! ওই বীভৎস আওয়াজেও আয়ুক্ষয় হচ্ছেই—সাউণ্ড পলিউশান একেই বলে—'' বলতে বলতেই চোখ পড়ল ঘরের আরেক কোণে—''অ্যাঁ? যামিনী রায়, সুনীলমাধব—সব মাটিতে ফেলে রেখেছিস? তোল তোল তুলে রাখ—কাকাবাবুর যত্নের এসব জিনিস তুই ধ্বংস না করেই ছাড়বি না দেখছি—'' বলতে বলতে নিজেই তুলতে শুরু করেন ছবিগুলো। ''জানিস, আমেরিকায় এ ছবির এখন কত দাম?'' তার পাশেই একটা তেতলা রথ—কাগজের শেকলের মালায় অর্ধসজ্জিত। বাকী শেকল, কাঁচি, আঠা, রঙিন কাগজ সমেত ভূলুণ্ঠিত। কারিগরগণ বোধহয় অন্য কোন দুষ্কর্মের টানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন আপাতত। মোমবাতি, কাঁসর প্রস্তুত।—''ওঃ, আজ রথ! বিষ্টি হবেই। আকাশও সেজে আসছে। আমি ঘুরেই আসি, বিষ্টি নেমে গেলে মুশকিল হবে। নে, ঘরদোর গুছিযে রাখ—আমি চারটে পাঁচটা নাগাদ ফিরে যেন সব টিপ্‌টপ্ দেখি। ভালো করে চা খাওয়াবি তখন—'' যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন দাদামণি। আজকাল দুর্গাপুরে বদলি হয়েছেন এবং এবার বেশ মাস তিনেক বাদে এলেন।

দাদামণি বেরুতেই ঝাঁটা ঝাড়ন নিয়ে লেগে পড়ি চুনবালি কুকুরের লোম সাফাইয়ে। গোপাল ঘোষ, যামিনী রায়দের তুলে রাখি স্টিরিওর স্পীকার দুটোর মাথায়। কাপডিশ বোতল টোতল ট্রেতে করে সরিয়ে ফেলি। টুকরোটাকরাগুলো যথাসাধ্য তুলে ট্রে ভরে ভরে গুছিয়ে রাখি। জুতোটুতো সরিয়ে দিই। গমের ঝুড়ি আর কেরোসিনের টিন রান্নাঘরেই পাঠাতে হবে—তার আগে জানলাগুলো বন্ধ করি। প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে। দাদামণি না ভিজে যান। বাচ্চারা রথই বা টানবে কেমন করে? আমার পক্ষে অবিশ্যি ভালই হলো বৃষ্টিটা হয়ে। জলছাদটা এত খরচ করে যে ফের পেটানো হল—পড়ার ঘরে জল পড়া বন্ধ হল কিনা সেটার একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে। পড়ার ঘরটা বৃষ্টির জলের চোটে অব্যবহার্য হয়ে গিয়েছিল। রহমান বলেছে তিরিশ বছরের মধ্যে আর জল পড়বে না, পড়ার ঘর এমনই রিপেয়ার করেছে।

জানলাটানলা বন্ধ করে ফের নজর করে দেখলুম এত ঝাঁটপাট দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়েও ঘরটাকে থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুম থেকে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমেও উন্নীত করা যায়নি। অতগুলো ধ্যাবড়া বড় বেডকভার জড়ানো পুঁটলি, মেঝে ভর্তি বই, খোলা খাট, খোলা টেবিল, খোলা স্টিরিও সিস্টেম, দুখানা ধামা, এসব যাবে কোথায়? হারমোনিয়ামের ওপরে টিভি সেট? তার ওপরে গোড়ে মালা? যাকগে যাক। আর পারি না।

পুজোর লেখা সব বাকি। আজ মিস্ত্রী নেই—এই ফাঁকে কাগজ কলম নিয়ে মেঝের গদিতে উপুড় হই। একটা বড় গল্প আধখানা লেখা হয়ে পড়ে আছে। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। কড়কড়াৎ বাজ পড়লো কোথায়। সীজনের প্রথম বড়ো বৃষ্টি। শব্দটা খুব ভালো লাগছে। ট্যাঙ্ক কাটা বন্ধ রেখে মিস্ত্রী নেমে গেছে নিচে। পঞ্চু অবিশ্যি ঘষে যাচ্ছে। তার শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছে বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্। এই সময়ে এক কাপ চাও হলে হত।

—''ঝর্ণা? এক কাপ চা হবে নাকি? ঝর্ণা!''

এই বাক্যের সোনার কাঠিতে হেঁটমুণ্ড দীপু প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেই চেঁচাতে শুরু করে—"ঝর্ণা! ঝর্ণা! চা! চা!" সিঁড়িতে ঝর্ণার মাথা দেখা যায়। একগাল হেসে বলে—

—"চা হবে নে—আন্নাঘরে তুলকেলাম!" সদাহাস্যময়ী ঝর্ণা বুড়ো আঙুল দেখায়।

—"মানে? রান্নাঘরে তুলকালাম! কেন?"

—"জল পড়তেছে গো, জল! আন্নাঘর জলে থৈ থৈ কত্তেচে—চাল আটা তেল চিনি সোব ঘেঁটেঘুটে একাক্কার—" দুই হাত নেড়ে শূন্যে গ্লোবাকৃতি করে ঝর্ণা।

—"সেকি? কী করে হলো?"

—"কে জানে কী করে হলো! আমরা তো জিনিস সরাত্তিই টাইম পাচ্চিনি—এই বাটি বসাই তো ঐখেনে জল পড়ে—ওখেনে থালাপাতি তো সেইখেনে ঝরঝর করে জল—আমরা খালি ছুটোছুটি করে থালাবাসন পাততিচি আর ঘর পুঁচতিচি—একেবারে বোকা বাইনে দেচে! এ্যাকোন চা-টা হবে নে, আগে এটু সামল দিয়ে নি।"

—"তা সামাল আর দিচ্ছো কোথায়? দিচ্ছো তো লেকচার"—দীপু বলে।

—"মা তো বলেচে আজ বিষ্টিতে খিজড়ি আন্না হবে? তাই ভগমানই আন্নাঘরে আবনা আবনি খিজড়ি এঁধে একেচেন—দ্যাকো গে যাও।"—

দীপু এবার বলে, "বাজে বোকো না—রান্নাঘরে আবার জল পড়বে কী করে? জল তো পড়ে পড়ার ঘরে।"

—"সে ঘর তো শুকনো খটখট কত্তেচে—এ লোতুন ফুটো গো—আগে ছেলনি!"

—"জল পড়ছে তো চা করতে কী হয়েছে? আশ্চর্য!" দীপু আর একটা যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করে ঝর্ণার কাছে বকুনি খায়।

—"উদিকে নংকাকাণ্ড হচ্চে—বলে কিনা, কী হয়েচে! তুমি নিজেই চা করে দ্যাকো না?"

—"যা না দীপু, দ্যাখনা একবার ব্যাপাবটা কী?"

—'যাচ্ছি, যাচ্ছি! বাব্বা। এক কাপ চাও চাইবার উপায় নেই। অমনি সংসারের একটা কাজ ধরিয়ে দেবে।" বলে দীপু টিভির ওপর পা তুলে দিয়ে—জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে—'ইস দিদি—বাইরেটা কী সুন্দর হয়েছে—"এবং উদাস গলায় গান ধরে—"মেঘছায়ে সজলবায়ে—" ওপরে যাবার লক্ষণ দেখায় না।

সত্যিই বাইরেটা ভারি মোহময় হয়েছে তো? সামনের কদম গাছটাতে বৃষ্টি যেন মণিমাণিক্যের মতো ঝকঝক করছে—মেঘমেদুর আবছা ঝাপসা আলোর মধ্যেও কী উজ্জ্বল ওর সবুজ রংটা—কে বলে আমাদের আদরেব কলকাতা মুমূর্ষু?

—"মা! মাগো! কী মজা! কী মজা! দেখবে এসো দিম্মার বারান্দায় নদী হয়েছে—" নাচতে নাচতে চুমপা এল। হাতে স্প্যানের মলাটে বানানো নৌকো।

—"নদীতে কত জল—ankledeep-এর চেয়েও বেশি, আমার প্রায় knee-deep জল—দিদি নৌকো ভাসাচ্ছে। এটা নিয়ে সাতটা হবে,—দিম্মা বলেছেন সপ্তডিঙ্গা।"

—"ওগুলো সব গিয়ে নালীর মুখ বুজিয়ে দেবে—এত বৃষ্টির মধ্যে নৌকো তো ভাসবে না, বৃষ্টি থামলে।"

—"এত বৃষ্টি কোথায়? কমে গেঁছে তোঁ? ভাঁসছেঁ তোঁ—বলতে বলতে টুমপা নৌকা সমেত পালায় তেতলায়। পরমুহূর্তেই তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শোনা যায়—

"মা! মা! দেখবে এসো— কী মজা! দিম্মার ঘরের মধ্যেও কি সুন্দর জল ঢুকছে—flood-এর মতন—"

তার পরেই মায়ের সেবিকা পুতুলের আর্তনাদ।

—"ও দিদি! ও কানাই! কী হবে! ঘরে যে জল ঢুকছে! ঝাঁটা? ঝাঁটা কোথা?"

—"সমস্তই তোমাদের নৌকো ভাসানোর প্রতিফল!"

মূর্তিমতী অরসিকা হয়ে ব্যাঘ্রগর্জনে এবং ব্যাঘ্রকম্পনে তেতলায় ধাবিত হই। এবং ঝাঁটা হস্তে জলভরা বারান্দায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। কানাইই বা অমন কাব্যিক বাক্যবন্ধকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ ছাড়বে কেন? 'ঝাড়ু হাতে এল, কানাই—সেও হাঁটু অবধি লুঙ্গি উঠিয়ে ঝাড়ু নিয়ে নেমে পড়ে টুমপার নদীতে। দুজনে মিলে বুজে যাওয়া নর্দমার ঝাঁজরিকে আক্রমণ করি। এই মিস্ত্রী খেটেছে তো? চুনবালি সব ঢুকেছে বোধহয়—একগাদা ভিজে কাগজের নৌকোর শব তোলা হয়—ম্লানমুখে পিকো-টুমপা ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান—তাদের দিম্মা সান্ত্বনা দিচ্ছেন—"সপ্তডিঙ্গা মাধুকরী ডুবেই থাকে দিদি—কিন্তু আবার ঠিকভেসে উঠবে দেখো—" কিন্তু ওরা কিছুই শুনছে না। নর্দমার খনিগর্ভ থেকে কানাই একে একে শণের নুড়ো, দেশলাই কাঠি, ইঁটের কুচি, শুকনো ফুলের মালা—এই জাতীয় প্রচুর রত্নরাজি উদ্ধার করছে। আস্তে আস্তে জলটা দিব্যি নামতে শুরু করলো। আমিও ঝাঁটা ফেলে, নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নাঘরের 'তুলকালাম' পরিদর্শনে যাই।

ছাদের মাঝখান দিয়ে জল পড়ছে। মেঝেয় আমার একটা ধোয়া শাড়ি ব্লটিং পেপারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চারিদিকে থরে থরে থালাবাটি কাপডিশ বিছোনো। তার মধ্যে বৃষ্টির জল ধরা হচ্ছে। আমার সাধের জাপানি ছাতাটি কায়দা করে মিট্‌সেফের সঙ্গে আটকে, তার নিচে বসে একা একাই বেধড়ক রাগারাগি করে মিস্ত্রীদের চর্তুদশপুরুষ উদ্ধার করতে করতে বাটনা বাটছে ঝর্ণা। রান্না করবার টেবিলের তলায় গ্যাসরিংটি নামিয়ে তার নিচে সঙ্গোপনে রান্না চড়ানো হয়েছে। ভয়ে চায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে, নিঃশব্দে কেটে পড়াই মঙ্গল মনে করে পা টিপে টিপে সরে আসি—পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন। নিচে গিয়ে লেখাটা ধরতে হবে।

নিচে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়ে পায়ে যেন জলের মতোই কী ঠেকলো। আরে, এঘরে আবার জল আসবে কী করে। বোতল ভাঙলো নাকি? নজর করে দেখি বড় খাটের পালিশ করা খোলা অংশগুলি ভিজিয়ে দাপটে জলস্রোত আসছে। কোথা থেকে আসছে? দুটো জানলাই তো বন্ধ? জানলার ওপর বইগুলো তো শুকনো? তবে তো জানলা দিয়ে নয়। ভাঙা কাচ-টাচ দিয়ে আসা অসম্ভব ছিল না—তবে সদ্য কাচ সবই সারানো হয়েছে—তবে? ঐ তো জলটা ধেয়ে আসছে বইয়ের র‍্যাকের তলা দিয়ে কুলকুলিয়ে। কাপড়ের পুঁটলির গা বেয়ে। কার্পেট ভিজিয়ে—কুতুল উঠে গদিতে চড়ে বসেছে—টেলিফোন উঠে সরে যেতে পারেনি, তাই ভিজে যাচ্ছে। সর্বনাশ! এত জল কোত্থেকে আসছে?

কুতুলটাও আশ্চর্য! সত্যি! উঠে গেছে, অথচ একটুও ঘেউ ঘেউ করেনি। করবেই বা কেন? জল তো চোর নয় ডাকাতও নয়, যে ঘরে ঢুকলে কুকুরকে চেঁচিয়ে তার জানান দিতে হবে? জল তো আউট অব সিলেবাস! কিন্তু একটু আগেও তো জলটল ছিল না? এই তো ওপরে গেছি বারান্দা সাফ করতে—এর মধ্যেই এত জল এল কী করে? বৃষ্টি তো কমেই গেছে! দীপুটাই বা কেমন? চুপচাপ এর মধ্যে বসে আছে? দেখছে না?

—"দীপু!" হাঁকটি ছাড়ি, প্রায় কাপালিকদের মতো। কিন্তু কোথায় দীপু? চেয়ার খালি। বাড়িতে চায়ের সুবিধে হবে না বুঝে তিনি নির্ঘাৎ পাড়ার দোকানে গেছেন। আশ্চর্য ছেলে! সংসারসুদ্ধু চুলোয় যাক, তার দৃষ্টিপাত নেই। চা-সিগারেট হলেই হলো।

—"পিকোলো! টুমপা! কানাই! ঝর্ণা! পুতুল! শিগগিরি নেমে আয়! শিগগিরি! নিচের বৈঠকখানা ভেসে গেল জলে—" আমি আমার সংসারের টোটাল ম্যানপাওয়ার ব্যবহার করতে চেষ্টা করি—প্রত্যেকটি মানুষকে মোবিলাইজ না করলে এ সংকটের মোচন অসাধ্য।

—"জল? বৈঠকখানায়? ও-ম্মা! কী মজা!"

—"কই? কই? কই? সত্যি বলছ তো?"

মহোল্লাসে কলরোল করতে করতে দন্ত বিকশিত করে দুই কন্যা লাফাতে লাফাতে এসে পড়ে। ঠাস্ ঠাস্ করে দুই থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করল আমার। এটা যে সমূহ বিপদ, ওরা তা বুঝতে পারছে না। মজা পাচ্ছে? মেঝেভর্তি আমাদের যাবতীয় ভূসম্পত্তি-বই, রেকর্ড, এবং অন্যান্য সবই যে মুহূর্তের মধ্যে জলমগ্ন ও বিনষ্ট হবে, এই ঘরে যে বান ডেকেছে—ওরা কিছুই টের পাচ্ছে না—নির্বোধ শিশু কাঁহাকা! জলের উৎস সন্ধানে তার গতিপথ অনুসরণ করে পাশের ঘরে উপস্থিত হই—কাপড় ঢাকা খাট, কাপড় ঢাকা গডরেজ আলমারির মাঝখান দিয়ে বাঁশের ভারার তলা দিয়ে বিপুল ক্রমবর্ধমান জলরাশি খবরের কাগজ ঢাকা দেওয়া ট্রাঙ্ক স্যুটকেস ড্রেসিং টেবিলের তলা ভিজিয়ে ছুটে এসে আমার পদসেবা করে সানন্দে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। উৎস, নর্দমা। কোণের নর্দমাটি দিয়ে বাইরের রেনওয়াটার পাইপের প্রবল জলকল্লোল অনায়াসে দোতলার শয়নকক্ষে অনুপ্রবেশ করছে। মাথার ওপর তিনতলার বারান্দায় কানাই তখনও সিংহবিক্রমে ঝাঁটা নিয়ে জলযুদ্ধ চালাচ্ছে, তার সম্মার্জনী ঝংকার শুনতে পাচ্ছি।

মুহূর্তেই ঘটনাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। যত জল আমরা ওপর থেকে ঠেলে দিচ্ছি, সব জল বেগে পালিয়ে এসে আমারই শোবার ঘরে শেলটার নিচ্ছে। কোনো বিশেষ কারণে জল একতলায় নামতে পারছে না। কি সর্বনাশ! প্রথমে ওপর থেকে জল নামা রুখতে হবে।

—"কানাই! অ কানাই! ঝাঁটা বন্ধ কর্, ঝাঁটা বন্ধ কর্"— বলতেই কানাইয়ের আরো জেদ চেপে গেল! সে তো নিচের সমস্যা জানে না? আমি যত চেঁচাই—'ঝাড়ু থামা'—ও তত বলে—"আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না দিদি, এই তো আর একটুখানি—জল সব সাবাড়!" তার রোখ চেপেছে, বারান্দা সে নির্জলা করবেই!

—"অ পুতুল! অ ঝর্ণা! প্লিজ কানাইকে থামাও! বারান্দার জল বারান্দাতেই থাকা ভালো, ও জল নাবিয়ে কাজ নেই—জলটা থাকুক, জলটা থাকুক, নর্দমা বুজিয়ে দাও—বরং নর্দমার মুখে ন্যাতা গুঁজে দাও—" শুনে কানাই ভাবলে দিদির মাথা খারাপ হয়েছে, সে আরো জোরে ঝাঁটা চালায়। নিজের কানকে অবিশ্বাস করে পুতুল ও ঝর্ণা নিচে আসে এবং ব্যাপার দেখেই রান্নাঘরে দৌড়ায়—নাঃ এ ন্যাতা-বালতির কেস নয়—এ কেলোর কীর্তি,—ওয়ার ফুটিংয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে। যে যা পারে, থালা বাসন নিয়ে বালতি ডেকচি নিয়ে হাজির। টুমপা পিকো সমেত কাঁসি নিয়ে কড়া নিয়ে মেঝের জল ছেঁচে বালতি ডেকচিতে তোলা হতে লাগলো—কুতুল হঠাৎ জেগে উঠে ঘরে এত লোক এত হৈ চৈ দেখে, বেধড়ক চেঁচাতে শুরু করলে—হট্টগোল শুনে পালিশ মিস্ত্রী পঞ্চু ছুটে এল, এবং অবস্থা দেখে বললে জালিটা ভেঙে না ফেললে জল বের করা যাবে না। বলেই কোথা থেকে একটা লোহার রড এনে ঝাঁজরিটা ভাঙতে শুরু করে দিলে। আমি চেষ্টা করছি একবার গদিটা টেনে সরাবার—রেকর্ডগুলো ভাগ্যিস জলের যাত্রাপথে নেই—ঘরের অন্যপাশে আছে—একবার লেপ তোশকের পুঁটলিটা নড়াতে চেষ্টা করছি—করতে কিছুই পারছি না—পুতুল দুই হাতে ঝাঁটাটা ক্রিকেট ব্যাটের মতো বাগিয়ে ধরেছে। দুহাতে জল পেটাচ্ছে, তার চেষ্টা জলটাকে বই আর গদির দিক থেকে সরিয়ে দরজার দিকে পাঠাবার—যে যার পজিশন নিয়ে নিয়েছি। ঝর্ণা দরজার কাছে দীপুর একটি জীনস্ জিভছোলা মতো করে দুটো পা দু'হাতে ধরে ছেঁচে ছেঁচে ঘরের সব জল নিয়ে সিঁড়িতে ফেলছে।

এতক্ষণে কানাইও নিচে এসেছে। এসেই আধোভিজে লেপ তোশকের গন্ধমাদনটা ওঘরের খাটে তুলেছে। স্টিরিও স্পীকার দুটো গদির ওপর তুলেছে। ওঘরের খাটের নিচে থেকে

স্যুটকেসগুলো বের করে শুকনো জায়গায় রাখছে—আর বলছে—"য্যাতো ঢাকন সবই উপ্রে আর য্যাতো জল, সবই নিচে—এ্যার বেলাইতি ছুটকেশ সব ভিজ্যে গেল গাঃ।"

হঠাৎ জল ছেঁচা ফেলে টুমপা কেঁদে উঠলো "আমার রথ! আমার রথ একদম ভিজে গেল—ওমা! আমার রথ!" আর পিকো চেঁচাচ্ছে—"মা! মা! স্টিরিও! স্টিরিও!"

স্টিরিওর মা কী করবে? অতবড় জিনিসটাকে কানাই দুই হাতে তুলে, হঠাৎ লক্ষ্মণের ফলধরা অবস্থায় পড়ল—সেটাকে নামানোর জায়গা নেই—বিন্ধ্যপর্বতের মতো কুঁজো হয়ে অনন্ত অপেক্ষায় রয়ে যায় কানাই। প্রত্যেকেই আমরা চেঁচাচ্ছি, প্রত্যেকে প্রত্যেককে নির্দেশ এবং উপদেশ দিচ্ছি একই সঙ্গে, এবং মা ওপর থেকে অনবরত তাঁর ঘন্টিটা এক নাগাড়ে বাজিয়েই চলেছেন পাগলা ঘন্টির মতো, আর বলছেন—"ওরে তোরা কোথায় গেলি? ওপরে কেউ নেই কেন? বারান্দায় যে এখনো অনেক জল রয়ে গেল!"

এদিকে দোতলায় তো প্রত্যেকের কাসাবিয়াংকার অবস্থা! কারুরই স্টেশন ছেড়ে নড়বার উপায় নেই—মা বেচারী কিছুই টের পাচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে একতলায় তিনটে অধৈর্য ডোরবেল বাজলো। কেউই সাড়া দিতে পারছে না। ওদিকে পঞ্চু ঝাঁজরি ভেঙে ফেলে সর্বনাশ করেছে। "ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল গরজি উঠিছে বিপুল রোষে"। বিনা বাধায় দ্বিগুণ বেগে ঘরে জল প্রবেশ ঘটছে। আবার বেল! আবার! আবার! এবার ঝাঁটা হাতে পুতুল ও সান্‌কি হাতে পিকোলো উঁকি দিল। নিচে ধোপদুরস্ত দুজন অধীর, অভিযোগনিরত ভদ্রলোক। আমাদেরই নিচের তলার বাসিন্দারা।

—"আমাদের ঘরে আপনাদের জল ঢুকছে। একটু যদি জলটা না সামলান তবে—"

—"স্বচক্ষে দেখে যান জল সামলানো হচ্ছে কি হচ্ছে না—" ওপর থেকে উত্তর যায়।

তারা স্বচক্ষে দেখতেই আসছিলেন, কিন্তু অত্যুৎসাহী ঝর্ণা অতো না বুঝে আরেক ক্ষেপ জল ঝাড়ে—এবং নায়াগ্রার মত জলপ্রপাত হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে নেমে তাঁদের হাঁটু অবধি সিক্ত করে দেয়। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে জল নেমে একতলাব দরজার তলা দিয়ে ওঁদের ঘরে ঢুকছে। চৌকাঠ না থাকায় কুফল।

—"দরজার নিচে দুটো বস্তা লাগিয়ে নিন!" এবারে আমিই চেঁচাই—"সিঁড়ির নিচে আছে!"

নিচের ভদ্রলোকরা যথার্থই ভদ্র, এবং বুদ্ধিমান। মুহূর্তেই বুঝে নেন, এটা সংকটজনক মুহূর্ত—এবং সঙ্গে সঙ্গে রেসকিউ পার্টিতে যোগ দেন। অর্থাৎ দৌড়ে নিচে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে বেরিয়ে রেনওয়াটার পাইপটি পরিদর্শনে লেগে যান। উপুর হয়ে চিৎ হয়ে উঠোনে শুয়ে নানাভাবে নল খোঁচাখুঁচি করে তাঁদের ডায়াগনোসিস হলো—"নল তো জ্যাম! একেবারে অনেকদূর পর্যন্ত। একবারে কংক্রিট হয়ে গেছে—মিস্ত্রীরা ভেতরে সিমেন্ট ফেলেছে নিশ্চয়ই—অতএব পাইপ ভর্তি হয়ে গিয়ে জলটা দোতলায় ঢুকছে।" এবার শুরু করলেন নলটি ভেঙে ফেলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। তাই দেখে আমার মনে পড়ে গেল—আরে! লোহাওয়ালা কোথায় গেল? সেই যে ট্যাঙ্ক ভাঙছিল? তার তো যন্ত্র আছে!

লোহাওয়ালা রকে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। বেণীর সঙ্গে মাথা না হোক, মাথার সঙ্গে বেণী—ট্যাঙ্কের সঙ্গে রেনওয়াটার পাইপও পাবে শুনে মহা উৎসাহে সে ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে লেগে পড়ল, ঠঠাং,ঠঠাং, ঠঠাং...কিন্তু তার আগেই—যুবক পঞ্চুর রডের অবিরাম ধাক্কার কাছে পঞ্চাশ বছরের পুরনো বেনডটি আত্মসমর্পণ করল। আর কত সইবে? পঞ্চু সমানেই খুঁচিয়ে যাচ্ছে—তার দৃঢ় ধারণা এখানেই কিছু জমে আছে—তার খোঁচানোর চটে মর্চে-ধরা লোহার নলটি গর্ত হয়ে গেল, এবং দোতলার ওপর থেকে দুটো নল দিয়ে নোংরা জল কিছু

ইট পাটকেল-শণের নুড়োসমেত প্রবল ধারায় নিচে কর্মরত পরোপকারী ভদ্রলোক এবং লোহাওয়ালার মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ভয়ে কাঁটা। ছিঃ ছিঃ—কী কাণ্ডটাই হয়ে গেল। কিন্তু মানুষের মন ভারি আশ্চর্য বস্তু ভিজে যাওয়া মানুষগুলির কণ্ঠ দিয়ে যে উল্লাসধ্বনি নির্গত হলো—সেটা রবি শাস্ত্রীর ছক্কা মারার সময়েই মানায়। পঞ্চুকে দেখাচ্ছিলও রবি শাস্ত্রীর মত।

জল ঢোকা বন্ধ। এবারে রিল্যাক্স করে আমরা অর্থাৎ দোতলার জলকর্মীবৃন্দ ঘরের জল, বারান্দার জল, সিঁড়ির জল, যাবতীয় জল সাফ-সুতরো করতে থাকি। আমার হাঁটুর কাছে কাপড় তোলা। হাতে নারকেল ঝাঁটা। একমনে ঘরের জল ঝাঁট দিচ্ছি। ওয়ারফুটিং থেকে এবারে গার্হস্থ্য পর্যায়ে নেমে এসেছে কর্মের জাতীয় চরিত্র। এবার শুনতে পাই পাগলা ঘন্টির সঙ্গে সঙ্গে শয্যাবন্দী মা চেঁচাচ্ছেন—"ওরে! ভাত পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে যে?—ওপরে কি কেউ নেই?"

ঝর্ণা জিভ কেটে ছুটলো ওপরে। হঠাৎ আমার কানের কাছে—

—"দিদি!"

—"কে রেঃ—" চমকে উঠি! দুটি ছেলে।

—"আমরা এসেছিলাম মধুকৈটভ থেকে—এবারে আমাদের পুজো সংখ্যাটা—"

—"আজ থাক, বুঝলেন? এখন খুব ব্যস্ত—"

—"যদি একটা প্রেমের কবিতা—এটা শুধুই প্রেমের কবিতার সংকলন—"

—"আজ থাক ভাই, আরেক দিন, কেমন? এখন ভাবতে পারছি না—দেখতেই তো পাচ্ছেন—"

—"ও—ঘরে জল ঢুকে গেছে বুঝি? কী করে ঢুকল?"

—"আরেক দিন সব বলব—রোববার সকালে আসবেন—।"

আপনমনে ঝাঁট দিতে থাকি। ছেলে দুটি চলে যায়। প্রেমের কবিতাই বটে!

—"দিদি!"

—"আবা-র?"

—"আমি শওকৎ! ঈদ মুবারক।"

—"ও"—শওকতের পরনে ধবধবে নতুন পোশাক—হাতে একটা কাগজের বাক্সো। খাবারদাবার আছে বলে মনে হয়। মিষ্টি? কাবাব? যাই থাকুক—এই কি তার সুযোগ্য সময়?

—"ঈদ মুবারক্, শওকৎ। স্যরি, আমি আজ একটু"—

—"এটা ধরুন দিদি—পিকো-টুমপার জন্য একটু পেস্ট্রি—"

—"কেমন করে ধরবো? হাতে তো ঝাঁটা। দেখছো না বাড়ির কী অবস্থা?"

দেখবে না কেন? কিন্তু শওকৎ বড় ভদ্র ছেলে। খানদানী পরিবার তাদের। সে এসব কেলেঙ্কারির মুহূর্তগুলি দেখেও দেখে না। যেন এটাই আমার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা—এই সিঁড়িতে জলপ্রপাত, এই হাতে ঝাড়ু নিয়ে, হাঁটু বের করে অতিথি আপ্যায়ন। যেন কিছুই হয়নি। সবই যথাযথ আছে। ইংরেজি এবং লখনউয়ী ভদ্রতায় এখানে একটা মিল আছে।

হঠাৎ যেন বাতাসে গন্ধ পেয়ে দুই মেয়ে হঠাৎ উদয় হয়। হাঁটু অবধি গোটানো ভিজে জীনসে একজন, আর যত্রতত্র ভিজে ন্যাকড়ার মতো ফ্রকে আরেকজন। দুজনেরই হাতে পুষ্পপাত্রের মতো ধরা দুটি সান্‌কি। তাতে নোংরা জল। শওকতের হতে বাক্স দেখেই লোভী টুমপার চকচকে চোখ প্রশ্ন করে—"কী গো? শওকৎ মামা? বাক্সে কী আছে?"

শওকৎ যেন বেঁচে যায়। বাক্স বাড়িয়ে ধরে সে বলে—"কিছু না সামান্য পেস্ট্রি। নে তোরা খেয়ে ফ্যাল—"

অমনি ঘাড় কাৎ করে কোঁকড়াচুলভরা মাথাটা এগিয়ে আকাশপাতালব্যাপী একটি হাঁ করে টুমপা। "দাও!"

তার মুখে ফেলে দিতে হবে। এটা সম্ভব নয়। পিকো ভদ্রভাবে বলে—"ওই টেবিলে রাখো। ওটা শুকনো জায়গা, আমরা পরে নিচ্ছি। তুমি ওই চেয়ারটাতে বসতে পারো। ওটা বোধহয় শুকনো চেয়ার। আজ বাড়িতে যা কাণ্ড! বাপরে—"

—"হামতুমম্...এক কামরেমে বন্ধ হো"—নিচে উচ্চৈঃস্বরে গান গাইতে গাইতে চা-প্রীত চিত্তে দীপুর প্রবেশ। এবং আর্তনাদ।—"একী? সিঁড়িতে এত জল কেন? কানাই! কানাই! ন্যাতা আর বালতি নিয়ে আয়। এত জল এলই বা কোত্থেকে—" বলতে বলতে ওপরে এসে দীপুর চক্ষুস্থির!

—"সর্বনাশ! বই? রেকর্ড? সব ভিজে গেল নাকি? স্টিরিওটা? টিভি? সব তুলে রেখেছো তো?"

—"গেছে। সব গেছে। তুই যা ফুটপাথের দোকানে গিয়ে চা খা ততক্ষণে। ঘরে যে জল ঢুকছে খবরটাও তো দিবি? ছিলি তো এই ঘরেই।"

—"জা-জানলে তো দেব? আগে তো ঢুকছিল না। ঢুকল কখন? ইস! হেভি কেলো করে রেখেচো দেখছি?"

—"আমি ? আমি কেলো করেছি?"

—"না, না মানে কেলো হয়ে রয়েছে।"

—"কেলোর তুই আর দেখলি কী?"

এখন ঝর্ণা, পুতুল ঘর মুছছে, কানাই সিঁড়ি মুছছে, ঐ জলই ফিনাইল গুলে নেওয়া হয়েছে, সবাই হাসি হাসি মুখে। তত বেশি ক্ষতি হয়নি যতটা হতে পারতো। এটাই যদি রাত্রে হত? যখন সবাই ঘুমিয়ে? পর্দা, তোয়ালে, ফ্রক, ইজের যা কিছু হাতের কাছে পাওয়া গেছে সবই তখন ব্যবহার করা হয়েছে ঘরের জল শুষে নেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে। একমনে কানাই সিঁড়ি মুছছে যেটা দিয়ে, সেটা দীপুর পাজামা। দীপু দেখেও চিনতে পারলো না।

"ওকি! ওকি! সর্বনাশ করেছে—" বলে সে লাফিয়ে পড়ে তুলে নিল ভিজে চুপচুপে একটা চার্মসের প্যাকেট।

—"ঈশ্‌শ্‌শ্‌!" বাসা থেকে খসে পড়া মৃত পক্ষিশাবকের মতো ব্যর্থ প্যাকেটটিকে আদর করে আবার ফেল দেয়।

বৃষ্টি ধরে গেছে। লাজুক লাজুক একটু হলুদ রোদও উঠেছে। পুতুল বসে গেল ভিজে পুঁটলিগুলো নিয়ে। ঘরে ঘরে সর্বত্র মেলে দেওয়া হতে লাগলো ছেঁড়া, ভিজে, বাতিল কাপড়-চোপড়ের রাশি। মা চেঁচাচ্ছেন, "ওকিরে খাটের বাজুতে ভিজে কাপড় দিল কে? তুলে নে! তুলে নে! পালিশের আসবাবে জল ঠেকাতে নেই—" মা যদি জানতেন নিচের খাটটা কেমনভাবে জলসিক্ত হয়েছে আজ!—মেঝেয় বিছিয়ে দেওয়া হলো ভিজে বইয়ের রাশি। "পাখা খুলে দে!" পাখা ঘুরলো না। লোডশেডিং। ঈদ প্লাস রথ। তবুও লোডশেডিং? ওহো! নিচে তো শওকৎ বসে আছে।

—"শওকৎকে চা মিষ্টি দে তো, পিকো।"

—"শওকৎ মামাকে চা মিষ্টি দাও তো, ঝর্ণাদি!"

অরণ্যদেবের ঢাক বাদকদের মতো নির্দেশটি রিলে হয়ে গেল। কিন্তু আমিও অরণ্যদেব নই, ঝর্ণাও নয়, অরণ্যের অধিবাসী। সে সাফ সাফ বলে দেয়—

"আমি কাউকে চা মিষ্টি দিতে পারবুনি বাপু। অগ্রে আমাকে কাপড় ছাড়তে হবেনি? সর্বো অঙ্গ ন্যাতাজোবড়া? ভিজে ঢোল? চা দাও বল্লেই হলো?"

—"থাক থাক দিদি! আমার আজ চা খেতে ইচ্ছে নেই—আমি বরং যাই—পরে একদিন আসবো—" শওকৎ উঠে দাঁড়ায়। এই বাড়িতে এই মুহূর্তে সভ্যভব্য শওকৎ বড্ড বেশি বেমানান।

—"এতক্ষণ মনের মতো ভূমিকা পেয়ে দীপু এগিয়ে আসে। চলো চলো, শওকৎ আমরা বরং ধীরেনের দোকানে গিয়ে ঈদ স্পেশাল চা খেয়ে আসি—এ বাড়ি থেকে এখন কাটিয়া পড়াই মঙ্গল—গুড লাক্ দিদি! ঈদ মুবারক!"

শওকৎও ভদ্রতা ভুলে হেসে ফেলে, পা বাড়ায়।

বারান্দায় ভিজে কার্পেট ঝুলছে। চতুর্দিকে ভিজে কাপড়। ঘরবাড়ি ঝকঝক তকতক করছে। চুনবালি ঝুলকালি সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার। আমরা সবাই পরিষ্কার শুকনো কাপড় পরে চুলটুল বেঁধে আদা চা খেতে খেতে গল্প করছি। বিদ্যুৎ এসে গেছে। পাখা ঘুরছে বই শুকোচ্ছে। তবু বুকের সেই ধড়ফড়ানিটা কমছে না কিছুতেই। এখনো বুকের মধ্যে হাতুড়ি, এমার্জেন্সি—কালোচিত উদ্বেগ। কিছুক্ষণ আগের ঘরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত জলরাশির দৃশ্য ভুলতে পারছি না।

নিচে বেল বাজলো। পাটভাঙা পাজামায় ফর্সা গেঞ্জিতে টেরি-কেটে চুল আঁচড়ে, শ্রীমান কানাই দরজা খুলে দিল। গুন গুন গান গাইতে গাইতে।

—"উফ কি বিষ্টি। কি বিষ্টি। কাজকম্ম আজ কিছু হলো না!" বলতে বলতে ওপরে এসে পড়লেন দাদামণি। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাদামণি বললেন—"কি রে? রথ সাজানো কমপ্লিট?"

শুকনো মেঝেয় থেবড়ে বসে টুমপা তখন রথের গা থেকে ভিজে কাগজ খুলছে, আর নতুন কাগজ কাঁচি আঠা নিয়ে পিকো বসে গেছে নতুন মালা শেকল তৈরি করতে।

চারিদিকে তাকিয়ে দাদামণি উচ্ছ্বসিত—

—"বাঃ! এ যে ম্যাজিক রে! এই দেখে গেলুম ঝুলকালি চুনকালি, আর এর মধ্যেই যে দিব্যি ফেসলিফটিং হয়ে গেছে। পরিষ্কার ঝকঝকে মেঝে-সিঁড়ি থেকে ঘর পর্যন্ত যেন ধুয়ে মুছে রেখেছিস। এই তো চাই। কে বলে খুকু সংসারী হয়নি?" বলতে বলতে দাদামণি চেয়ারে মেলে রাখা দুটি ভিজে বাতিল ব্লাউজের ওপরে বসে পড়লেন।

আসন ।। বাণী বসু

সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। দর-দাম, দলিল-দস্তাবেজ, ইনকাম-ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সব। সব হয়ে যাবার পর গলদঘর্ম বাড়ি ফিরে একটু জল গরম করে নিয়ে ঠাকুর্দার আমলের বাথটাবটাতে শুয়ে শুয়ে বিকেল সাড়ে তিনটেয় একটা লম্বা অবগাহন স্নান। আ-হ্। যেন অনেক দিনের পুরনো পাপের বোঝা নেমে গেল ঘাড় থেকে। শুধু স্নান নয় শুচিস্নান। সত্যিই, পিছটান বলে তো কিছু নেই। শুধু আপনি আর কপনি। তা আপনির ইচ্ছেমতো কপনি চলবে? না কপনির ইচ্ছেমতো আপনি! এ ক'দিনের মধ্যে এই নিয়ে বোধহয় সাতবারের বার গুরুদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু হাত কপালে ঠেকালো সুনন্দা। স্থাবর সম্পত্তি ঘড় জ্বালা। বড় গুরুভার। হালকা হয়ে যে আকাশে পাখা মেলতে চায় ইঁট-কাঠ তার ঘাড়ের ওপর অনড় হয়ে বসে থাকলে সে বাঁচে কেমন করে? সবই গুরুদেবের কৃপা। বাড়িটা শেষ পর্যন্ত কিনতে বাজিই হয়ে গেল শরদ দেশাই। তিন শরিকের এক শরিকি অংশ। বাবা নিজের অংশটুকু ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছিলেন তাই বাসযোগ্য ছিল এতদিন। সামনের উঠোন চৌরস করে ভেঙে খোলামেলা নিশ্বাস ফেলবার জায়গা খানিকটা। একটা আম গাছ, একটা নিম, সেগুলো ফেলেননি। নিম-আমের হাওয়া ভালো। তা ছাড়াও আমের কোঁকড়া পাতায় ফাগুন মাসে কেমন কচি তামার রঙ ধরে! বাকি জায়গাটুকু নানারকমের বাহারি গাছপাতা দিয়ে সাজানো। ফুল গাছ নয়, পাতাবাহার। বাবার শখের গাছ সব। না-বাগান না-উঠোন এই খোলা জায়গাটুকু পার হতে হতে দোতলার লাল টালি ছাওয়া বারান্দাখানা চোখে পড়বে। তার ওপর ছড়ানো বোগেনভিলিয়ার ফাগ আর মুক্তো রঙের ফুলঝুরি। মার্চ-এপ্রিল থেকে ফুল ফোটা শুরু হবে, চলবে সেই মে অবধি।

বারান্দাটা যেন বেশ বড়সড় একখানা মায়ের কোল। তেমনি চওড়া, নিশ্চিন্ত-নির্ভয়। সুনন্দার নিজের মায়ের কোলটিও বেশ বড়সড় ছাড়ালো দোলনার মতোই ছিল বটে। মনে থাকার বয়স পর্যন্ত সেই শীতল, গভীর কোলটিতে বসে কত দোল খেয়েছে সুনন্দা। তারপর মায়ের বোধহয় বড্ড ভারি ঠেকল। হাত-পা ঝেড়ে চলে গেলেন, ফিরেও তাকালেন না। টাকার সাইজের এক ধামি সাদা ময়দার গোল পিংপঙ বলের মতো লুচি সাদা আলুভাজা দিয়ে না হলে যে সুনন্দা রেওয়াজে বসতে পারে না এবং সে জিনিস যে আর কারো হাত দিয়েই বেরোবার নয় সে কথা মায়ের মনে থাকল না।

অনেকদিন আগলে ছিলেন বাবা। মায়ের কোল থেকে বাপের কাঁখ, সে তো কম পরিবর্তন নয়! ঈশ্বর জানেন বাবাকে মা হতে হলে স্বভাবের নিগূঢ় বাৎসল্য রসের চালটি পর্যন্ত পালটে ফেলতে হয়। তিনি কি তা পারেন? কেউ কি পুরোপুরি পারে? মায়ের জায়গাটা একটা বায়ুশূন্য গহ্বরের মতো খালি না থাকলে বুঝবে কেন সে কে ছিল। কেমন ছিল? বোঝা যে দরকার। মা হতে পারেননি, কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন, তাই বাবা আরও ভালো বাবা, আরও পরিপূর্ণ বাবা হতে পেরে গিয়েছিলেন। পাঁচজন যেমন বউ মরলেই হুলু দিয়ে থাকে তেমন

দিয়েছিল বই কি। তিনি চেয়েছিলেন মাথায় আধ-ঘোমটা গোলগাল ছবিটির দিকে। চোখ দুটি ভারি উদাস, কিন্তু ঠোঁটের হাসিতে ফেলে-যাওয়া সংসারের প্রতি মায়া ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা। তারপর ফিরে তাকিয়েছিলেন ঘুমন্ত ফুলো-ফুলো মুখ, ফুলো-ঠোঁট আর বোজা চোখ দুটির দিকে। ঘুমের মধ্যে চোখের মণিদুটো পাতার তলায় কাঁপছে। আহা! বড় বনস্পতির বীজ। কিন্তু কত অসহায়। মাতৃকুলে যন্ত্রসঙ্গীত পিতৃকুলে কণ্ঠসঙ্গীত। সরু সরু আঙুলে এখনই কড়া পড়ে গেছে। ওইটুকুন-টুকুন আঙুল তার টেনে টেনে এমন নাজনখরা বার করে যে মনে হবে রোশেনারা বেগম স্বয়ং বুঝি হোরি গুনগুন করছেন।'

—'মানুষেরর আপন পেটের বাপ-মা কি দুটো হয়?' ভ্য.বলা মেরে-যাওয়া কন্যাদায়গ্রস্ত কিংবা হিতৈষীদের তাঁর এই একই উত্তর। নাও এখন মানে কর।

বালিকা থেকে কিশোরী, কিশোরী থেকে তরুণী, তরুণী থেকে যুবতী বাবা ঠায় কাঁধে মাথাটি নিয়ে। আয় ঘুম যায় ঘুম বর্গীপাড়া দিয়ে। একটি দিনের জন্যও ঢিলে দেননি। 'সুনি নতুন শীত পড়েছে, বালাপোষখানা বার কর', 'সুনি, আদা তেজপাতা গোলমরিচ দিয়ে ঘি গরম করে খা, গলাটা বড্ডই ধরেছে', 'টানা তিন ঘণ্টা রেওয়াজ হল সুনি, আজ যেন আর খুন্তি ধরিসনি, তোর বাহন যা রেঁধেছে তাই ভালো।'

মাতৃহীন, অবুঝ, অভিমানী, তার ওপর অমন গুণী পিতৃদেব কিছুতেই আর বিয়ের জোগাড় করে উঠতে পারেন না। পাত্র ঠিক বলে তো পাত্রের বাড়ি যেন উল্টো গায়। বাড়ি-ঘর ঠিক আছে তো পাত্র নিজেই যেন কেমন কেমন! অমন ধ্রুপদী বাপের সেতারী মেয়ের পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি নয়। গুণীর পাশে দাঁড়াতে হলে গুণী যে হতেই হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু সমঝদারিটাও না জানলে কি হয়? বাবার যদি বা পছন্দ হয়, মেয়ে তা-না-না-না করতে থাকে।

—'অমনি রাঙা মুলোর মতো চেহারা তোমার পছন্দ হল বাবা? সব শুদ্দু ক'মণি হবে আন্দাজ করতে পেরেছো?'

মেয়ের যদি বা পছন্দ হল তো বাপের মুখ তোম্বা হয়ে যায়—'হলোই বা নিজে গাইয়ে। দুদিন পরেই কমপিটিশন এসে যাবে রে সুনি, তখন না জানি হিংসুটে-কুচুটে তোর কি হাল করে!'

এই হল সুনির বিবাহ বৃত্তান্ত। বেলা গড়িয়ে গেলেও উৎসুক পাত্রের অভাব ছিল না। কে বাগেশ্রী শুনে হত্যে দিয়ে পড়েছে, কে দরবারীর আমোদ আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু পিতা-কন্যার মন ওঠেনি। আসল কথা ধ্রুপদী পিতার ধ্রুবপদটি যে কন্যা! আর কন্যা তার পরজ-পঞ্চমের আরোহ-অবরোহ যখন ঘাট নামিয়ে-নামিয়ে বেঁধে নিয়েছিল পিতার সুরে, জীবনের সুরটিও তখনই ঠিক তেমনি করেই বাঁধা হয়ে গেছে।

বেলা যায়। বেলা কারো জন্যে বসে থাকে না। একটু একটু করে একজনের মাথা ফাঁকা হতে থাকে। আরেকজনের রুপোর ঝিলিক দেয় মাথায়। বাবার মুখে কালি পড়ে। শেষে একদিন পাখোয়াজ আর পানের ডিবে ফেলে উঠে আসেন শীতের মন খারাপ করা সন্ধ্যায়।

—'কি হবে মা, বেশি বাছাবাছি করতে গিয়ে আমি কি তোর ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে দিলুম?'

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সুনন্দা—'করেছোই তো, খুব করেছো, বেশ করেছো! এখন তোমার ডিবে থেকে দুটো খিলি দাও দেখি, ভালো করে জর্দা দিও, কিপটেমি করো না বাপু।' হেসে ফেলে মেয়ে। বাপের মুখের কালি কিন্তু নড়ে না।

অবশেষে সুনন্দা হাত দুটো ধরে করুণ সুরে বলে—'বাবা, একবারও কি ভেবে দেখেছো, আর কেউ সেবা চাইলে আমার সেতার, সুরবাহার, আমার সরস্বতী বীণ সইবে কি না। এই

দ্যাখো, কড়া পড়া দু আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে সুনন্দা বলে—'এই দ্যাখো আমার বিবাহ-চিহ্ন, এই আমার শাঁখা, সিঁদুর।'

—'আমি চলে গেলে তোর কি হবে সুনি?' আঁধার মুখে বাবা বললেন।

—'বাঃ, এই আমার একলেশ্বরীর শোবার ঘর, ওই আমার তেত্রিশ কোটি দেবতার ঠাকুরঘর, ও-ই আমার জুড়োবার ঝুল-বারান্দা, আর বাবা নিচের তলায় যে আমার তপের আসন। আমি তো আপদে থাকবো না! এমন সজ্জিত, নির্ভর আশ্রয় আমার, কেন ভাবছো বলো তো?'

বাবার মুখে কিন্তু আলো জ্বলল না। সেই আঁধার গাঢ় হতে হতে যকৃৎ-ক্যান্সারের গভীর কালি মুখময়, দেহময় ছড়িয়ে পড়ল। অসহায়, কাতর, অপরাধী দু চোখ মেয়ের ওপর নির্নিমেষ ফেলে রেখে তিনি পাড়ি দিলেন।

তার পরও দশ এগারোটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে, সুনন্দা খেয়াল করতে পারেনি। রেডিওয়, টেলিভিশনে, কনফারেন্সে, স্বদেশে বিদেশে উদ্দাম দশটা বছর। খেয়াল যখন হল তখন আবারও এক শীতের মন খারাপ-করা সন্ধ্যা। এক কনফারেন্সে প্রচুর ক্লিকবাজি করে তার প্রাপ্য মর্যাদা তাকে দেয়নি, চটুল হিন্দি ফিলমের আবহসঙ্গীত করবার জন্য ডাকাডাকি করছে এক হঠাৎ-সফল সেদিনের মস্তান ছোকরা, যে গানের গ-ও বোঝে না, এখনও, এই বয়সেও এক আধা বৃদ্ধ গায়ক এতো কাছ ঘেঁষে বসেছিলেন যে টেরিউলের শেরওয়ানির মধ্যে আটকে পড়া ঘামের দুর্গন্ধ দামী আফটার শেভের সৌরভ ছাপিয়ে যেন নাকে চাবুক মেরেছে।

সামনের কম্পাউণ্ডে নিমের পাতা আজ শীতের গোড়ায় ঝরে গেছে। আম্রপল্লবের ফোকরে ফোকরে শীতসন্ধ্যার কাকের চিকারি কানে তালা ধরায়, শরিকি বাড়ির ডান পাশ থেকে স্বামী-স্ত্রীর চড়া বিবাদী সান্ধ্য ভূপালির সুর বারবার কেটে দিয়ে যাচ্ছে। বাঁ দিকের বাড়ি থেকে কৌতূহলী জ্ঞাতিপুত্র বারান্দায় মুখ বাড়িয়ে থেকে থেকেই কি যেন দেখে যাচ্ছে। এতো রাগ-রাগিণীর ঠাট মেল জানা হল, নিজের রক্তের এই রক্তবীজটি যে কোন ঠাটে পড়ে, কি যে ও দ্যাখে আর কেন যে, সুনন্দা তা আজও ধরতে পারল না। শিল্পীবাড়ির শরিক যে কি করে এত রাম-বিষয়ী হয়, তাও তার অজানা। দেখা হলেই বলবে—'তোমাদের ড্রেনটা ভেন্ন করে ফ্যালো, আমি কিন্তু কর্পোরেশনে নোটিফাই করে দিয়েছি, এর পরে তুমি শমন পাবে।' হয় এই, আর নয়তো বলবে—'ইস মেজদি, চুলগুলো তোমার এক্কেবারেই পেকে ঝুল হয়ে গেল! বয়ঃ কতো হল বলো তো!'

চুল পেকে গেলে যে কি করে ঝুল হয় তা সুনন্দা জানে না। আর, বিসর্গ যে উচ্চারণ করতে পারে 'স' উচ্চারণ করতে তার কেনই বা এতো বেগ পেতে হবে, তা-ও না। ও যেন যমের দক্ষিণ দুয়ার থেকে রোজ এসে একবার করে জানান দিয়ে যায়। 'এই যে মেজদি, তুমি হয়ে গেলেই আমার হয়ে যাবে।'

সামনের ঝুপসি অন্ধকারের দিকে চেয়ে সুনন্দা হঠাৎ বলে উঠল—'ধ্যাত্তেরি।'

বারান্দার আরাম-চেয়ার থেকে সে উঠে পড়ে, শোবার ঘরে ঢুকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার একলার খাট-বিছানা, চকচকে দেরাজ-আলমারি, দেয়াল-আয়নার গোল মুখ, আবার বলে—'ধ্যাত্তেরিকা।' পাশে ছোট্ট ঠাকুরঘর। সোনার গোপাল, কষ্টিপাথরের রাধাকৃষ্ণ এসব তাদের কুলের ঠাকুর। মার্বেলের শিব, কাগজমণ্ডের বুদ্ধ, পেতলের নটরাজ, এসব শেলফের ওপর, নানা ছাত্র-ছাত্রী, গুণমুগ্ধ অনুরাগীর উপহার। চারদিকে সাদা পঙ্খের দেয়াল, খালি, বড্ড খালি। সীলিং থেকে জানলার লিনটেন বরাবর বেঁকা একটা চিড় ধরছে। সেই খালি দেওয়ালে একটি যোগীপুরুষের ছবি। সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে সে বলে—'তুমিই ঠিক। তুমিই সত্য। তুমিই শেষ আশ্রয়।'

ড্রয়ারের ভেতরে ফাইল, ফাইলের ভেতর থেকে 'মধুরাশ্রম' ছাপ মারা খামটা দিনের মধ্যে এই তৃতীয়বার সে তুলে নেয়।

মোটা সুতোর কাগজ। হাতের লেখা খুব জড়ানো। ঠাকুর এক বছর ধরে রোগশয্যায়। স্মিতমুখে শরের মতো টান-টান শয়ান। বুকের ওপর খাপ কাটা হেলানো লেখার ডেস্ক, মাথার দিকটা তোলা। ঠাকুর সিদ্ধদাস নিজ হাতে সুনন্দাকে এই চিঠি দিয়েছেন অন্তত ছ মাস আগে।

সুরাসুর সিদ্ধাসু মা সুনন্দা,

তোমার সমস্যা নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ অনেক ভাবাভাবি করেছি মা। আমি ভাবার কেউ নয়, যাঁর ভাবনা তিনি ভাবছেন বলেই বুঝি তোমার সুরসমুদ্রটি এবার এমন স্রোত গুটিয়ে ভাটিয়ে চলল। তোমার হৃদয়ে যখন তাঁর ডাক এমন করে বেজেছে তখন দরজা দু হাতে বন্ধ রাখবে সিদ্ধদাসের সাধ্য কি? তুমি এসো। মনের সব সংশয়, দ্বিধা ছিন্ন করে চলে এসো। বিষয়-সম্পত্তি তুমি যেমনি ভালো বুঝবে, তেমনি করবে। আশ্রমে খাওয়া-থাকার জন্য নামমাত্র প্রণামী দিতে হয় সে তো তুমি জানোই। এখানে বরাবর বাস করতে গেলে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরার বিধি। নিজের পরিধেয়র ব্যবস্থা তুমি নিজেই করবে। খালি এইটুকু মনে রেখো মা, তোমার বস্ত্র যেন অন্য আশ্রমিকাদের ছাড়িয়ে না যায়। তোমার যন্ত্র সব অবশ্যই আনবে মা। তাঁর আশ্রম স্বর্গীয় সুরলাবণ্যে ভরিয়ে তুলবে, তাতে কি আমি বাধা দিতে পারি? তোমার সিদ্ধি সুরেই। সে তুমি এখানেই থাকো, আর ওখানেই থাকো। আমি ধনঞ্জয়কে তোমার ঘরের ব্যবস্থা করে রাখতে বলছি। আসার দিনক্ষণ জানিও। গাড়ি যাবে। শ্রীভগবানের আশীর্বাদ তোমার ওপর সর্বদা থাকে প্রার্থনা করি।

সিদ্ধদাস

চিঠিটা কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ ঠাকুরঘরে জোড়াসনে বসে থাকে সুনন্দা। তারপর আস্তে আস্তে ওঠে। ঠাকুরকে ফুল জল দেয়, দীপ জ্বালে। ধূপ জ্বালে। একলা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে, কালো পাথরের চকচকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে। নিচের ঘরের তালা খুলে সুইচ টিপে দেয়। অমনি চারদিক থেকে ঝলমল করে ওঠে রূপ। আহা! কি রূপ, কত রূপ! কাচের লম্বা চওড়া শো-কেসে শোয়ানো যন্তরগুলো। সবার ওপরে চড়া সুরে বাঁধা তার হালকা তানপুরা। পরের তাকে ঈশ্বর নিবারণচন্দ্র গোস্বামীর নিজ হাতে তৈরি, তার ষোল বছর বয়সে বাবার উপহার দেওয়া তরফদার সেতার। তারপর লম্বা চকচকে মেহগনি রঙের ওপর হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা সুরবাহার। আর সবার শেষে, একেবারে নিচের তাকে অপূর্ব সুন্দর সমান সুগোল দৈবী স্তনের মত ডবল তুম্বিশুদ্ধ সরস্বতী বীণা। তানসেনের কন্যা সরস্বতীর নামে খ্যাত সুগম্ভীর গান্ধর্বী নাদের বীণা। ডান দিকে নিচু তক্তাপোশে বাবার খোল, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ। কোণে বিখ্যাত শিল্পীর তৈরি কাগজের সরস্বতী মূর্তি—কাগজ আর পাতলা পাতলা বেতের ছিলে। বাঁ দিকে শ্বেতপাথরের বর্ণহীন-সরস্বতী, গুরুদেব জব্বলপুর থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। বলতেন 'অবর্ণা মা'। এই মূর্তির সানুদেশ ঘেঁষে মেঝের ওপর সমুদ্র নীল কার্পেট। তার ওপর সাদা সাদা শুক্তি-ছাপ। পাশেই আর একটি নিচু কাচের কেসে তার শেখবার সেতার এবং ডবল ছাউনির টঙটঙে তবলা। ঘরের মাঝখানে নিচু নিচু টেবিল-সোফা-মোড়ায় বসবার আয়োজন। মায়ের হাতের নকশা করা চেয়ার-ঢাকা, কুশন-কভার এখনও জ্বলজ্বল করছে।

সুনন্দা এই সময়ে রেওয়াজে বসবার আগে এ ঘরেও দীপ ধূপ জ্বালিয়ে দেয়। ঘর খুলতেই যেন কতকালের ধূপগন্ধ তার নাকে প্রবেশ করল। অগুরু গন্ধে আমোদিত ঘর। মার্বেলের

প্রতিমার সামনে দীপগাছ জ্বালিয়ে বিজলিবাতি নিবিয়ে দিল সুনন্দা। আধা-অন্ধকার ঘর যেন গন্ধর্বলোক। বাবার পাখোয়াজের বোল কি শুনতে পাচ্ছে সুনন্দা? না, না, সেখানে শুধু ইষ্টনাম। শুনতে পাচ্ছে কি গুরুজীর সেই অনবদ্য বঢ়হত, আওচার, মন লুটিয়ে দেওয়া তারপরণ? দীপালোকে অস্ফুট ঘরে প্রতিমার সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে সুনন্দা। হাতে নিবারণ গোঁসাইয়ের সেতার। সোনালি রুপালি তারে মেজরাপের ঝঙ্কার। রাগ দেশ। গুরুজী সিদ্ধ ছিলেন এই রাগে। সেতার ধরলেও যা সুরবাহার ধরলেও তা। বীণকারের ঘরের বাজ। সুরে ডুবে ডুবে বাজাতেন। আলাপাঙ্গে তাঁর অসীম আনন্দ। আলাপ থেকে জোড়, মধ্য জোড়, ডুব সাঁতার কেটে চলেছেন। নদীর তলাকার ভারী জল ঠেলতে ঠেলতে গর্তের মুখটাতে এসে যখন তেহাই মেরে ভেসে উঠতেন তখন আঙুলে সে কী জয়ের উল্লাস! অনেক দিনের স্বপ্ন বুঝি আজ সত্য হল। যা ছিল রূপকথার কল্পনাবিলাস তা বুঝি ধরা পড়ে গেল প্রতিদিনের দিনযাপনের ছন্দে রূপে। এমনিই ছিল গুরুজীর বাজের তরিকা। কনফারেন্সে বাজাতে চাইতেন না। অভ্যাস ছিল নিজের গুরুদেবের ছবির সামনে বীণ হাতে করে বসে থাকা। কিংবা গুটিকতক নিষ্ঠাবান তৈরি ছাত্র-ছাত্রী ও সমঝদারের সামনে আনন্দসত্র খুলতেন। বলতেন, 'আজ তোদের কাঁদিয়ে ছাড়ব। লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদবি বাবারা।'

কিন্তু সুনন্দা আজ জানতেই পারল না কখন তার দেশ তিলককামোদ-এর রাস্তা ঘুরে ঘুরে বৃন্দাবনী সারঙের মেঠো সুর তুলতে লেগেছে। একেবারে অন্যমনস্ক। কদিন ধরেই এই হচ্ছে।

দিন না মাস! মাস না বছর। সুনন্দা যেখানকার সেতার সেখানে শুইয়ে রেখে হাত জোড় করে বলল আমি চললুম আমায় মাফ কর। অবর্ণা সরস্বতীর দিকে ফিরে বদ্ধাঞ্জলি আবারও বলল, পারলে ক্ষমা কর, আমি চললুম।'

মধুরাশ্রমে ধনঞ্জয়ের সাজানো ঘরে, নিশ্বাসে মালতীফুলের গন্ধ আর দু চোখ ভরা তারার বৃষ্টি নিয়ে তবে যদি এ হাতে আবার সুরের ফুল ফোটে। আর যদি না-ই ফোটে তো না ফুটুক। অনেক তো হল। আর কিছু ফুটবে। তাই আর কিছুর জন্যে সে বড় উন্মুখ হয়ে আছে।

২

মধুরাশ্রমে ঢোকবার গেট বাঁশের তৈরি। তার ওপরে নাম না-জানা কি জানি কি নীল ফুলের বাহার। মধুর মধুর। জমিতে মধু, হাওয়ায় মধু, জলে মধু। ভেতরে দেখো বিঘের পর বিঘে বাগান, ফলবাগান, ফুলবাগান সবজিবাগান। প্রতি বছরেই একবার করে এখানে এসে জুড়িয়ে যায় সুনন্দা। কোলাহল নেই। না যানের, না যন্ত্রের, না মানুষের। নিস্তব্ধ আশ্রয় জুড়ে শুধু সারাদিন বিচিত্র পাখির ডাক। সন্ধান দিয়েছিল আজ দশ এগার বছর আগে—মমতা বেন। এক ছাত্রী। মমতার বাপের বাড়ির সবাই সিদ্ধদাসের কাছে দীক্ষিত। বাবার মৃত্যুর পর তখন সেই সদ্য সদ্য সুনন্দার মধ্যে একটা হা-হা শূন্যতা তেপান্তরের মাঠের মতো। সব শুনে বুঝে ছাত্রী মমতা গুরুগিরি করল। ঠাকুর সিদ্ধদাসের হাতের ছোঁয়ায় অনেকদিনের পর সেই প্রথম শান্তি।

দেশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগও মমতার মাধ্যমে মধুরাশ্রমে যখন মন টানল তখন শরিকি বাড়ির অংশটুকু নিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছিল সুনন্দা। মোটে আড়াই কাঠার বাস্তু, তার ওপরে তো আর জগদ্দল কংক্রিট-দানব তৈরি করা যাবে না, সুতরাং প্রোমোটারে ছোঁবে না। যারা বাস করবার জন্য কিনতে চায় তারাও দুদিকে শরিকি দেয়াল দেখে সরে পড়ে। জমির দাম আকাশ-ছোঁওয়া। কে আর লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিবাদ-বিসংবাদ কিনতে চায়? এই রকম হা-হতোস্মি দিনে মমতা বেন দেশাইয়ের খোঁজ দিয়েছিল। কোটিপতি ব্যবসায়ী, কিন্তু সমাজসেবার দিকে বিলক্ষণ নজর। সোশাল সার্ভিস সেন্টার খুলবে। একটা ছোটখাটো বাড়ি

কিনতে চায়। পরিবার-পরিকল্পনা, ফাস্ট এড, শিশু কল্যাণ ইত্যাদি ইত্যাদি। সুনন্দার বাড়ি তার খুব পছন্দ হয়ে গেল। বসবার ঘরটাকে পাটিশন করেই তিনটি বিভাগ খুলে দেওয়া যায়। ভালো দাম দিল দেশাই।

সবটুকুই সামলালো মমতা আর তার স্বামী। সমস্ত আসবাবসমেত বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছে সুনন্দা। মায়ের বিয়ের আলমারি, খাট দেরাজ, সোফাসেট, রাশি রাশি পুতুল আর কিউরিও-ভর্তি শো-কেস, বাহারি আয়না, দেওয়ালগিরি, ঝাড়বাতি, সমস্ত সমস্ত। শ্বেতপাথরের সরস্বতী প্রতিমাটি মমতাকে সে উপহার দিয়েছে। বেত-কাগজের শিল্পকীর্তি দেশাইয়ের বড় পছন্দ। তার নিজস্ব বাড়ির হলঘরে থাকবে। বিক্রিবাটার পর যতদিন সুনন্দা থেকেছে, বাড়ি যেমন ছিল তেমনি। আশপাশের কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি কিচ্ছু।

ঠাকুরঘরের ফাটল আর শোবার ঘরের বাঁ কোণে চুঁইয়ে-পড়া জলের দাগটার দিকে তাকিয়ে সুনন্দা মনে মনে ভেবেছিল 'বাব্‌বাঃ, এসব কি একটা একলা মেয়ের কম্মো!' ওই ছাদ কতবার হাফ-টেরেস হল, টালি বসানো হল, তা সত্ত্বেও জল চোঁয়াচ্ছে দেখে মাঝরাত্তিরে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছিল সে। এখন বেশ ঝাড়া হাত, ঝাড়া পা, পরনে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি আর হাতে সেতার, বাঃ!

এবার যেন মধুরাশ্রম আরও শান্তিময় লাগল। গুরুভাই ধনঞ্জয় সেই ঘরটাই ঠিক করে রেখেছে যেটাতে সে প্রত্যেকবার এসে থাকে। সরু লম্বা। ছয় বাই বারো মতো ঘরটা। ঢোকবার নিচু দরজা সবুজ রঙ করা। উল্টো দিকে চার পাল্লার জানলা। খুলে দিলেই বাগান। এখানকার সবাই বলে মউ-বাগান। মউমাছির চাষ হয় ফুলবাগানের এই অংশে। ঘরের মধ্যে নিচু তক্তাপোশে শক্ত বিছানা। একপাশে সেতার রেখে, শুতে হবে। একটিমাত্র জলচৌকি। ট্রাঙ্ক সুটকেস রাখতে পারো, সেসব সরিয়ে লেখার ডেস্ক হিসেবেও ব্যবহার করতে পারো, কোণে চারটে ইটের ওপর মাটির কুঁজো। আশ্রমের ডিপ টিউবওয়েলের জল ধরা আছে। ঘরের বাইরে টিউবওয়েলের জলে হাত পা ধুয়ে পাপোশে পা মুছে, কুঁজো থেকে প্রথমেই এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল সুনন্দা। আহা! যেন অমৃত পান। ধনঞ্জয় বলল, 'দিদি, ঠাকুরের সঙ্গে যদি দেখা করবেন তো এই বেলা।'

ট্রেনের কাপড় ছেড়ে সঙ্গে আনা বেগমপুরের লাল পেড়ে শাড়িটি পরে দাওয়া পেরিয়ে ঠাকুর সিদ্ধদাসের ঘরে চলল সুনন্দা। চারদিকে খোলা আকাশ, একেবারে টইটম্বুর নীল। সেই আকাশটা তার রঙ, তার ব্যাপ্তি, তার গাঢ়তা আর গভীরতা নিয়ে ফাঁকা বুকের খাঁচাটার মধ্যে ঢুকে পড়ছে টের পেল সে। প্রণাম করল যে, আর প্রণাম পেলেন যিনি উভয়েরই মুখ সমান প্রসন্ন। সিদ্ধদাস বললেন, 'মা খুশি হয়েছ তো?' আলোকিত মুখে জবাব দিল সুনন্দা।

ঠাকুর সিদ্ধদাস তাঁর পুবের ঘরে আসন থেকে বড় একটা নড়েন না। ব্রাহ্ম মুহূর্তে একবার, সন্ধ্যায় একবার আশ্রমের চত্বর বাগান ঘুরে আসেন। নিত্যকর্মের সময়গুলো ছাড়া অন্য সময়ে তিনি তাঁর আসনে স্থির। ভোরবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সুনন্দার। সে-ও সে সময়টা বেড়াতে বেরোয়। কিন্তু তখন সিদ্ধদাস তদ্গত তন্ময়। কারো সঙ্গে কথা বলেন না, হনহন করে খালি হেঁটে যান। কে বলবে ক'মাস আগেও কঠিন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন।

এখানকার দিনগুলি যেন বৈদিক যুগের। শান্তরসাস্পদ। পবিত্র, সরল, উদার, সুগন্ধ। একটু কান খাড়া করলেই বুঝি মন্ত্রপাঠের ধ্বনি শোনা যাবে। নাসিকা আরেকটু গ্রহিষ্ণু হলেই যজ্ঞধূমের গন্ধ পাওয়া যাবে। যেন জমদগ্নি, শ্বেতকেতু, নচিকেতা, উপমন্যু এই বন বাগানের অন্তরালে কোথাও না কোথাও নিজস্ব তপস্যায় মগ্ন। কিন্তু কী আশ্চর্য, আশ্রমের রাতগুলি যে আরব্য উপন্যাসের! তারার আলো যেমন একটা রহস্যজাল বিছিয়ে দেয় রাত আটটা নটার পরই। কে যেন ট্যাঁও ট্যাঁও করে রবারের তাঁতের তারে চাপা আওয়াজ তোলে, চুমকি

বসানো পেশোয়াজ, ওড়না সারা আকাশময়, ঘুঙুর পায়ে উদ্দাম নৃত্য করে কারা, হঠাৎ কে তীব্র স্বরে চিৎকার করে বলে 'খামোশ'। একদিন দুদিন করে মাস কেটে গেল। আকাশে বাতাসে চাপা রবারের আওয়াজ শুনে শুনে সুনন্দা আর থাকতে পারে না। ব্রাহ্ম মুহূর্তে বেড়াতে বার হয় না সে, চৌকির ওপর বিছানা গুটিয়ে রাখে। সদ্যতোলা গোলাপফুল রেকাবির ওপর রেখে অদৃশ্য সরস্বতী মূর্তিটির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সেতারের তারে মেজরাপ ঠেকায়। ললিতে আলাপ। মন্দ্র সপ্তকে শুরু। খরজের তারে অভ্যাস মতো হাত চালায়, ঢাঁই আওয়াজ করে তার নেমে যায়, নামিয়ে তারগুলোকে আবার টেনে টেনে বাঁধে সুনন্দা। কান লাগিয়ে লাউয়ের ভেতরের অনুরণন শোনে। আবার আলাপ ধরে। তারগুলি কিন্তু সকালে বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে, সুনন্দার তর্জনী আর মধ্যমার তলায় যেন কিলবিল করছে অবাধ্য, সুর ছাড়া, সৃষ্টিছাড়া কতকগুলো সাপ, জোর হাতে কৃন্তন লাগাতে গিয়ে আচম্‌কা ছিঁড়ে যায় তার।

সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরের ঘরের ধ্যানের আসর থেকে নিঃশব্দ পায়ে উঠে আসে সুনন্দা। সকালবেলাকার সেই ছেঁড়া তার যেন আচমকা তার বুকের মধ্যে ছিটকে এসে লেগেছে। সারি সারি নিস্তব্ধ, তন্ময় গুরু ভাইবোনেরা। কেউ লক্ষ্যও করে না। কিন্তু তার মনে হয় ধূপজ্বলা অন্ধকারের মধ্য থেকে জোড়া জোড়া ভুরু তার দিক পানে চেয়ে কুঁচকে উঠছে।

রাতে তার ঘুম আসে না। সকালের ডাকে কলকাতার চিঠি এসেছে। অন্তরঙ্গ এক সহকর্মী দুঃখ করে লিখেছেন, তিনি ছিলেন না বলেই সুনন্দা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। তিনি থাকলে নিশ্চয় বাধা দিতেন। কেন যে এ কথা লিখেছেন পরিষ্কার করে বলেননি। সুনন্দার ভালো-মন্দ সুনন্দা কি নিজে বোঝে না। জানালা দিয়ে কত বড় আকাশ দেখা যাচ্ছে। শহরে সেই গলির বাড়িতে এতো বড় আকাশ অকল্পনীয় ছিল। আস্তে আস্তে মনটা কি রকম ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়ছে ওই আকাশে, তার যেন আর কোনও আলাদা অস্তিত্ব থাকছে না। কিছুতেই তাকে গুটিয়ে নামাতে পারছে না সে আঙুলে।

মাস তিনেকের মাথায় সিদ্ধদাস নিভৃতে ডেকে পাঠালেন—'মা, খুবই কি সাধন ভজন করছ?'

সুনন্দা চুপ।

'তোমার বাজনা শুনতে পাইনে তো মা!'

—'বাজাই না ঠাকুর।'

চমকে উঠলেন সিদ্ধদাস, 'বাজাবার কি দরকার হয় না মা? এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যখন বাজাবার দরকার আর হয় না, মন আপনি বাজে।'

—'আমার সে দিন তো আসে নি!' সুনন্দা শুকনো মুখে বলল—'আঙুলে যেন আমার পক্ষাঘাত হয়েছে। হাত চলে না। সুর ভুলে যাচ্ছি, হৃদয় শুষ্ক,' সুনন্দার চোখ দিয়ে এবার অধৈর্য কান্না নামছে, 'অপরাধ নেবেন না ঠাকুর, কিছু ভালো লাগছে না, সব যেন বিষ, তেতো লাগছে সব।'

সিদ্ধদাস বললেন, 'অপরাধ কি নেবো! তুমিই আমার অপরাধ মার্জনা করো মা। তোমাকে সঠিক পথ দেখাতে পারি নি। কিছুদিন ধরেই শুনতে পাচ্ছি তুমি খাচ্ছো না ভালো করে, ঘর ছেড়ে বেরোও না, ধ্যানের সময়ে আসো না। মন অস্থির চঞ্চল হয়েছে বুঝেছি। তুমি আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, একটা না একটা উপায় বার হবেই, আশ্রম কখনও তোমাকে জোর করে ধরে রাখবে না। তোমার যেখানে আনন্দ, তাঁরও যে আনন্দ সেইখানেই।'

সেই রাত্রে অনেক ছটফট করে ঘুমিয়েছে সুনন্দা, দেখল সে সমুদ্রের ওপর বসে বাজাচ্ছে। বার বার ঢেউয়ে ঢুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। বিশাল তুম্বি সুদ্ধু বীণ বারবার তার

সিল্কের শাড়ির ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে। খড়খড়ে তাঁতের কাপড় পরে এলো সে। বীণে মিড় তুলেছে। পাঁচ ছয় পর্দা জোড়া জটিল মিড়। কার কাছে কোথায় যেন শুনেছিল। কিছুতেই পারছে না। বীণ শুধু গ্যাঁও গ্যাঁও করে মত্ত দাদুরির মত আওয়াজ তুলে চলেছে, হাত থেকে ছটাং ছটাং করে তার বেরিয়ে যাচ্ছে। এক গা ঘেমে ঘুম ভেঙে গেল, বীণ কই? সুরবাহার কই? সে সব তো এখনও আসেই নি! আঁচল দিয়ে সেতার মুছে দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল সুনন্দা। শেষ রাতে আবার চোখ জড়িয়ে এসেছে। আবারও সেই স্বপ্ন। সমুদ্রের ওপর বীণ হাতে একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। হাত থেকে বীণ ফসকে যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সুনন্দা।

দরজার কড়া নড়ছে জোরে। ঝাঁকাচ্ছে কেউ। খুলতেই সামনে মমতা।

—'সারা রাত কী বৃষ্টি ! কী বৃষ্টি! এখানে পৌঁছে দেখি বালি মাটির ওপর দিয়ে সব জল কি সুন্দর সরে গেছে', মমতা একগঙ্গা বকে গেল, তারপর অবাক হয়ে বলল—'একি সুনন্দাদি, কাঁদছ কেন!'

সুনন্দা চোখের জল মুছে বলল, 'তুই হঠাৎ? কি ব্যাপার? আমার বীণ নিয়ে এসেছিস?'

মমতা বলল, 'ব্যাপারই বটে সুনন্দাদি। বীণ আনবো কি? গোটা বাড়িটাকেই বুঝি তুলে আনতে হয়।'

ঘরে এসে বলল মমতা, 'শোনো সুনন্দাদি, রাগ করো না। দেশাই তোমার বাড়ি নিতে চাইছে না। বলছে ওখানে ভুত আছে। রি-মডেলিং করার আগে যোশী আর দেশাই কদিন তোমার নিচের ঘরে শুয়েছিল, অমন সুন্দর ঘরখানা তো। তা সারা রাত বাজনা শুনেছে।

—'যাঃ'—সুনন্দা অবাক হয়ে গেছে, 'কি বাজনা।'

—'ওরা কি অত জানে! খালি বাজনা, কত বাজনা। ঘুম আসলেই শোনে, চোখ মেললেই সুর মিলিয়ে যায়, ঘরের একটা জিনিসও সরাতে পারেনি।'

—'কেন?' মমতাকে দু হাত দিয়ে চেপে ধরেছে সুনন্দা।

—'কেন আর? কিছুই না। জিনিস সরাতে গেলেই অমন কাঠখোট্টা ব্যবসাদারেরও মনে হয় আহা থাক। বেশ আছে, বড় সুন্দর আর ক'দিন থাকই না।'

সুনন্দা বলল—'তুই বলছিস আমার ঘর যেমন ছিল তেমনি আছে?'

—'শুধু ঘর নয় গো। বাড়ি আসবাব যা যেখানে ছিল, সেখানেই আছে।'

সুনন্দা হঠাৎ উত্তেজিত পায়ে বাইরে ছুটল, 'ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়!'

—'কি দিদি!'

—'আমি আজকের গাড়িতেই কলকাতা যাচ্ছি। আমার বাজনা প্যাক করে তুলে দেবার ব্যবস্থা করো ভাই।'

বৃষ্টি ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে ঘরে ফিরছেন ঠাকুর সিদ্ধদাস। উদ্‌ভ্রান্ত সুনন্দা উল্কার মতো ছুটে আসছে।

—'ঠাকুর ঠাকুর, আমি বাড়ি ফিরছি, বাড়ি।'

স্মিতমুখে ডান হাত তুলে সিদ্ধদাস বললেন, 'স্বস্তি স্বস্তি।'

কেউ নেই এখন। কেউ না। না তো। ভুল হল। আছেন। অবর্ণা, বর্ণময়ী আছেন। সর্বশুক্লা। তাই লক্ষ সুরের রঙবাহার তাঁর পায়ের কাছে মিলিয়ে গিয়ে আরও লক্ষ সুরের আয়োজন করে। সেতার নামিয়ে আজ বীণ তুলে নিয়েছে সুনন্দা। গুরুজীর শেষ তালিম ছিল বীণে। বলতেন নদী তার নাচন-কোঁদন সাঙ্গ করে সমুদ্রে গিয়ে মেশে বেটি, বীণ সেই সমুন্দর সেই গহিন গাঙ। বীণ তক পঁহুছ যা। সুনন্দা তাই বীণে এসে পৌঁছেছে। মগ্ন হয়ে বাজাচ্ছে,

হাতে সেই স্বপ্নশ্রুত মিড়। সুরের কাঁপনে বুকের মধ্যে এক ব্যথামিশ্রিত আনন্দ, তবুও মিড়ের সূক্ষ্ম জটিল কাজ কিছুতেই আসছে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, সুনন্দা অসম্পূর্ণ সুরের জাল বুনেই চলেছে, বুনেই চলেছে। খোলা দরজা, বাইরের ছায়াময় উঠোন বাগান দেখা যায়। কিন্তু সুর বন্দিনীর মতো গুমরে গুমরে কাঁদছে ঘরময়। কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছে না। সেই সঙ্গে মুক্তি দিচ্ছে না তাকেও, দরদর করে ঘাম নামছে, ঘাম না কি চোখের জল যা দেহের রক্তের মতোই গাঢ়, ভারী! পরিচিত জুতোর শব্দ, খোলা দরজা দিয়ে গুরুজী এসে ঢুকলেন, বললেন 'সে কি! এতোক্ষণেও পারছিস না বেটি। এই দ্যাখ।' চট করে দেখিয়ে দিলেন গুরুজী। কয়েকটা শ্রুতি ফসকে যাচ্ছিল। স্মৃতির কোণে কোথায় লুকিয়ে বসেছিল। গুরুজী তাদের টেনে আঙুলে নামিয়ে আনলেন। সুনন্দা বাজিয়ে চলেছে। হুঁশ নেই আনন্দে। গুরুজী যে চলে যাচ্ছেন, ওঁকে যে অন্তত দু'খানি পান দেওয়া দরকার সে খেয়ালও তার নেই। যাবার সময়ে বলে গেলেন—'আসন, বেটি। আসন! তুই যে আসনে ধ্যান লাগিয়েছিস, তুই ছাড়লেও সে তোকে ছাড়বে কেন?' বলতে বলতে গুরুজী মসমস করে চলে গেলেন। হঠাৎ দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। সুনন্দা যেন এতক্ষণ ঘোরে ছিল। সে বীণ নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। গুরুজী এসেছিলেন এত রাত্রে? সে কি? পান? অন্তত দু খিলি পান...কাকে পান দেবে? গুরুজী তো বাবা যাবার তিন বছর পরেই কাশীতে...। চার দিকে চেয়ে দেখে সুনন্দা। খোলা দরজায় এসে দাঁড়ায়। নিমের পাতায় হু হু জ্যোৎস্না। কোথাও কারও চিহ্ন নেই। দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল সে, তারপর তীব্র ভঙ্গিতে এসে বীণ তুলে নিল। মিড় তুলল। সেই জটিল, অবাধ্য মিড়। হ্যাঁ। ঠিকঠাক বলছে। অনেক দিনের স্বপ্নের জিনিস তুলতে পেরে এখন সুনন্দার হাতে সুরের জোয়ার। আরও মিড়, জটিলতার, আরও ব্যাপ্ত, আরও প্রাণমন কাঁদানো, সব মানুষের মধ্যেকার জাত-মানুষটাকে ছোঁবার মিড়। গুরুজী সত্যি এসেছিলেন কি আসেনি তৌল করতে সে ভুলে যায়। সে তার আসনে বসেছে, তার নিজস্ব আসন। সমুদ্র নীলের ওপর বড় বড় শুক্তি ছাপ। সাত বছর বয়স থেকে এই আসনে বসে সে কচি কচি আঙুলে আধো আধো বুলির মতো কতো কবিতা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাজ নখরা ফুটিয়েছে ত্রিতন্ত্রী বীণায়। ঠিক যেমনটি কেসর বাই কি রোশেনারা রেকর্ডে শুনেছে। অবর্ণা দেবীমূর্তির দিকে মুখ করে, কিন্তু নতমুখ আত্মমগ্ন হয়ে, সারারাত সুনন্দা সমুদ্রের দিকে চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। পাশে শোয়ানো সেতারের তরফের তারগুলি ঝংকৃত হয় থেকে থেকে। কাচের কেসের ডালা খোলা। সেখান থেকে সরু মোটা নানান সুরে আপনা আপনি বেজে ওঠে সুরবাহার, তানপুরা।

কে আছে দাঁড়িয়ে এই সুরের পারে? তারের ওপর তর্জনীর আকুল মুদ্রায় প্রশ্ন বাজতে থাকে। কে আছে? কে আছো? ঝংকারের পর ঝংকারে উত্তর ভেসে আসে সুর। আরও সুর। তারপরে? আরও সুর। শুধুই সুর। ধু ধু করছে সুরের কান্তার। ঠিক আকাশের মতোই। তাকে পার হবার প্রশ্ন ওঠে না। শুধু সেই সুরের ধূলি বৃন্দাবন রজের মতো সর্বাঙ্গে মাখো। সেই সুরের স্রোতে ভেসে যাও, আর সুরের আসনে স্থির হয়ে বসো। 'মন রে, তুই সুরদীপ হ'।

শেষ বিকেলে ।। কণা বসুমিশ্র

অনেক কালের সঙ্গী এই ইজিচেয়ারটি। এ বাড়ির যা বয়স তারও কুড়ি বছর আগের। মানে ষাটের বছরের সঙ্গী। যখন অমরনাথের যুবক বয়স প্রেম দিয়ে বসেছে কোন নারীকে নয়। কতগুলো শুক্‌নো বইয়ের পাতাকে। ওঁর গবেষণার যাদু ওই অক্ষরগুলো। ওই তো ওই কাঠগোলাপের গাছটার নীচে এই চেয়ারটা পেতে বসে অমরনাথ কত সময়ই না কাটিয়েছেন। কত সন্ধে, সকাল, দুপুর। শীতের রোদ গায়ে মেখে বসে বই পড়েছেন। কত ঘুমহীন রাত কেটেছে থিসিসের তথ্য সংগ্রহ করতে এই চেয়ারে বসে। চশমার পাওয়ার একটু একটু করে বেড়েছে। পুরু লেন্সের মধ্যে দিয়ে নিজেকে আবিষ্কারের নেশায় চোখকে পাত্তা দেননি। মাথার ঘন চুল পাতলা হয়ে এসেছে। ব্রহ্মতালুতে টাক পড়তে শুরু করেছে যেদিন থেকে, এই ইজিচেয়ারটা সেদিন থেকে সাক্ষী। সেদিনের অমরনাথ আয়নায় নিজের চেহারা দেখার সময় পাননি। বিয়ে করেননি যে বউ বলে দেবে, কি গো! তোমার মাথায় টাক কেন?

অমরনাথের বেশ মনে পড়ে, প্রথম যখন চাকরী নিয়ে এলেন কলকাতায়, তখন তো একটা তক্তপোষ আর ওই ইজিচেয়ারটা ছাড়া ওঁর কিছুই ছিল না। পকেটের জোর না থাকায় নিজের ব্যবহারিক জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও উনি উদাসীন ছিলেন। শুধুই কি তাই? প্রয়োজনের তাগিদটাও তো ছিল সামান্য। বাঁচবার মানেটাই যেখানে ছিল একমাত্র গবেষণা। জৈবিক ক্ষিধে বলতে ছিল দুবেলা হাত পুড়িয়ে রান্না করে দুটো সেদ্ধভাত খাওয়া আর সময় পেলে এক আধঘণ্টা চোখ বুঁজে একটু জিরিয়ে নেওয়া। সেদিনের সঙ্গী এই ইজিচেয়ারটা ওঁকে বড্ড বাঁচা বাঁচিয়েছিল। ওই চেয়ারের ওপর বসেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ওঁর যা কিছু। তক্তপোষটাকে টেবিল বানিয়ে ইজিচেয়ারে বসে ওঁর লেখালেখি, পড়াশুনো। ইন্‌সমনিয়া ঘুণপোকার মত যখন ওঁর মধ্যে বাসা বেঁধেছিল, সেই ঘুমহীন মধ্যরাতে আশা-নিরাশার, সুখ-দুঃখের ছোট ছোট মালা গেঁথে যুবক অমরনাথ ওই চেয়ারে বসে দোল খেয়েছেন।

একদিন ওঁর একক জীবনের নিঃসঙ্গতাকে কাটিয়ে মধুরিমা আসেন ঘরে। অমরনাথ সেই আগের মতই বইপত্রের মধ্যে ডুবে থাকেন। গবেষণা শেষ। উনি তখন ডক্টরেট হয়ে গেছেন। কিন্তু শেষের পরেও তো শেষ থাকে? গবেষণার কি শেষ আছে? অক্ষর গেলার আনন্দ আর অক্ষর সৃষ্টির আনন্দটা যাবে কোথায়?

কিন্তু মধুরিমা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ঘরগেরস্থালি গোছাতে। স্বামী, সংসার তাঁর প্রাণ। তাঁর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ঘরটা দামী হয়ে যায়। কিন্তু অসহ্য শালকাঠের ওই ইজিচেয়ারটা। ষোলো বছরের যুবতীর চোখে ওটা যেন সতীন। মধুরিমা একদিন প্রস্তাব দিলেন, হ্যাঁগো, চেয়ারটা কাউকে দিয়ে দিলেই তো হয়?

—কেন? চশমার পুরু কাঁচের মধ্যে দিয়ে অমরনাথ তাকান্। তখন কতই বা বয়স হবে অমরনাথের? বত্রিশ?

কিন্তু ওঁর ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনে যায় সদ্যফোটা যুবতীর চপলতা। উনি থতমত খেয়ে

স্বামীর দিকে তাকান। আমতা আমতা করে বলেন, বাবা বলছিলেন, তোমার তো এখন চেয়ারের অভাব নেই।

—হুম।—অমরনাথের গাম্ভীর্যের কোন পরিবর্তন হয় না। শ্বশুরবাড়ির মেহগিনী কাঠের দামী আসবাবপত্রের ভিড়ে ওই শালকাঠের সস্তা ইজিচেয়ারটা বেমানান হয়ে গেছে। উনি বোঝেন। তবু চেয়ারটা সরানোর কোন গরজই দেখান না। শুধু ভুরু কুঁচকে বলেন,—এ বাড়িতে আমিই যে খুব বেমানান। আমায় ফেলে দিলে হয় না? মধুরিমার মুখের হাসি ফুরিয়ে যায়। ওঁর বড় বড় চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে।

সেদিনের কথাগুলো ভাবতে বেশ লাগে অমরনাথের। পায়ে মল, নাকে নাকছাবি। সারাবাড়ি ঘুর ঘুর করে বেড়াতেন মধুরিমা। মাঝে মাঝে মলের আওয়াজ বেজে উঠত ওঁর পড়ার ঘরে। অমরনাথ চমকে উঠতেন। ওঁর ধ্যান ভেঙে যেত। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে তাকাতেন। মধুরিমা খিল খিল করে হেসে উঠতেন। বলতেন, যাক্ আমায় দেখার সময় তোমার হল?

অমরনাথের মন আর বাগ মানত না। যৌবনের তোড়ে কোথায় যেন ভেসে যেত। মধুরিমা থুতনিতে হাত রেখে অমরনাথ বলতেন,—তোমার চোখে চোখ রেখে বসে থাকলেই হবে?

মধুরিমা কৃত্রিম অভিমানে মুখ ফুলিয়ে পরমুহূর্তেই বলতেন, এই ইজিচেয়ারটা যেন আমার সতীন। রাত্তিরে আমার পাশ থেকে উঠে এসে তুমি এই চেয়ারটায় শুয়ে রাত কাটাও কেন গো?

অমরনাথ হো হো করে হেসে উঠতেন। বলতেন, সতীন নয় গো, সতীন নয়। তোমার আমার অন্নদাতা। রোজ সেলাম ঠুকবে একে। এই চেয়ারে বসেই আমার লেখাপড়া, থিসিস, কলেজের খাতা দেখা। একে তো তোমার সহ্য করতেই হবে।

মধুরিমা কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতেন না। উনি তেমনি অভিমানেই গাঢ় গলায় বলতেন, শুধু আমাকেই সহ্য করতে হবে? ওকি আমায় সহ্য করবে? তোমায় আমার কাছ থেকে কেবলই কেড়ে কেড়ে নেয়। আমি বুঝি একা একা থাকব?

অমরনাথ বলতেন, তুমিও আমার পাশে বসে পড়। তাহলে আর একা লাগবে না।

অমরনাথ যত্ন করে তাঁর বালিকা বধূটিকে হোমটাস্ক দিতেন। তাঁকে আদর করতে করতে বড় জগতের স্বপ্ন দেখাতেন। মধুরিমার তবু বায়না, ওই চেয়ারটা ছেড়ে তুমি আমার কাছে খাটে বসে পড়।

—ব্যাপারটা কি জানো? অমরনাথ অন্যমনস্ক হতেন। ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে আয়েস করে বসে বলতেন, এটা ছাড়া আমার ঠিক সুবিধে হয় না। খাটে বসে কি করে পড়ি? তোমার গায়ের গন্ধ আমায় যদি ঘুম পাড়িয়ে দেয়?

—আহা হা রে! খুশির ঝিলিক খেলে যেত মধুরিমার চোখে।

২

এরপর সংসারে একে একে অনেকেই আসে। ওঁরা দুজনে বাবা মা হন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়। একদিন তাদের চোখেও বিশ্রী লাগে এই ইজিচেয়ারটা। মেয়েরা বলে,—বাবা, তুমি তো তোমার সেক্রেটারিয়েট টেব্‌লের সামনের ওই রিভলভিং চেয়ারটায় বসেও লেখাপড়া করতে পার?

অমরনাথ বলেন, আধশোওয়াভাবে একটু আরাম ছাড়া কি এই বয়সে পড়াশুনো করা যায় মা?

—বেশ তো, ওই স্প্রীং ডিভানটায় শুয়ে পড়াশুনো কর?

চশমার কাঁচ মুখে নতুন করে পরেন অমরনাথ।—না বাবা, ওসব তোমাদের জন্যে। আমি পুরনো কালের মানুষ, এই বেশ আছি। ছোটমেয়ে তুলতুলিটা তবু নাছোড়বান্দা। ও একটা আঙুল নেড়ে বলে, এই চেয়ারটা অচল। একে ফেলতেই হবে বাবা। এক্কেবারে ব্যাকডেটেড্।

অমরনাথ হেসে ওঠেন। বলেন, আমিও যে অচল। ব্যাকডেটেড্ মা। আমায় ফেলে দেবে না?

ওই ইজিচেয়ারটার দিকে তাকিয়ে অমরনাথের মনে পড়ে যেত একশো টাকার মাইনের চাকরিটার কথা। তক্তপোষটা মধুরিমা বিদায় করেছিলেন অনেক আগেই। কিন্তু ওই চেয়ারটা ছাড়ার কথা ভাবলেই ওঁর প্রাণ কেঁদে উঠত।

মেয়েরা এখন পরের ঘরে। ছেলেরা বউ নিয়ে আলাদা হয়ে চলে গেছে। কিন্তু এই ইজিচেয়ারটা আজও বেইমানী করেনি। সস্তা কাঠের গায়ে এখনো কোন চিড় খায়নি। অমরনাথ এখনো বসেন ওই ইজিচেয়ারটায়।

শেষ বিকেলের মরা আলোয় ওঁর চোখদুটো যখন ঝাপ্সা হয়ে আসে, তখন অমরনাথ বারান্দার এক কোণে কান পেতে শোনেন পাখির শেষ কলরব।

পাশেই একটা বেতের চেয়ারে বসে মধুরিমা বই পড়ে শোনান স্বামীকে। কখনও বই, কখনও বা খবরের কাগজ। আজ আর অমরনাথ চোখে দেখতে পান না। ছানি পড়া চোখ। ছানি কাটিয়েও ফল হয়নি তেমন। এই পৃথিবীর ফুল, পাখি, বইপত্র সবই তো এখন ঝাপসা। উনি কতদিন গাছপালার সবুজ রঙ দেখেননি। দেখেননি নীল আকাশের মেঘের খেলা। শীতের আকাশে খেলে হাঁসের মিছিল।

মধুরিমা কাগজ পড়ে যান। অমরনাথ একই খবর বার বার শুনতে চান। রাজনীতির রকমফের, মন্ত্রী বদল, দুর্মূল্যের বাজার, হরতাল, মৃত্যু, খুনখারাপির খবর শুনতে শুনতে অমরনাথ পুরনো কালটার সঙ্গে আজকের কালের ফারাক খোঁজেন। মধুরিমা বোঝেন, অমরনাথ হারিয়ে যাচ্ছেন। সময়ের ক্যালকুলেটারে নিজেকে মেলাতে মেলাতে উনি ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে থাকেন পথের দিকে। সে পথের পথিকের অস্পষ্ট মুখ অমরনাথের মনের মধ্যে ঝড় তোলে। চেনাকে অচেনা লাগে অমরনাথের। অচেনাকে চেনা মনে হয়। ঘোলাটে চোখদুটো নিয়ে অমরনাথ কি যেন খুঁজে বেড়ান। ভাবতে ভাল লাগে ওঁর যেদিন উনি অক্ষম ছিলেন না, সেদিন ওদের মতই উনিও দেখতে পেতেন এই পৃথিবীর রঙ বদল। অমরনাথও হাঁটতেন ওই রাস্তাটা দিয়ে। বাঁদিকে সরু পথ। এঁকেবেঁকে চলে গেছে শিবমন্দিরের দিকে। বাঁধানো বেলগাছটার নীচে শিবমন্দির। টুপ টুপ করে বেলপাতা পড়ে শিবের মাথায়। সন্ধ্যে হলে প্রদীপ জ্বলে। ঘণ্টা বাজে।

পুরুতঠাকুর আরতি করে চলে যান। উনি মনে মনে হিসেব করেন বেলগাছটার বয়স কত?

ভোরবেলা বেরিয়ে এসে অমরনাথ দুর্গানাম লিখতেন। এখনো লেখেন। কাঁপা কাঁপা হাতে। তেমন চোখে দেখতে পান না বলে অক্ষরগুলো কেঁপে যায়। কিন্তু যখন চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়নি সেই তখন দুর্গানাম লিখেই ধুতিপাঞ্জাবি পরে তৈরি হতেন। প্রাতঃরাশ সেরে বাজারের ব্যাগ হাতে দুলিয়ে বাজার করতেন। ওটাও ছিল ওঁর দীর্ঘদিনের অভ্যেস। ওই সবজিঅলা, মাছওলা ওরা যে ওঁর কতদিনের চেনা। ওই চেনা মুখগুলো কি না দেখে পারা যায়? কত লোকের আসা, যাওয়া ছিল এ বাড়িতে, আজ আর কেউ আসে না। নব্বুই বিরানব্বুই বছরের বৃদ্ধের পৃথিবীটা বড় করুণ। তাঁর জন্যে শুধু জরা-ব্যাধি। আর দীর্ঘায়ুর জন্যে মানুষের অপমান কুড়নো। পাশের বাড়ির ছেলেটা গোবিন্দ এসে প্রায়ই গল্প করে যায়,

পাড়ার অমুক চলে গেল, তমুক চলে গেল। কাঁচের গাড়িতে ফুলের বিছানায় শুয়ে। দাদু, আপনার চেয়ে অনেক ছোট তারা। অমরনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, কি আর করব বল? সবই তাঁর ইচ্ছে।

এই তো সেদিনও বছর পাঁচেক আগে উনি যখন একটু একটু দেখতে পেতেন, হয়ত সকালবেলা বই খুলে বসেছেন, হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলতেই, কি করছেন মেসোমশাই?

—কিহে কি খবর?

—কেমন আছেন?

—বেশ আছি।

—মেসোমশাই আপনাকে দেখলে হিংসে হয়।

—কেন?

—এই যে বললেন, বেশ আছি, আমরা কেন বলতে পারি না, বলুন তো?

—ঈশ্বর না চাইতেই এত দিয়েছেন, তাই বলি বেশ আছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ মেসোমশাই, এই দেওয়াটাকেই বা কজন দেওয়া বলে মনে করে? সত্যি মেসোমশাই, কি ফাইন লোক আপনি। সামনের বাড়ির অরিন্দম বলে যেত।

অমরনাথ বুঝতে পারেন না, এখন আর কেউ ওঁকে পছন্দ করেন না কেন? ওঁর কি স্মৃতিবিভ্রম ঘটছে? নাকি ওঁর কথাবার্তা অসংলগ্ন। আগে যারা ওঁর কাছে আসত ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা—কথা আর ফুরতো না। তবে? উনি তো এখনও শেক্‌সপীয়ার মনে রেখেছেন। উনি যে এখন অনর্গল আবৃত্তি করতে পারেন মিলটন থেকে। তবু কেন এমন হয়? ওঁর ভাবতে ভাল লাগে, যেদিন ওঁর দাম ছিল এই পৃথিবীতে। উনি যেন হাতড়ে হাতড়ে খোঁজেন সেই দামী অমরনাথকে।

আকাশে জলভরা মেঘের আনাগোনা। অমরনাথ ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকেন আকাশে। মধুরিমা কাগজ পড়া বন্ধ করে স্বামীর চোখে বিলি কাটেন। ওঁর চোখ দুটোও যে ভেসে যায় বহুদূরে। এই বিকেলটা ফুরোতে চায় না মধুরিমারও। নিজেকে ওঁর সব থেকে অসহায় লাগে ঠিক এই সময়।

কাজের মেয়েটি সারাদিন পর ঘরে ফিরে যায়। তখন শিশুর মত অসহায় স্বামীর পাশে বসে থাকতে থাকতে ওঁরও যে পুরনো কথা মনে পড়ে। মধুরিমা খুব চোরা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। পাছে সেই নিঃশ্বাসের হাওয়া অমরনাথকে ছুঁয়ে যায়। অমরনাথ বলেন হ্যাঁগো ছেলেমেয়েরাও খোঁজ করে না বুড়োবুড়ির? ওদের জন্যে তোমার মন কেমন করে না?

মধুরিমার চোখদুটো ভিজে ওঠে। ওঁকে ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলতে হয়, ওরা তো প্রায়ই চিঠি দেয়। এই তো সেদিন পাপুনের চিঠি এল জব্বলপুর থেকে, তুলতুলির আসানসোল থেকে, বুলবুলির সিমলা থেকে, টাপুনের ব্যাঙ্গালোর থেকে—তোমার মনে নেই?

অমরনাথ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, কোথায়, কোথায় সেই চিঠি?

মধুরিমা অনেকদিন আগের হলদে হয়ে যাওয়া পোস্টকার্ডটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, এই তো সেই চিঠি!

অমরনাথ পাগলের মত হাত বুলিয়ে যান সেই হলদে হয়ে যাওয়া পোস্টকার্ডের অস্পষ্ট অক্ষরের গায়ে। বলেন, এটা তো একখানা। বাকীগুলো?

মধুরিমা পোস্টকার্ডটা সরিয়ে দিয়ে ফের ওটাই হাতে ধরিয়ে দেন। তারপর আবার। তারপর আবার...ওরা যেন কেউ তুলতুলি, কেউ বুলবুলি, কেউ টাপুন, কেউ পাপুন...।

কাঠগোলাপের গাছটা থেকে টুপ টুপ করে ফুল ঝরে যায়। উনি যেন কান পেতে শোনেন,

পাপুনের ছেলে ভোডোর সাইকেলের ঘণ্টা। ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...। ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...।

টাপুনের বাপী ক্রিকেট খেলছে একচিলতে বাগানে। গেল গেল সব গেল। ওই নতুন ফুলের চারাগাছগুলো গেলো তো? ইস্, মরশুমি ফুলের টবগুলোও যে ভেঙে শেষ। অমরনাথ মনে মনে ছুটতে থাকেন তাঁর নাতির পেছন পেছন।

—দাদু, তুমি বলিং করো।

—হ্যাঁ দাদু, এই তো করছি।—অমরনাথ ছুটছেন। তাঁর গায়ের চাদর ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। অমরনাথ হাসতে হাসতে বলছেন,—দাদু! বুড়ো হাড়ে কি এত সয়?

চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। ঝিঁঝির একটানা গোঙানি। জোনাক পোকার ঝাঁক জ্বলে জ্বলে নিভে যায়। ওদিকে লোডশেডিং। মধুরিমা যান আলো আনতে। অমরাথ ইজিচেয়ারে হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ শিশুর মত কেঁদে ওঠেন। উনি যেন চেঁচিয়ে বলতে চান, ওরে তোরা ফিরে আয়! তোরাও যে একদিন বুড়ো হবি!

টান ।। সুচিত্রা ভট্টাচার্য

বাজার হাতে থমকে দাঁড়ালেন সুখময়। তাঁর সযত্নে সাজানো একতলার ড্রয়িংরুমে উদ্দাম লাফালাফি করছে দুই শিশু। জুতো পায়ে দামী সোফায় উঠছে, ঝাঁপ কাটছে নকশাদার গালিচা'য়। তকতকে মোজাইক মেঝেতে এলোমেলো ছড়ানো গোটা দু-তিন কিটসব্যাগ, প্লাস্টিকের থলি, সস্তাদামের ওয়াটার-বটল।

সুখময়ের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল,—তুই কোত্থেকে?

—এই এলাম। সুখময়ের প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল না অমল। দাঁত ছড়িয়ে হাসল,—ধরো তোমাদের দেখতে। বুড়োবুড়ি একলাটি পড়ে আছ!

সুখময় একটুও প্রীত হলেন না। বাইরে থেকেই এখানকার কলরব কানে বাজছিল। কলরব নয়, যাকে বলে তাণ্ডব। তাঁর তপোবনের মতো প্রশান্ত গৃহ আর্তনাদ করছে শিশুদের হুড়দ্দুমে। তখনও কি ছাই বুঝেছেন, তাঁর অকালকুষ্মাণ্ড ভাগ্নেটিই এসে হাজির হয়েছে সাতসকালে। সেই সিউড়ি থেকে— লটবহর সমতে!

হাতের বাজার রান্নাঘরে নামিয়ে এলেন সুখময়। দুরন্ত শিশু দুটি একটু থমকাল। হাঁ করে দেখছে সুখময়কে। বড়টা বছর পাঁচেকের। ছোটটা বড় জোর তিন।

এক ঝলক ছেলে দুটোকে জরিপ করে সুখময় পাখার নিচে বসলেন,—খবর কি তোদের? মেজদি কেমন আছে? জামাইবাবু?

—মা-বাবারা এই বয়সে যেমন থাকে, তেমনই আছে। গেঁটেহাত। অর্শ। বুক-ধড়ফড়। প্রেসার। সুগার। অমল বাবু হয়ে সোফায় বসল,—মামীও তো দেখলাম বেশ কাত হয়ে পড়েছে!

—হুঁ। সুখময় গম্ভীর,—কদিন ধরে শ্বাসকষ্ট চলছে। কাল একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল।

একটু নয়, কাল রাতে বেশ ভালই বাড়াবাড়ি হয়েছিল অনুরূপার। বরাবরই তাঁর সর্দিকাশির ধাত, বছর আষ্টেক হল একটি বিশ্রী টানও উঠছে—হাঁপানির। প্রথম প্রথম টানটা শুধু ঋতু বদলের সময়ে আসত। এখন আর মাস-ঋতু মানে না, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত যখন-তখন হানা দেয়।

কালও কষ্ট দিয়েছিল। সন্ধে থেকে অল্পস্বল্প রুটিনমাফিক চাপ ছিল ফুসফুসে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুম করে বেড়ে গেল কষ্টটা। দু-চারটে বাঁধা ওষুধ ঘরেই থাকে, তাতেও কমল না। রাত বারোটায় ফোন করতে হল ডাক্তারকে। চেনা ডাক্তার, প্রায়ই দেখে অনুরূপাকে, তবু অত রাতে আসতে রাজী হল না সে। টেলিফোনে ওষুধের নাম আউড়েই খালাস। কাছেই সিএ মার্কেট, সেখানে শঙ্কর মেডিকেল সারারাত খোলা থাকে; রাতদুপুরে দোকানে ছুটলেন সুখময়। ক্যাপসুলটা খেয়েও রাতভর বিছানায় ঠায় বসে রইল অনুরূপা। বালিশ বুকে চেপে হাপরের মত হাঁপাচ্ছেন। গলা কাঁপিয়ে উৎকট শব্দ ছিটকে আসছে। দম বুঝি বেরিয়ে যায়-যায়!

আর সুখময়? একবার তখন বালিশ দিচ্ছেন স্ত্রীর পিঠে, একবার মুখে ফসফস ওষুধ স্প্রে দিচ্ছেন আর উদ্বিগ্নমুখে তাকিয়ে আছেন। কীভাবে যে কেটেছে রাতটা!

সুখময় বললেন,—তোর মামীকে নিয়ে চিন্তায় আছি।

অমল দুলছে বসে বসে,—আমরা এসে তোমাদের অসুবিধে হল তো?

সুখময় বলতে যাচ্ছিলেন, তা হল। বললেন না। তেতো গেলা মুখে হাসলেন,—অসুবিধে আর কি। মামার বাড়ি, এখানে আসবি না তো কোথায় আসবি?

—কারেক্ট। আমি তো মঞ্জুকে সে কথাই বলছিলাম। মঞ্জু মামীকে দেখে একেবারে ঘাবড়ে একসা।

—মঞ্জু মানে তোর বউ? কোথায় সে?

—মামীর ঘরে। এসে ইস্তক ওপরে সেঁটে আছে। বলেই অমল হাঁক পাড়ল,—মঞ্জু-উ-উ, মঞ্জু-উ-উ, নীচে এসো। মামাকে প্রণাম করে যাও। ডাকতে ডাকতে ঝপ করে গলা নামাল,—আসলে তোমার ভাগ্নেবউ মামীকে দেখে যত না ঘাবড়েছে, তার থেকে বেশি ব্যোমকেছে তোমার এই বাড়ি দেখে। আরে বাবা, মামা আমার লর্ড। সল্টলেকে প্যালেসে থাকে। বুঝলে মামা, মঞ্জু ভাবে আমার সব আত্মীয়ই বুঝি তার শ্বশুর-শাশুড়ির মতো নেই-নেই পার্টি। এবার দ্যাখ নিজের চোখে। এমন ঝিকঝ্যাক বাড়ি, এমন চাম্পুস সাজানো-গোছানো। বাপের জন্মে দেখেছিস কোনদিন? ছিলি তো ন্যাংটো মাস্টারের মেয়ে।

দুই শিশু বাবার বকবক গিলছিল, হঠাৎ বড়টা হাততালি দিয়ে উঠল,—দাঁড়াও, মাকে বলে দেব!

অমল খিকখিক হাসল,—কি বলবি?

—তুমি দাদুকে ন্যাংটো বলেছ!

—বলিস। নেচে নেচে বলিস। যা ভাগ এখান থেকে। পাঁচ বছরেই পেকে বোঁদে হয়ে গেছে। খালি বড়দের কথার মধ্যে কথা। মারব টেনে তিন লাথ।

ধমক খেয়ে ছেলেটা গা মোচড়াচ্ছে।

সুখময় বেশ বিরক্ত হলেন। অমলটা চিরকালই বড় অমার্জিত। জংলি। হ্যা-হ্যা করে হাসে। গাঁক গাঁক চেঁচায়। মুখের মাত্রা নেই। লেখাপড়াতেও অগা। কোনক্রমে ঘষ্টে ঘষ্টে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে সরস্বতীকে বিদায় দিয়েছে। মেজদির কম জ্বালা গেছে এই ছেলে নিয়ে। এখন কোন এক কোল্ডস্টোরেজে চাকরি করছে। কি কাজ যে করে, ভগবান জানে। শুধু মেজদির চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় রোজগারপাতি তেমন ভাল নয়। তার মধেও কী দুঃসাহস! বাবু বিয়ে করে ফেলেছেন! প্রেমের বিয়ে! বোঝার ওপর শাকের আঁটি ছ'বছরেই তিন-তিনটে অ্যাণ্ডাবাচ্চা। একটা তো একেবারেই কোলের। সবে পুজোর সময় হয়েছে। মেজদির বিজয়ার চিঠি থেকে জেনেছে সুখময়।

ড্রয়িংরুম থেকে কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সেই সিঁড়ি দিয়ে নামছে অমলের বউ। আড়ষ্ট পায়ে। কাছে এসে খোঁপায় আঁচল তুলল। ঢিপ করে প্রণাম সারল একটা।

সুখময় মেয়েটিকে আগে দেখেননি। অমল ন'মাসে ছ'মাসে আসে এ বাড়িতে। একাই আসে। এক-আধ বেলা থেকে চলে যায়। সুখময় নিজে কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যান না। যাওয়া পছন্দও করেন না। বিয়ে অন্নপ্রাশনেও নয়। কোথাওই সম্পর্ক রাখেন না বেশি। মাঝেমধ্যে টুকটাক চিঠিপত্র, ব্যস।

সম্পর্ক রাখার অর্থ জানেন সুখময়। দায়—অজস্র দায়। এর মেয়ের বিয়েতে দাঁড়াও, ওর ছেলের চাকরি করে দাও। একে খয়রাতি করো, ওকে ধার দাও। কেন রে বাবা? লিলিপুটদের

বংশে তালগাছ হওয়াটা কি অপরাধ? তাছাড়া আত্মীয়স্বজন মানেই কূটকচালি, কেচ্ছা-কেলঙ্কোরি। এসব সুখময়ের ঘোরতর অপছন্দ।

তা মঞ্জুকে অবশ্য প্রথম দর্শনে মন্দ লাগল না সুখময়ের। শান্ত চেহারা, বিনীত হাবভাব। রঙ চাপা হলেও আলগা একটা শ্রী আছে। তবে রোগা বড্ড। ডিগডিগে, ক্ষয়াটে। কোলের কন্যাসন্তানটিও খুবই শীর্ণ। অপুষ্টির শিকার।

মঞ্জু নতমুখেই বলল—আপনাকে মামীমা একবার ওপরে ডাকছেন।

সুখময় গলা ঝাড়লেন,—তোমার মামীমা কি শুয়েছেন একটু, না এখনও বসে?

মঞ্জু একদিকে ঘাড় নাড়ল। উত্তরটা ঠিক ধরতে পারলেন না সুখময়। সিঁড়ি অবধি গিয়েও ঘুরলেন মঞ্জুর দিকে,—তোমাদের বাচ্চারা কিছু খেয়েছে?

অমলই আগবাড়িয়ে উত্তর দিল,—তুমি ভেবো না মামা, ওরা ঠিক খেয়ে নেবে।

—তোরাও তো এতটা পথ এলি... তোদেরও খিদে পেয়েছে...দ্যাখ না, পুষ্পর জলখাবার তৈরি কত দূর এগোল?

হা হা করে হাসল অমল,—আমাদের পেট হল রাবণের চিতা। সারাদিন জ্বলছে। ও নিয়ে ভাবতে গেলে তোমার ভাঁড়ার ফাঁক হয়ে যাবে। তুমি যাও, মামী কি বলছে দ্যাখো।

মঞ্জুর দিকে চোখ চলে গেল সুখময়ের। স্বামীর রসিকতায় মুখে আঁচল চেপে ফিক ফিক হাসছে।

ঘড়িতে সাড়ে নটা। চৈত্রের সকাল তেতে উঠছে ক্রমশ। এলোমেলো বাতাস তপ্ত। আচম্বিতে ছোট ছোট হাওয়ার ঘূর্ণি বাইরে। দক্ষিণের জানলার ঠিক গায়েই একটা বেঁটে নারকেল গাছ। চোদ্দ বছর বয়সের। গৃহপ্রবেশের দিন গাছটা লাগিয়েছিলেন অনুরূপা। সেই গাছের চওড়া পাতায় শেষ বসন্তের হাওয়া বাজছিল সরসর।

হাওয়া কি অতীতের কথা বলে? হয়ত বলে, হয়ত বলে না, হয়ত নিজের মনেই দোল খায় জানলায়—গাছে, সুখময়ের মনে।

পঁচিশ বছর আগে সুখময় এখানে চার কাঠার প্লটটা কিনেছিলেন। তখন এ অঞ্চলে গাছগাছড়া বিশেষ ছিল না। প্রায় ধূ ধূ। বিশাল বিশাল মেছো ভেড়ি বোজানো হয়ে সবে তখন শহর এদিকে গায়ে-গতরে বাড়ছে। মাটিতে চিকচিক করে বালি। লোকবসতি খুব কম। কলকাতার সঙ্গে সুতোর যোগ রাখে একটা দুটো বাস। এত ফাঁকা চারদিক যে লোকজন সহজে বাড়িঘর বানাতে সাহস পায় না।

সেটা অবশ্য শাপে বরই হয়েছিল। এখনকার হিসেবে জলের দরে জুটে গিয়েছিল জমিটা। তবে সুখময়ও তক্ষুণি বাড়ি করেননি। করলেন অনেক পরে. সাউথ ইস্টার্ণ রেলের জেনারেল ম্যানেজার হয়ে রিটায়ার করার ছ'বছর আগে—রামপুরহাটের জমি বাড়ির নিজের অংশ বেচে দিয়ে। এই উপনগরী তখন অনেক জমজমাট। ছবির মতো সুন্দর সুন্দর বাড়িতে ভরে যাচ্ছে চারদিক। চওড়া চওড়া পথঘাট। সবুজ বুলেভার্ড। গাড়ি-ঘোড়াও চলছে অনেক। তবু এখানকার একটা আলাদা নির্জনতা আছে । এক ধরনের আলাদা শান্তি। নিস্তরঙ্গ সুখ।

সেই সুখের আদলে তৈরি হল সুখময়ের বাড়ি। একতলায় অতিকায় ড্রয়িংরুম—রান্নাঘর। ভাঁড়ার, কাজের লোকেদের থাকার ঘর। বিশাল খাওয়ার জায়গা। ছোট্ট একটা স্টাডিরুম কাম পারিবারিক লাইব্রেরি। ওপরে তিনটে পৃথক পৃথক ব্লক। প্রতিটি ব্লক এক-একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়ান-রুম ফ্ল্যাট— সুখময়দের, বাবিনের, ছোট্টুর, এছাড়া মনভোলানো এক পূর্ব-দক্ষিণ-খোলা বারান্দা।

বাড়ির নাম হল স্বপ্নাতীত।

বাড়ি দেখে খুশিতে পাগল হলেন অনুরূপা। দুই ছেলেও। বাবিন তখন আই আই টিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ছোট্টুর ক্লাস নাইন। বিপুল উৎসাহে দুই ভাই ছুটে ছুটে এখান ওখান থেকে ফুলগাছ এনে লাগাচ্ছে। অনুরূপা সামনের লনটার পরিচর্যা করছেন সারাদিন। বাবির আর ছোট্টুর ঘর পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল। বাবিনের দেওয়ালে ফিল্মস্টার। শুধুই অমিতাভ বচ্চন, বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন মেজাজে। ছোট্টুর দেওয়াল জুড়ে খেলোয়াড়দের মিছিল—গাভাস্কার, বিশ্বনাথ, ইমরান, কপিলদেব, ম্যাকেনরো, বর্গ, ঝাঁকড়াচুলো মারিও কেম্পেস। তার সঙ্গে বাবা-মার দেওয়ালও পরিপূর্ণ। আশায়, সুখে। উষ্ণতায়। মায়াবী নিশ্চিন্ত বার্ধক্যের অলস স্বপ্নে।

বাবিনের আমেরিকায় এখন মধ্যরাত।

ছোট্টুর লণ্ডনে এখনও ভোর হয়নি।

এই উপনগরী এখন রোদ্দুরে ঝলসাচ্ছে।

—কি ভাবছ জানলায় দাঁড়িয়ে?

সুখময় ফিরলেন। খাটের প্রান্তে এসে আধশোয়া স্ত্রীর কপালে হাত ছোঁয়ালেন,—কিছু না।

—আমাকে ডাকোনি কেন?

—ভাবলাম ঘুমোচ্ছ, ঘুমোও।

—দূর, ঘুম কি আর আসে। অনুরূপা ক্লান্তভাবে চোখ বুজলেন।

—সকালের ক্যাপসুলটা খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—ডাক পাঠিয়েছিলে কেন?

—বাজার থেকে কি আনলে? রোজকার সেই চারাপোনা?

—না। বাটা মাছ, কেন?

—কেন কিগো? ভাগ্নে-ভাগ্নেবউ এল, মেয়েটা আমাদের বাড়িতে এই প্রথম, ওদের শুধু বাটা মাছের ঝোল খাওয়াবে? অনুরূপা এখনও হাঁপাচ্ছেন একটু একটু, —বাচ্চাদের জন্য মাংস আনলে হত না?

—বাচ্চারা থোড়াই খাবে। খাবে তো ওই গণ্ডারটা। হাসতে হাসতে বললেন সুখময়,—ও ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও তো। চুপটি করে আজ সারাদিন বিশ্রাম নাও। বিছানা থেকে একদম উঠবে না।

অনুরূপা বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসলেন,—অমলের বউটা কিন্তু বেশ হয়েছে। একটু বোকা ধরণের, কিন্তু বেশ কাজের। কথা শুনে মনে হল, মেজদি-জামাইবাবুর খুব দেখাশুনো করে।

—বোকা না হলে ওই ছেলের প্রেমে পড়ে!

—শুধু প্রেম নয় গো, অমলকে খুব ভয়-ভক্তিও করে।

—বাবাহ! আধঘণ্টা কথা বলেই তুমি অনেক কিছু বুঝে ফেলেছে দেখছি। সুখময় বাঁকা হাসলেন, —সদলবলে এখানে হঠাৎ কেন উদয় হল তা কিছু বলল?

—নিজে থেকে না বললে জিজ্ঞেস করা যায় নাকি?

সুখময় কিছু বললেন না। আলমারি খুলে কয়েকটা কাগজ বার করলেন। ইলেকট্রিক বিল, প্রেসক্রিপশন—কিছু টাকাও।

অনুরূপা ঠাট্টার ছলে বললেন,—একদিক দিয়ে ভালই হল। তোমারও ক'দিন নাতি-নাতনি নিয়ে জমিয়ে কাটবে। ও সুখ তো তোমার ভাগ্যে বড় একটা জোটে না!

বাবিন গতবছর এসেছিল। জাম্বো বড় ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল সুখময়ের। দাদুন, আমি

তোমার সঙ্গে খেলব। দাদুন, আমি তোমার সঙ্গে শোব। দাদুন, আমি তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করব—এক প্লেটে। দাদুন, চলো না আমরা ওয়াকে যাই।

সুখময় ঝট করে মুখ ফেরালেন,—বাচ্চাগুলোর চেহারা দেখেছ? কী চাষাড়ে! শ্যাবি!

—ছি, বাচ্চাদের ওরকম বলতে নেই। ওরাও তো সম্পর্কে নাতি-নাতনি নয়?

পুষ্প ঘরে এসেছে। হাতের ট্রেতে সুখময়ের জন্য চা-টোস্ট, অনুরূপার হরলিক্স, বিস্কুট কয়েকটা। খাটের লাগোয়া টেবিলে ট্রে নামিয়ে বলল,—মা, আপনি লুচি খাবেন দু'চারটে? এনে দেব?

—ওদের দিয়েছিস?

—দেওয়ার দরকার হয়নি। নিজেরাই তার আগে হামলে পড়ে খেয়ে নিল।

চকিত অতিথি-সমাগমে পুষ্পর মুখও বেশ অপ্রসন্ন। সে এ বাড়ির রাতদিনের কাজের লোক। বহুকাল আছে। সুখময়-অনুরূপার কাছে সে এখন অন্ধের যষ্ঠি। তবু তার বাচনভঙ্গিটা এ মুহূর্তে সুখময়েরও অভব্য লাগল।

গম্ভীর মুখে বললেন,—তুই এখন একবার বাজারে যা। ওদের জন্য দুটো মুর্গি নিয়ে আয় বড় দেখে। আর আন্দাজ মতন দই মিষ্টি। বাচ্চা দুটোকে একটু দুধ দিয়েছিস?

পুষ্পর মুখ আরও ভারী,—বউটা নিজেই নিয়ে খাইয়ে দিয়েছে। দুই ছেলেকে বড় বড় দু-গ্লাস। খাবলা খাবলা চিনি মিশিয়ে, এক থালা করে লুচি তরকারি খাওয়ানোর পর।

—দিক না। তুই খেপে যাচ্ছিস কেন? অনুরূপা হাসছেন মিটিমিটি—বউ নয়, বৌদি বল। ওরা আমাদের আত্মীয়।

—সে আমি জানি। পুষ্প খরখর করে উঠল,—নীচে গিয়ে দ্যাখো না, দুই ছেলেতে কল খুলে কিরকম বাথরুম ভাসাচ্ছে।

পুষ্প টাকা নিয়ে চলে গেল।

অনুরূপা হরলিক্সে চুমুক দিলেন—তুমি নিজে বাজার গেলে পারতে। সব কাজ কি কাজের লোকদের দিয়ে হয়!

—আমার এখন সময় নেই। তোমার মাউথ-স্প্রে ফুরিয়ে এসেছে, শঙ্কর মেডিকেলে নেই—দেখি একবার বিডি মার্কেট যেতে হবে। ইলেকট্রিক বিলেরও আজ লাস্ট ডেট। সুখময় বিরস মুখে টোস্টে কামড় বসালেন,—পোস্ট অফিসও যাব। বাড়িতে এয়ারমেল নেই, আনতে হবে।

—তুমি এখনও ছোট্টুকে উত্তর দাওনি। সেই কবে ওর চিঠি এসেছে!

—কবে কোথায়, পরশুই তো এল। তাও আমরা চিঠি দেওয়ার আড়াই মাস পর।

—ওদের নতুন সংসার। নতুন দেশ। নতুন কাজ। তাও আবার যে সে কাজ নয়, অসুখ নিয়ে রিসার্চ। সব সামলে চিঠি লিখতে বসা...সময় তো লাগবেই।

—নতুন কোথায়, দেখতে দেখতে তো আট মাস হয়ে গেল।

—আট মাস আর কি এমন সময়? ওদিকে তোমার বাবিনের যে আট বছর হয়ে গেল। সে কটা চিঠি লেখে বছরে? গুনে গুনে চারটে কি পাঁচটা। তাও বউ লেখে, নিজে তার সঙ্গে নীচে দু'লাইন।

সুখময় চকিতে উদাস। সোঁ সোঁ করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে বুকে,—ওদের সবই নতুন। সব সময়ে। শুধু বাবা-মা দুটো ছাড়া।

—ও আবার কি কথা! হরলিক্স শেষ করে অনুরূপা শুচ্ছেন ধীরে ধীরে,—চা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎই দরজার দিকে নজর গেল সুখময়ের। অমলের বড় ছেলেটা পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছে ঘরে।

অনুরূপাও দেখেছেন। কোমল গলায় ডাকলেন,—আয় দাদু।

ছেলেটা দু'দিকে মাথা দোলালো। এল না।

অনুরূপার স্বর আরও নরম,—তোর চোখ ছলছল করছে কেন রে? মা বকেছে? ওমা এ তো জলও গড়াচ্ছে দেখছি!

দু-হাতের চেটোর উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে নিল ছেলেটা, মুখে স্বর ফুটেছে,—তোমাদের ছাদটা কি বড় গো! আমি আর ভাই চুপি চুপি গিয়ে দেখে এসেছি।

—তাই? আর কি দেখলি? ছাদের ফুলগাছগুলো দেখেছিস?

—হ্যাঁ। অ্যা, ভাই না একটা ফুল ছিঁড়েছে! লাল ফুল।পর্দা সরিয়ে দু-পা এগোল ছেলেটা,—আমরা কোন ঘরে থাকব গো ঠাম্মা? মা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলল। বনু ঘুমিয়ে পড়েছে তো!

—এমা ছি ছি, তুমি কি যে করো না! অনুরূপা অপ্রস্তুত মুখে স্বামীর দিকে তাকালেন,—যাও ওদের জন্য বাবিনের ঘরটা খুলে দাও। বাবিনের খাট বড় আছে।

বাবিন ছোট্টুর ঘর তালাবন্ধই থাকে সারা বছর। সপ্তাহে একদিন ঝাড়াঝুড়ি হয়। আগে অনুরূপা নিজের হাতেই করতেন। ধুলো নাকে গেলে কষ্ট বাড়ে বলে নিজে আর ঢোকেন না, পুষ্পই সাফসুতরো করে রাখে যতটা সম্ভব।

সুখময়ের কণ্ঠে শ্লেষ ফুটল—বাবিনের খাটেও পাঁচজন ধরবে না। ছোট্টুর ঘরও লাগবে।

—লাগলে লাগবে, খুলে দাও। ও তো এখন ভূতের ঘর।

ড্রয়ার থেকে দুপদাপ চাবির গোছা বার করে সুখময় বিছানায় ছুঁড়ে দিলেন। অনুরূপার পলকা আদিখ্যেতা তাঁর মোটেই মনঃপূত নয়। ওফ, ওই মায়াবী ঘর দুটো এখন তছনছ করবে অমল! গ্রাম্য গন্ধ ছড়িয়ে দেবে চারদিকে!

সুখময় দরজার দিকে এগোলেন,—পুষ্প ফিরুক, ওকে দিয়েই খুলিয়ে নিও। আমি বেরোচ্ছি।

দুপুরে অমলদের আসার প্রকৃত কারণটা জানা গেল। অমলই বলল খাওয়ার সময়ে। অমলের বড় ছেলেটার চোখে কি সব গণ্ডগোল হয়েছে, ছেলেকে বড়ডাক্তার দেখাতে এনেছে কলকাতায়। সারাক্ষণই নাকি চোখ ছলছল করে, জল পড়ে, মাঝে মাঝে যন্ত্রণাও হয়। সিউড়িতে দু-তিনজন ডাক্তারকে দেখিয়েছিল, তাদের এক একজনের এক এক মত। কেউ বলে গ্ল্যাণ্ডের গণ্ডগোল, কেউ বলে নার্ভের, কেউ বলে কর্নিয়ার। ওখান থেকে এক ডাক্তার চিঠি দিয়ে দিয়েছে, তার সুপারিশেই দেখাবে বড় ডাক্তারকে। ডাক্তারটির নাম সুরেন সরকার। পিজির প্রফেসার। শোনা-শোনা নাম, ছোট্টুর মুখেই সুখময় শুনেছেন বোধহয়।

স্টাডিরুমে এসে সুখময় একটা সিগারেট ধরালেন। খাওয়া-দাওয়ার পর এ ঘরে বসে মৌজ করে একটু সিগারেট খান। আগে দিনে কুড়ি-পঁচিশটা হয়ে যেত। এখন নেশাটা অনেক কমিয়ে এনেছেন। দুপুরে রাতে খাওয়ার পর একটা করে, আর সারা দিনে বড়জোর দু-তিনটে। এবার ভাবছেন ছেড়েই দেবেন অভ্যাসটা। একটু জোরে হাঁটলেই আজকাল একটা চিনচিনে হাল্কা ব্যথা হয় বুকে, হাঁপিয়েও যান বড় তাড়াতাড়ি। ব্যথার কথাটা অনুরূপাকে বলেননি। মিছিমিছি মানুষের উদ্বেগ বাড়িয়ে কি লাভ! একেই তো নিজের জ্বালায় জ্বলে মরছে বেচারা!

দুপুরের বাতাস বাইরে থম মেরে ছিল অনেকক্ষণ, হঠাৎই একটা ঝাপটা দিল যেন। খোলা

জানলা দিয়ে কিছু ধূলোবালি উড়ে এল। শুকনো পাতারা ছুটছে রাস্তায়। সুখময় উঠে জানলাটা টেনে দিলেন। পুষ্পকে কতবার করে বলেছেন বেলা বাড়লে সব জানলা বন্ধ করে দিতে, এ সময়ে ধূলো ঢুকে ঘরদোর বড় নোংরা হয়, তা কথাটা যদি খেয়াল থাকে মেয়েটার! আজ অবশ্য খেয়াল না থাকলেও বলার নেই কিছু। সিউড়ি থেকে আসা উটকো ধূলো সামলাতেই যা হিমশিম খাচ্ছে!

অমলটা সত্যিই যাচ্ছেতাই। যেমন নোংরা, তেমন বেআক্কেলে। শিক্ষাদীক্ষা না থাকলে যা হয়! অতটুকু ছেলে চোখ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে, অথচ বাপকে দ্যাখো দিব্যি মাংসের হাড় চুষতে চুষতে ব্যাখান করে চলেছে ডাক্তারদের। ভাষাই বা কী! ওখানকাব ডাক্তারটা লেবঞ্চুস! বেঁড়ে পাকামি করছিল! চেম্বারে ঢুকে দিয়েছি ব্যাটাকে আচ্ছা করে কড়কে! বসার ভঙ্গিটাও কী অশালীন! এক-পা চেয়ারে তুলে, এক পা নাচাতে নাচাতে খাওয়া! লোমশ খালি গা! পরনে উৎকট চেক লুঙ্গি! শব্দ করে করে কুলকুচি করা! অসহ্য! অসহ্য!

সুখময় চেপে চেপে সিগারেট নিবিয়ে ওপরে এলেন। আঃ, ঠিক যা ভয় পেয়েছিলেন তাই! অনুরূপার সামনে মোড়া টেনে বসে আগড়ুম বাগড়ুম গল্প করে চলেছে অমল। সাধারণ বুদ্ধিটুকুরও এত অভাব? শুনলি মামী সারারাত ঘুমোতে পারেনি—এখন কষ্ট কম, একটু শুয়ে নিতে দে, তা নয়..! অনুরূপাও কেন যে এত লাই দেয় ছেলেটাকে! নির্ঘাত এখন আত্মীয়স্বজনদেব ঠিকুজি কুষ্ঠির তালাশ চলছে—কার বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না, কার মেয়ে বাপকে লুকিয়ে বিয়ে করাব মতলব ভাঁজছে, রামপুরহাটের কোন দেওর কার জমি হাতাল, এসব শুনে অনুরূপার কী যে মোক্ষ লাভ হয়! নিজে তিনি কোনদিন প্রশয় দেননি অমলকে। এসেছ এসো, দু-চার ঘণ্টা থাকো, খাও দাও, বিদায় নাও। শুধু অমল নয়, সব আত্মীয়ের জন্যই সুখময়ের এক বিধান।

ঘরে না গিয়ে সুখময় সামনের প্যাসেজটার দিকে গেলেন। দু'ধারে বাবিন আর ছোট্টুর ঘর। দুটোই হাট করে খোলা। ছোট্টুর খাটে বিশ্রীভাবে ছড়ানো রয়েছে অমলদের মালপত্র, জামাকাপড়। বাবিনের বিছানায মঞ্জু কোলের মেয়েটাকে নিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে। বড় ছেলেটি মেঝেয় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। ছোটটি খাটের প্রান্তে গুটিয়ে গুটিয়ে জড়সড়ো।

সুখময় সরে এলেন। পূর্ব-দক্ষিণ-খোলা গোল বারান্দা থেকে দুপুর হলেই রোদ সরে যায়। একটা ইজিচেয়ার আর গোটা দু-তিন মোড়া সব সময় ছড়ানো থাকে এখানে। সুখময় ইজিচেয়াবে শবীব ছেড়ে দিলেন। বাবিন আর ছোট্টুর ঘর দুটি তাঁর বড প্রিয়। নির্জনতার সঙ্গীও বটে। অনুরূপাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝেই ঘর দুটোর তালা খোলেন সুখময়। চেয়ার টেবিল খাট আলমারি বিছানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেন। পোস্টারগুলো কবেই আর নেই, তবু ফিকে রঙিন দেওয়ালে এখনও অনেক ছবি দেখতে পান তিনি। বাবিন জন্মাল। হাঁটছে। কথা ফুটল মুখে। স্কুলে যাচ্ছে। রাত্তিরবেলা অনুরূপাকে আবার রেখে আসতে হল রেলের হাসপাতালে। ছোট্টু এল। পিঠোপিঠি বড় হচ্ছে দুই ভাই। ছবি আর ছবি। পর পর অজস্র ছবির মিছিলে দেওয়াল পূর্ণ হয়ে যায়। বাবিন আমেরিকা থেকে বিয়ে করতে এল। বউ নিয়ে চলে যাচ্ছে। ছোট্টুর লণ্ডনে রিসার্চ করতে যাওয়ার সুযোগ এসে গেছে। নিজের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে সে-ও চলে গেল বাইরে। কখনও এয়ারপোর্টে গিয়ে হাত নাড়ছেন সুখময়। কখনও হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরছেন ছেলেদের, নাতিকে। সব—সব মুহূর্ত এই দুটো ঘরে যেন বন্দী হয়ে আছে।

চাবি খুলে শুধু তাদের দেখা বারবার, প্রাণভরে।

—ঘুমোচ্ছ নাকি?

সুখময় চোখ খুললেন, উত্তর দিলেন না।

অমল মোড়া টেনে বসল। সুখময়কে বিস্মিত করে চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ। যেন উষ্ণ দুপুরের ছায়া আবিষ্ট করেছে তাকেও। হঠাৎই বলল,—তুমি কেমন বুড়োটে হয়ে গেছ মামা!

সুখময়ের ছোট্ট শ্বাস পড়ল—বয়স তো হচ্ছে!

—বয়স কিসের? এখনও তো সত্তর ছোঁওনি! কত চলছে? আটষট্টি ? উনসত্তর?

—সেটা কি কম হল?

—কম নয়, বেশিও নয়। আমার বড় জ্যাঠাকে দ্যাখো, এইট্টি ওয়ান। এখনও বাচ্চাদের ফুটবলে রেফারিং করতে নামে। এদিকে আমার বাবা ছিয়াত্তরেই কুপোকাত! অলটাইম বিছানায়!

সুখময় অন্যমনস্কভাবে বললেন,—জামাইবাবু রোগাভোগা।

—ওটা বাজে কথা। আসল ব্যাপারটা কি জানো? যাদের ওপর টান খুব বেশি, তাদের কাছ থেকে ল্যাং খেলে শরীর ভেতর থেকে ধসে যায়।

—কে তোর বাবাকে ল্যাং মারল? তুই রয়েছিস, বউমা রয়েছে...

—আমরা কি বাবার ভালবাসার জন নাকি। ভালবাসার ছেলে হল দাদা। বাবার ভাল ছেলে। লেখাপড়ায় ভাল, বাবিন ছোট্টুর মতো না হলেও দু-তিনখানা ডিগ্রি আছে। তাকে নিয়ে বাবার অত সাধ-আহ্লাদ, অথচ তিনি তো পুরো কাট্টি করে দিয়েছেন! আমি চিরকালের লাথখোর ছেলে, বাবা আমাকে হারামজাদা না বলে কোনওদিন জল খায়নি, সেই আমার মুখ চব্বিশ ঘণ্টা দেখতে বাবার ভাল লাগে?

মেজদির চিঠিতেই কথাটা জেনেছিলেন সুখময়, তবু প্রশ্ন করলেন—নির্মল কি পার্টিশন করে নিয়েছে?

—পার্টিশন মানে? পুরো পাঁচিল গেঁথে ফেলেছে। দশ ইঞ্চির দেওয়াল। একেবারে বউ-এর ভেড়া হয়ে গেছে। বাবার একটা হার্ট-অ্যাটাকের মতো হল, রাস্তায় ডেকে বললাম, একবার চোখের দেখাও দেখতে এল না। এলে যদি মাল্লু ছাড়তে হয়! পূজোর সময় মাকে হাতে করে একটা কাপড় পর্যন্ত দেয় না!

সুখময় হাল্কা চালে বললেন,—ভালই তো তুই বাবা-মাকে দেখছিস, তোর পুণ্যি বাড়ছে।

—পাপ-পুণ্য বুঝি না মামা। আমার মোটা বুদ্ধি বলে যে বাপ-মা খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছে, তারা বুড়ো হলে আমাদেরকেই তাদের দেখতে হবে। এ কোন দয়া-ফয়ার ব্যাপার নয়, পুরো হিসেবের কড়ি। জুতো-ঝ্যাঁটা যাই মারুক, খেতে পরতে তো দিয়েছিল! সেই লোনটা শোধ করতে হবে না!

কথাটা সামান্য বিঁধল সুখময়কে। কোথায় যে ঠিক বিঁধল, বুঝতে পারলেন না।

অমল দুম করে প্রশ্ন করে বসল,—বাবিন শুনলাম আর নাকি ফিরছে না। মামী বলছিল, কিসব গ্রিন কার্ড-মার্ড পেয়ে গেছে?

—তা পেয়েছে। তবে ফিরবে না এমন কথা তো বলেনি! বলতে গিয়েও ঠিক ঠিক জোর ফুটল না সুখময়ের গলায়। স্ত্রী ওপর মনে মনে বিরক্তই হলেন তিনি। অমলকে এত কথা বলার কি দরকার ছিল।

অমলের কৌতূহলের শেষ নেই, সে আবার খোঁচা দিল—তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মামা, ছোট্টু বিদেশে পড়ে থাকতে পারবে না, ও যা মামীর কোলঘেঁষা।

সুখময় শক্ত হলেন,—ওদের যদি বিদেশে ভাল লাগে, নিশ্চয়ই থাকবে। এ দেশে তেমন স্কোপই বা কোথায় ওদের জন্য?

—তা ঠিক। না ফেরাই উচিত। এত ভাল ছেলে ওরা। অমল বিজ্ঞের মতো রায়

দিল,—আমি তো মঞ্জুকে বলি, তুমি শুধু আমাদের ফ্যামিলির দুটো স্যাম্পেল দেখলে! এক আমি, ডিগবাজি খেয়ে খেয়ে ধপাস পার্টি। আর এক আমার বউ-এর পাশে লেজ নাড়ানো দিগগজ দাদা, মাদুর পাতা মাস্টার। যদি খাঁটি জুয়েল দেখতে চাও, আমার মামার ছেলেদের দেখো। কী ভদ্র! কী অমায়িক ব্যবহার! কোনও পরীক্ষায় কখনও ফার্স্ট ছাড়া সেকেণ্ড হয়নি।

কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও কথাটা খুব মিথ্যে নয়। বাবিন হায়ার সেকেণ্ডারিতে থার্ড হয়েছিল, ছোট্টু মেডিকেলের জয়েণ্ট এন্ট্রান্সে সেকেণ্ড। দুই ছেলের পিছনে কম পরিশ্রম কম অর্থব্যয় করেননি সুখময়। তাঁর সব চেষ্টা আজ সার্থক। ছোটবেলা থেকে ছেলেদের নিখুঁতভাবে পথ দেখাতে পেরেছেন বলেই না তিনি আজ এক সফল পিতা। দুই পুত্রবধূও তাঁর শিক্ষিত। মার্জিত। বাবিনের বউ ওখানে একটা স্কুলে চাকরি করছে, ছোট্টুর বউ তো ছোট্টুর মতই ডাক্তার।

সুখে প্রাচুর্যে সাফল্যে সব দিক দিয়েই পরিতৃপ্ত সুখময়, তবু কেন যে বুকটা চিনচিন করে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ, এই নির্জন অপরাহ্নবেলায়?

—কি লিখলাম শুনবে না?

অনুরূপা রাতের খাওয়া সারছিলেন। দুটো রুটি, অল্প মুর্গির মাংস। তাঁর জন্য স্টুয়ের মতো করে আলাদা মাংস রেঁধেছে পুষ্প। এমনি অনুরূপা পাতলা রান্না ভালইবাসেন, কিন্তু আজ ঠিক গলা দিয়ে নামছিল না তাঁর। একটা চোরা ভয় শিরদাঁড়া ছুঁয়ে যাচ্ছে। আবার যে কখন কালকের মতো এসে পড়ে কষ্টটা!

সুখময় অসহিষ্ণুভাবে বললেন,—কি হল শুনবে? পড়ব না মুখ বন্ধ করে দেব?

অনুরূপা ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন—কি আর শুনব? লিখেছ তো সেই বাঁধা গৎ—আমরা ভাল আছি, তোমরা কেমন আছ? মাঝে তোমার মায়ের শরীর খারাপ হয়েছিল—সেই হাঁপের টান। এখন মোটামুটি আছে। তোমরা আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না।

সুখময় ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হলেন,—আর কিছু লিখি না আমি?

—বলো, আর কি লেখো?

সুখময় তীব্র চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, —লিখে দেব তোমার জন্য সারারাত জেগে বসে থাকতে হয়? তোমার চোখ মুখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে?

—আমি কি বলেছি, ওসব লিখতে?

—তাহলে কি লিখব? লিখব, স্নেহের ছোট্টু, তুমি একদা গেটের সামনে যে কৃষ্ণচূড়া গাছটি পুঁতিয়াছিলে তাহাতে ফুল আসিয়াছে, তোমার দাদার পোঁতা পলাশ গাছেও। দুটি গাছের ফুলে আমাদের গেটের সম্মুখভাগ লাল হইয়া থাকে।

অনুরূপা খাওয়া বন্ধ করে স্বামীর দিকে তাকালেন,—সত্যি কথা স্বীকার করতে এত ভয় পাও কেন তুমি? যা লিখেছ, এ ছাড়া সত্যিই কি কিছু লেখার আছে? চিঠি লেখা মানে তো এখনও জ্যান্ত আছি সেটা জানানো, আর কি?

সুখময় নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। এয়ারমেলের মুখ জুড়লেন ধীরে ধীরে। ঘরের উজ্জ্বল আলোটাকে বড় নিষ্প্রভ লাগছিল তাঁর। শুধু নিষ্প্রভ নয়, ঝাপসাও।

নিম্নস্বরে বললেন সুখময়,—তুমি বড় নিষ্ঠুর অনু!

—নিষ্ঠুর নয়, যা দেখি যা বুঝি তাই বলছি। তুমি যা সত্যি সত্যি লিখতে চাও, তা তোমার কলমের ডগায় আসবে? আমি চাইলেও আমাকে লিখতে দেবে সে কথা?

—কেন লিখব আমরা? সুখময়ের গলা ফ্যাসফ্যাসে শোনাচ্ছিল।

—লিখো না। যক্ষ হয়ে কুবেরপুরী আগলাও।

একতলা থেকে টিভির শব্দ ভেসে আসছিল। সিনেমার গান হচ্ছে। পুরনো দিনের গান। অমল খুব জোরে চালিয়েছে টিভিটা।

কান পেতে গানটা শোনার চেষ্টা করলেন অনুরূপা। কি গান বোঝা যাচ্ছে না। থালায় হাত ধুতে ধুতে বললেন,—তুমি আজকাল বড় অবুঝ হয়ে যাও। ওইটুকু বাচ্চাকে তখন ওইভাবে ধমকালে! কোন মানে হয়?

—বেশ করেছি। খবর শোনার সময়ে অত চেঁচাবে কে ? বউটারও বলিহারি! তিন-তিনটের মা হয়েছে, একটাকেও সামলাতে পারে না। সুখময় প্রায় ভেংচে উঠলেন,—কোলের মেয়েটা সোফাতে পেচ্ছাপ করে দিল, মায়ের হিলদোল নেই, একটু কাঁচিয়ে ফেলে দিল শুধু। ছোট ছেলেটা শোকেসের কাচ ভটাং করে টানছে বন্ধ করছে, মায়ের ভ্রূক্ষেপ নেই। একদিনেই বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে দিল।

—দিক গে, অত পিটপিট কোরো না তো! দুটো দিনের জন্য এসেছে...আর ওই সোফা-শোকেস নিয়ে কি আমরা স্বর্গে যাব? তোমার ওই মর্নিং ওয়াকের মিলিটারি বন্ধু বলে না, এর পর সব বাড়ি সার সার ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে, ঠিকই বলে।

সুখময় চশমা খাপে ভরলেন। অনুরূপার কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললেন তিনি,—আর আমি হব যক্ষ, তাই তো? এ পাড়ায় সার সার যক্ষ!

—তাই তো হবে। অনুরূপাও হাসছেন, অনেক বকেছ, এবার আমার ক্যাপসুলটা দাও।

ওষুধের সঙ্গে বেশ খানিকটা জল খেলেন অনুরূপা, তারপর বললেন,—দশটা তো বাজে, তোমরা খেতে বসবে না?

—বসব। তোমার পুষ্পরাণীর টিভি দেখা শেষ হোক। সকালে অমলের বউটাকে সহ্য করতে পারছিল না, এখন তো তার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব।

—অমলের বউটা সত্যিই ভাল গো। বড় দুঃখী। অনুরূপা সামান্য ইতস্তত করে বললেন,—তোমার মেজদিও নাকি ওর ওপর খুব অত্যাচার করে।

—কেন?

—কেন আবার কি? বিয়েতে তেমন কিছু পায়নি, প্রায় এক বস্ত্রেই চলে এসেছে, মেয়েটা, তাই নিয়ে দিবারাত্র নাকি গঞ্জনা দেয়। বলতে বলতে কেঁদে ফেলছিল বেচারা।

—অমলের তো খুব হাঁকডাক, ও কেন প্রোটেস্ট করে না?

—মুরোদ কোথায়? মাইনে তো পায় হাজার টাকা। তোমার জামাইবাবুর পেনশানের টাকা আছে, ফিক্সড ডিপোজিটের ইন্টারেস্ট আছে—তাই দিয়েই চলে সংসারটা।

সুখময় থমকে গেলেন। বিড়বিড় করে বললেন,—তবে যে ছেলেটা বড় মুখ করে বলছিল বাবা-মাকে দেখছি! অন্নের ঋণ শোধ করছি।

—বাজে কথা। মেয়েটা আলাদা থাকতে চায়, তোমার ভাগ্নে নিরুপায়। আলাদা হলে খাবে কি? নেহাত অন্ন জুটবে না বলেই বাবা-মার কাছে পড়ে আছে। বাপ-মার ওপর ভক্তি নয় গো, একে বলে দায়ে পড়ে রায়মশাই। তোমার জামাইবাবু নাকি নাতির চোখের চিকিৎসার জন্যও ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে দিয়েছে ছেলেকে।

পুষ্প ঘরে এসে এঁটো থালাবাসন গোছাচ্ছে, যাওয়ার সময় সুখময়কে খেতে ডেকে গেল।

সুখময় খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরলেন। সিগারেট ধরিয়ে গোল বারান্দায় পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। শুয়ে পড়লেন।

সারাদিনের তপ্ত ভাব আর নেই। একটা নরম মিঠে বাতাস জানলা বেয়ে ঘরে ঢুকছে।

স্পর্শ করছে ঘরের আসবাবপত্র। মানুষদেরও। নারকেল গাছের ওপারে পিছনের রাস্তার টিউবলাইটটা জ্বলছে নিবছে বার বার।

রাত বাড়ছিল।

মাঝরাত অবধি ঘুম এল না সুখময়ের। প্রতি পলে কাল রাতের বিপন্নতার স্মৃতি কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছিল তাঁকে। পাশের ঘরের কলকাকলি স্তব্ধ হওয়ার পরও চোখের পাতা এক হল না কিছুতেই।

হঠাৎই সুখময় একটা শব্দ শুনলেন। শব্দটা প্রথমে একটু শুরু হয়েই থেমে গেল। তারপর আবার শুরু হল। বাড়ছে কমছে। থামছে । বাড়ছে।

বেশ খানিকক্ষণ মন দিয়ে শোনার পর শব্দের উৎসটা খুঁজে পেলেন সুখময়। অমল নাক ডাকছে।

রাগতে গিয়েও সুখময়ের রাগ এল না। স্নায়ু কেমন ঝিমিয়ে এল। অন্ধকার বাড়িতে শব্দটা পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। মথের মতো। একটা প্রাণের অস্তিত্ব হয়ে।

অনুরূপার টান উঠল না। সুখময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

টানটা পরদিন উঠল না—পরদিনও না। দুদিন ধরে গোটা বাড়ি জুড়ে দক্ষযজ্ঞ করল অমলের দলবল—ছড়ালো, লাফালো, নোংরা করল, ছাদের টব প্রায় নির্মূল করে ফেলল শিশুরা। ছেলেকে ডাক্তার দেখাল অমল। তেমন বিপদের কিছু নেই। গ্ল্যাণ্ডেরই গোলমাল। ওষুধ চলবে এখন। এক মাস পরে আবার দেখাতে হবে ছেলেকে। মনের আনন্দে অমল কলকাতা ঘোরালো বউ-বাচ্চাদের। পাতালরেল, দ্বিতীয় হুগলি সেতু,—কিছুই বাদ পড়ল না। আজ তার লটবহর নিয়ে ফেরার পালা।

দুপুর দুটোয় বাস। ধর্মতলা থেকে। পথে খাওয়ার জন্য কোঁচড় বেঁধে টিফিন দিয়ে দিলেন অনুরূপা নিজের হাতে তৈরি করে। লুচি তরকারি হালুয়া। একটা ভাল শাড়িও দিলেন মঞ্জুকে। বাচ্চাদের এক সেট করে জামাকাপড়।

মঞ্জু খানিকটা কাঁদল। অমল হাসল হা হা করে। বাচ্চাগুলো খুশি না ব্যথিত বোঝা গেল না।

অমল চলে গেল, ঝাঁ ঝাঁ রোদে।

বাবিন আর ছোট্টুর ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে পুষ্প। সাজিয়ে-গুছিয়ে ঘর আবার পুরনো চেহারায়।

সুখময় ঘর দুটোতে তালা দিতে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। দুটো খোলা দরজার মাঝখানে, ছায়া ছায়া প্যাসেজ, নিঝুম দাঁড়িয়ে আছেন অনুরূপা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কী নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে বাবিন-ছোট্টুর গরবিনী মাকে। শুধু একা নয়, শূন্য। কাঙাল।

বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল সুখময়ের। তার একটা ছেলেও যদি অশিক্ষিত, বেরোজগেরে হত ওই অমলটার মতো।

যাত্রা ॥ জয়া মিত্র

ঘুম ভেঙে গিয়েও খানিকক্ষণ চোখ মেলেন না সাগরময়ী। ঘুমের যে কখন শেষ আর কখন পুরোপুরি জেগে ওঠা শুরু চোখ বন্ধ রেখেই আজকাল সেটা যেন একটু একটু করে বুঝতে পারেন। চোখ মেললেই বা কি! চারপাশেই তো অন্ধকাব এখনও। মশারির বাইরে বাঁ হাতে খোলা জানলার নিচে বড় বাতাবি লেবুর গাছটায় ফুলের গন্ধ ইদানীং কমে এসেছে। ফুল ঝরে গিয়ে জালি পড়তে শুরু করেছে বোধহয়। অন্ধকারেরও তো রকমফের আছে। এখন আর রাত্তিরের অন্ধকার নয়, ঘুম ভেঙেছে মানেই রাত ফুরিয়ে এসেছে। গাছে গাছে এবার পাখিদের জেগে ওঠার সময় হবে। সেই যে ডাকা পাখি না ছাড়ে বাসা, খনা বলেন সে হল ঊষা, এখন সেই ঊষা আসবার সময়। অন্যদিনে এ সময়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়েই রাত্রিশেষের হালকা বাতাসের স্রোত বয়। আজ যেন একটু দমচাপা লাগছে। এখন কি তার শুয়ে থাকার সময়! গোপালকে জাগরণ দিতে হত, শয়ন তুলে নতুন পোষাক পরানো চন্দন দেওয়া, তারও আগে নিজের স্নান। উঠোনের অন্ধকারে শাদা শাড়িটি মেলে দিলেই যেন অন্ধকার একটু কম হয়ে যেত। তারপর সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে টুলটুল করে তাকিয়ে থাকা ফুলের কলিগুলি, টগর, গন্ধরাজ, গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা বঁড়শির ডগায় চাঁপা, গুলঞ্চ। আর একটু পরে ভোরের প্রথম আভাটুকু গায়ে মেখে নিয়ে ফুটে উঠবে স্থলপদ্ম, বাগানের পুবদিকের গাছটি থেকেই যেন আলো ছড়িয়ে পড়বে উঠোন জুড়ে, আর শরতের মেঘ উড়ান নিতে না নিতে ফুটতে শুরু করত শিউলি অঘ্রাণের শেষ পর্যন্ত। আহা, সেই গন্ধের যে টান! মাটির দিকে, অন্ধকারের মধ্যে গাছের তলায় বিছিয়ে থাকত বাশি রাশি ফুল, সেই সব ফুল দিয়ে আসন সাজাতে, চন্দন ঘষতে গুনগুন গান গাওয়া, গোপালকেই তো জাগান, সাজান। তারই মধ্যে কখন আলো ফুটতে শুরু করত। আর বিছানা ছেড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তামার ঘটিতে রাখা এক ঘটি জল ঢকঢক করে খেয়ে সেই মানুষটি উঠোনে পুবমুখো হয়ে বসতেন। একটি নিচু জলচৌকির ওপর আসনপিঁড়ি, হাতের তানপুরোটি একবার দুবার সুর ছাড়ত আর কী ভরাট গলা! অবাক হয়ে আড়চোখে মানুষটার দিকে দেখতে দেখতে এক-একদিন সাগরময়ীর মনে হয়েছে, ওই বুকের ভিতর থেকে ওঠা গম্‌গমে আওয়াজের ধ্বনি ধরেই যেন সূর্য উঠে এল। কোনদিন কি বলেছেন সেকথা! ভয়ে মাটিতে মিশে থাকতেন না নিজের থেকে সাতাশ বছরের বড় স্বামীর সামনে! দশটায় ভাত খেয়ে তিনি অফিস চলে গেলে তবে যেন বাড়িতে একটু খোলামেলা হতে পারতেন সাগরময়ী।

আজ কেন এখনও অন্ধকার একটুও হালকা হল না? তবে কি সত্যি এখনও মাঝরাত্রি? যেন অনুভব করেন জলতেষ্টা পেয়েছে তাঁর। একটু দূরের খাটে ছেলে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তাকে কি ডাকা যায়? যাক, একটু পরে হয়ত নিজেই জেগে উঠবে। এই হাত পা শরীর সব এমন অচল হল, কে বা জানত এমন হবে! যাদের বৌ করে ঘরে এনেছিলেন, তাদের কোলে যারা জন্ম নিয়েছিল তারা কতজন চলে গেল চিরকালের মত। কতজন এতদূরে চলে গেছে যে

তারাও যেন চিরকালের মত— ষাট্ ষাট্ কি কথা ভাবলেন, যে যেখানে আছে ভালো থাক, দীর্ঘায়ু হোক। শুধু তিনিই কেন যেতে পারেন না! আর কতদিন এই পারের কিনারায় বসে অন্যদের চলে যেতে দেখবেন! নড়াচড়া করার ক্ষমতা, দুচোখ মেলে চেয়ে দেখার ক্ষমতা, তাও যে গোপাল নিয়ে নিল—তবে গোপাল তাঁকে কেন নেয় না? তিনি যে আর একা থাকতে পারেন না একথা কাকে বা বলবেন। কতবার কত শিশুর মুখে গোপাল এসে দেখা দিয়েছে, তাঁর কোলে খেলা করেছে। কত মানুষজন কত কাজ ছিল সংসারময়। সাতাশ বছরের বড় স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়ে তিনি সংসারে এসেছিলেন, চোদ্দ বছর বয়সে। তাতেই তাঁর বাবাকে আত্মীয়পরিজন কত গঞ্জনা দিত।

এত বড় পাহাড়ের মত মেয়ে বুকের উপর বসা, দুবেলা গলা দিয়া ভাত নামে ক্যামনে? বাবার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন সাগর। একটি মাত্র মেয়ে, অনেকগুলি ছেলের পিঠে। লোকে বলত অমুকের মাইয়ারে মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়ায় খায়। কোন্ শাশুড়ি জানি কপালে নাচতে আছে।

না, শাশুড়ি ননদের ভরা সংসার পাননি তিনি। নতুন সংসারে কতদিন পর্যন্ত তিনি একা মেয়ে। একটা কাজ যে শিখিয়ে দেবে, সাহায্য হবে, হাতে গরম ফ্যান পড়ে গেলে কি শিলে আঙুল ছেঁচে গেলে একটা আহা করার কেউ ছিল না। এও সত্যি, অপমান-নির্যাতনও কখনও সহ্য করতে হয়নি তাঁকে সে সংসারে। স্বামী বড় শান্ত মানুষ ছিলেন। সংসারটি শান্ত ছিল। মনে কষ্ট কি পাননি? মনের কষ্ট ছাড়া নারীজন্ম কবে যায়? জলের দেশের মেয়ে তিনি, বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে আসবার সময় নৌকায় বসেই জিগেস করেছিলেন, খোকার নাম কি?

আগে জেনেছিলেন অন্যের ফেলে যাওয়া সংসারে ঢুকতে যাচ্ছেন তিনি। কচি ছেলে রেখে স্ত্রী মারা যেতে সেই সতী সুভাগার ছেলের দায়িত্ব নেবার জন্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করছেন মানুষটি। একবার প্রশ্নে উত্তর না পেয়ে ভেবেছিলেন নদীর শব্দে, দাঁড়ের শব্দে শুনতে পান নি স্বামী। দ্বিতীয়বার জিগেস করতে শুনেছিলেন—খোকা না, খোকারা। তিন ছেলে এক মেয়ে তোমার। চমকে ওঠে নি বুকের ভিতর? কষ্ট হয়নি খুব? জানতেন না ঠিক কিসের কষ্ট কিন্তু তবু মনে হয়েছিল মা-বাবা কি সব জেনে তার কাছে লুকোলেন? মা-বাবা কি জানেন না? কোন অজানা দেশের সেই অচেনা সংসারের ভয়ে আবার তাঁর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠেছিল।

অঘোরনাথের বড়ছেলে সাগরময়ীর চেয়ে চারবছরের বড় ছিল, মেজ দুবছরের। তারপর একটি মেয়ে, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সে সাগরময়ীর সমবয়সী। তাকে সাগরময়ী দেখেছেন অনেক পরে। সবচেয়ে ছোট যে ছেলে, মাধব, তার বয়স আট। তারই মা হয়ে আসবার কথা শুনেছিলেন বিয়ের আগে। প্রথম কিছুদিন ছেলেরা আড়ষ্ট ছিল, মা বলে ডাকত না। খোকা তো ডাকতই না। সে ছোট ছিল, সে তো সংসারে আইনকানুন জানত না, সে তার মাকে চিনত। প্রায় মাসখানেক কি তারও বেশি সে ডাকত 'এই' 'অই' বলে। তার বাবা বারেবারে জেদ করতেন—'অই কি' মা কও'। সে বাবার সামমাসামনি আসত না। বড় দুই ছেলে পারতপক্ষে ঢুকত না ভিতরবাড়িতে। চুপ করে খেয়ে ওঠা ছাড়া তাদের সঙ্গে আর বড় সম্পর্ক ছিল না। একসময়ে ধীরে ধীরে সেইসব ভয় কষ্ট লজ্জা কিছু কেটে গেল কিছু সহজ হয়ে গেল। তবু আজও মনে আছে অতো বড় বড় ছেলেদের সামনে তাদের বাবার স্ত্রী হয়ে আসার লজ্জা। খুব জ্বর। কোনরকমে রান্নঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় শুয়ে পড়ে মনে হচ্ছিল বন্ধ চোখের চারদিকে যেন লাল কি ঘুরছে। আর সেই জ্বরের সময়ই বড়ছেলে বিষ্ণুপদর সেবায় অনেকখানি আশ্রয় আর নির্ভয় পেলেন সংসারে।

দু'বছরের মাথায় বিষ্ণুপদর বিয়ে দিলেন। সৌরভী সংসারে এল। শাশুড়ি বৌ দুই সঙ্গিনী হয়েছিলেন। দুপুরবেলা বাপছেলেরা যে যার কাজে গেলে দুজনে নিশ্চিন্তমনে খিড়কী

বাগানের আমগাছে উঠেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কেটেছেন পুকুরে। তিনি তো পণ্ডিতের মেয়ে, সৌরভীর বাবা কাছারিতে কাজ করতেন—অনেক ভালো ভালো জিনিস রাঁধতে জানত সৌরভী। তার বাবা নিজের জামাইকেও কাজ ধরিয়েছিলেন সদর কাছারিতে। কিন্তু একটুও গুমোর ছিল না সৌরভীর। বড় হাসিখুশি মেয়ে ছিল। তবু একটা লজ্জার কথা খুব ভিতরে কোথায় যে কষ্ট দিত—যখন প্রায় একই সঙ্গে গর্ভিণী হতেন দুজনে। সৌরভী যে ছেলের বৌ। সেই ছেলের সামনে মাকেও যখন ভারী শরীর নিয়ে চলাফেরা করতে হয় বড় লজ্জা হত। অথচ পুরুষমানুষরা কেন বোঝে না? তাদে'র লজ্জা হত না, তারাও তো বাবা আর ছেলে? কিন্তু এমন তো হতই। বিষ্ণু তো সাগরময়ীর পেটের ছেলে ছিল না, গর্ভজাত পুত্রের বৌ আর শাশুড়ি একই সময়ে আঁতুড়ঘরে থাকাই কি কম হত তখন! কিন্তু প্রতিবারই তো যে আসে সে একটি শিশু। আহা বুক জুড়িয়ে যেত। বিস্ময়ের যেন আর সীমা পরিসীমা থাকত না। আর কত না আনন্দ। তবু তো সবাই থাকত না তারা। অত কষ্ট অত যন্ত্রণা দিয়ে যদি দিতেন ঠাকুর তবে কেন ফিরিয়ে নিতেন আরও যন্ত্রণা দিয়ে? দ্বিতীয়বার গর্ভে যমজ ছেলে ছিল তাঁর। জন্মের পর চারদিন মাত্র বেঁচেছিল তারা। কত বয়স ছিল তখন সাগরের? আঠারো কি উনিশ। বুকে ভরাট দুধেব যন্ত্রণায় আর খালি কোলের শোকে পাগল হয়ে গেছিলেন। জোরে কাঁদতে পারতেন না, দাওয়ার খুঁটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে কপালে কালশিরা পড়ে গিয়েছিল। তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে 'ও মা—' বলে সৌরভীও কাঁদত।

তাই কি একবার? কানু গেল ছ বছর বয়সে। কী যে হয়েছিল! জ্বর চলল একটানা, খাওয়া বন্ধ। কষ্টিপাথরের মত ছেলে পাঙাশপানা হয়ে গেল। কালো ঝিকমিকে চোখ যেন মরা মাছের মত। থাকবে না বলেই বুঝি অতো রূপ নিয়ে এসেছিল। পাথরকাটা যেমন ঠাকুরটি। মিটিমিটি হাসি, মুখখানি ঘিরে থুপি থুপি চুল। সেই ছেলে চোখের সামনে কোলের ওপর একটু একটু করে শুকিয়ে গেল, কবিরাজের ওষুধে কোন কাজ হল না। যাবার দিন সকালে জ্বরের মধ্যে হঠাৎ চোখ মেলে সন্দেশ খেতে চেয়েছিল কানু, মা, আমারে একখানা সন্দেশ দিবা?

কবিরাজ রাজি হননি, বলেছিলেন না খাওয়া দুর্বল নাড়ি অতোটা পারবে না। দু-একদিন সবুর করতে। সবুর করার সময় ছিল না কানুর। সারাজীবনে আর সন্দেশ ছোঁননি সাগরময়ী। কিন্তু সে তো পরে। সেদিন? তখনি? যখন হারিকেনের আলো নিয়ে সরঞ্জাম নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল সবাই আর দরজার বাইরে থেকে অঘোরনাথ বলেছিলেন, সাগরবৌ, দিয়ে দাও। কারে ধরে আছ? সে ত নাই—ও তো মাটি। মাটির জিনিস মাটিরে ফিরায়া দাও।

যে শরীরে রাখে আর শরীর ছিঁড়ে মাটিতে নামিয়ে দেয় তার বুক ছিঁড়ে যাবে না? মাটির কোথায়? মাটিকে তো আমি দিয়েছি। মাটি তো তৈরি করেনি ওকে, আমি করেছি। পুরুষে কি জানে!

সেই তো তখনই দীক্ষা নেওয়ালেন অঘোরনাথ। গোপাল মন্ত্র কানে দিয়ে গুরু কষ্টিপাথরের এই বালগোপালকে দিয়ে গেলেন। বলেছিলেন—এই তোমার ছেলে, একে কোলে রাখো, এর সেবা করো। এর জন্ম নাই, মরণও নাই—এ এক-একবার লুকায় আবার ধরা দেয়, ওই তার লীলা।

সেই গোপালকে বুকে আঁকড়ে ধরা, নিজের সব দুঃখকষ্ট গোপালের ওই পা দুটিতে সঁপে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা—কত বছর হল আজ? সত্তর বছর? নাঃ, ওই যে পাশের ঘাটে ঘুমোচ্ছে রাধু তারই তো সত্তর হয়ে গেল। রাধু তাঁর গর্ভজাত চুতর্থ সন্তান। তাহলে পঁচাত্তর বছর? নাকি সমস্ত জীবন ধরেই দিয়ে আসছেন? কতদিন ধরে বা চলছে এই জীবন? রাধু উঠলে, আজ একবার শুধোবেন কত বয়স হল তাঁর? লজ্জা হয় জিগেস করতে। ছোটরা সব চলে যাচ্ছে একে একে। এই তো গতবছর বুঝি নাকি তার আগের বছর পুজোর সময়

কলকাতা থেকে নাতি-নাতবৌ তাদের ছেলেমেয়েরা এসেছিল, পাশের ঘরে গল্প করেছিল, সুন্দরদাদারও তো বয়স হচ্ছে, এবার উনি থাকতে থাকতে যদি সুন্দরদাদাও চলে যান—কি হবে!

শুনতে চাননি সাগরময়ী, তবু গোপাল শোনাও কেন? আমি যে এত ডাকি তবু যে আমারে নাও না তাইলে আমি কি করি!

রাধু সংসার করল না। সেই কোনকালে বিয়ের তিন না চার বছর পরে সুন্দরবউ মরল, আর সংসার করল না রাধু। মা সাগরময়ীকে নিয়ে কত দেশ দেখাল, কত তীর্থ ঘোরাল, তারপব আবার সেই নিজের ভিটেয় ফেরা। উঠোনের পুব-দক্ষিণ কোণ জুড়ে বিশাল স্বর্ণচাঁপার গাছ, এখনও কি আছে? কতদিন যেতে পারেন না উঠে। কতদিন দেখেননি। ওই স্বর্ণচাঁপার গন্ধ অনেক বছর যেন সহ্য করতে পারতেন না। অন্ধকারে ফুল তুলতেন বলে কতবার সাবধান করেছেন অঘোরনাথ আর সেই মানুষকে খোলা সকালবেলায় সাপে দংশন করল ওই স্বর্ণচাঁপার নিচে। আটটি ছেলে-মেয়ে পেটে ধরে বিয়ের চোদ্দ বছরের মাথায় সব শেষ।

কতকাল গেল তারপরে। সে যেন অন্য কোন জন্মের এক সাগর। সেই তখন থেকে বড়খোকা সংসারের হাল ধরল। আর সৌরভী—সংসারের আঁচটুকুও লাগতে দেয়নি তাঁর গায়ে। যতটুকু পারেন আঁচ তিনি নিজে লাগিয়েছেন। মাথার সব চুল ফেলে দিলেন, একাদশী পূর্ণিমা অমাবস্যা, বৈশাখে গাছকে জলের সেবা করা, কার্তিক মাসে ব্রত রেখে এক সিদ্ধ ভাত খাওয়া, মেঝেতে শোয়া—যে যা নিয়ম বলেছে সব ধরেছেন, পালন করেছেন। কোন ব্রতফল পাবার লোভে নয়। কেবল পালন করে যাবার জন্যই শরীরকে কষ্ট দিয়েই কি শোক ভুলে থাকার চেষ্টা করে মানুষ? আনন্দেও তো থেকেছেন। অঘোরনাথ যাবার পর যখন মাথা তুলে বসতে পারলেন তখন থেকে একটি তো তাঁর জন্যই নির্ধারিত করেছিল সংসার—বাচ্চাদেব নিয়ে থাকা নিজের ছোট ছেলে মধুসূদনের তখন দু'বছরও পুরো হয়নি। তার ওপরে নিধু তার ওপর সর্বজয়া। সৌরভীর পাঁচটি। ততদিনে মেজ বৌও তিন ছেলের মা। সেই মানুষের ধরানো পাথরের গোপাল আর এই সব চঞ্চল বালগোপালদের নিয়ে দিন কেটেছে। দিনে দিনে ছোটরা বড় হয়েছে, আবার নতুন নতুনরা এসেছে। শুধু কি নিজের ঘরের? পাড়ার আর পাঁচটা ঘরেরগুলি আসেনি? ঝুলনের দিনে আনন্দ করেননি সব ললিতা বিশাখা সুবল সখা সাজিয়ে? প্রতি পূর্ণিমায় এলাচদানা এনে দিয়েছে বড়খোকা। কত আনন্দ ওই উঠোনেই আবাব হয়েছে। দুঃখ কি আর জায়গায় থাকে? দুঃখ চলে যায়। সুখও কি জায়গায় থাকে? সুখও যায়। দুঃখ যেমন জায়গা ছেড়ে গিয়ে মনে বাসা নেয় সুখ নেয় না কেন? কালাজ্বরে মধু গেল। তিনি কেন সৌরভীও কি পারল রাখতে? বুকের দুধ দিয়ে তো বড়ো করেছিল সৌরভী।

এই দোতলা উঠল। ওই উঠোনেই বৌছত্তরের আল্পনার ওপর দিয়ে এসে ছেলের বৌরা দুধ-আলতা ভরা থালায় দাঁড়াল একে একে। বিজয়া সর্বজয়া দুই মেয়ে গেল ওই উঠোন থেকে। উঠোনের কি দোষ? সৌরভীর চুল পাকল, মেজবৌ নয়নতারার চিকণ চেহারায় ভাঁজ পড়ল। তখন কত বয়েস হয়েছিল সাগরময়ীর যখন সৌরভী গেল? সৌরভী আগে গেল না সুন্দরবউ? অনেকদিন আগেকার কথা তো বেশ মনে আছে, পরের কথাগুলি এমন ভুল হয়ে যায় কেন? তালগোল পাকিয়ে যায়। অথচ সবকিছুতে তো ভুল হত না কই। সৌরভীর বড়ছেলে অপূর্বর বৌ, সাগরময়ীর বড় নাতবৌ, কতদিন বাঁকা করে বলত, কন দেখি যে ভুইলা যান, বাজার থিক্যা কি কি আনছিল—সেইখান কোন্‌দিন ভোলতে দ্যাখলাম না—

কি করে ভোলেন? মনে মনে হিসেব থাকে না কে কোন্‌টা ভালোবাসে, কার খুশিমুখ দেখার জন্য কোন্‌টা রাঁধবেন? গোপালের ফুলজল সকালের ভোগ দেবার পর সেই তো ছিল

কাজ। সৌরভী নয়নবৌ মাছের হেঁসেল তুলত। বাচ্চাদের দুধজাল সিদ্ধচালের ভাত মুসুরির ডাল। তা ছাড়া যা কিছু নিরামিষ ব্যঞ্জন সব তো রাঁধতেন সাগরময়ী। অপূর্ব ভালোবাসত দুধলাউ, নয়নবৌয়ের ছেলেরা একটু মিষ্টির ভক্ত ছিল। শেষ পাতে একটুখানি পায়েস কি নারকেল সন্দেশ পেলে খুশি। কে ভালোবাসত তিলবাটা দিয়ে চালতার টক? কে যেন? তাঁর নিজের ছেলেরা তো সকলেই ভালোবাসত মায়ের রান্না, যার যেটা বেশি পছন্দ। সারা গ্রীষ্মকালটা তাঁর হাতের কাসন্দ ছাড়া মুখে ভাত উঠত না কারুর। আর নাতিনাতনিগুলি? নিজের ভাত তো তিনগ্রাস, কিন্তু রাঁধতেন পিতলের বোগ্‌নোটার গলা পর্যন্ত। সবকটি নিজেদের মাছখাওয়া জামাকাপড় ছেড়ে দরজার গোড়ায় গোল হয়ে বসত হাত বাড়িয়ে। এক একটি ব্যঞ্জনে ভাত মেখে নিজে এক গ্রাস মুখে দেওয়া আর বাকি সবটুকু ওই এক একটি হাতে এক-একটি দলা। তাই কে আগে পাবে তার জন্য চাপা ঠেলাঠেলি নিজেদের মধ্যে।

কখন থেকে যে ধীরে ধীরে খালি হতে শুরু করল বাড়িঘর। অথচ সংসার বাড়লে যেন জায়গা অকুলান না হয় এইজন্যই না বড় জামাইয়ের পরামর্শে এত বড় দোতলা তুলেছিল বড়খোকা মেজখোকা। হঠাৎ কি একটা অস্বস্তি হল সাগরময়ীর, কি একটা ঠেলে উঠতে চাইল বুকের মধ্যে থেকে। হ্যাঁ মনে আছে টুকরো টুকরো কতো কথা—একবার কবে দুই নাতনি এসেছিল নিজেদের ছেলেমেয়ে নিয়ে। তখনও বসে নিজে রান্না করতে পারতেন। কেবল তো নিজের আর রাধুর—কীই বা রান্না! ওরা আসতে কতদিন পর অনেক সময় ধরে ছেঁচকি ঘণ্ট তিলনারকেল বাটা করেছিলেন। খেতে বসে বড় খুশিমনে ডেকেছিলেন পুতিনদের আর তারা এ মাগো, তোমার এঁটো ওই চটকানো ভাত খাবো?

রাধু বকেছিল, কইছি না, দিনকাল বদলাইছে। বোঝ না সোজ না, ঝামেলা পাকাও—

ঝামেলা তো পাকাতে চাননি। হ্যাঁ মনে কষ্ট তো হয়েই ছিল কিন্তু গোপাল জানে কারো ওপর রাগ হয়নি তাঁর। রাধু আগেও বকেছিল, এই যে শরীর পাত কইরা বড়ি আমসত্ত্ব কাসন্দ করতে বারণ করি, কানে লও না, এইগুলি খাইবো ক্যাডা?

ক্যান আলাদা আলাদা শিশিতে যে রাখছি, সক্কলরে পাঠায়া দিবি এট্টু এট্টু কইরা। কেমন ভাল খাইত সকলে—

হ' পাঠায়া দিমু, কই পাঠামু? বিজয়া থাকে আমেরিকায়, তার পোলার কাছে। সর্ব দিল্লিতে—তার বৌ মেমসাহেব, বড়বৌমা বিছানায়, নিধুর পোলাপান এইসব খায় না আর নিধু হইছে অম্বলের রুগী। আমেদাবাদ, জম্মু, হায়দ্রাবাদ—এই সকল জায়গা কি কাছে যে পাঠামু?

নিধুর বড়ছেলে, মেজছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ের ঘরের নাতিরাও বোধহয় এতদিনে বড় হল। কত বছর দেখেননি নিধুকে। মধু যাবার পর ওই সবার ছোট ছিল। মায়ের কোল ঘেঁষে ছাড়া শুতো না কত বড় বয়স পর্যন্ত। অনেককাল হল নিধুর সব সংসারসুদ্ধ কলকাতায়। ওর মুখটাও মনে পড়ে না স্পষ্ট। একবার সেখানে মাসখানেকের জন্য গোপালসুদ্ধ সাগরময়ীকে রেখে আসবার কথা হয়েছিল। সে অনেকদিন, তখনও নিধুর বড়ছেলে গৌতমের ঘরে নাতি-নাতিন হয়নি। নাকি হয়েছিল? ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু তখনও রাধুর কলেজে কাজ ছিল। সেই কাজের জন্যই বুঝি একমাস বিলেত যাবার কথা ছিল রাধুর। গৌতম কি নিধুর বড়ছেলে? নাকি নিধুর উপরে বিধু—তার? ভাবতে গেলে মাথা অস্থির করে, আরও বেশি মনে পড়ে না। কিন্তু সেবার থাকা হয়নি কলকাতায়। নিধুর বৌ প্রথমদিনই বলল, মা থাকলে তো খুবই ভালো হত কিন্তু মায়ের আবার যে আচারবিচার। আমার তো একটাই রান্নাঘর—

বাক্সের মত কিরকম যেন ওদের উনোন। ঘুঁটে কয়লা কিছু লাগে না। সেগুলো টেবিলের ওপর বসিয়ে রান্না করে দেখেছিলেন সাগরময়ী। ভাতের হাঁড়ি টেবিলে রেখে খায় আবার সেই টেবিলেই রেখে কাগজ পড়ে। তপতী ঠিক বলেছিল, তিনি পারবেন না। তাঁর গোপালকে রাখবার আলাদা ঘর চাই, তিনি নিজে হাতে শুদ্ধমত রান্না করে ভোগ দেন, নিজে খান। নিধুরা চারজন মানুষ, চারটে ঘর। বন্ধু-বান্ধবরা আসে। তাছাড়া, মনে আছে নিধুর ছোট মেয়ে বলেছিল, ঘরের মধ্যে গোপালকে নিয়ে থাকবে, ঘরের মধ্যে রান্না করবে বাসন ধোবে ঠাকুমা, সবাই দেখলে কি বলবে?

তাঁর সামনে বলেনি অবশ্য। কিন্তু তপতীর সাজানো ঘরদুয়োর, বুঝেছিলেন সাগরময়ী, সত্যিই তো তাঁর অনেক আচারবিচার। কিন্ত সেই ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস থেকে তিনি যে এই আচারবিচারই জেনে এসেছেন কেবল। সেই আচারবিচার দিয়েই শোক ভোলা, তাই দিয়েই গোপালকে ধরে রাখা। তখন কি কেউ বলেছিল অন্য কিছু করার কথা? বরং যে যেখানে ছিল ওই আচার মেনে চলা, অতো কঠিন নিয়ম করার জন্যই তো ভালো বলেছে—

রাধু কি খাটে পাশ ফিরল? অন্ধকারের কি আর শেষ হবে না আজ? তুলসির গন্ধ আসে নাকি? নাঃ এত ওপরে কোথায় তুলসির গন্ধ? বড় ইচ্ছা হয় উঠে স্নান করতে। উঠোনের অন্ধকারে কাপড় মেলে দিয়ে গাছগুলি হাতেকরে ধরতে। কত দুপুর হলে তবে ওই বারান্দায় জলচৌকি বসিয়ে গরমজলে স্নান করাবে সেই মেয়েটা। সে কোথা থেকে যেন আসে, বিকেল হলে চলে যায়।

এত জলতেষ্টা কেন পাচ্ছে? যেন সমস্ত শরীরে জলতেষ্টা পায়। মা মাগো, হঠাৎ নিজেরই কিরকম অবাক লাগে সাগরময়ীর। গোপালের বদলে মায়ের নাম কেন মুখে এল? মনে আছে মায়ের মুখ? মনে আছে নাকি মাকে? যার নাম ছিল স্বর্ণময়ী? কিছু কি মনে পড়ে ঘোমটায় ঢাকা সেই মুখের তের বছর বয়সের পর যে মুখ আর দেখেননি? কবে নীলাচলে সমুদ্র দেখে এসে যে মা মেয়ের নাম রেখে ছিল সাগর, তার কথা?

খাটটা হালকা দুলে ওঠে। মশারি তার আপন জায়গায় চার খুঁটে বাঁধা রয়ে যায়, তার নীচ থেকে ভেসে খোলা জানলা দিয়ে আস্তে আস্তে উড়ে যায় খাট। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ঘন বেগুনিরঙের প্রজাপতিরা সাদা চাদর ওড়ানো বিছানা বয়ে নিয়ে চলে। বাতাবি ফুলের গন্ধ কচি তুলসির গন্ধেব সঙ্গে স্বর্ণচাঁপার গন্ধ এসে মিশতে থাকে।

নবায়ন ।। সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

—কি হচ্ছে কি এগুলো?

স্টোর-রুমের দরজার পাল্লাদুটো ধরে দীপক দাঁড়িয়ে আছে, গরম গলায় কৈফিয়ৎ চাইছে।

ভুরু বাঁকিয়ে সুনেত্রা একবার দীপকের দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে সীমাহীন অবজ্ঞা। জবাব দেবার কোনোই প্রয়োজন বোধ করল না। ফের অন্যদিকে ফিরে একের পর এক জিনিস মেঝের ওপর টেনে নামিয়ে জড়ো করে চলল।

কঠিন মুখ আরো শক্ত হয়ে উঠল দীপকের। সুনেত্রা জুতোপায়ে ঘরে ঢোকা দেখতে পারে না বলেই জুতো মস্‌মসিয়ে ভেতরে ঢুকল। চিৎকার-চেঁচামিচি ঝগড়া-মারামারির তুলকালামের থেকেও অনেক বেশি অসহ্য সুনেত্রার এ ধরনের তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি আর পাত্তা না দেওয়া অভদ্র নীরবতা। দীপক সুনেত্রার কাঁধে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল—কথা কানে যাচ্ছে না? জিগেস করছি যে, কি হচ্ছেটা কি এগুলো?

গায়ে নোংরা কিছু পড়লে যেভাবে ঝেড়েফেলা হয়, অবিকল সেইভাবে সুনেত্রা কাঁধ থেকে দীপকের হাত ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিল। তারপর আবার ওদিকে ঘুরে ডাঁইকরা আসবাবপত্রের মধ্যে থেকে তার নিজস্ব জিনিসগুলো বেছে বেছে বের করতে করতে নির্বিকার গলায় জবাব দিল—কি হচ্ছে বুঝতে পারছ না?...খেলা...খেলা হচ্ছে।

ব্যঙ্গের ঝাঁঝে দীপকের মুখ লাল হয়ে উঠল। কেটে কেটে সে ও এবার মুখ দিয়ে ছপটি চালালো—খেলা তো শুরু হয়েছে বিয়ের আগে থেকেই। প্রেম—প্রেম-প্রেম খেলা। ওটাই তো সব থেকে বড় প্রহসন এ বিয়ের। শুধু বিটটুটার জন্যে এতদিন ধরে সহ্য করে চলেছি। নয়তো যে খেলা এখন তুমি দেখাতে যাচ্ছ তা অনেক আগেই আমি তোমাকে ভালো করে দেখিয়ে ছাড়তাম।

সুনেত্রার হাত থেমে গেল। এদিকে ঘুরে বসে এতক্ষণে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে দীপকের চোখে চোখ রাখল। লম্বা লম্বা ঘন বাঁকানো পাতার ঘেরে প্রায় কান পর্যন্ত টানা অপূর্ব ছাঁদের কৃষ্ণকালো দীঘল চোখ। কাজল না পরেও মনে হয় সবসময় কাজল পরে আছে। তাদের প্রান্ত-রেখা দেবীচক্ষুর মতোই ঈষৎ ওপর দিকে তোলা। চোখের শ্রী-র সঙ্গেই মিলিয়ে নাম—সুনেত্রা।...এই চোখ দেখেই আরো অনেকের মতো দীপকও চোখের মালিকের প্রেমে পড়েছিল এককালে। প্রেমে পড়েছিল আঁখিজোড়ার অধিকারিণীও। আর সবাইকে বাদ দিয়ে দীপককেই বেছে নিয়েছিল। এখনো বিয়ের দশটা বছর পরেও সেই চোখ আছে, সেই দৃষ্টি আছে, কিন্তু সেই প্রেম নেই। 'বিটটু' নামটা শুনে সুনেত্রার চোখে এখন যে দৃষ্টি, আগে হলে দীপক এটা সহ্য করতে পারত না। বিসর্জনের 'জীবন্ত' প্রতিমার আর্ত চোখ। যতো সাঙ্ঘাতিক ঝগড়াই হোক, এ সময়টাতে দীপক বারবার হেরে যেত। সুনেত্রাকে জোর করে জড়িয়ে ধরত। চোখের পাতায় চুমু দিতে দিতে বলতে থাকত—রাগ তেজ ঝগড়া অশান্তি সব আমি সহ্য করতে পারি,

কিন্তু তোমার এই তাকানো আমাকে একেবারে খেয়ে ফেলে সোনা—আমি পারি না, কিছুতেই পারি না এর সঙ্গে লড়াই করতে। আমার বুকটা সত্যিসত্যি ফেটে যায়...

সেই দীপকই এখন সুনেত্রার ওই চাউনি নিয়ে চাবুকের ওপর চাবুক মারতে লাগল। —আবার? আবার ওই অ্যাকটিং? আবারও সেই একই ট্রিক? তুমি ভেবেছ তোমার ওই ডিসেপটিভ তাকানো দিয়ে বারবার তুমিই বাজিমাৎ করবে, না? এখন থেকে ও সমস্ত চাল অন্য জায়গায় চেলো, এ দিয়ে এখানে আর কোনও সুবিধে করতে পারবে না! তোমার ওই ঢ্যালঢ্যাল করে চেয়ে থাকা, ছলচাতুরি চোখের খেলা—অনেক ঠকেছি এতে, আর না...

এতক্ষণের নির্লিপ্ত ঔদ্ধত্য, ঠাণ্ডা প্রতিরোধ, তাচ্ছিল্যের বর্ম, সব এই একটা আঘাতে চুরমার হয়ে গেল। সুনেত্রা মাথা নিচু করে ঠোঁট কামড়ে ধরল নিজেকে সামলাতে। এ কী হৃৎপিণ্ড খাবলে তোলা আঘাত আর অপমান! লাঞ্ছনায় যন্ত্রণায় নিজে থেকেই নিচে নেমে এল চোখের পাতা। লজ্জায় আঁখিপল্লব বন্ধ করে দিল তাদের ঝাঁপ। আধখানা চাঁদ ঢেকে দেওয়ার মত ঘন ছায়া প'ড়ল গালের ওপর। নির্জন সাগরদ্বীপে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ঝাউপাতার মতো কাঁপাকাঁপা, বিষণ্ণ, বিধুর।...চুপ হয়ে গেল দীপক। 'আর না' বলা সত্ত্বেও আবারো মুগ্ধ হল। তার মনে হচ্ছিল পাপড়ি-বোজা পদ্মচোখের এক অসহায় অন্ধ মেয়ে।

কিন্তু সুনেত্রা সেটা জানতেও পারল না। তার ভেতরটা থরথর করছে। ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা, মোটা করে কাজল-ল্যাপা-চোখে ইশারা করা, সস্তার মেয়েমানুষের চেয়েও সস্তা মনে হচ্ছে নিজেকে।...কি বলল এটা দীপক? সে তার চোখের চাউনি দিয়ে বাজিমাৎ করে? চাল চালে? বিটটু—তার বিটটুর নামটা কানে যাওয়ামাত্র যে নাড়ি-ছেঁড়া কষ্টে সে দীপকের দিকে অমনভাবে তাকিয়েছিল, সেটা অ্যাকটিং? ট্রিক? শঠতা? প্রতারণা?...তার তাকানো 'ডিসেপটিভ?' সে প্রবঞ্চক? ছলচাতুরি চোখের খেলা দিয়ে সে অনেক ঠকিয়েছে?... বোজা চোখ বোবা ঠোঁট তিরতির করে কাঁপতে লাগল। নিরুচ্চারে তারাও বলছিল, ''আর না, আর না!'

সুনেত্রাকে দেখতে দেখতে এখনো দীপকের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। কিন্তু সেই নরম দুর্বলতা থেকে নিজেকে ছিঁড়ে আনল সে। হ্যাঁ, এই কথাগুলো না বললেই হত, কিন্তু সে-ও অনেক কিছু সহ্য করেছে এতদিন ধরে। তারও মন বলে উঠল—আর না, আর না!

নাঃ, সত্যিই আর না। সত্যিই আর কিছু হবার নয়। অনেক আগে থেকেই ওরা তৈরি হচ্ছিল। ঢাকে শেষ কাঠি দিয়ে ফেলেছে দুজনেই। বিসর্জনের শেষ বাজনা বেজে গেছে।

দীপকের দিকে আর তাকাল না সুনেত্রা, কিন্তু কথা বলল। স্তূপ করা জিনিসগুলো ঠেলে ঠেলে দিয়ে বলতে লাগল—দেখে নাও, ভালো করে দেখে নাও কি কি নিয়ে যাচ্ছি বা কিছু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি কিনা তোমার সংসার থেকে! অনেকই যখন ঠকিয়েছি তখন চুরিটাও তো করতে পারি!...ক্ষোভে, উত্তেজনায় সুনেত্রার হাত খুব দ্রুতবেগে চলছিল—দ্যাখো, এটা আমার বাবার দেওয়া সুটকেস...এতে এই যে কিছু ছবি আর ব্যবহার করা পুরনো কিছু জামাকাপড়, তাদের চিহ্ন হিসেবে রাখা ছিল। আর এটা আমার মায়ের পুরনো বাসনের ঝাঁপি—দেখে রাখো, এতে আছে মায়ের কিছু তামা-পেতলের বাসন আর তার নিজের হাতে তৈরি আসন। এবার এটা—এটা হল আমার বাপের বাড়ীর...

কথা শেষ হল না। লাথিতে লাথিতে সব ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সুনেত্রার ব্যবহার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দীপকের সহ্যের শেষ বাঁধটাও ভেঙে গেল। জুতোপরা পায়ে লাথি মেরে মেরে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করতে করতে ক্ষ্যাপার মতো চিৎকার করতে লাগল—ড্যাম্, ড্যাম্ ইওর বাপের বাড়ি আর সেখানকার যত রদ্দি রাবিশ মাল। গেট লস্ট—ইম্মেডিয়েটলি তোমার সমস্ত মালপত্তর নিয়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যাও, 'এটা আমার

ওটা তোমার' করে লাস্ট মোমেন্টে শেষ অঙ্কের যাত্রার পালা গাইতে এসো না! আমার বা এই বাড়ির কোন কিছু এর মধ্যে আছে কিনা সেটা আমি পা দিয়েও ছুঁয়ে দেখতে চাই না। সব তোমার, সমস্ত তোমার বাপের বাড়ি থেকে বয়ে আনা—ঠিক আছে, এবার যাও, ফালতু ন্যাকামি না করে সব নিয়ে এখান থেকে বিদেয় হও...

উন্মত্ত লাথিতে সমস্ত আসবাব ঘরময় ছিটিয়ে পড়ছিল। কত পুরনো জিনিস, কত স্মৃতির টুকরো ভেঙে যাচ্ছিল। হাত গুটিয়ে নিল সুনেত্রা। নিশ্চল হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল ঘরের দক্ষযজ্ঞ। সবকিছু ভেঙেচুরে উড়ে উড়ে গিয়ে পড়ছে, এরই মধ্যে এবার 'সেই জিনিসটা' বেরিয়ে এল। পুরোটা নয়, অর্ধেকটা। বাকি আধখানা তখনো পুরনো জঞ্জালের তলায় চাপা পড়া। এইবার ওটার ওপর দীপকের দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য পা নেমে আসছে। এখুনি চুরমার হয়ে যাবে! ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সুনেত্রা। তার দুই হাত ওটাকে আঁকড়ে ধরল। এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেল দীপক। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও পুরোটা সামলাতে পারল না, তার পা গিয়ে পড়ল সুনেত্রার হাতের ওপর।

সুনেত্রার হাতের ঘেরে একটা ভাঙা এস্রাজ। তার খোলের ওপর আঠা দিয়ে আটকানো একটুকরো হলদে হয়ে যাওয়া কাগজে বড় বড় করে কাঁচা অক্ষরে লেখা 'নবায়ন'। খোলের পেটের মধ্যেই ঢুকে আছে এস্রাজের ভাঙা ছড়টা।

সময় কি কখনো থামে? পৃথিবী কি কখনো থমকে দাঁড়ায়?—না। যদি থামত, যদি দাঁড়াত, তাহলে নিমেষে প্রলয় ঘটে যেত। কিন্তু এখন এখানে সময় থামল। পৃথিবী থমকে দাঁড়াল। আর প্রলয়ও ঘটতে লাগল। বড় নিঃশব্দে, স্থবির হয়ে যাওয়া দুটো মানুষের বুকের মধ্যে। তছনছ হওয়া এই ঘরের মতো নিজেদের জীবনটাকেই তছনছ করে তোলা দুটো প্রাণী তাদের মনের মধ্যেকার ঝড়ের ঝাপটায় ওলোটপালোট হয়ে যেতে যেতে সম্মোহিত হয়ে দেখতে লাগল ধুলোমাখা তারছেঁড়া ভাঙা পুরনো এস্রাজ, ভাঙা ছড়, আর মরা-হলুদ-হয়ে-ওঠা তাদের ভাঙা ললাটের লিখন—'নবায়ন'।

দেশবিভাগের ভয়ঙ্করী দাঙ্গার জেরে আরো অনেকের মতো পূর্ববঙ্গ (তখন ছিল) ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের খাস শহর কলকাতায় চলে এসেছিল একজোড়া স্বামী-স্ত্রী। সঙ্গে তাদের একমাত্র ছেলে। তারা পার্শ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়াবতী, আর বাচ্চু। পার্শ্বনাথ তখন টগবগে জোয়ান আর মায়াবতী পূর্ণ কিশোরী। স্ত্রী আর শিশুসন্তানের মতো আর যাকে পার্শ্বনাথ তার বুকের পাঁজরার সঙ্গে লাগিয়ে অতি সন্তর্পণে নিয়ে এসেছিল, সেটা একটা পুরনো এস্রাজ। এই বাজনার জন্যই খুব কম বয়েসে পার্শ্বনাথ তার জীবনের প্রথম, শেষ, আর একমাত্র চুরিটা করে ছিল। বরাবরই তার গানবাজনার শখ, বিশেষ করে তারের বাজনার। সেই সুযোগে গ্রামে যাত্রা করতে আসা এক পার্টি বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়ে তাদের পুরনো এস্রাজটাকে ছোট ছেলেটার ঘাড়ে চালান করে দিয়েছিল। বাবার হাতবাক্সের টাকা সরিয়ে বাজনা কেনার জন্য বেদম মার খেয়েও কষ্ট হয়নি পার্শ্বনাথের। কষ্ট হতে শুরু করল যখন অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ওটাতে সুর তুলতে পারল না। কিন্তু হাল ছাড়ল না। প্রত্যেকদিন সময় ধরে ওটাকে নিয়ে 'সুর-সাধনায়' বসত। আওয়াজ উঠত ঘ্যাঁ ঘোঁ, ঘ্যাঁ ঘোঁ, ঘ্যাঁ ঘোঁ।...বাড়ির লোক, মানে বাবা আর জ্যাঠা-জেঠী শুনতে শুনতে তেতো হয়ে গিয়ে শেষে এতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। তারপর তো এল মায়াবতী। স্বামীর বাজনা শুনে হেসে কুটিপাটি হত। আবার পার্শ্বনাথের মুখের করুণ অবস্থা দেখে মায়ায় ভরে যেত তার নরম বুক। বাঙাল ভাষায় যে সান্ত্বনা আর উৎসাহ সে দিত,তা এপারের বুলিতে দাঁড়াত—ওমা, একটু একটু মিঠে আওয়াজ

তো উঠছে দেখছি! দেখো একদিন ঠিক সুন্দর সুর খেলবে। আগে সংসারটাকে একটু সামাল দিয়ে নিই, ঘরে দুটো পয়সা আসুক ঠিকমতো, তারপর একজন ভালো মাস্টারমশাই ঠিক করে ধরে ধরে শিখতে হবে।

এমন ফতোয়া মায়াবতী জারি করতেই পারে। কারণ বিয়ের পর থেকেই সে সংসারের কর্ত্রী। সে আসার অনেক আগেই শাশুড়ী সাপের কামড়ে মরেছে। তারপর গুটি-বসন্তে একসঙ্গে গেছে একজোড়া দেওর আর ননদ। পার্শ্বনাথের বাবা, মানে মায়াবতীর শ্বশুর, খালি একমাত্র জীবিত সন্তানকে সংসারী করার অপেক্ষায় দাদা-বউদির সঙ্গে এক হেঁশেলে ছিল। সুলক্ষণা মায়াবতীর খোঁজ পাওয়ামাত্র কিশোর বয়েসেই ছেলের বিয়ে দিয়ে, বউয়ের শাঁখা-সিঁদুরের জোরের ওপর তার আয়ু জিম্মা করে, দাদা-বউদির সংসার থেকে সরে এসে তাদের আলাদাভাবে থিতু করে দিয়ে একদিন কোথায় যে চলে গেল, কেউ জানতেও পারল না। তাই খুব অল্প বয়েসেই ছোট ছোট দুটো হাতে মায়াবতীকে তার সংসারের চাকাটা ঘোরাতে হয়েছিল! কষ্ট হত, ক্লান্ত হত, কিন্তু বিরক্ত হয়নি কখনও। আর হারায়নি আশা আর তার টুকটুকে মুখের হাসিটি।

ওপার ছেড়ে, ভিটেমাটি খুইয়ে, এপারে এসেও সে আশা আর হাসি নষ্ট হয়নি। তারপর...অনেকই পলি পড়েছে সময়ের ওপর, বয়েসের ওপর। সেদিনের টগবগে জোয়ান পার্শ্বনাথ মাঝবয়েসী ভদ্রলোক, ফুটফুটে কিশোরী মায়াবতী অভিজ্ঞ গিন্নি, বড় হয়ে উঠেছে তাদের ছোট্ট ছেলে বাচ্চু। অচেনা অজানা বিশাল কলকাতা শহরে একটু ঠাঁই খুঁজে নিয়ে গুছিয়ে বসতেই অনেকটা সময় বেরিয়ে গেছিল। শেষমেশ সবই জুটলো। স্থায়ী একটা রোজগার, ছোট একফালি বাসা, স্বামী-সন্তানের পাতে একটু মাছ-দুধ। শুধু মায়াবতীর মনে একটাই অভাবের আক্ষেপ—মাত্র একটা, আর সন্তান হল না কেন? তার যে ঘরভরা ছেলেমেয়ের বড় শখ! তখন তো আর এখনকার মতো 'একেই যথেষ্ট, দুইয়ে বেশি, তিনে ভিড়'-এর যুগ ছিল না, কিন্তু সেকালেও পার্শ্বনাথের মনে এ নিয়ে কোনও দুঃখ ছিল না। তার মতে—না হলে কি আর করা যাবে, ছেলের মতোই আরও একজন তো আছেই, তাকে যতো ইচ্ছে কোলে নাও না। ছেলে বরং বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে বিরক্ত হবে, কিন্তু এই একজন কখনও কিছু বলবে না।

একথা শুনে মায়াবতী ছোট মেয়ের মতোই হেসে ওঠে। পার্শ্বনাথের 'এই একজন' হল তার পুরনো এস্রাজটা। মায়াবতীর সামনে ভেসে আসে ফুলশয্যার রাত।...তেরো বছরের ছোট্ট বউ বাপের বাড়ি ছেড়ে আসার শোকে দু'চোখে তখনও ভাসাভাসি বন্যা। কিছুতেই কান্না থামাতে না পেরে শেষে তার হাতে এস্রাজটা তুলে দিয়েছিল তার কিশোর বর। বউয়ের চোখে তখনও থইথই জল, কিন্তু তার মধ্যেই আস্তে আস্তে কৌতূহল ফুটেছিল। নেড়েচেড়ে দেখছিল জিনিসটা। এরকম একটা সত্যিকারের আস্ত বাজনা হাতে পাওয়া দূরে থাক, চোখেই দেখেনি কখনও। ধীরে ধীরে জল নেমে গিয়ে চোখে রোদ ঝিকিয়ে উঠল। তারপর তার নতুন বর যখন বউকে আরও খুশি করতে গিয়ে নিজের কেরামতি ফলিয়ে ওটাতে ছড় টানল, তখন বিকট ঘ্যাঁ-ঘোঁ আওয়াজে চমকে উঠেছিল মায়াবতী। কিন্তু পার্শ্বনাথ নির্বিকার, একনাগাড়ে বাজিয়েই চলেছে। আর সমানে আর্তনাদ করছে বাজনাটা—ঘ্যাঁ ঘোঁ, ঘ্যাঁ ঘোঁ, ঘ্যাঁ ঘোঁ...! সত্যি একসময় হাসতে লেগেছিল বাচ্চা বউ। শেষে ঘরের দরজায় বাড়ির লোকেদের ধাক্কা না পড়া পর্যন্ত তো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে কুটোপাটি হচ্ছিল।...এসব সেই কতদিন আগেকার কথা। তারপর তো এত কিছু ঘটে গেল। কিন্তু একটা কাজই কেবল করে ওঠা হল না, বাজনার ভালো একজন মাস্টারমশাইয়ের কাছে ধরে ধরে শেখা। ফলে আগের মতোই তখনও সমানে আওয়াজ ওঠে—ঘ্যাঁ ঘোঁ, ঘ্যাঁ ঘোঁ। কিন্তু ততোদিনে পার্শ্বনাথের বদ্ধমূল ধারণা

হয়ে গিয়েছিল যে সে যথেষ্ট ভালো বাজায়। গুচ্ছের পয়সা খরচ করে লোকের কাছে শেখার আর কোন দরকার নেই। সেই যে বাচ্চা বয়েসে বাবার টাকা চুরি করে এস্রাজটা কিনে এনেছিল, তারপর বেদম ঠ্যাঙানি খেয়ে, দিনরাত গালাগাল শুনে বা সবার হাসাহাসিতেও একটা দিনের জন্যেও সে বাজানো বন্ধ করেনি, নিজেকে নিজে তালিম দিয়ে গেছে—এর কোন দাম নেই? যারা তার বাজনা শুনে হাসে তারা আসলে বাজনার কিছু বোঝেই না। কই মায়াবতী তো আর হাসে না আগের মতো!

ঠিকই। সত্যিই মায়াবতী আর হাসত না আগের মতো। কিন্তু এর কারণ অন্য। আর কারুর সঙ্গে এর কোন তুলনা করা যায় না। মায়াবতীর কানে পার্শ্বনাথের ওই ঘ্যাঁ-ঘোঁ তখন সত্যিকারের বাজনা হয়ে বাজে। ওই আওয়াজ থেকে যে 'সুর' ওঠে, শুধুমাত্র সে একলা শুনতে পায়। সেটা আসলে তারই নিজের হৃদয়ের সুর। উথলে পড়া দুধের মতো বুক-উপচানো শুভ্র ভালোবাসার বিশুদ্ধ ছড়ের টান।

...কিন্তু পরে মায়াবতী সন্ত্রস্ত হতে লাগল। ছেলে বড় হয়ে ওঠার সময় থেকে। পার্শ্বনাথের বাজনা শুনে ছেলে বিরক্ত হয়, বন্ধুদের সামনে বাজনা চললে তার বড় লজ্জা করে আর বাবার ওপর ভীষণ রাগ হয়। মায়ের কাছে কথাটা বাচ্চু পরিষ্কার করে বলে দিল। তারপর থেকেই মায়াবতী স্বামীকেবোঝানোর মতো করে বাধা দিত—এখন না ছেলে বড় হয়েছে, তার লেখাপড়া আছে, বন্ধুবান্ধব আসে, ওদের অসুবিধে হয়—বাচ্চু বাড়িতে থাকলে তুমি বাজিও না।

পার্শ্বনাথ অবাক হয়ে যেত। তার বাজনায় ছেলের অসুবিধে হয়! বিশ্বাসই হত না। উল্টে মায়াবতীকেই জেরায় জেরায় জেরবার করত—বাচ্চু এই কথা বলেছে? বল যে নিজের মুখে বাচ্চু তোমাকে এ কথাটা বলেছে! বলেছে যে আমার বাজনা শুনলে ওর অসুবিধে হয়—তার মানে ওর খারাপ লাগে।

স্বামীর ওই মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যি জবাবটা আর কখনোই দিয়ে উঠতে পারেনি মায়াবতী। চুপ করে যেত। পার্শ্বনাথ তখন প্রবল আত্মবিশ্বাসে হা-হা করে হাসত—তবে? আমার ছেলে কখনো বলতে পারে এমন কথা? যে ছেলে জন্ম থেকে এটার সঙ্গে একসঙ্গে বড় হয়েছে? তোমার ওসব মনগড়া ভাবনা বাদ দাও তো!

কিন্তু ভাবনা বাদ দিতে পারত না মায়াবতী। তখন পর্যন্ত ছেলের সামনে এস্রাজের আওয়াজে অপরাধী হয়ে থাকত, আর ছেলে বিয়ে করে বউ আনার পর হয়ে উঠল তটস্থ। অল্প বয়সেই ছেলের বিয়ে দিয়েছিল। দেখেশুনেই বউ পছন্দ করেছিল তারা। বাবা-মায়ের পছন্দে বাচ্চুও খুশি। কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই বোঝা যাচ্ছিল বউ খুশি নয়। এ বাড়ির কোন কিছুই তার পছন্দ নয়। যখন-তখন ছেলের ঘর থেকে ভেসে আসতে লাগল ঝগড়া, অশান্তি, রাগারাগি। পার্শ্বনাথের কানে এলেই এস্রাজ তুলে নিয়ে ছড়ের টান দিতে থাকে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে, ওই ঘর হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। তারপরেই দ্বিগুণ বিক্রমে ফের আরম্ভ হয়। এবার ছেলে নয়, একরতফা বউয়ের গলা। মায়াবতী বুঝতে পারে এই বাজনা নিয়ে ছেলেকে এবার যা-তা কথা শোনাচ্ছে বউ। শোনাচ্ছে তাদের দুজনকেও। কিন্তু পার্শ্বনাথ যে কিছুতেই শুনবে না। মায়াবতী যত বলে, ওগো থামো, শুনছ না কি হচ্ছে? বউ বাচ্চুকেও কি সব বলছে?...পার্শ্বনাথ ততো নির্লিপ্তভাবে বাজায় আর বলে, শুনছি বলেই তো বাজাচ্ছি! বাজনার সুরে মন শান্ত হয়, ওরাও হবে।

কিন্তু মায়াবতীর মন শান্ত হয় না। তার ভয়চকিত মুখের দিকে তাকিয়ে পার্শ্বনাথ ঘ্যাঁ-ঘোঁ ঘ্যাঁ-ঘোঁ করতে করতে নিশ্চিন্তে হাসে।—হ্যাঁগো, সবাই কি আর তুমি-আমি যে এতগুলো বছরেও একটা দিনও ঝগড়া হল না! সব স্বামী-স্ত্রীরই ওরকম হয়, আবার ঠিকও হয়ে যায়।

ও নিয়ে অত ভাববার কিছু নেই।...পার্শ্বনাথ তখন কল্পনাও করতে পারেনি কি মারাত্মক ভাবনার ভার তাদের পিষে ফেলতে আসছে। মায়াবতীও না।

ছেলের বউ পালিয়ে গেল। ছেলেরই এক বন্ধুর সঙ্গে। বিয়ের দেড়টা বছর পুরতে না পুরতে। তখন ওদের বাচ্চাটা সবে চার মাসের। মায়ের বুকের দুধ খাওয়া ছাড়া বাকি সব সময় দাদু-ঠাকুমার কাছেই থাকে। নাতির মুখ দেখে উচ্ছ্বসিত মায়াবতী সদ্য নিশ্চিন্ত হতে শুরু করেছিল—যত ঝগড়াই করুক নিজেদের মধ্যে, এই নাড়িছেঁড়া-ধন যখন এসে গেছে তখন বজ্রআঁটুনি পড়ে গেছে সম্পর্কের গাঁটছড়ায়, আর চিন্তা নেই। ঠিক সেই সময়টাতেই শিশু-সন্তান ফেলে, কাউকে কিচ্ছু টের পেতে না দিয়ে এক ঘুমন্ত রাতে ঘরের বউ পরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

সারা বাড়ি জুড়ে মৃত্যুর থম্‌থম্‌। কচি বাচ্চাটার মাঝে মধ্যে কেঁদে ওঠা ছাড়া একটা শব্দ নেই কোথাও। মায়াবতী নাতি কোলে নিয়ে পাথর হয়ে বসে আছে। ছেলে তার ঘরে মুখ ঢেকে পড়ে রয়েছে। দিন কেটে গিয়ে সন্ধ্যে নামল, তখন সারাটা দিনের সমস্ত নৈঃশব্দ হঠাৎ খানখান হয়ে গেল। পার্শ্বনাথের এস্রাজ বাজছে, ছড়ের একেকটা প্রচণ্ড টান পড়ছে, তীব্র আর্তনাদ উঠছে—ঘ্যাঁ-ঘোঁ ঘ্যাঁ-ঘোঁ ঘ্যাঁ-ঘোঁ। সেই আওয়াজে শিউরে উঠল মায়াবতী। স্বামীর কতখানি যন্ত্রণা যে এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে সেটা কেবল সেই বুঝল। এদিকে নাতিটা শব্দের চোটে আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে কাঁদতে শুরু করেছে। তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে মায়াবতী দেখল তাদের ছেলে একটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে তাকে ডিঙিয়ে বারান্দা পার হয়ে বাপের ঘরে গিয়ে ঢুকল। বুকটা থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। নাতিকে কোনরকমে বারান্দায় ঝোলা-দোলনায় শুইয়ে দিয়ে সবে নিজেদের ঘরের দরজায় পা রেখেছে মায়াবতী, ছেলের হিংস্র মূর্তি দেখে হিম হয়ে গেল সে। এক হ্যাঁচকায় পার্শ্বনাথের হাত থেকে এস্রাজটা ছিনিয়ে নিয়েছে বাচ্চু। গলা ফাটিয়ে তার বাবার ওপর চিৎকার করছে—দুনিয়ার সবকিছু চুলোয় যাক্, তবু তোমার বাজনা বাজানো থামবে না, না? আর সবার যা খুশি হোক, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তোমার এই উৎকট শখ বন্ধ হবে না, না?...এস্রাজটাকেই দুম্ দুম্ ঘুষি মেরে চলল বাচ্চু।—তুমি কি জানো যে বিয়ের প্রথম থেকেই আমাদের মধ্যে অশান্তির একটা মস্ত বড় কারণ তোমার এই অসহ্য বাজনা? পরেও যা নিয়েই ঝামেলা শুরু হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সব এসে দাঁড়াত তোমার এই কান ঝালাপালা করা ঘ্যাঁ-ঘোঁ ঘ্যাঁ-ঘোঁ নিয়ে। দিনের পর দিন আমাকে যা-তা শুনতে হয়েছে এর জন্যে। অসম্ভব স্বার্থপর তুমি, অসম্ভব আত্মকেন্দ্রিক আর নিষ্ঠুর। নিজের ছেলের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে মহা আনন্দে বসে বসে তুমি এস্রাজ বাজাও। তুমি মানুষ নও, নিজের বাচ্চা চিবিয়ে খাওয়া জংলী জানোয়ারের চেয়েও মারাত্মক তুমি...

হতবুদ্ধি হয়ে গেল পার্শ্বনাথ। বাচ্চু এসব কি বলছে তাকে? ঠিক শুনেছে তো সে? আর্ত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল। সেই আহত রক্তাক্ত দৃষ্টি মায়াবতীর বুকে তীর হয়ে বিঁধল। হাহাকার বেরিয়ে এল মাত্র একটা শব্দে—বাচ্চু!

এইবার মায়ের দিকে ঘুরল ছেলে। গলা ছিঁড়ে চিৎকার করতে করতে মাকেই আক্রমণ করল এবার।—তুমি, তুমি সব জানতে! তোমাকে আমি বলিনি? ছোটবেলা থেকে বন্ধুদের কাছে এইজন্যে অপদস্থ হয়ে এসেছি, তখন তোমাকেই জানিয়েছিলাম। বিয়ের পরে দিনের পর দিন বউয়ের হেনস্থা সহ্য করেছি এই নিয়ে, তখনও তোমাকেই ডেকে বলেছি। কিন্তু তুমিও কান দাওনি, কিচ্ছু করনি এ ব্যাপারে। কারণ বাবাই তোমার সব। ছেলের যা হয় হোক, কিন্তু ওই লোকটার উৎকট শখে তুমি বাধা দেবে না।...অসহ্য ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মায়ের মুখের সামনে আঙুল নেড়ে বলল—কিন্তু তা বলে আজও? আজকের এই দিনটাও বাজনা বাজিয়ে আনন্দ করার দিন? আমার সবকিছু ছারখার হয়ে গেলেও তোমাদের এই

অসহ্য বিলাস একটা দিনের জন্যেও থামবে না?... দেওয়াল তাক করে এস্রাজটা ছুঁড়ে মারল বাচ্চু।—তাহলে আমিই এটাকে শেষ করে দেব, ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তবে আমি...

'—খবরদার!' ছেলের গলার ওপর দিয়ে ভীষণ গলায় ডাক দিয়েছে মায়াবতী। ছুঁড়ে মারা এস্রাজটা নিজের বুক পেতে আটকেছে। তারের দিকটা কপালে লেগে রক্ত পড়ছে চামড়া ফেটে। টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছে গরম ফোঁটা আর টগবগ করে ফুটছে এতকালের শান্ত নিরীহ ঠাণ্ডা রক্ত। মায়াবতী মারাত্মক হয়ে উঠল।—এট'কে কোনদিনও তুই শেষ করতে পারবি না! কারণ এটা সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রীর সত্যিকারের ভালোবাসা! তোদের সম্পর্কের মতো ভেজাল নেই এতে। দুধের বাচ্চা ফেলে তোর অলক্ষ্মী বউ চলে গেছে, তার জন্যে তোর বাবার বাজনা বাজানো দায়ী? তোর ঘর ছারখার হওয়ার জন্যে একমাত্র এটার আওয়াজই দায়ী? আগুনের জিভের মতোই দাউদাউ করে উঠল মায়াবতীর এতদিনের নরম হয়ে থাকা জিহ্বামূল।—তাহলে প্রথমেই বউ নিয়ে আলাদা হয়ে চলে যাসনি কেন? আমিই বলে দিচ্ছি কেন, কারণ নিজেও খুব ভালো করেই জানতিস তোদের আসল গলদটা কোথায়? জানতিস তোদের মধ্যে ভালোবাসা নেই, পুরো সম্পর্কটাই ফাঁক আর ফাঁকির। তোরা এই বাজনাটা নয়, এ দুটো বুড়োবুড়ি নয়, আসলে নিজেদেরই সহ্য করতে পারতিস না।...তুলতুলে আঙুল এবার লোহার মুষল হয়ে ছেলের দিকে ঘুরে চরম ধিক্কার দিল।—লজ্জা করে না তোর? আজ এসে দাঁড়িয়েছিস বাজনাটা ভাঙতে? বাবা-মায়ের ভালোবাসায় হাত দিতে? নিজে কতবড় অমানুষ হয়ে গেছিস যে অমন বাপকে 'জংলী জানোয়ারের চেয়েও...' কথা শেষ করতে পারল না মায়াবতী। স্বামীর অপমানে, নিজের গর্বের ওপর জ্বালায়, থরথর করতে করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এক ক্ষ্যাপা স্ত্রী, এক ক্ষিপ্ত মা গলা ফাটিয়ে তার শেষ ফয়সালা শোনাল।—তোর বাবা এটা বাজাবে, রোজ রোজ বাজাবে। যতদিন আমি বাঁচব ততদিন তাকে বাজাতে হবে। তোর সহ্য না হলে তুই এখান থেকে চলে যা!

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তার এতদিনের সাথীকে দেখছিল পার্শ্বনাথ! দুর্জয় রাগে তার এতকালের মাকে দেখছিল বাচ্চু। কেউই বিশ্বাস করতে পারছিল না এ সেই বরাবরের মায়াভরা মায়াবতী। হঠাৎই উন্মত্তের মতো বারান্দার দিকে ছুটে গেল বাচ্চু। কপালের রগ, গলার শিরা মোটা দড়ির মতো ফুলে উঠল।—তাই যাচ্ছি, আমার ছেলে নিয়ে এখুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি...

কিন্তু ছেলের কাছ অবধিও যেতে পারল না, এমনকি ঘরটাও পেরতে পারল না—দরজার গোড়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। চোখের মণি পাক খেতে খেতে থেমে গিয়ে স্থির হয়ে চেয়ে রইল। মুখে গ্যাঁজলা উঠে ধড়ফড় করতে করতে শেষ যে কথাটা গোঙানি হয়ে বেরিয়ে এসেছিল সেটা হল—ওহ্ মা।

মায়াবতীর হাত থেকে গড়িয়ে পড়ল এস্রাজ। খোলের দিকটা ফেটে গেল। পার্শ্বনাথ ছুটে এসে ছেলেকে বুকে নিয়ে বুকফাটা ডাকে তাকে তুলতে চেষ্টা করল। যখন বুঝল ছেলে আর কোনদিনই উঠবে না কেবল বাড়ি ছেড়ে নয়, দুনিয়া ছেড়েই চলে গেছে, তখন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল এস্রাজটার ওপর। আঙুলে টেনে টেনে তারগুলো ছিঁড়তে গেল। সেই আক্রমণে টং টং করে কঁকিয়ে উঠল বাজনাটা। এর মধ্যেও এবারও তাকে বাঁচাল মায়াবতী।

এরকম অভিশপ্ত পুত্রশোক, ঘরের বউয়ের মর্মান্তিক গ্লানি, স্বামীর উন্মাদ আচরণ, সব নিজের মধ্যে ধারণ করল মায়াবতী। যারা গেছে তারা তো গেছেই, সেই দুঃসহ যন্ত্রণা চেপে রেখে যারা এখনও আছে তাদের জন্যে তৈরি হল। মায়াবতীর কল্যাণী হাত প্রথমে স্বামীকে ধরল। টেনে নিল চিড়-ধরা তার-ছেঁড়া কেঁদে ওঠা এস্রাজ। ওটা আর ছেলের মাথা কোলে নিয়ে বসল। স্থির হয়ে যাওয়া চোখ নিজের হাতে বুজিয়ে দিল। আঁচল দিয়ে মুখের গ্যাঁজলা

মুছে নিল। ছোটবেলায় ঘুম পাড়ানোর মতো ছেলের মাথায় গায়ে হাত বোলাতে লাগল। গুনগুন করে নিজের মনে বলে চলল—এখনও যে তোর বাবা রয়ছে, নাতিটা রয়েছে, ওদের জন্যেই সব সয়ে থাকতে হবে...থাকতেই হবে...যে কটা দিন বাঁচি এভাবেই বাঁচতে হবে...

এতক্ষণ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল পার্শ্বনাথ। তাকেও বুকে টেনে নিল মায়াবতী। গুনগুনিয়ে বলল—কাঁদো, যত পার কাঁদো, প্রাণভরে কাঁদো, কেঁদে ঠাণ্ডা হও। ...কিন্তু তার নিজের চোখে এক ফোঁটা জল নেই। কোলে সদ্য মরা ছেলে, হাতে ফাটা-ছেঁড়া অসহায় এস্রাজ, বুকের মধ্যে ভেঙে পড়া স্বামী। সক্কলকে জড়িয়ে নিয়ে খাঁ খাঁ শূন্যদৃষ্টিতে মরুভূমির নিদাঘ হয়ে বসে রইল মায়াবতী।

পার্শ্বনাথ আর মায়াবতীর সেই ছোট্ট চার মাসের নাতি একটু একটু করে বড় হল। ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কলজে সে। বাবা-মা যে নেই সে অভাব কখনও টের পায়নি তার এই দাদু আর ঠাম্মার জন্যেই। চোখ-ফোটা থেকেই সেও দেখে আসছিল দাদু একটা ভাঙা পুরনো এস্রাজ বাজায়। কখন যে আবার ওই খোল-ফাটা তার-ছেঁড়া বাজনাটা বাজতে শুরু করল তা পার্শ্বনাথের স্মৃতিতে নেই। শুধু ধূ-ধূ মনে পড়ে তখনও তাদের ছেলের শ্রাদ্ধ হয়নি, অশৌচ চলছে, নিঃশব্দের হা-হা হাহাকার তাদের গিলে ফেলছিল। তখন একদিন শাঁখা-লোহা-পরা দুটো হাত তার হাতে এস্রাজটা তুলে দিল, আর কোলে দিল চার মাসের ছোট্ট শিশু। পাশে বসে বলল—বাজাও, বাজাও, না বাজালে যে আমরা পাগল হয়ে যাব!

পার্শ্বনাথ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ছিল। চিড়-ধরা তার-ছেঁড়া বাজনা বাজবে কি করে? মায়াবতী বুঝতে পেরেছিল স্বামীর না-বলা কথা। জোর দিয়ে বলেছিল—তোমার হাতে ঠিক বাজবে। যে কটা তার আছে তাতেই বাজবে। সব তার তো ছেঁড়েনি।

কোলে নাতি, পাশে স্ত্রী, হাতের ফাটা-ছেঁড়া বাজনায় ছড় দিল পার্শ্বনাথ। আরও বীভৎস আওয়াজ বেরুল। এই প্রথম পার্শ্বনাথ বুঝতে পারল শব্দের আসল রূপ। বুঝল এ সুর নয়, বেসুরের বিশ্রী আর্তনাদ। সত্যি কোনদিন সুর বাজেনি তার হাতে। নামিয়ে রাখতে গিয়ে দেখল কোলে শোওয়া নাতি বড় বড় চোখ করে মুখে আঙুল পুরে সেই বাজনাই শুনছে চুপ করে। আর মায়াবতী চোখ বুজে দুটো হাত বুকের কাছে জড়ো করে ধরে একটু একটু দুলছে—ঠিক তেমনি করে, যখন বহু বছর আগে তাদের ছোট্ট বাচ্চুকে বুকের মধ্যে ধরে দুলে দুলে ঘুম পাড়াত। নামিয়ে রাখা হল না পার্শ্বনাথের, ছেঁড়া তারেই ছড়ের পর ছড় টানতে লাগল।

আবার বাজতে লাগল ভাঙাচোরা এস্রাজ। শুনতে শুনতে বড় হয়ে উঠতে লাগল তাদের একমাত্র অবলম্বন তাদের নতুন গতিপথ—দীপক।

এই সেই দীপক ব্যানার্জী আর তার স্ত্রী সুনেত্রা ব্যানার্জী পার্শ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর মায়াবতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি আর নাতবউ—এই মুহূর্তে তাদের থেমে থাকা পৃথিবীতে নিশ্চল দুটো মূর্তি হয়ে রয়েছে। একটা ব্যাপারে একটু আগেই তারা দুজনেই একমত হয়েছিল—আর না, এভাবে আর একসঙ্গে থাকা যায় না। বিশেষ করে সুনেত্রা—যে 'ব্যানার্জী' পদবী ছেঁটে ফেলবে বলে চিরকালের মতো চলে যাবার আগে বন্দ্যোপাধ্যায়-বাড়ির গুদামঘর থেকে তার নিজস্ব জিনিসগুলো টেনে টেনে বের করছিল। আর সেটা মুখে মেনে নিলেও মন থেকে তখনও মানতে পারছিল না বলে শেষ মুহূর্তে লাথি মেরে মেরে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাইছিল দীপক। তারই ফল হিসেবে বেরিয়ে এসেছে সেই ফাটা এস্রাজ, যেটা কোনদিন সারাই না হয়েও ছেঁড়া তারেই আরও প্রবল আওয়াজে ঘ্যাঁ-ঘোঁ করে বাজত। যেটা শুধু ওই

দুই বুড়োবুড়িরই প্রাণ ছিল না, ছিল বিটটুরও—দীপক আর সুনেত্রার একমাত্র ছেলের 'নবায়নে'র!

...কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত তারা এটা জানত না, একেবারেই জানত না, বাপ-মা হয়েও জানত না। তাদের বিটটু যে আসলে 'নবায়ন', সেটাও তো কতদিন জানত না। জানতে পারার পরেই তো যত সমস্যা, আর এই পরিণতি।...

বিয়ের পর নিজেদের নিয়ে উন্মত্ততা। তখন তো দুনিয়ার আর কাউকে দেখতেই পেত না বা গ্রাহ্য করত না। তারপর অনিবার্যভাবে শ্রান্ত হয়ে থিতিয়ে যাওয়া—গরম দুধ আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যেভাবে সর পড়ে ঠিক সেভাবে। এভাবেই নব্বই ভাগ দাম্পত্যজীবন চলে, কিন্তু এদের সম্পর্কে এল ছানা কাটার পালা। বেমিশাল দুধের সাদা ফেনায় ক্রমাগত মিশতে থাকে এক এক ফোঁটা চোনা। পড়ে চলে, পড়েই চলে। কেউই এতে 'ফিলটার' দিয়ে বিশুদ্ধিকরণের কথা ভাবে না। কারণ দুজনেই যে 'শিক্ষিত', দুজনেই যে 'স্ব-নির্ভর', কেউই যে কারুর ওপর ভরসা করে বেঁচে নেই এটা সমানে প্রমাণ করে যেতে হবে না? তাই ক্রমাগত অভিযোগ আর আক্রমণের আঙুল ওঠে—ওর দিকে এর, এর দিকে ওর। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যেই যে একটা জলজ্যান্ত বাচ্চা জন্ম নিয়েছে তাদেরই মাধ্যমে, বড় হয়ে উঠেছে—সেটা কেউই সেভাবে খেয়াল করে না বা আলাদা করে নজর দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। তারা তো তার দরকারের সবকিছু তাকে দোকান থেকে কিনে এনে দেয় জন্ম থেকেই। প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশিই দেয়। আর তো কিছু করার নেই। সুনেত্রা-দীপক এই বৈজ্ঞানিক ফর্মুলায় গড়া আধুনিক ছাঁচের মা-বাবা। তার ওপর দুজনেই দুরন্ত জেদী আর মাথাগরম। কেউ এক তিল ছাড়বে না। নাতির ঘরের পুতি বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের একমাত্র সলতে বিটটুরও আসল অবলম্বন হয়ে উঠল বুড়ো-দাদা পার্শ্বনাথ আর বুড়ো-দিদি মায়াবতী। ছোট্ট বাচ্চা, কিন্তু সে তার সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে বুঝেছিল, এই দুজন দুজনের ওপর নির্ভরশীল। আর সেটাই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সম্পদ।

...বিটটুর সাড়ে ছ'বছর বয়েস পর্যন্ত পার্শ্বনাথ আর মায়াবতী এই সংসারে ছিল। দীপক-সুনেত্রার প্রেমের বিয়ে, জাতেপাতে মিল নেই, কিন্তু কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর এতে কোনই আক্ষেপ ছিল না। বরং নাতবউ বরণ করে ঘরে তোলার সময় সকলকে শুনিয়ে মায়াবতী মজা করে নাতির কানে খুব জোরে জোরে ফিসফিস করেছিল—ওরে, এ যে দেবীচক্ষু মেয়ে! বুঝেশুনে চলিস, ও চটলে কিন্তু মহিষাসুরের দশা হবে তোর!

শুনে সবাই হাসছিল। সুনেত্রা লজ্জা-মেশা আনন্দে খুশি, আর দীপক অন্যদের টপকে এই মেয়েকে জয় করার গর্বে খুশি। তখনই আওয়াজটা সুনেত্রার কানে আছড়ে পড়েছিল—ঘ্যাঁ ঘোঁ, ঘ্যাঁ ঘোঁ।...পার্শ্বনাথ তার নিজস্ব পদ্ধতিতে নাতবউ বরণ করছিল এস্রাজ বাজিয়ে। ঠিক সেই সময় মায়াবতী সুনেত্রার কানে মধু ছুঁইয়ে বলছিল—'এ বাড়ির সবকিছু তোমার কাছে মধুময় হোক।' কিন্তু ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে গিয়েছিল সুনেত্রা। এরকম একটা শুভ মুহূর্তে এমন বিশ্রী স্থূল শব্দ তাকে বিমুখ করে দিয়েছিল। কোনদিনও সে এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

...তারপর বিটটু। এর মাঝেই কোন অদ্ভুত কারণে বা নিতান্তই অকারণে স্বামী-স্ত্রীর নিরন্তর পাল্লা দেওয়া একে অপরের সঙ্গে। আর সুনেত্রার সেই ঝাল গিয়ে পড়া নির্দোষ দুটো বুড়োবুড়ির ওপর—যারা একটা ভাঙা বাজনা নিয়ে থাকে আর ওদেরই ছেলেকে আগলে রাখে। প্রাণ দিয়ে বাচ্চাটাকে দেখা আর তার সমস্ত ঝক্কি পোয়াতো বলে নিজের স্বার্থেই সুনেত্রা দাদা-শ্বশুর-দিদিশাশুড়ীর সঙ্গে সামনাসামনি সংঘর্ষে যেত না। কিন্তু মেজাজ একটু বিগড়োলেই রাতের বন্ধ ঘরে সব বিষ দীপকের ওপর উগরে দিত। দীপকও ছাড়ত

না, তখন দাদু-ঠাম্মার পক্ষ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে লড়াই করে আর পরদিন সকালে তেতো-বিরক্ত মেজাজ নিয়ে যে কোন ছুতোনাতায় তাদের ধরে।

শেষে এল সেই কালান্তর দিন। সাড়ে ছ'বছরের ছেলেকে কটা মাস ধরে আড়ংধোলাই করে 'শিক্ষা দিয়ে' নার্সারি স্কুল থেকে নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম হাই-স্কুলে ভর্তির পরীক্ষা দেওয়াতে নিয়ে গেছে বাবা-মা। এই পরীক্ষা তাদেরও মান-সম্মানের জীবন-মরণ পরীক্ষা। ইন্টারভিউতে ছেলেকে নাম জিজ্ঞেস করাতে সাবাইকে চমকে দিয়ে সে বলে উঠল—নবায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ওদিকে বার্থ-সার্টিফিকেটে, ভর্তির অ্যাপলিকেশনে, ফর্মে নাম রয়েছে বিশাল ব্যানার্জী। হয়তো ছেলে বিশাল মাপের হবে বলে, কিংবা অবাঙালী স্টাইলে 'ভিশাল' বললে আরো চটকদার শোনায় তাই, অথবা এখনকার রীতি অনুযায়ী কোন অভিনবত্বের কারণে বিটটুর ভালো নাম রাখা হয়েছিল বিশাল, যা সুনেত্রার শেখানো উচ্চারণের ফলে 'ভিশাল ব্যানার্জী'। কেতাদুরস্ত ইংরেজি কায়দায় ব্যানার্জীর রেফটাকেও বাতিল করা হয়েছিল। এই স্কুলের ইন্টারভিউয়ের আগে কয়েক লক্ষবার বিটটুর মহড়া নেওয়া হয়েছে এই নিয়ে।—হোয়াট'স ইওর নেম? প্রতিবারই নির্ভুল উচ্চারণে তোতাপাখির বুলি আউড়ে গেছে বিটটু—মাই নেম ইজ ভিশাল ব্যানার্জী। কিন্তু আসল দিনে আসল পরীক্ষায় বিটটুই বুক চিতিয়ে বলতে লাগল—আই অ্যাম নবায়ন, মাই নেম ইজ নবায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। একবার নয় বারবার। সুনেত্রা আর দীপক যেন ফাঁসির আসামী। নিজেদের কানকে তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওদিকে ইন্টারভিউ বোর্ডের সবাই অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকাচ্ছিল। সকলের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল বিশাল বানার্জীর নামসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র।

শে .ষ হয়তো কৌতূহলের বশেই সত্যিকারের বিশাল চেহারার প্রিন্সিপাল যখন জিগেস করল, কেন তুমি অন্য নাম বলছ? কে তোমার এই নাম রেখেছে? তখন আরেকটা মারাত্মক অপরাধ করল বিটটু—বাংলায় কথা বলল। বুক চিতিয়ে গড়গড় করে বাংলায় বলে উঠল, আমি অন্য নাম বলছি না, আমার আসল নাম নবায়ন। আমার বুড়োদাদা এই নাম রেখেছে। এর মানেও আমাকে বলে দিয়েছে।

অবাক হয়ে হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইল সুনেত্রা-দীপক। ক্রমশ সুনেত্রার হচ্ছিল অসহ্য রাগ। তাদের সাড়ে ছ'বছরের ছেলেকে তারা এতদিন ধরে চেনেনি? পরম নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়িয়েছে ওই দুই বুড়োবুড়ির হাতে ছেড়ে দিয়ে? কিন্তু সেই বিশাল আকৃতির প্রিন্সিপাল এরকম 'কেস' কখনও পায়নি বলেই বোধহয় আগ্রহী হয়ে উঠল। সকলকে চমকে দিয়ে ইংরেজি ছেড়ে পরিষ্কার বাংলাতে বিটটুকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা বলো তো এর মানে কি?

সাড়ে ছ'বছরের ছেলে গড়গড় করে বলে গেল।—নব মানে নতুন, আর অয়ন-এর অনেকগুলো মানে। একটা মানে হল অবলম্বন, যেমন লাঠি, বুড়োদাদা আমাকে বলেছে অন্ধের লাঠিই তার একমাত্র অবলম্বন। নব আর অয়ন যোগ করলে হয় নবায়ন।

প্রিন্সিপাল ঝুঁকে এল।—আর কি কি মানে হয় নবায়ন এর?

বিজ্ঞের মতো প্রিন্সিপালকেই শুধরে দিল বিটটু।—নবায়নের নয়, শুধু অয়ন-এর। দাঁড়াও বলছি।...চোখ বুজে পার্শ্বনাথের মুখ আর তার কথাগুলো মাথায় নিয়ে আসছিল বিটটু।—একটা মানে আশ্রয়, আরেকটা হল থাকার জায়গা, স্থান। তার পরেরটা হচ্ছে পথ। কিসের পথ জানো?...প্রিন্সিপালকেই জিগেস করল বিটটু। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই বিশদ ব্যাখ্যা করে গেল।—এই পথ কিন্তু আমাদের 'রোড' মানে রাস্তা নয়। এটা হচ্ছে সূর্য, যে ছ'মাস ছ'মাস করে উত্তর আর দক্ষিণ দিকের পথে থাকে, সেই পথ। বুড়োদাদা সহজ করে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছে, এটা হল সূর্যের গতিপথ। এগুলো ছাড়াও আরও আছে। সে খুব শক্ত শক্ত সব কথা,, সেগুলো এখন মনে আসছে না।

মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল সুনেত্রার তার ছেলের এই এঁচড়ে পাকামিতে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রিন্সিপালকে সূর্যের 'উত্তরায়ণ' আর 'দক্ষিণায়ন' নিয়ে লেকচার দিচ্ছে এইটুকু ছেলে! আবার বলছে 'আরও আছে'...উফ্! পারলে ছেলের গলা টিপে ধরে সুনেত্রা!

দীপক কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ওদিকে প্রিন্সিপাল বলে উঠল, ''ভেরি গুড''। তারপর আগ্রহভরে আবার প্রশ্ন করল, এই বুড়োদাদাটি কে—কেনই বা সে এই নামটা রেখেছে?

পরম উৎসাহে তার বুড়োদাদা আর বুড়েদিদির পরিচয় পেশ করল বিটটু। তারপর এই নাম দেওয়ার গল্পটা শোনাতে লাগল—মনে মনে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকা সুনেত্রার আর উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে থাকা দীপকের অসভ্য বাঁদর ছেলে।

—শোনো তাহলে। আমার দাদু, মানে বাপির বাবা, মানে বুড়োদাদা আর বুড়োদিদির ছেলে যখন ভগবানের কাছে চলে গেল তখন আমার বাপিই হল তাদের নতুন অবলম্বন, নতুন সূর্য। বাপিকে নিয়ে তাদের নতুন আশ্রয় হল, নতুন গতিপথ তৈরি হল। কিন্তু বড় হয়ে যাবার পর বাপি, আর তারপরে যখন মাম্মি এল তখন তারা দুজনে মিলে একটা আলাদা গতিপথ বানিয়ে নিল। অনেক দূরে চলে গেল বুড়োদাদা আর বুড়োদিদির কাছ থেকে। আবার সেই ভাঙা পুরনো এস্রাজটা নিয়ে মনের দুঃখে তারা দিন কাটাতে লাগল। তাই তো ভগবান তাদের দুঃখ ঘোচাতে আমাকে পাঠিয়ে দিল, সেইজন্যে আমিই এখন বুড়োদাদা আর বুড়োদিদির নবায়ন।

প্রিন্সিপাল তাকিয়ে আছে। তাকে বিশ্বাস করাতে বিটটু জোর দিয়ে বলে উঠল—হ্যাঁ, সত্যি! আমাকে বলেছে। সব বুঝিয়ে দিয়ে বুড়োদাদা বলেছে যে আমিই এখন তাদের সবকিছু। নতুন আশ্রয়, নতুন অবলম্বন আর নতুন সূর্য। আমাকে নিয়ে বুড়োদাদা আর বুড়োদিদি আবার একটা নতুন গতিপথ বানিয়েছে।

শুনে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বিশালকায় ক্রিশ্চান প্রিন্সিপাল। তারপর বিটটুকে বলল, ঠিক আছে। খুব সুন্দর বলেছ তুমি। কিন্তু এই স্কুলে ভর্তি হতে হলে আরও অন্য কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এবার আমরা সেইসব প্রশ্ন করব আর তুমি সেগুলোর জবাব ইংরেজিতে দেবে, কেমন?

আশায় বুক বেঁধে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল সুনেত্রা, দীপকও খানিকটা ভরসা পেল। কিন্তু সবকিছুতে জল ঢেলে দিল বিটটু। পরিষ্কার বলে দিল—আর আমি কোন প্রশ্নের জবাব দেব না। আমার ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে না করলে ছোটদের জোর করে কিছু করাতে নেই, বুড়োদাদা বলেছে। বলেছে ছোটরা হচ্ছে চারাগাছ, জোর-জবরদস্তি করলে চারাগাছ ছিঁড়ে যায়।

একেই তো প্রিন্সিপালকে 'তুমি তুমি' করে কথা, যেটা সুনেত্রার হিসেবের মধ্যে ছিল না। সে ছেলেকে তৈরি করেছিল ইংরেজিতে 'ইউ' দিয়ে। তার ফল এই! এবার সুনেত্রা সভয়ে শুনল তার পইপই করে ম্যানার্স শেখানো ছেলে অম্লানবদনে বলে দিল—আসলে এখন আমার খুব খিদে পেয়েছে। তোমরা ছেড়ে দিলেই বাড়ি গিয়ে বুড়োদাদা আর বুড়োদিদির সঙ্গে খাব। ওরাও আমার জন্যে না খেয়ে বসে আছে।

ছেলেকে চোখ দিয়ে ভস্ম করতে না পেরে ছেলের বাবার দিকেই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল সুনেত্রা। দীপকেরও রাগ হচ্ছিল প্রচণ্ড। চোখের কোণা দিয়ে সেটা দেখে নিয়ে লম্বা শ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসল প্রিন্সিপাল। ইংরেজিতে বলল—মিস্টার এবং মিসেস ব্যানার্জী, আপনাদের ছেলে অত্যন্ত বিস্ময়কর রকমের অনুভূতিশীল, বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাবান। আমি সত্যিকারের দুঃখিত ও নিরুপায় যে এখানকার ভর্তির নিয়ম মেনে ওকে এখন নিতে পারলাম

না। কিন্তু আপনারা যদি ওর সঙ্গে ঠিকমতো সহযোগিতা করে চলেন, তাহলে জীবনের সব থেকে কঠিন পরীক্ষাও ও অনায়াসে পার হয়ে যাবে। আমার অনুরোধ, আজকের ফেলইওরের জন্যে ওর এই অসাধারণ মনটাকে আপনারা চাপ দিয়ে বা শাসন করে নষ্ট করবেন না। ঠিকই বলেছে ও, চারাগাছকে টেনে লম্বা করতে গেলে সেটা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে যায়। আরো একটা কথা মনে রাখবেন, ফেল ও করেনি, করেছি আমরা—ওকে নিতে না পেরে।

প্রিন্সিপাল যতই বলুক না কেন, মুখ কালো করে উঠে দাঁড়াল সুনেত্রা আর দীপক। সুনেত্রার ইচ্ছে করছিল ধড় থেকে ছেলের মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আনতে। প্রিন্সিপাল বোধহয় বুঝতে পারল, পরিস্থিতি সহজ করতে নিজে উঠে এসে বিটটুর হাত ধরে দরজা অবধি নিয়ে গেল। গল্পের ছলে বাংলায় জিগ্যেস করল, তোমার বুড়োদাদা বুঝি এস্রাজ বাজান? ওঁদের একটা ভাঙা এস্রাজের কথা বললে না তখন?

বিটটু পরম উৎসাহে বলে উঠল—ওটাও তো নবায়ন। বুড়োদাদা আর বুড়োদিদির প্রথম নবায়ন। ভাঙা হলেও ওটা চমৎকার বাজে। ছেঁড়া তারেও বাজে। সবাই অবশ্য বলে বিচ্ছিরি আওয়াজ, কিন্তু ওর কথা কেবল বুড়োদাদা বুড়োদিদি আর আমি শুনতে পাই। বুড়োদাদা ছড় টানে আর বাজনা বাজে—নবায়ন...নবায়ন। এখন আমরা দুজনেই নবায়ন।

প্রিন্সিপাল এবার বিটটুর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে ইংরেজিতে বলল—তাই হও। সত্যিকারের নবায়ন হও জীবনে। নিরাশ্রয়ের যেন নতুন আশ্রয় হতে পারো, সর্বহারার যেন নতুন অবলম্বন হতে পারো, নতুন গতিপথ যেন তৈরি করতে পারো নিঃসঙ্গ মানুষের জন্যে। ...লম্বা চেনে ঝোলানো গলার ক্রস নিজের হাতে বিটটুর কপালে কাঁধে বুকে ছুঁইয়ে দিয়ে বিশালকায় মানুষটি তার শেষ আশীর্বাদ জানাল—মে গড ব্লেস ইউ, মে গড প্রটেক্ট ইউ।

...কিন্তু ক'টা মাসের আপ্রাণ পরিশ্রম ভণ্ডুল করে দেওয়া ছেলের মা-বাবা, বিশেষ করে মা, প্রিন্সিপালের কথায় ঠাণ্ডা তো হয়ইনি, রাগে ফাটতে ফাটতে তাদের 'শয়তান' ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। রাস্তাতেই, গাড়ির মধ্যেই সুনেত্রা পেছনে হাত বাড়িয়ে ছেলের চুল খামচে ধরে ঠাস ঠাস করে যতটা পারে মার শুরু করে দিল। ডানহাতে স্টিয়ারিং, বাঁ-হাতে দীপক সুনেত্রাকে আটকাতে যাওয়ামাত্র শুরু হয়ে গেল ধুন্ধুমার ঝগড়া। ক্ষিপ্ত সুনেত্রা তাদের আট বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম দীপকের মা তুলে চরম খারাপ কথাটা বলে দিল—আর কত হবে? যতই ভদ্র করার চেষ্টা করি, রক্তে তো বইছে ঘর-ভাঙানি পর-ভোলানি নষ্টামির বদমাইশি! সব আশা-আকাঙক্ষা চুরমার করে দেবে না তো আর কি করবে এই ছেলে! বাপ আবার তাকে বাঁচাতে আসছে...

প্রচণ্ড জোরে ব্রেক মারল দীপক।—সাবধান সুনেত্রা!

সুনেত্রাও আজ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ।—কিসের সাবধান? কিসের ভয় দেখাচ্ছ তুমি? লজ্জা করে না যে তোমারই দাদু-ঠাকুমা তোমারই একমাত্র ছেলেকে এভাবে নষ্ট করে! তোমার মা তো একেবারে ফেলে চলে গিয়েছিল, এরা যে আরো বড় সর্বনাশ করছে। গ্যাঁট হয়ে বসে বসে কুবুদ্ধি দিয়ে দিয়ে একটা বাচ্চার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করে দিচ্ছে—ন্যাস্টি, রট্ন্ ফ্যামিলি!

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল দীপক।—চুপ! একেবারে চুপ! ফ্যামিলি তুলে আর একটা কথা বললে...

কেয়ারই করল না সুনেত্রা। ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে বলে চলল—আমরা গতিপথ চেঞ্জ করেছি, অনেক দূরে সরে গেছি—ওনাদের কোন আশ্রয় নেই, কোন অবলম্বন নেই, বড় দুঃখ ওঁদের...এইটুকু বাচ্চাকে এসব কথা বলেছে। আসলে আমাদের নিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো পুতুলখেলাটা করতে পারেনি তো, তাই ছেলেটার মাথা চিবিয়ে খেয়ে এভাবে সর্বনাশ করছে। ছিঃ, ভাবতেও ঘেন্না করে!

দীপকের সমস্ত ক্রোধ সেই মুহূর্তে ওই দুই বুড়োবুড়ির দিকে ঘুরে গেল। ভুলে গেল জন্মের পর থেকে আজ অবধি তার জন্যে, তাদের জন্যে, তারপর তাদের সন্তানের জন্যে এরা কি না করেছে। এখনকার দুই প্রচণ্ড বিপক্ষ শিবির, দীপক ব্যানার্জী আর সুনেত্রা ব্যানার্জীর হাত মিলে গেল। তাদের 'কমন' শত্রুর মোকাবিলা করতে তারা সাময়িক মৈত্রীর চুক্তি করল মনে মনে।

...পার্শ্বনাথ আর মায়াবতী বিটটুর জন্যেই অত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে বসে ছিল। সময় কাটাতে গীতা পড়ছিল পার্শ্বনাথ। 'জ্ঞান-কর্ম-সন্ন্যাসযোগ' পড়ছিল সে, মায়াবতী শুনছিল। দীপক আর সুনেত্রা সেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিয়ে এল। নাতি-নাতবউয়ের একজোট আক্রমণে প্রথমে অবাক, পরে কাঠ হয়ে গেল দুজনে। বিটটু ছুটে তাদের কাছে যেতে গেলে দীপকের চড়ে ঘুরে পড়ে গেল। মায়াবতী দৌড়ে ধরতে এলে শক্ত হাতে ছেলেকে সরিয়ে নিয়ে সুনেত্রা বলে উঠল—না, আর আপনারা ওকে ছোঁবেন না—সর্বনাশ তো যা করার করেইছেন, কিন্তু আর নয়।

পার্শ্বনাথ আর মায়াবতীর মুখ থেকে একই সঙ্গে বেরিয়ে এল—সর্বনাশ? কিসের সর্বনাশ?

অভিযোগের তোড়ে এবার ভেসে গেল তারা। একবার দীপক, পরক্ষণেই সুনেত্রা। আবার সুনেত্রা, সঙ্গে সঙ্গে দীপক। তাদের মুখ থেকে ছিটকে আসা বাক্যবাণ শুনতে শুনতে পার্শ্বনাথ আর মায়াবতী জানল কোন্ মারাত্মক অপরাধের আসামী তারা—তারা ঠাণ্ডা মাথায় জঘন্য 'ক্রিমিনাল'! কিভাবে একটু একটু করে বিটটুর মাথাটা তারা চিবিয়ে খেয়েছে! কিভাবে নষ্ট করেছে বংশের সলতেটুকুর ভবিষ্যৎ!...নবায়ন! নতুন আশ্রয়! নতুন অবলম্বন!'—কি বিশ্রী কদর্যতায় ভেঙচে উঠল তাদের সুপুরুষ নাতি আর দেবী-চোখের সুন্দর মুখের নাতবউ! বিহ্বল হয়ে দুই হতবাক বুড়োবুড়ি শুনে গেল—সাবধান! আজ থেকে ওদের ছেলের সঙ্গে তারা যদি একটাও কথা বলে বা কোন সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করে তো খুব খারাপ হবে। আরও একটা শর্ত, এখন থেকে আর একবারও যদি ওই লক্ষ্মীছাড়া ভাঙা বাজনাটার ঘ্যাঁ-ঘোঁ কানে আসে তাহলে বিটটুকেই মেরে পাট করে ফেলবে ওরা। সেটা খেয়াল রেখে তবে যেন ওটাতে হাত দেয় পার্শ্বনাথ।...নিজের ছেলের বেলায় এই জায়গাটাতে রুদ্রাণী মূর্তি ধরছিল মায়াবতী। কিন্তু ছেলের ছেলের এই শাসানিতে একটা কথাও বলতে পারল না। বড়ো নিষ্ঠুর প্যাঁচে আর চালাকিতে তাকে ঠুঁটো করে দিয়েছে ওরা। এস্রাজ বাজলে মার খেয়ে মরবে তাদের বুকের কলজে বিটটু!...চরম ফতোয়া জারি করে ছেলে নিয়ে চলে গেল 'ভিশালে'র জন্ম দেওয়া বাবা-মা। শুধুমাত্র ছেলের বার্থ-সার্টিফিকেটে বাপ-মা হওয়াটাই তো এখনকার মোক্ষম অস্ত্র। এই একটা মাত্র হাতিয়ারের জোরে সন্তানের ব্যাপারে যে কোন সময়ে যা খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায় এখন।

তিন-চারদিন হয়ে গেল ঘর থেকে বেরোল না পার্শ্বনাথ আর মায়াবতী। তাদের ঘরে কয়েকবার বাবা-মায়ের হাত ছিটকে ঢুকে পড়ে বেদম মার খেয়েছে বিটটু। তারপর থেকে তারাই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বাজনাও বন্ধ শাসানির সেদিন থেকেই।...চারদিন পরে কাকভোরে দীপকের ঘরের দরজায় আওয়াজ হল। দীপক ঘুমচোখে দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখল ঠাম্মা দাঁড়িয়ে আছে। মায়াবতী খুব শান্ত স্বরে বললো—উনি চলে গেলেন।

দীপক আরো অবাক!—দাদু চলে গেছে? কোথায় গেছে এত সকালে?

সুনেত্রাও ঘুমচোখে হাউসকোট জড়াতে জড়াতে এসে দাঁড়িয়েছে। মায়াবতী শান্ত দৃষ্টি মেলে নাতি-নাতবউকে কয়েক পলক দেখে নিয়ে নিজের ঘরমুখো চলতে চলতে আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে গেল—ওইখানে।

...পার্শ্বনাথের যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল। এই বয়েসে মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক। সকলেই তাই বলছিল। কেবল দীপক আর সুনেত্রার মনে হচ্ছিল, তা নয়। নিশ্চুপ নির্বাক মায়াবতীর দিকে তাকাতে পারছিল না তারা। ভুলতে পারছিল না তার সকালের সেই দৃষ্টি। বারবার মনে হচ্ছিল, শুধু এই একটি মানুষ জানে কেন এরকম হল, কাদের জন্যে হল!

. .দাহ শেষ করে শ্মশান থেকে সবাই ফেরার পর পাড়ার মহিলারা মায়বতীর ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল। এবার স্নান করে বৈধব্যের বেশ নিতে হবে। কিন্তু দরজা খুলছে না মায়াবতী। পার্শ্বনাথকে নিয়ে সবাই রওনা দেবার পর ভেতরে এসে সুনেত্রা দেখেছিল দিদিশাশুড়ীর ঘর বন্ধ। তারও আর সাহসে কুলোয়নি তাঁকে ডাকতে, নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে ছিল। এখন হাঁকাহাঁকি ধাক্কাধাক্কির আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে এল। দীপক তখন ধাম্-ধাম্ করে দরজায় ঘা দিতে দিতে ডাকছিল—ঠাম্মা, দরজা খোল! দরজা খোল ঠাম্মা!

দরজা খুলল না। কিন্তু ঘরের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক জোরে বেজে উঠল ভাঙা এস্রাজ। বাজতেই লাগল ঘ্যাঁ-ঘোঁ ঘ্যাঁ-ঘোঁ ঘ্যাঁ-ঘোঁ...। সারা বাড়ি যেন থরথর করে উঠল সেই অপ্রাকৃত শব্দে। শিউরে উঠল প্রত্যেকে । দরজা ভেঙে ফেলা হল। মায়াবতী ঘুমিয়ে আছে, তার বুকের ওপর পড়ে ভাঙা এস্রাজটাতে ছড় টানছে বিটটু। বাজনা শুনিয়ে তার বুড়োদিদির ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু ঘুম ভাঙল না। বৈধব্যের সাজে সাজতেও হল না। মায়াবতী তার টুকটুকে পান-খাওয়া ঠোঁটে সবাইকে মজা দেখানোর একচিলতে হাসি নিয়ে মহাঘুমে ঘুমিয়েই রইল। বয়স্কজনরা বলল, শুধু সতী নয়, মহাসতী। সতী যায় স্বামীর আগে, আর মহাসতী যায় স্বামীকে রওনা করে দিয়ে তার পেছনে পেছনে। এবার কেবল দীপকআর সুনেত্রার মনে হল তা নয়, তা নয়। এর আসল কারণ কেউ জানে না তারা দুজন ছাড়া।

একই দিনে দুটি মৃত্যু। তাই একই সঙ্গে তাদের ক্রিয়াকর্ম, শ্রাদ্ধ-অশৌচ-নিয়মভঙ্গ শেষ। আর তার সাথে সাথে শেষ হয়ে গেল বেঁচে থাকা দুজনের সাময়িক চুক্তির মেয়াদ। দীপক আর সুনেত্রা যার যার শিবিরে ঢুকে গিয়ে ফের অস্ত্রে শান দিতে লাগল। এই মৃত্যুর জন্যে সুনেত্রাকে দায়ী করে দীপক খোলাখুলি আঘাত হানতে লাগল। সুনেত্রাও পাল্টা আক্রমণে ফিরিয়ে দিয়ে চলল প্রতিটি মার। এবার ছেলেকে কেন্দ্র করে শুরু হল দু'পক্ষের লড়াই। দুজনেই এবার ছেলেকে নিজের মতো করে মানুষ করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু দুজনের মতামত যে দুই মেরুর। তার সঙ্গে মিশেছে জেদ আর অন্যজনকে হারিয়ে দেওয়ার তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতা। দু'পক্ষের দড়ি টানাটানির 'টাগ অফ ওয়ার' ছেলেটাকেই ছিঁড়ে ফেলছিল।

...একদিন বিটটুকে পাওয়া গেল না। পাড়ার পার্কে খেলা শেষ করে বাড়ি আসার সময় পেরিয়ে যাবারও অনেক পরে অফিস করে ফেরা মা-বাবার খেয়াল হল ছেলে তার ঘরে নেই। অন্য কোন ঘরেও নেই, বাথরুমে নেই, বারান্দায় নেই, ছাদে নেই, বাড়ির কোথাও নেই। নেই তো নেই-ই। তারপর থানা, খবরের কাগজ, টিভি, নিরুদ্দিষ্টের প্রতি চিঠি, ছবি দিয়ে পুরস্কার ঘোষণা, বারবার 'বিটটু ফিরে এসো'—কিচ্ছু বাদ পড়ল না। কিন্তু ছেলে ফেরত এল না—আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ভাঙা এস্রাজটাকে। ওটাও বিটটুর মতোই উধাও হয়ে গেছে।

আশায় আশায় কেটে গেল আরো অনেকগুলো দিন। যে একই বুকভাঙা ব্যথা তাদের কাছে নিয়ে আসতে পারত, সেটাকে উপসর্গ করেই তারা আরও দূরে সরতে লাগল। অফিস থেকে এসে রোজ মদ নিয়ে বসে দীপক, আকণ্ঠ খায়। হয় চুর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, নয়তো দুর্দান্ত হয়ে উঠে তার দাদু-ঠাম্মার মৃত্যু থেকে শুরু করে ছেলের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে সুনেত্রাকে যা

মুখে আসে বলে যায়। সুনেত্রা এখন তার রণকৌশল পাল্টেছে। আগের মতো তালে তাল দিয়ে ঝগড়া বা চিৎকার করে না। দু'চোখের ঠাণ্ডা ঘেন্না দিয়ে বা ছুরির ফলার মতো ব্যঙ্গের হাসি হেসে, কখনও বা একটা দুটো বাছা বাছা শব্দের ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়ে বুঝিয়ে দেয় যে দীপক ব্যানার্জী একটি অতি নিকৃষ্ট প্রাণী, সুনেত্রার মতো মহিলা ওরকম একটা বাজে লোকের কারণে মুখের থুতুও ফালতু নষ্ট করে না।

প্রায় দু'বছর ধরে এইভাবে কাটাবার পর দুজনেই বুঝতে পারছিল আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না। কিন্তু আজকেই যে চলে যাবে এই সিদ্ধান্তটা সুনেত্রা নিয়েছিল গতরাতে, দীপকের চরম বাড়াবাড়ির পর। কিন্তু আজই বেরিয়ে এল এত করে খোঁজা ভাঙা এস্রাজ, আর বড় বড় কচি অক্ষরে 'নবায়ন'! দীপকের দক্ষযজ্ঞ ভাঙচুর এতক্ষণ ধরে হাত গুটিয়ে নিয়ে বসে দেখে চলছিল সুনেত্রা। কতটা করতে পারে? তার শেষ দেখতে চাইছিল। কিন্তু এস্রাজটা চোখে পড়তে নিজেকে আর নির্লিপ্ত রাখা গেল না। ওটাকে রক্ষা করতে নিজে থেকেই ধেয়ে এল দুই হাত, চেপে ধরল প্রাণপণ। আর সেই মুহূর্তে একই ধাক্কা খেয়ে চেতনায় ফিরেছিল দীপক। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও পুরোটা সামাল দিতে পারেনি। স্ত্রীর হাতের ওপর তার জুতোসুদ্ধু ভারি পা—সবকিছুর নিচে সুরক্ষিত 'নবায়ন'। কবে কখন যে বিটটু তার কাঁচা হাতে কচি অক্ষরে নিজেকে এখানে খোদাই করে রেখেছে, প্রতিষ্ঠা করে গেছে, তারা জানে না। এখানেই থেকে গেছিল সময়, পৃথিবী আর মানুষ দুটো।

ধুলোভরা মেঝের ওপর বসে পড়ল দীপক। তার পা সরে গেছে, কিন্তু সুনেত্রার হাত তখনো আঁকড়ে ধরে রয়েছে ভাঙা এস্রাজটা। দীপক সেই হাতসুদ্ধু ভাঙা তারছেঁড়া বাজনাটাকে তুলে নিল। হৃৎপিণ্ডের ধকধকানির সঙ্গে চেপে ধরে বলে উঠল—সুনেত্রা যেও না! আমার কাছে ওকে নিয়ে থাকো!

দেবীচোখ থরথরিয়ে উঠল। মুখ তুলে তাকাতে গিয়ে চোখ নামিয়ে ফেলল সুনেত্রা। পাছে এ নিয়ে দীপক আবার যা তা বলে বসে।

দীপক বলল—তার চিবুক তুলে ধরে চোখে চোখ রেখে বলে উঠল—রাগ ঝগড়া অশান্তি সব সহ্য হয়, কিন্তু তোমার এই চাউনি আমাকে শেষ করে ফেলে, কুরে কুরে খায়, আমার বুকটা ফেটে যায় সোনা...

কতকাল—কতকাল খরার পরে, কত যুগের অনাবৃষ্টির পরে বৃষ্টি নামল। দেবীচক্ষু মেয়ে কেঁদে উঠল। কাঁপা-ঠোঁট তিরতির করে ডাকল—বিটটু, আমার বিটটু, আমাদের বিটটু...

দীপক সুনেত্রার ঠোঁটে আঙুল রাখল।—উঁহু, বিটটু না, নবায়ন। ঠিক ফিরে আসবে। আগে আমরা আমাদের গতিপথে ফিরে যাই।

অনেকদিন পর স্বামীর বুকের নির্ভরতায় মাথা রাখল স্ত্রী। এস্রাজটাকে ধরে রাখা একের হাতের ওপর অপরের হাত। সুনেত্রা অস্ফুটে বলল—ফিরে আসবে নয়, বলো ফিরে এসেছে।...দীঘল চোখের পাপড়ি বন্ধ করে সুনেত্রা বলতে লাগল—তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি নতুন পথ—নবায়ন, তুমি আমি আমরা।...পদ্মপাতা থেকে শিশির গড়াচ্ছিল, টুপ টুপ টুপ টুপ।

রাগী জেদী দীপক ব্যানার্জীরও ছোট্ট ছেলের মতো চোখ ভাসিয়ে জল পড়তে লাগল। ওরা দেখতে পেল না বুকফাটা তারছেঁড়া 'নবায়নের' ধুলো ভিজিয়ে ভাঙা এস্রাজের খোলের ওপরে দু'জোড়া চোখের জলে অদৃশ্যে আঁকা হচ্ছিল একজোড়া বুড়োবুড়ির ফুটিফাটা হাসিমুখ।

বি পজিটিভ ॥ সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার

সূর্যর বাবা ডাক্তার। সেই কারণেই হয়ত ছোটবেলা থেকে সূর্যর শরীর খারাপ। বড় কোনও অসুখ নয়। পেটখারাপ, সর্দিজ্বর, কাশি, পায়ে ব্যথা, দাঁত কনকন—সারাক্ষণ একটা না একটা লেগেই আছে। বাবা ডাক্তার তাই বাড়ির লোকের চিকিৎসা করেন না। কিন্তু ডাক্তার বন্ধুর অভাব নেই। তাঁদের আসা যাওয়া লেগেই থাকত সূর্যর ছোটবেলা থেকে। আর লেগে থাকত মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভদের আসা-যাওয়া। সূর্যর জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই তাদের দিয়ে যাওয়া ওষুধে বাড়ি উপচে উঠত। সূর্যর অক্ষর পরিচয়ের পর থেকে নানা ওষুধের নামের সঙ্গে ওর বিলক্ষণ পরিচয়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছোট মামার এনে দেওয়া রবিনসন ক্রুসো, ট্রেজার আইল্যাণ্ড, চাঁদের পাহাড় শেষ করার আগেই ও ওষুধের গায়ে লেবেলে ছাপা লম্বা লম্বা সব রাসায়নিক নাম শিখে ফেলেছিল। লেবেল ছাড়াও শিশির ভেতরে চিরকুটের সন্ধান পেয়ে সেই অল্পবয়সেই সূর্য বিভিন্ন ওষুধের কন্ট্রা-ইন্ডিকেশন পর্যন্ত মুখস্থ করে ওষুধ সম্পর্কে ছোটখাট বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল।

ক্লাস এইট।

স্কুলে খেলার মাঠের ধারে বেঞ্চিতে বসে ক্লাসের ছেলেদের খেলা অবজ্ঞাভরে দেখছিল সূর্য। মাকে বলে বাবাকে দিয়ে নোট লিখিয়ে খেলা থেকে স্থায়ী ছাড় আদায় করেছে। সুতরাং অন্যরা যখন হৈ হৈ করে মাঠ দাপিয়ে বেড়ায়, সূর্য তখন বেঞ্চিতে বসে বসে খেলোয়াড়দের সমালোচনা করে। এদিনও আপনমনে সহপাঠীদের খেলার নিম্নমান নিয়ে মনে মনে আলোচনা করছিল আর মাঝে মাঝে নিতান্ত বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে হতাশা প্রকাশ করছিল। পাশে বসে নিবিড়, ফার্স্ট বয়। পাড়ার টিমে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে পা মচকে আহত। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে স্কুলে আসছে বটে কিন্তু খেলার ক্লাসে মাঠে নামার মতো জোর এখনও পায়ে নেই। অনেকক্ষণ ধরে সূর্যর আপনমনে বিড়বিড় আর মাথা নাড়া লক্ষ্য করে মনে মনে কৌতূহল হচ্ছিল।

এক সময় সূর্য মাথা ঘোরাল। নিবিড়ের সঙ্গে চোখাচোখি হল। পায়ের দিকে তাকিয়ে সূর্য জিজ্ঞেস করল, 'কী ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার?'

ওষুধের নাম শুনে আবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

—মাথা নাড়লি যে! জিজ্ঞেস করল নিবিড়। অনেকক্ষণ ধরেই ওর এই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে।

—কী আর বলব। আজকালকার ডাক্তাররা...তুই কি জানিস, ওষুধটা বেশিদিন খেলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়?

ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ওষুধের লিটারেচারে 'রেযার কেসেস' লেখা শব্দদুটো ও ইচ্ছে করে চেপে গেল নাকি সত্যি মনে ছিল না, জানা গেল না।

নিবিড় গম্ভীরভাবে নিজের পায়ের দিকে তাকাল। গোলাপি রঙের ক্রেপ ব্যাণ্ডেজের

ধারগুলো ময়লা হয়ে এসেছে। কষে বাঁধা। চলাফেরা করতে ইদানীং আর তেমন লাগছে না। মনোযোগ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ পরীক্ষা করতে করতে অন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনা কতটা তা নিয়ে একটু যে চিন্তিত সে ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

বাড়ি ফিরেই সূর্য গম্ভীরচালে মাকে বলল, আজকালকার ডাক্তারদের আর বিশ্বাস করা যায় না।

—কেন, আবার কী হল? ছেলের রায়ে বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মা।

—আমার আবার কী হবে? হয়েছে নিবিড়ের।

তেরো বছর বয়সে তেত্রিশ বছরের গাম্ভীর্য আয়ত্ত করে সূর্য মাঝেমাঝেই তা মায়ের ওপর প্র্যাকটিস করে। ধনী পরিবারের পুত্রবধূ তাঁর একমাত্র পুত্রের প্রতিটি আচরণে যে মুগ্ধতা প্রকাশ না করার কোনও কারণই খুঁজে পান না।

—নিবিড়ের ডাক্তার ওকে যে ওষুধ দিয়েছে তাতে ও শিগগিরই অন্ধ হয়ে যাবে।

—তুই কী করে জানলি?

—ওষুধের নাম বলতেই বুঝতে পারলাম। সেবার যখন পড়ে গিয়েছিলাম, সঞ্জয়কাকুর বন্ধু সেই বসাক বলে ডাক্তার আমাকে ওই ওষুধই দিয়েছিল। তখনই তো জানতে পেলাম। তারপর অবশ্য আর ওই ওষুধ খাইনি।

আরতি ছেলের বিচক্ষণতায় অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বলবেন কি বলবেন না ভাবতে ভাবতে বলেই ফেললেন—বাবু, তুই বড় হয়ে ডাক্তারি পড়লে পারিস, তোর এত জ্ঞান!

অবজ্ঞাভরে মার দিকে তাকাল সূর্য।

—তুমি ক্ষেপেছ! বাবাকে দেখেও তোমার শিক্ষা হয় না! সারাক্ষণ হাসপাতাল ক্লিনিক আর পেশেন্ট। তাছাড়া আমার শরীরের এই অবস্থা—অত স্ট্রেন করা সম্ভব নয়।

বিহ্বল হয়ে আরতি ছেলের কথা শুনলেন। সত্যিই তো, শরীরের কথাটা আরতিরই ভাবা উচিত ছিল। মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লেন। একই সঙ্গে একটু গর্বিতও ছেলের জন্যে। কী বিচারক্ষমতা! এমন বোদ্ধা ছেলে লাখে একটা মেলে। তের বছরের ছেলের ন'বছরের পাঁকাটি চেহারা আরতির চোখ এড়িয়ে গেল। মোটা চশমার আড়াল থেকে মায়ের মুখে খেলে যাওয়া বিভিন্ন অনুভূতি সূর্যর চোখ এড়াল না। অসাধারণ আত্মপ্রসাদে আপ্লুত সূর্য অসুখের ভারে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে, চটি ঘষতে ঘষতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

২

স্কুল পাশের পরীক্ষায় সূর্য কোনও মতেই আশাতীত ফল করেনি। মোটের ওপর মন্দ নয়, বাবা-মায়ের গর্বে বুক ফুলে ওঠার মতো কিছু নয়। সত্যি বলতে কি, রেজাল্ট দেখে সূর্যর বাবা সুধাংশুশেখর ব্যানার্জির মুখটা গম্ভীরই হয়ে গেল। আশেপাশে সূর্য নেই স্থির করার পর বিরসমুখে স্ত্রী আরতিকে বললেন, 'এই রেজাল্ট নিয়ে ডাক্তারিতে তো চান্স পাবেই না, ভাল কোনও কলেজে ঢোকাও মুস্কিল হবে।'

—'ডাক্তারি!' আঁতকে উঠলেন আরতি। 'তুমি কি ওকে মেরে ফেলতে চাও? এই শরীর নিয়ে ও ডাক্তারি পড়বে!

নামকরা, রাশভারি ডাক্তার স্বামী আর ক্ষণজন্মা, ক্ষীণজীবী ছেলের মধ্যেখানে পড়ে আরতি চিরতটস্থ, চিরউদ্বিগ্ন। গত কুড়ি বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে কখনও জোর গলায় কথা বলতে শোনা যায়নি তাঁকে। সেই আরতির গলা চড়ে গেল দেখে সুধাংশুশেখর যত না বিরক্ত তার চেয়ে অবাক হলেন বেশি। তাহলে কি আমি অন্যায় কিছু বলে ফেললাম,

ভাবলেন মনে মনে। ডাক্তার হয়েও নিজের ছেলেকে স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তুলতে পারেননি ঠিকই, তাই বলে ডাক্তারি পড়ার পরিশ্রমটুকুও সে যে করতে অক্ষম, সে কথা তাঁর জানা ছিল না। রুগি, ক্লিনিক আর হাসপাতাল করতে করতে তাঁর দিন কেটে যায়। বহুকাল স্ত্রী-পুত্রের খবর নেওয়া হয়নি।

—সূর্যর কি আবার শরীর খারাপ হয়েছে? সাবধানে জানতে চাইলেন।

—শরীর তো চিরকালই খারাপ। হঠাৎ চেঁচিয়ে ফেলে আরতি কেমন ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেন, স্বাভাবিকের চেয়েও মলিন গলায় স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন—তোমার তো অনেক চেনাজোনা আছে, তুমি বরং দেখেশুনে ওকে একটা ভাল কলেজে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দাও।

—দেখি কী করতে পারি। সুধাংশুশেখর পাইপ ধরালেন। আজ বহুদিন পরে স্ত্রী সঙ্গে বসেছেন। সাধারণত এই সময় চেম্বারে বসেন। আজ চেম্বার বন্ধ, মেরামত হচ্ছে। খুব জরুরি কিছু কেস। এক ঘণ্টা পরে বাড়িতে আসবে।

বেশ লাগছে আরতির সঙ্গে বসতে। অনেকদিন পরে দু'চারটে সুখ-দুঃখের কথা বলতে, শুনতে ইচ্ছে করছে। স্বামীর সংসর্গে আরতিও কিছুটা অভিভূত। বছরের পর বছর কত কথা জমেছে, একে একে মনে পড়তে শুরু করেছে।

—পারুলের মেয়ের বিয়েতে এক জোড়া বালা গড়িয়ে দিলে কেমন হয়? স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন।

প্রস্তাবটা সুধাংশুশেখরের খারাপ লাগল না। আজকাল সোনার অনেক দাম, তবু ছোট বোনের মেয়ে, আপন ছোট বোন, আরতি মন্দ বলেনি। মনে মনে জুতসই একটা বাহবা ভাঁজতে ভাঁজতে মুখ থেকে পাইপ বের করলেন। পর্দার ওদিকে চটি ঘষার শব্দ হল। পরমুহূর্তেই পর্দা সরিয়ে সূর্য ঢুকল।

—তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে! আজকাল কেউ সোনা দেয়? সেই তো ঘরের সোনা দিতে হবে। একবার আমার কথা ভাবলে না? এই তো শরীরের হাল, যদি কিছু হয়ে যায় তখন থাকার মধ্যে একমাত্র ওই সোনাই তো সম্বল হবে। না না, সোনাফোনা দিতে হবে না। মোটা দেখে গিফ্‌ট চেক দিয়ে দাও, তাতেই ওরা খুশি হবে। ফিক্সড ডিপজিট করে রাখবে, সুদে বাড়বে।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁফাতে হাঁফাতে সূর্য বসে পড়ল।

আরতি অসহায়ভাবে একবার স্বামীর দিকে একবার ছেলের দিকে তাকালেন। উনি জানতেও পারলেন না সুধাংশুশেখর ওঁর কথায় সায় দিতেই যাচ্ছিলেন। ফলে নিজের নির্বুদ্ধিতায় ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'না না, তুই ঠিকই বলেছিস। সোনা দিয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে বরং একখানা বেনারসী কিনে দেব, কী বলো?

সুধাংশুশেখরের মুখে আবার পাইপ ঢুকেছে। আরতির মতো সূর্যকে উনি ঠিক সমীহ না করলেও, ডাক্তার বাবা হয়েও ছেলের স্বাস্থ্যের কোনওরকম উন্নতি না ঘটাতে পেরে মনে মনে সর্বদা একটু কুণ্ঠিত হয়ে থাকেন। কাজেই আরতির প্রশংসা শুধু ভাঁজাই হল, উচ্চারণ হল না।

—আমার যে খাওয়ার সময় হয়েছে মা, তুমি কী করছ বসে বসে?

ছেলের মুখে বিরক্তির ছাপ দেখে আরতি তাঁর মোটা শরীর নিয়ে যতদূর সম্ভব লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর মনেও হল না উনিশ বছরের ছেলেকে বলি, গীতাকে গিয়ে বল, খাবার দিয়ে দেবে। বাবার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

চশমার ভেতর দিয়ে বাবাকে লক্ষ্য করছিল সূর্য। বয়সের ছাপ পড়েছে। আজকাল আর আগের মতো অত কঠোর মনে হয় না।

ইদানীং সুধাংশুশেখর শাসন তো নয়ই, আগবাড়িয়ে ছেলের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন না। নিজেরই ছেলে, তবু মাঝেমাঝে মনে হয় ওকে ঠিক বুঝতে পারছেন না। আচমকা এমন সব কথা বলে, অস্বস্তি হয়। অথচ খতিয়ে ভাবলে দেখা যায়, যা বলে, নিতান্ত মন্দ বলে না। বিয়ের পর বোনই বলো আর দিদিই বলো, সব তো সত্যি পর হয়ে যায়। সেই পরের ঘরেই সোনা দেওয়ার কথা হচ্ছিল, তাতে কার লাভ! বুদ্ধি আছে ছেলেটার! দেখতে তো হবে কার ছেলে! ভেবে আত্মতুষ্টি হচ্ছিল সুধাংশুশেখরের, স্বপ্ন ভাঙল সূর্যর কথায়।—রেজাল্ট দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখলাম। সুধাংশুশেখর এর পর কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

—আজকাল কোনও পরীক্ষার খাতা ঠিকমতো দেখা হয় না। আমার বন্ধু কুনালের বাবা একজ্যামিনার। কুনালকে দিয়ে খাতা দেখান। এ দেশের কোনও আশা নেই। ঠিকমতো খাতা দেখা হলে আমার রেজাল্ট নিয়ে ভাবনা থাকত না। তোমাকে আমার জন্যে ধরাধরিও করতে হতো না।

সুধাংশুশেখর স্তম্ভিত হয়ে সূর্যর দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ আগে আরতি এ কথা বলছিল ঠিকই, তাই বলে উনি যে চেষ্টা করবেন এমন কথা তো দেননি। অথচ সূর্য ধরেই নিয়েছে ধরাধরি উনি করবেনই, ওর জন্যে চেষ্টা করবেনই! হঠাৎই সুধাংশুশেখর মনে মনে প্রতিবাদ করে উঠলেন। কেন করবেন? যার ভর্তি হওয়ার সে নিজে চেষ্টা করুক। বিরক্তিতে পাইপ কামড়ালেন। কিন্তু তারপরেই চিরাচরিত কুণ্ঠা কুর্নিশ করে দাঁড়াল। মুখে কিছু বলতে পারলেন না।

—তুমি বরং কালই চৌধুরীকাকুকে ফোন করে বলে রেখো। গম্ভীরভাবে সূর্য পরামর্শ দিল। ওর শ্যেনদৃষ্টি সুধাংশুশেখরের মুখের ওপর।

—হ্যাঁ, তাই ভাল হবে। শুভস্য শীঘ্রম।

সুধাংশুশেখর উঠে পড়লেন, রুগী আসার সময় হয়েছে।

৩

কথাটা শুনে আঁতকে উঠেছিলেন আরতি।—শেষে বাবুকে মেয়েদের সঙ্গে ক্লাস করতে হবে?

—আহা, শুধু তো মেয়ে নয়, ছেলেরাও আছে। হাসপাতাল সেরে রুগীর বাড়ি যাওয়ার ফাঁকে স্ত্রীকে সংক্ষেপে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন সুধাংশুশেখর। কো-এড কলেজের ব্যাপারে আপত্তি ওঁরও ছিল। কিন্তু আজকাল ভাল কলেজ নাকি সবই কো-এড। তাছাড়া এই কলেজে চেনাজানা বেরিয়েছে। অন্য কলেজে কে কোথায় পরিচিত লোক আছে খোঁজার মতো সময় তাঁর কোথায়!

—বাবু শুনলে বিরক্ত হবে।

কেন যে আরতি এ কথা ধরে নিলেন তা জানা গেল না। হয়ত ওঁর ধারণা সূর্যর মতো বিচারবোধসম্পন্ন বিচক্ষণ ছেলেদের মেয়েদের মতো হাল্কা, পাতলা, অগভীর জীবের প্রতি কোনও আগ্রহ থাকে না। আশেপাশের ওই বয়সী ছেলেমেয়েদের তুলনায় সূর্য যে অকেটাই আলাদা সেকথা তাঁকে বলে দেওয়ার দরকার নেই। ওরা সব যখন করিশমা কাপুর, মাধুরী দীক্ষিত, শালমান খান আর শাহরুখ খানকে নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তখনই সূর্য হঠাৎ শেয়ার বাজার আবিষ্কার করল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিভিন্ন খবরকাগজের বাণিজ্যের পাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কোন্ শেয়ারের কী দর ওর নখদর্পণে। শুধু উপযুক্ত রেস্ত না থাকায় কেনাবেচা করতে পারে না।

আরতি ভাবেনইনি এহেন ছেলে মেয়েদের প্রতি কোনওভাবে আকৃষ্ট হতে পারে! তবু

প্রথম দু'এক মাস ক্লাসে ছেলেমেয়েদের বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সব জেনে নেওয়ার একটা ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

—সব বোগাস!

দুটো শব্দে সূর্য ক্লাসের ছাত্রছাত্রী, টিচার, লাইব্রেরি ইত্যাদি যাবতীয়ের বর্ণনা দেওয়ায় আরতি মোটামুটি নিশ্চিন্তই ছিলেন। চমক ভাঙল যেদিন প্রথম ফোন এল।

—আন্টি, আমি মোনা বলছি, সূর্য আছে?

সূর্যকে ডেকে দিয়ে আরতি সোজা পুজোর ঘরে ঢুকলেন।

—জয় ঠাকুর, জয় মা! জয় ঠাকুর, জয় মা! মোনা যদি লক্ষ্মী মেয়ে হয়, তাকে আমি সোনা দিয়ে মুড়ে ঘরের বউ করে নিয়ে আসব। সবই তোমাদের ইচ্ছে। কিন্তু দেখো আমার সোনার টুকরো ছেলে যেন ডাইনির পাল্লায় না পড়ে। একটু দেখো ঠাকুর, মা মাগো।

বারবার কপালে হাত ঠেকাতে লাগলেন আরতি। কী করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। একব র ভাবলেন সুধাংশুশেখরকে ফোন করে জা‌‌নাই। তারপরেই দ্বিধা হল। হয়ত উনি হেসে উড়িয়ে দেবেন। তারপরেই মনে হল সূর্যর কথা। বাবাকে জানিয়েছি টের পেলে যদি বিরক্ত হয়। সূর্যর অসন্তুষ্ট মুখটা মনে হতেই আরতি ফোন করে সুধাংশুশেখরকে জানানোর কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন।

মোনার ফোন নিয়মিতই আসে। ওর সঙ্গে কথা বলতে বাবু যে খুব অনিচ্ছুক, আরতির তা মনে হয় না। ছেলের পছন্দ হলেই হল, ভাবেন মনে মনে, একবার যদি চোখে দেখা যেত।

ঋতু পরিবর্তনের সময় যথারীতি সূর্য থেকে থেকে অসুখে পড়ে। ক্লাসে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এবারে আর ফোন নয়, সশরীরে মোনা এসে হাজির। দরজার বাইরে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আরতি প্রথমদিন থমকে গিয়েছিলেন। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভভাবে হেসেছিল মেয়েটি।

—সূর্য আছে? আমি মোনা!

নাম শুনে হুঁশ ফিরল আরতির।

—এসো। ওর শরীরটা ভাল নেই, শুয়ে আছে।

সূর্যর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন আরতি। বেশ সুশ্রী মেয়েটি। কি সুন্দর স্কার্ট ব্লাউজ পরেছে। আজকালকার মেয়েরা কত সুন্দর সাজতে জানে, লেখাপড়াও করে, একা একা ঘুরেও বেড়ায়। বন্ধুর বাড়ি যায়। ভাবতে ভাবতে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে আরতি ওদের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

বছর ঘুরতে থাকে । ঋতু পাল্টায়। সূর্যর শরীরও খারাপ হয়। মোনার আসা যাওয়া চলে নিয়ম করে। সূর্য ওদের বাড়ি যায় না, মোনাই আসে। একদিন আরতি বলেছিলেন, 'একবার গিয়ে দেখে আয় না কেমন বাড়ি! তোর যখন পছন্দ হয়েছে...।'

মাঝপথে থেমে যেতে হয়েছিল, সূর্য কড়া মুখে ওঁর দিকে তাকিয়েছিল।—পছন্দ অপছন্দ আবার কী? ক্লাসে পড়ে, ব্যস, চুকে গেল।

টেস্ট পরীক্ষার ঠিক আগে জ্বরে পড়ল সূর্য। এমনিতেই নিয়ম করে ক্লাস করা হয় না। তার ওপর যদি পরীক্ষা না দিতে পারে, আরতি উদ্বেগে উদ্ভ্রান্ত। পরীক্ষার চাপেই বোধহয় মোনা আজকাল আসছে কম। কী যে হবে!

সূর্যর ফলের রস নিয়ে ওর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন আরতি, সূর্যর গলার আওয়াজ পেয়ে থেমে গেলেন।

—পরীক্ষা একা তোমার, আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে না? একেই বলে মেয়েদের বুদ্ধি!

নোটগুলো নিয়ে আসবে, আর কোনও সাজেশন দিলে ভুলে বসে থেকো না। তোমার মেমারি তো বাঁধিয়ে রাখার মতো।

আরতি শিউরে উঠলেন। এইভাবে ধমকাচ্ছে, মেয়েটা বেঁকে বসবে না তো। বাবুর মুখটাই ওইরকম, ভেতরটা তো সবাই চিনতে পারে না। বাবুকে চেনা সহজ! আমিই মাঝে মাঝে বুঝে উঠতে পারি না।

—থাক, আর বড়াই করতে হবে না! আমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অত সোজা! তাছাড়া যে কোনও শিক্ষিত লোক জানে মেয়েদের মগজের ওজন ছেলেদের মগজের ওজনের চেয়ে কম। তার মানে যে কী, মাথায় ঢুকল?

পরের দিন দরজার সামনে মোনাকে দেখে আরতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক, তাহলে বাবুকে চিনতে ভুল করেনি। বুদ্ধিমতী মেয়ে বলতে হয়। আহা, এমন একজনকে যদি বাবুর বউ করার জন্যে পেতাম! বাবুরও তো পছন্দই হয়েছে মনে হয়। নাহলে রোজ বাড়িতে ডেকে আনে! আহা ঠাকুর বাঁচিয়ে রাখুন। এই বেলা বরং ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপটা সেরে ফেললে হয়।

আরতিকে হাল্কা হাসি দিয়ে সূর্যর ঘরে ঢুকল মোনা।

ঘণ্টা দুয়েক কেটে গিয়েছে। রোজকার মতো কথাবার্তার কোনও শব্দ নেই দেখে আরতি বিচলিত হয়ে পর্দা ফাঁক করলেন। চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় ঘুমোচ্ছে বাবু আর ওর টেবিলে বসে একমনে নোট টুকে যাচ্ছে মোনা।

আরতির চোখে জল এসে গেল। আবেগে বুক কেঁপে উঠল। এই না হলে ভালবাসা! পারবে—এই মেয়েই পারবে। আমরা যখন কেউ থাকব না, তখন বাবুর ভার ও-ই নিতে পারবে। জয় ঠাকুর!

চেয়ার সরানোর আওয়াজ হল।

—সূর্য, এই সূর্য! মৃদু গলায় মোনা ডাকল।

অনিচ্ছে সত্ত্বেও আরতি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর পায়ে যেন হঠাৎ শেকড় গজিয়ে গিয়েছে।

আবার ডাকল মোনা।—কী, হল-টা কী? বিরক্তিতে সূর্যর গলা তীক্ষ্ণ।

—নোট লেখা হয়ে গিয়েছে, রাত হয়ে যাচ্ছে, আমি যাচ্ছি।

—যাচ্ছ তো যাও না, আমাকে বিরক্ত করছ কেন? দেখতে পাচ্ছ না রেস্ট নিচ্ছি! সব ঠিকমতো লিখেছো, নাকি এমন কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং করে লিখেছ যে পড়া যাবে না।

টেবিল থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে, পর্দা সরিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মোনা। আরতিকে দেখে ছোট্ট করে হাসার চেষ্টা করল। ঠিক হল না।

—একবার শুনবে? আরতি ডাকলেন ওকে। তারপর সূর্যর ঘর থেকে যতটা সম্ভব দূরে গিয়ে বললেন, 'কোথায় থাকো মা তুমি?'

—বেকবাগান। বলল বটে, কিন্তু মোনার চোখ সামান্য বড় হয়ে গেল।

—বাড়িতে কে কে আছেন?

এবার হাঁ করে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল মোনা।

—মা-বাবা আছেন তো? আরতি কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

—হ্যাঁ, সবাই আছেন।

—তোমাদের ঠিকানাটা দেবে মা? অনুনয় করে উঠলেন আরতি।

—ওর ঠিকানা দিয়ে তুমি কী করবে? জলদগম্ভীর গলায় বলে উঠল সূর্য। আরতি খেয়ালই করেননি ও কখন ওঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—না, মানে...বলতে শুরু করে থেমে গেলেন আরতি।

—তুমি আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও যাও! হাত নেড়ে মোনাকে বিদায় করে দিল সূর্য। তারপর গম্ভীরমুখে মার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

—কী ব্যাপার, ওর ঠিকানা চাইছিলে কেন? তীক্ষ্ণ গলায় আবার বলল।

—না, মানে...তোর ওকে পছন্দ হয় বাবু?

—পছন্দ অপছন্দের তো কিছু নেই। ক্লাসে পড়ে, আমার প্রয়োজন হলে নোট দিয়ে যায় ব্যাস। এখানে পছন্দ অপছন্দ নিয়ে লাফালাফি করছ কেন?

—না, ভাবছিলাম, তোকে তো খুব ভালবাসে। আরতি আমতা আমতা করে থামলেন।

—এই সব তোমাকে বুঝিয়েছে বুঝি? আমি তখনই বুঝেছি, মেয়ে সুবিধের নয়। বড়লোকের বাড়ি। দেখেছে, অমনি পাকড়ানোর তাল করতে শুরু করেছে। কী বলেছে তোমায়?

—আমাকে কিছুই বলেনি। অসহায়ভাবে বলে উঠলেন আবতি।

—তাহলে আবোলতাবোল বকছ কেন?

—না ভাবলাম, তোকে ভালবাসে, তোর যদি পছন্দ হয়, তাহলে...

—কী তাহলে? খেঁকিয়ে উঠল সূর্য।

—না, মানে, তাহলে ওর বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে রাখতে পারি, মিনমিন করে বললেন আরতি।

—নোট লিখে দিচ্ছে বলে ওকে বিয়ে করতে হবে নাকি?

—তোকে ও ভালবাসে তো!

—তাতে কী হল? জানো ওরা কোথায় থাকে? কী রকম বাড়িতে থাকে? একতলার ঘুপচি ফ্ল্যাট। তাও আবার ভাড়া করা, নিজেদের নয়। তুমি ভাবছ ওই হাভাতে ঘরের মেয়েকে আমি বিয়ে করব? কী দিতে পারবে ওরা? নোট লিখে দেয় বলে তাকে বিয়ে করতে হবে নাকি?

অসুস্থ সূর্য ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। আরতি শেষ চেষ্টা করলেন।—মেয়েটা কিন্তু ভাল রে।

—ওরকম বহু ভাল মেয়ে শহরে আছে। বড় ঘরেরও ভাল মেয়ে আছে। তাদের খোঁজো—খুঁজে বেব কবো। বাড়িতে বসে বসে তো আর মেয়ে পাওয়া যাবে না।

আরতি চুপ করতে বাধ্য হলেন। সত্যিই তো, ছেলের বউয়ের খোঁজ করতে হলে কাঠখড় পোড়াতেই হয়। বাবু আমার ঠিক বলেছে। সত্যি তো, গরীব ঘরের মেয়ে আনলে যদি বাবুর পছন্দ না হয! হাজার হোক, আজকালকার ছেলে! সমানে সমানে না হলে যদি মনের মিল না হয়।

পা টেনে টেনে সূর্য নিজের ঘরে ঢুকল। আরতি মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৪

সমানে সমানেই সূর্যকে বিয়ে দিতে পারলেন সুধাংশুশেখর আর আরতি। উত্তরপাড়ার ব্যবসায়ী বাবার একমাত্র মেয়ে। উচ্চ মাধ্যমিকের পর আর পড়াশোনা করেনি। অনেক খাটপালঙ্ক, গয়নাগাঁটি নিয়ে এসে উপস্থিত হল সূর্যর জীবনে। আরতির একটা ক্ষীণ আশা ছিল, এবারে বোধহয় ছেলের মন গলবে। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেল, তেমন কোনও লক্ষণ চোখে পড়ল না।

এদিকে সুধাংশুশেখরের মধ্যস্থতায় সূর্য ে সরকারি সংস্থায় মোটামুটি চলনসই মাইনের

চাকরি করছে। খুঁটির জোর থাকায় অফিসে বিশেষ কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না। তার ওপর গুরুগম্ভীর হাবভাব, বাড়ির মতো কাজের জায়গাতেও লোক ওকে একরকম এড়িয়েই চলে।

বছর ঘুরতে লাগল। আরতি আশায় আশায় ছেলে, ছেলের বউয়ের মুখের দিকে তাকান। সুখবর পাওয়ার সময় কি এখনও হয়নি? বউমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। প্রথম প্রথম নতুন অবস্থায় যে উচ্ছলতা দেখে আরতি ভেবেছিলেন, সূর্য হয়ত এবারে ওঁদেরও কাছাকাছি চলে আসবে। সেই প্রাণবন্ত ভাব আর নেই। কেমন চুপ হয়ে গিয়েছে। কথা বলেই না, মেশিনের মতো কাজ করে যায়।

—মা আপনার পান!

আরতি মুখ তুলে তাকালেন। চোখের কোণে কালি, শীর্ণ মুখ, বড় বড় চোখ। বড় মায়া হল।

—বসো। শরীরটা বড্ড খারাপ দেখাচ্ছে, ঠিক আছো তো?

মুখ নিচু করে মাথা নাড়ল আরতির ছেলের বউ বিজয়া। খারাপ লাগল আরতির। ছেলের জন্যে প্রাণ দিয়ে করে, বউ করে এনে ঠিকই করেছেন জানা সত্ত্বেও অপরাধী লাগল নিজেকে।

—বাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন।

—নাহ্। ছোট্ট উত্তর, চাপা নিঃশ্বাস।

—ক'দিনের জন্যে ও বাড়ি ঘুরে আসবে? অনেকদিন ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়নি, আমিও খবর নিতে পারি না—উত্তরপাড়ার ওঁরা সব ভাল আছেন তো? ফোন করেছ?

বেশি কথা বলতে চায় না বিজয়া। ঠিক যে চায় না, তাও নয়। চায় হয়ত, কিন্তু বলে উঠতে পারে না, কোথায় যেন বাধা পায়।

—উত্তরপাড়া যাবে? আবার জিজ্ঞেস করলেন আরতি।

—বারণ করেছে।

—কে, বাবু?

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে প্রশ্ন করতে করতে আরতি উদ্ধার করলেন সূর্য বিজয়ার বাপের বাড়ি যাওয়ার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছে।

—আমাকে দেখাশোনা করবে বলেই তোমাকে বিয়ে দিয়ে আনা হয়েছে। সেসব ফেলে রেখে নাচতে নাচতে বাপেরবাড়ি দৌড়লে, তাহলে সেখানেই থাকো—আর এ বাড়িতে আসার দরকার নেই।

মা বাবার জন্মদিন, ভাইফোঁটা, এমনকি দিদির মেয়ের অন্নপ্রাশনও ফোনে সারতে হয়েছে। অন্নপ্রাশনের আগের দিন সূর্য সুস্থ বোধ করছিল না। আরতি তবু অনেক করে বিজয়াকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে বলেছিলেন।

—একটাই দিদি, তার প্রথম সন্তান। বউমা ঘুরে আসুক না, আমি তো আছি।

—যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলার অভ্যাস তোমার গেল না। একবার হাতের বাইরে চলে গেলে তখন কে সামলাবে, তুমি?

বড় হওয়ার পর থেকে সূর্যর ওই তির্যক ভঙ্গীর সঙ্গে আরতির পরিচয়। ভয় পান। তবু চেষ্টা করলেন আর একবার।

—লৌকিকতার দিকটাও তো আছে। কুটুম্ব বাড়ি। আমরা তো কেউ যাচ্ছিই না, তার ওপর বউমাকেও যেতে না দিলে...।

—বাজে ভ্যানভ্যান করো না তো কানের কাছে! ওকে পাঠিয়ে দাও, গা হাত পা টিপে দেবে—ব্যথা করছে। দেখছ সকাল থেকে অপিস যাওয়া হল না, হুঁশ নেই—যত্তসব জুটেছে!

অতক্ষণ ধরে বউমার সঙ্গে কথা হল, কই কিছু বলল না তো! ভেবে আরতির অত আনন্দের মধ্যেও একটু দুঃখ হল।

ঘণ্টাখানেক আরতির সঙ্গে কথা বলে বিজয়া ফলের রস করে সূর্যকে দিতে গেল। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সুধাংশুশেখর পাইপ থেকে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে বললেন, 'তাহলে আর কি, আনন্দের আর সীমা রইল না যে!' আরতি অবাক হয়ে সুধাংশুশেখরের মুখের দিকে তাকালেন।

—কী বলছ গো?

—বউমা আমাদের জননী হতে চলেছে। বলে হাসলেন সুধাংশুশেখর।

—সেকি! তোমাকে কে বলল?

—কে আর বলবে! হপ্তাখানেক আগে দেখি বেটি গুটি গুটি করে চেম্বারে ঢুকেছে। শরীর ভাল যাচ্ছে না, খিদে হচ্ছে না, এইসব। আমার তখনই সন্দেহ হল। পরীক্ষা করতে পাঠালাম। দু'দিনের মধ্যেই জেনে সূর্যকে ডেকে পাঠালাম। ও শুনেটুনে অবশ্য তোমাকে বলতে বারণ করল। ভাবলাম বোধহয় নিজে বলতে চায়। বলেনি?

—কই না তো! আরতি বিহ্বল হয়ে সুধাংশুশেখরের দিকে তাকালেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন, হঠাৎ মনটা খচখচ করে উঠল।

—কেন বলল না? আমি জানলে কী হবে? বউমা আজ অত কথা বলল, কই এ ব্যাপারে তো কিছু জানাল না।

—সে আমি কী করে বলব বলো, তোমার ছেলে তুমিই ভাল জানো। বলে সুধাংশুশেখর পাইপে আগুন দিতে দিতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

ইচ্ছে সত্ত্বেও ওঁর হাসিতে আরতি যোগ দিতে পারলেন না।

৫

সূর্যর ছেলে বিদ্যুৎ। দু'বছর হতে না হতেই নামের সার্থকতা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। মা-ঠাকুমা তো দূরের কথা পেশাদার আয়াও সামলাতে গিয়ে হিমসিম। অবশ্য বজ্র নাম রাখলেও ভুল হত না। দু'বছরের ওইটুকু শরীর থেকে যে এত আওয়াজ বেরোতে পারে, আরতি বা সুধাংশুশেখরের ধারণাই ছিল না। মাঝে মাঝে আরতির মনে হয়, বাবা-মায়ের প্রায় নির্বাক জীবনযাপনই যে বাঁচার একমাত্র উপায় নয়, তা প্রমাণ করতেই যেন বিদ্যুৎ দিনরাত চেষ্টা চালাচ্ছে ওদের নিঃশব্দ জীবনের বিরুদ্ধে এটাই ওর সরব প্রতিবাদ।

বিদ্যুৎ আসার পর থেকে সূর্য আরও চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। বাড়ির সকলের মনোযোগ এখন আর ওর দিকে নেই দেখে সূর্যর মেজাজ আরও চড়ে যাওয়ার কথা ছিল, তেমন কিন্তু হয়নি। বরং আগের চেয়ে আরও খানিকটা গুটিয়ে গিয়েছে। আপিস থেকে ফিরে নীরবে নিজের ঘরে আশ্রয় নেয় আরতি, বিজয়া বা কাজের মেয়েটি জলখাবার দিয়ে যায়।

এক-একদিন হুলস্থূল চলতে থাকে। বিদ্যুতের দৌরাত্ম্যে সকলের অস্থিরতা তুঙ্গে পৌঁছে যায়, জলখাবার দেওয়ার কথা আর মনে থাকে না। সূর্যকে তখন নির্বিবাদে বিছানায় শুয়ে বই পড়তে দেখা যায়। এমন সময় ছুটতে ছুটতে বিদ্যুৎ পৌঁছে যায়। সে বেচারা বাবার গুরুগম্ভীর ভাবমূর্তির তাৎপর্য কিছুই বোঝে না, আর নয়ত সবই বুঝে তোয়াক্কা না করে হেঁচড়পেঁচড় করে খাটে উঠে বাবার পিঠের ওপর সটান ডাইভ দেয়। এই সময় সাধারণত সূর্যর হাত থেকে বই পড়ে যায়, দু'একবার চশমাও ছিটকে যেতে দেখা গিয়েছে।

এতক্ষণ ধরে বিদ্যুতের পেছনে যে সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়াচ্ছিল, সেই আয়া ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য মোছা ন্যাতার মতো বিদ্যুৎকে ধরে খাট থেকে নামিয়ে দেয়।

—সারাদিন তো এই একটাই কাজ করার জন্যে মাইনে করে রাখা হয়েছে। সেটাও ঠিকমতো করতে পারো না। নিয়ে যাও ঘর থেকে, পড়াশোনার সময় খবরদার যেন বিরক্ত না করে।

সূর্যর ধমকে তটস্থ আয়া বিদ্যুৎকে কোলে তোলামাত্র সে প্রবল উৎসাহে চিৎকার সহকারে হাত-পা ছুঁড়ে মুহূর্তের মধ্যে আর এক কাণ্ড বাধিয়ে ফেলে। ঠিক তারপরেই শোনা যায় সরবে শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। বাড়ির সবাই জানল, সূর্য পড়াশোনা করছে। আর তখনই আরতি, বিজয়া আর কাজের লোকের মনে পড়ে যায়, জলখাবার দেওয়া হয়নি। পা চালিয়ে রান্নাঘরে ফেরে ওরা।

সূর্যর জীবনে বাকি সকলের মতো বিদ্যুতের প্রতিও ওর যে বিশেষ টান নেই, তা বাড়ির লোকের বুঝতে কোনরকম অসুবিধা হয় না।

তবু কাণ্ডটা যখন হল, তখন শুধু আরতি বা বিজয়া নয়, সুধাংশুশেখরও সূর্যকে জানাতে ইতস্তত করেছিলেন।

কাজের মেয়ের দু'হাত জোড়া। এদিকে ভাতের ফ্যান উথলে যাচ্ছে। ঢাকা সরাতে যেটুকু সময় লাগে, আয়া সেইটুকু সময়েই বিদ্যুৎকে ছেড়ে ছিল। সেই মওকায় সিঁড়ি বেয়ে না নেমে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন বিদ্যুৎবাবু। পরমুহূর্তে পরমাণু বিস্ফোরণের মতো চিৎকার।

গোটা বাড়ি যখন ছুটে এসেছে তখন মেঝেতে রক্তের ছোটখাট পুকুর, বিদ্যুতের ঘাড় বেয়ে রক্তগঙ্গা। অভিজ্ঞ, প্রবীণ সুধাংশুশেখর যখন অনেক চেষ্টা করেও সেই রক্ত থামাতে পারলেন না, তখন নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া স্থির হল।

—একবার দাদাবাবুকে জানাবেন না? কথাটা কাজের মেয়ে মুখ ফসকে বলে উঠতে আরতি আর বিজয়া প্রমাদ গুনলেন। ওঁদেরও যে মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু কেউই মুখ ফুটে বলতে চাইছিলেন না। বলা মানে ফোন করা। সেই ফোন করবে কে?

—তুমি সূর্যকে জানিয়ে দাও, আমি দাদুভাইকে নিয়ে যাচ্ছি। আরতির দিকে তাকিয়ে সুধাংশুশেখর বললেন। আরতির সেই মুহূর্তে মনে হল, ওঁর চেয়ে সুধাংশুশেখরের দায়িত্ব অনেক সোজা। আরতি তাকালেন বিজয়ার দিকে। সে বেচারি হয় ছেলের দুর্ঘটনা আর স্বামীকে সেই খবর দেওয়ার যৌথ চাপে পড়ে কিংবা সূর্যকে ফোন করার দুরূহ কাজটা এড়াতে ঠিক সেই মুহূর্তে হাপুসনয়নে কাঁদতে শুরু করল।

সুধাংশুশেখর বিদ্যুৎ নামের আওয়াজ ও আস্ফালনের পুঁটলিটিকে নিয়ে রওনা দিয়েছেন। ফোন তুললেন আরতি। থরথর করে হাত কাঁপছে।

—বাবু, দাদুভাই পড়ে গিয়েছে, মাথা ফেটে গিয়েছে। তোর বাবা নার্সিংহোমে নিয়ে গেছেন।

এক মুহূর্ত কোনও কথা শোনা গেল না। আরতির অন্তরাত্মা হিম হয়ে গেল। নিজেদের অপদার্থতায় কুঁকড়ে গেলেন। দুর্ঘটনা ওঁর মনে কম আঘাত করেনি, তার ওপর সূর্যর মর্মান্তিক ধাক্কার জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন।

—আমি আসছি। বুলেটের মতো দুটো শব্দ। ওই গলা আরতি চিনতে পারলেন না। জীবনে শোনেননি।

—বাবু! বলে ডেকে উঠলেন।

লাইন কেটে গিয়েছে।

সামনে এসে ধমকাবে ভেবে সিঁটিয়ে গেলেন আরতি। সত্যিই তো, এই অপরাধের ক্ষমা নেই। বিজয়া চোখ মুছতে মুছতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—আসছে বলল। ম্লানমুখে জানালেন আরতি। দু'জনের কারো অজানা রইল না, ওই ম্লানমুখের কারণ যত না বিদ্যুৎ তার চেয়ে অনেক বেশি সূর্য।

শাশুড়ি-বউ প্রায় প্রাণভয়ে সূর্যর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ফোন বাজল। সুধাংশুশেখর নার্সিংহোম থেকে জানালেন, রক্ত লাগবে। বি পজিটিভ গ্রুপের।

—আমার ভাইকে ডাকি, মা? ওর তো অনেক চেনাজানা আছে। কয়েকজন মিলে এলে একজন না একজনের রক্তের সঙ্গে মিলে যাবে নিশ্চয়।

—তাই ডাকো। সায় দিলেন আরতি। বাবু ফেরার আগে যতদূর সম্ভব কাজ এগিয়ে রাখতে ওঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

বাইরে গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল। তারপরেই সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজের ঝড়। বিজয়া আরতির শরীর ঘেঁষে প্রায় শরীরের আড়ালে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে প্রাণপণ।

—বাবা ফোন করেছিলেন? ঘরে ঢোকার আগেই জিজ্ঞেস করল সূর্য।

—রক্ত লাগবে। বি পজিটিভ। বউমা তপনকে লোক জোগাড় করে আনতে বলেছে। ওরা তো ক্যাম্পট্যাম্প করে। আরতির গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

—বি পজিটিভ? আমার বি পজিটিভ! কোথায় আছে, লেক ভিউতে?

দু'জনে সমস্বরে বলে উঠল, হ্যাঁ।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে সূর্য—নামছে তো না, উড়ছে।

—বাবু, তুই দিস না, তোর শরীর খারাপ হবে। চিৎকার করে উঠলেন আরতি।

—কিচ্ছু হবে না। রুখে উঠল সূর্য। পরমুহূর্তে থেমে পেছন ফিরে তাকাল—'বিজয়া চলো।'

হলুদ লাগানো তাঁতের শাড়ি আর হাওয়াই চটি পরে বিজয়া সূর্যর পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

—ভাই আসবে, মিনমিন করে বলতে শুরু করল বিজয়া।

—আসুক। আমার ছেলেকে রক্ত আমি দেব। পাড়ার লোকে নয়।

কথাগুলো আরতিও শুনতে পেলেন। হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওদের চলে যাওয়ার দিকে। বোঝার চেষ্টা করলেন, বিদ্যুতের মাথা ফেটে যাওয়ায় আজ যে সূর্যর দেখা পেলেন, এতদিন কোন্ মেঘের আড়ালে সে লুকিয়ে ছিল!

মহাজীবন ।। অনিতা অগ্নিহোত্রী

বরফ গলা জলে দুই পায়ের পাতা, মালিনী মনে করতে চেষ্টা করল, অরুণাভর সঙ্গে কবে, কখন তার শেষ দেখা হয়েছিল। মনে করতে গিয়ে ওইভাবে মালা হাতে দাঁড়িয়েই এক লহমার জন্য চোখ বন্ধ করে নিল মালিনী। ব্যথায় টনটন করতে থাকা মাথা, ঘাড় নামালো। একে দেখা হওয়া বলে না অবশ্য, কয়েক মুহূর্তের জন্যে মালিনীই দেখেছিল অরুণাভকে। অরুণাভ তাকে দেখতে পায়নি।

গতকাল সকালে। সাতটা বেজেছে কি বাজেনি, মেঘ-ভাঙা ভোরের আলো বিনা-নোটিসে এসে মালিনীর বারান্দার গ্রিল ছুঁয়েছিল। বর্ষণের পূর্বাভাস ছিল গতরাতের বুলেটিনে। ঘুমের মধ্যে মেঘের ডাক, স্বপ্নে, বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনতে শুনতে মালিনী বেশ কবার পাশ ফিরেছে। উঠতে ইচ্ছে করছিল না একদম, ওঠার পরে পিঠে অল্প ব্যথা। শীত শীত ভাব, এইসব হচ্ছে স্নান-না চাওয়ার জন্য শরীরের দুষ্টুমি।

স্নান না করলে আলসেমি আরও পেয়ে বসবে, তারপর তার জের চলবে অফিসেও, ওই ভেবে মালিনী অন্যদিনের চেয়ে সকাল সকালই বাথরুমে ঢুকেছিল। মাথায় তেল দেওয়া ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন। মধ্য-চল্লিশেও তার ঘাড় পর্যন্ত কোঁকড়ানো রুক্ষ চুলের ভার। ছিটকিনি বন্ধ করে কাঁধ থেকে আঁচল নামিয়ে গুনগুন করে উঠেছিল, 'এই যে বিশাল চরাচর লোকে...এই অপরূপ আকুল আলোকে...সেই সঙ্গে তার অভ্যস্ত হাত দেখে নিচ্ছিল হুকে সব কিছু ঠিকঠাক টাঙানো আছে কিনা, তাকে সাবান, ট্যালকম পাউডার...তোয়ালে নেই। সঞ্চারীর মুখে এসে মালিনী বুঝতে পারল। তখন সে দ্রুত বাইরের বারান্দায় চলে এসেছিল তার টাঙানো তোয়ালেটা নিতে, 'ওই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে'...এই কথাগুলি মিলিয়ে গিয়ে রক্তিম দুই ঠোঁটে তার ফুটে উঠেছিল দিব্য এক মৃদু হাস, নিজের একেবারে অজান্তেই।

অরুণাভ বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে।

এখানে, এই বারান্দায় দাঁড়ালে, বাঁদিকের বাড়িটার দিকে চোখ পড়বেই। গাড়িবারান্দা ঝাঁপিয়ে মাধবীলতা, দুধে-আলতা ফুল ফুটেছে থোকা থোকা। গেট ছাড়িয়ে রাস্তায় পৌঁছে গেছে অরুণাভ, সেখান থেকেই ইশারায় কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে, রীণা মানে ওর স্ত্রীকেই। ইশারা হয়তো বুঝতে পারল না রীণা, তখন মুখের সামনে দুই হাত জড় করে একটু চেঁচিয়ে অরুণাভ বলে উঠল—'ব্যাগ'। এবার দোতলা থেকেই ব্যাগটা, হালকা নীল প্ল্যাস্টিকের, লাফিয়ে পড়ল। লুফে নিল অরুণাভ। বাজারের দিকে যাবে। ঋজু, দীর্ঘ শরীর, শার্টের সূক্ষ্ম স্ট্রাইপ ও কপালের ওপর এসে পড়া একগুচ্ছ চুলে ওর তিপ্পান্ন বছর বয়সকে অনেক কম দেখায়।

তোয়ালেটা তুলে নিয়ে বাথরুমে ফিরে এসেছিল মালিনী। ওর ঠোঁটে তখনও হাসিটা লেগে। এ ওর মনের বহুদিনের অভ্যেস। পঁচিশ বছরের তো হবেই। অরুণাভর কথা একা বসে ভাবার সময় অথবা দূর থেকে ওকে দেখলে নিজের অজান্তেই মালিনীর ঠোঁটে এই

হাসিটা ফুটে ওঠে। তবে লোকে বলে, ইনট্যুইশন। প্রিয়জনের বিপদের অগ্রিম আভাস ছায়া ফেলে মনের ওপর। সে সবই কি মিথ্যে? মালিনী তো কিছুই টের পায়নি। একটু-ও না। রোদ মিলিয়ে গিয়ে মেঘ মেঘ বেলা নেমে এসেছিল। স্নান করে ব্যস্ত হাতে সামান্য প্রসাধন, মুখে চুলে। চোখে আইলাইনার, কপালে টিপ নেই। নীল বুটির ছাপা শাড়ি, নীল ব্লাউজে সেজে মালিনী পাখির মতন ব্রেকফাস্ট সেরে তার মারুতি নিয়ে অফিসে বেরিয়ে গেছিল ঠিক ন'টায়। বেসরকারি অফিস, কাঁটায় কাঁটায় হাজিরা। অফিসেও দিনটি গেছিল, অন্য পাঁচটা দিনের মতন। সেলস অ্যাডভাইসারি গ্রুপের মিটিং, লাঞ্চ ব্রেকে হাসিঠাট্টা, বিকেলে অমৃত ত্রিপাঠী আর মালিনী মিলে আগামী বার্ষিক জেনারেল বডি মিটিং-এর জন্য নোটটা ফাইনাল করে নিল। একটা প্রিণ্ট আউট বাড়িতেও নিয়ে এসেছিল, ছোটখাটো সংশোধন করবে বলে, যেটা মালিনীর নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ। অফিসের কাজ ও কোনদিন বাড়িতে আনে না। এবং স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে এনেছিল বলেই সেটা ছুঁয়েও দেখেনি আর বাড়ি এসে। সন্ধে সাড়ে ছ'টায় তারামণি চা এনে দিয়েছিল মালিনীকে। পরিপাটি করে স্টিলের ট্রে, এমব্রয়ডারি করা ট্রে-ক্লথে সাজিয়ে। আর ঠিক তক্ষুণি অমরনাথবাবু, যিনি ওদের রাস্তার প্রথম বাড়িটাতে বড় রাস্তার মুখে থাকেন তিনি মালিনীর কয়েকটা ইংরেজি ম্যাগাজিন পড়ে ফেরাতে এসেছিলেন। এই, আর এক কাপ চা এনো। বলেই মালিনীর মনে পড়েছিল, অমরনাথবাবু চা ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়িতে বোধহয় লেবু নেই, তাহলে সরবৎ—

অমরনাথবাবু জিভ কেটে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আরে না না, চা খান তো আপনি। আমি আসছিলাম এমনিই, অরুণাভকে দেখে ওই পথে বাড়ি ফিরে যাবো।

—অরুণাভকে দেখে, মানে?

—ওঃ আপনি জানেন না, অরুণাভ ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আছে আজ বিকেল থেকেই। জানেন না? সত্যি?

বিমূঢ় মালিনী ঘাড় নেড়েছিল।

সংক্ষেপে ঘটনাবলী গুছিয়ে বলে অমরবাবু স্কুটারের শিং ধরে ঠেলে অন্ধকারে পা বাড়ালেন।

—আমার সঙ্গে যাবেন? তা হলে আসুন।

—না। মালিনী তখনও স্থির। ওর মনের মধ্যে চিনচিন করে উঠছে একটা পুরনো অভিমান। একটা টেলিফোন, রীণা তাকে সারাদিনে একটা ফোন করতে পারত না। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে আসত মালিনী, কোনওদিকে তাকাত না।

বেরুতে একটু দেরিই হল মালিনীর। মাঝে তারামণি এসে রাতের খাওয়া নিয়ে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করে গেল, অন্যমনস্কভাবে হুঁ, হ্যাঁ, বলেছে মালিনী। ও বুঝতে পারছিল না, এখন ছুটে, হাসপাতালেই চলে যাবে কিনা। রীণা কী অবস্থায় আছে, রাতে ওখানে থাকার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে কিনা, এইসব অরুণাভ থাকলে অরুণাভকেই জিজ্ঞেস করা যেত, এখন তো সে প্রশ্ন অবান্তর। ওর বুকের মধ্যেটা অসাড় হয়ে গেছিল। অনেকদিন আগে, চব্বিশ বছরের মালিনী যেমন হলুদ-ফোঁটা লাগানো একটা নিমন্ত্রণের চিঠি উলটে পালটে কিছুতেই বুঝতে পারেনি, সেটা কী ভাষায় লেখা! অরুণাভ বসু নামক অতি প্রিয় নামখানা রীণা চৌধুরী বলে অচেনা এক নামের সঙ্গে এমন বিনা নোটিশে কোথায় বেড়াতে চলল, এখন মালিনী কোনদিকে যাবে, কী করবে এইসব ভাবতে ভাবতে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে গেছিল মালিনীর। দুটো বোধই কি এক গোত্রের? মালিনীর মাথায় গাড়ি নেওয়ার কথা এল না। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, চুলে জলের শিশির, ও শহরতলির হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছনো।

এমন বিশ্রী একা অবস্থায় এখানে কোনওদিন ওকে আসতে হয়নি। আসলে গত আড়াই বছরে এই শহরে নতুন আসার পর থেকে একাকিত্বের বোধ কোনদিন আক্রমণ করেনি মালিনীকে। অরুণাভ-ই এই বাড়ির খোঁজ দিয়েছিল। তার নিজের বাড়ি তখনও নতুন, পলেস্তারার ওপর রঙ চড়েনি। এখানে ওখানে কাজ চলেছে, প্লাম্বিং কাঠের কাজ। মালিনীর বাড়িঅলা দিল্লিতে সেটেলড। মাঝে মধ্যে এসে ভাড়াটে বসিয়ে কনট্রাক্টে সই করিয়ে চলে যান। বছর খানেক একটু একা লেগেছিল মালিনীর, তবে তারই মধ্যে অরুণাভ রীণাদের পাশের বাড়িতে চলে আসার তোড়জোড়, এলেই মালিনীর ড্রয়িংরুমে আড্ডা, স্বভাবতই। কারণ তখনও অরুণাভদের বিজলি আসেনি। অরুণাভর সঙ্গে সপ্তাহান্তে একবার দেখা, দরকারে কখনও মাঝে মধ্যে ফোন কিন্তু ও যে পাশেই আছে এই বোধটাই মালিনীকে ভরপুর করে রাখত। অরুণাভ জানে কোথায় ইনডোর প্লান্ট পাওয়া যায়, নতুন মার্কেটের চারতলায় একচিলতে বইয়ের দোকানটা অরুণাভই খুঁজে বার করেছিল। নতুন ভেজিটেরিয়ান রেস্তোরাঁ খোলার আগেই অরুণাভর শিকারী নাক তার সন্ধান পায়। আর এইসব অভিযানে অমোঘ সঙ্গী রীণা-অরুণাভর একমাত্র সন্তান অভি। অভি হস্টেলে থাকে, কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় আসে। বাবাই অভির হিরো। অবশ্য যদি বেঁকে বসে, অভি তার মালামাসির কাছে দাপাতে দাপাতে চলে আসবে। হাসপাতালের সামনে নানা ধরণের টু-হুইলার অগোছালো ভাবে পার্ক করা, কার পার্কিং একটু এগিয়ে বাঁদিকে। মালিনী মলিন করিডর ধরে, এমার্জেন্সি পিছনে রেখে এগোল। প্রাইভেট নার্সিংহোমে যারা চট করে যেতে চায় না এমন বন্ধু অথবা সহকর্মীদের দেখতে কয়েকবার এখানে এসেছে মালিনী, কিন্তু অরুণাভকে দেখতে কোনদিন যে আসতে হবে, সেই সম্ভাবনা ওর মাথায় ক্ষণিকের জন্যও উঁকি মারেনি। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের সামনে ইতস্তত জটলা, ওকে দেখে কয়েকজন তাকালো, অথচ কেউ সরলে না। বাইরের ডিউটিরুমে ডাক্তার নেই। অনুমতি না নিয়ে ভেতরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, অতএব অপেক্ষা। একটুখানি বাঁদিকে ঘাড় ঘোরালেই ঘুমন্ত বা অচেতন অরুণাভকে দেখতে পাবে তাবু তাকাতে ইচ্ছে করল না মালিনীর। ও এখন অপেক্ষা করবে। যত দেরি হয়, হোক।

আর তক্ষুণি ভেতরের ঘরের দরজা ঠেলে রীণা বেরিয়ে এল। ঘাড়ের কাছে নিঃশব্দে ভেঙে পড়েছে, যেন কেউ হাত দিয়ে মুছে দিয়েছে, সারা দেহে নিঃসীম ক্লান্তির চিহ্ন, সেই ভোর থেকে এই সন্ধে রাতের মধ্যে ওর ওপর দিয়ে বিশাল এই বালুঝড় বয়ে গেছে যেন। মালিনীর একটা হাত হাতের মধ্যে নিল রীণা, তারপর কান্না ভেজা অস্ফুট গলায় বলে উঠল, ঘুমচ্ছে। ঘুমের ওষুধ দিয়েছে দেখবে?

শেষ কথাটার সঙ্গে হাতের আঙুলে যে চাপ পড়ল, তার জন্য প্রস্তুত ছিল না মালিনী। অপ্রস্তুত ওর শরীরকে কাচের এ পিঠে টেনে নিয়ে গেল ব্যাকুল দুই পা।

আর তক্ষুণি, বিজন এক আশঙ্কায় শিউরে উঠল মালিনীর শরীরটা। ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। ঘুমচ্ছে অরুণাভ। এত নিথর হয় মানুষ ঘুমে? বুকটা উঠছে নামছে না? ওই বুকের ওপর হাত দু'খানি যেন কত শতাব্দী ধরে স্থির। চেনা টাইটন কোয়ার্টাজ ঘড়িটা ওরা খুলে নিয়েছে, মণিকা খালি। এই একবেলার মধ্যে যেন কেউ কালি মেড়ে দিয়েছে অরুণাভর মুখে। এই মানুষটা উঠবে তো আবার, উঠে হেসে কথা বলবে কোনওদিন।

—অভিকে খবর...মানে...ফোন করা হয়েছে?

কোনও মতে ওইটুকু বলতে পারল মালিনী দরজা থেকে বিষণ্ণ মুখখানি ঘুরিয়ে।

রীণা কিছু বলার আগেই, পাশ থেকে অরুণাভর এক সহকর্মী বলে উঠল, হ্যাঁ, বউদির

সঙ্গে বিকেলেই কথা হয়েছে খোকার। ওর এখন পরীক্ষা। আসতে বলা হয়নি। এমনি তো কণ্ডিশন স্টেবলই...

ওই সহকর্মীর স্ত্রী এসে রীণাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে বাইরে নিয়ে চললেন।

—কতক্ষণ বসে আছ, জলটল মুখে দাও। এনেছি বাড়ি থেকে বানিয়ে।

রীণা ঘাড় ঘুরিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে মালিনীকে বলল, মালা তুমি যাও। রাত কোরো না বরং কাল সকালে...

মালিনী জেদী শিশুর মতন বলল, আমি থাকি না রাতে...

ভিড়টা বেশ অনিচ্ছুক শোরগোল তুলে বলতে লাগল...না, না আপনি কেন...আমরা আছি...পালা করে, আপনার অত সকালে অফিস।

রীণা ক্লান্তভাবে ঘাড় নেড়ে সায় দিল শুধু।

তীব্র এক অভিমান বিদ্ধ করেছিল মালিনীকে।

রীণা, অরুণাভর সহকর্মীরা, তাদের স্ত্রীরা এরা সবাই এক দল, দুর্ভেদ্য ঘনিষ্ঠতা এদের মধ্যে। এখানে মালিনীর জায়গা নেই। অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি বাড়ি গিয়ে। রাত সাড়ে বারটার পর দু'চোখের পাতা লেগে এক হয়ে এলে খাটের ওপর শরীরটা মেলে দিতে বাধ্য হয়েছিল মালিনী। ঝম ঝম বৃষ্টি। জানলার ওপরে করুগেটেড শিটে বৃষ্টির শব্দ। হাওয়া, ঘুম ভেঙে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দু'তিনবার। অঘোর রাত বাইরে। এখনও ঘুমের ওষুধ ছিঁড়ে চোখ খোলেনি অরুণাভ? রীণা কী করছে? টিপ মোছা, ক্লান্ত বিস্রস্ত ওর কপালটা মনেপড়ে বার বার। ওখানে আজ রাতে মালিনী থাকলে রীণা একটু ঘুমিয়ে নিতে পারত। ঘড়ির দিকে তাকালো মালিনী। আড়াইটে বাজে।

মালিনী কোনওদিন কি জানবে, জানবে, যদি, বহুদিন পর, শীতের নরম রোদে বসে রীণা ধীরে ধীরে কোলে উল নিয়ে বসে বলে, আড়াইটের সময় ও চোখ খুলল।

—তাই?

—হ্যাঁ, আমি অরুণাভর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে? এত ক্ষীণ, জড়ানো আওয়াজ। বলল, বার বার কোথায় উঠে যাচ্ছ? কই, এখানে তো বসে আছি। একটু আগে খালি টয়লেটে...কতবার টয়লেটে যেতে হয়। বসতে পারো না কাছে। আবার চোখ বুজল। তারপর চোখ বন্ধ করেই বলল মালা...আসেনি। হ্যাঁ, সন্ধেবেলায় এসেছিল। তুমি ঘুমচ্ছিলে। ডাক্তারের মানা ছিল। কেউ যেন ভিতরে না আসে। আবার আগামীকাল সকালেই এসে যাবে, দেখো...ও, বলে যেন আবার আচ্ছন্নতার মধ্যে ফিরে গেল অরুণাভ।

না, এই ডিটেলটুকু মালিনী জানতে পারেনি।

ভোরের মুখে, তার সুন্দর কপালে রাত-ভাঙা আলো এসে পড়ার সময়, মালিনী অথবা অরুণাভর মালা একটা স্বপ্নের ভিতর চলে গেছিল। প্রতিবারই মনে হয় এই স্বপ্নটা যেন আগেও দেখেছে দু'তিনবার অথচ জাগরণে এই বোধটা থাকে না। স্বপ্নটা আসলে মালিনীর জীবনের উলটো পিঠ। নতুন শাড়ি খসখস করছে, গলায় রজনীগন্ধার মালা, মালিনীর বিয়ে হচ্ছে। একটা অন্ধকার করিডর, দূরে অরুণাভর সিল্যুট। অরুণাভ একটা থাম ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

মালিনীর ভেতরে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, অরুণদা, আমি চলে যাচ্ছি...বলছে, অথচ কোনও আওয়াজ বেরুচ্ছে না গলা দিয়ে।

এই একটা তো জীবন, একটাই জীবন...

অরুণাভর ছায়া শরীর থেকে এইরকম কোনও একটা অভিব্যক্তি বয়ে আসছে, মালিনী শুনতে পাচ্ছে...অথচ অরুণাভর ঠোঁট নড়ছে না। ও স্থির।

পাখিরা ডাকাডাকি করে ওকে জাগালো।

হাত-পা চলছে না, তবু সাতসকালে চান করে তৈরি হয়ে নিয়েছিল মালিনী। এক কাপ চা খেল। ভাবল তারাকে একবার বলে ফ্লাস্কে চা করে দিতে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। তারপর মনে হল, থাক, ওরা, অরুণাভর বন্ধুরা আছে, ওরাই চা আনবে হয়ত। অত ভোরে যাওয়া ভাল দেখায় না, সকাল সাড়ে আটটায় হাসপাতালে পৌঁছে গেছিল মালিনী। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের সামনে জমাট শূন্যতা, দূরে চাতালে কেবল কয়েকটা কাক ঘুরছে। একজন ঝাড়ুদার ন্যাতা-বালতি নিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল। আর কেউ নেই।

কোথায় গেল এরা সবাই?

একটু পরে একজন সিসটারকে দেখতে পেয়ে মালিনী গিয়ে কথা বলল।

—ওঁকে বিক্রমনগরে শিফট করা হয়েছে আজ ভোরে। এখানে ইকুইপমেণ্টস নেই, হার্টের কণ্ডিশন মনিটর করা যাচ্ছিল না।

—কিন্তু এতবড় একটা অ্যাটাকের পর...জার্নি করতে পারবেন...?

—তা তো জানি না। ডাক্তার জেনেশুনেই বলেছেন তো। সিসটার ব্যস্তভাবে অপারেশন থিয়েটারের দিকে চলে গেল।

ওই দিকশূন্যতা থেকে বেরিয়ে মালিনী অফিসে এল। কাজে মন বসাবে বলে পুরনো বেশ কয়েকটা প্রজেক্ট রিপোর্ট তাক থেকে নামিয়ে আনল। অথচ মন তো লাগছে না কিছুতেই, ছিঁড়ে যাচ্ছে সুতো। বিক্রমনগর চলে যেতে ইচ্ছে করছে ছুটে। যাবে, কিছু কাজ সেরে একেবারে ছুটি নিয়ে চলে যাবে মালিনী।

বেলা বারটা বেজে দশ মিনিটের সময় ডেপুটি জি এম-এর টেবিলের লাল ফোনটা চিৎকার করে উঠল। খান্না নিজে আধমিনিট মতন, হ্যাঁ, আচ্ছা ইত্যাদি বলে ভুরু ঈষৎ উঠিয়ে মালিনীকে ডাকলেন।

আর মালিনীর বুকের মধ্যে মচ করে কী যেন ভেঙে গেল সেই মুহূর্তে। যেভাবে অন্ধকার সুড়ঙ্গের দিকে এগোয় মানুষ, সেইভাবে সন্ত্রস্ত মুখে ও ফোনের দিকে গেল। চোখের পাতা তখনি ভেজা ছিল মালিনীর। ফোনের ওপিঠে অরূপ, অরুণাভর বন্ধু।

মালিনী হাতের ব্যাগটা তুলে নিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

খান্না নরম করে হাসলেন, হাসির সময় এটা নয় বুঝেও।

—টেক ইট ইজি। আজ আর অফিসে এসো না। সঙ্গে টাকা পয়সা আছে তো?

—আছে। মালার ডান হাতটা ব্যাগের ওপর।

লাল মারুতি ভিজে-ভিজে রোদ্দুরের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে গেল বিক্রমনগর। বীরপুর থেকে বিক্রমনগর—চল্লিশ কিলোমিটার পথ। জ্যাম্ না থাকলে এক ঘণ্টার রাস্তা। একবার শহরের বাঁক, ভিড়, সিগন্যাল পেরলে স্টেট হাইওয়ের দীর্ঘ প্রশান্তি চুম্বকের মতো টানে। দুধারে আকাশনীল, ইউক্যালিপটাস ছায়া ফেলেছে মৃদু। এ পথ কত প্রিয় মালিনীর অন্য সময়। আজ যে যন্ত্রের মতো স্টিয়ারিংটা ছুঁয়ে আছে। গাড়িটা মন্ত্রমুগ্ধের দুপুর ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে আর মনের মধ্যেটা তোলপাড় করছে অনেকদিন আগে পড়া কবিতার কয়েকটা লাইন। কেন মনে আসছে এই কথাগুলো বার বার? কবিতা ওরও প্রিয়, অরুণাভরও, সেই জন্য কি? সিপিয়া রঙে তরুণ পাবলো নেরুদার অন্যমনা মুখ মলাটে।

To night I can write the saddest lines.
Through nights like this one I held her in my arms.
I kiased her again and again under the endless sky.
To night I can write the Saddest lines.

To think that I do not have her. To feel that I have lost her.
To hear the immense night, still more immense without her.
And the verse falls to the soul like dew to the pasture.

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে, মেঘে, বায়ুস্তরে সূক্ষ্ম পরাগের মতন ছড়িয়ে যাবে অরুণাভর প্রাণ। হয়ত এখনই পৌঁছে গেছে, মালিনী তো জানবে না। এতদিনের প্রিয় দেহখানি ছেড়ে চলে যাবার জন্য কী বিপুল তাড়া। প্রিয় নারীকে ছেড়ে অন্য রমণীর কাছে যাবার জন্য যেমন তর সইছিল না একদিন।

বিক্রমনগরের হাসপাতাল অনেক বড় বীরপুরের তুলনায়। মাইলব্যাপী তার কম্পাউন্ডওয়ালে অশ্বত্থ চারার বাড়বাড়ন্ত দেখে অতীতের দাপট ও গরিমা কিছুটা আন্দাজ করা যায়। ভিতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা বিভাগ, ওয়ার্ড, রিসার্চ ল্যাব। কার্ডিওলজি ইউনিটের সামনে ভিড় ছত্রখান হয়ে আছে। কয়েকটা গাড়ি, জিপ। ওপরে উঠতে উঠতে নানারকমের চাপা কান্না, ফোঁপানির আওয়াজ কানে। ওখানেও ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট। অনেক চটি, জুতো বাইরে ছড়িয়ে আছে। মানুষেরা খালি পায়ে ভিতরে।

একটা উঁচু স্টুলের ওপর দেওয়ালে পিঠ দিয়ে রীণা বসে। তার চোখের কোলে জল নেই, খোলা চুলে শোক জমে আছে। দুই হাত কোলের ওপর। প্রথমে রীণা, তারপর অরুণাভর দিকে চোখ গেল মালিনীর। মাথাটা সামান্য হেলানো ডানদিকে, চোখ দুটো বোজা, চশমা নেই। বহুক্ষণব্যাপী একটানা যন্ত্রণার পর এখন তার সারা শরীরে স্নিগ্ধ স্তব্ধতার চন্দন। বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছে চাদরে তাজা রক্ত পড়ে আছে। কেন রক্ত? শিউরে উঠে মালিনী রীণাকে জড়িয়ে ধরল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ঘোলা জলের মতন ছুটে আসা কান্নার দমকে কাঁপতে লাগল মালিনীর শরীর, চারপাশে সবাই তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে, মালিনীর খেয়াল নেই, ও নিজের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। যেন, এত কান্না! অনেকক্ষণ পর মালিনীর খেয়াল হয়েছিল ওই সময় সে কী বলেছিল দু'হাতে রীণার মাথা নিজের বুকে চেপে ধরে চুলে আঙুল বোলাতে বোলাতে...কেন হল, কেন এমন হল, আমার কী হবে...

আর রীণা ওর গভীর দুই চোখ মালিনীর মুখের ওপর রেখে কান্নার মধ্যে দিয়ে বলছিল...

অনেক, অনেক দূর যেতে হবে আমাদের...অনেক কষ্ট লেখা আছে...এ তো কিছুই না...অনেক কাঁদতে হবে সামনের রাস্তায়...

বরফগলা জলে দুই পা, মালিনী এখন মনে করতে চেষ্টা করছে গতকাল ভোরের কথা, যখন সে শেষবার অরুণাভকে দেখেছিল। জীবনে টইটম্বুর অরুণাভ, ঋজু, দীর্ঘ, কপালে এসে পড়া চুলের গুচ্ছ। ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে আসা বাজারের ব্যাগটা লুফে নিচ্ছে। অথবা তিরিশ বছর আগেকার মুজফ্‌ফরপুর, যখন সে প্রথম অরুণাভকে দেখে। রেল কলোনির পাঁচিল লালরঙা বাড়িঘর, ইঁদারা, অরুণাভ। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে সবে, টগবগ করছে তার হলুদ শার্ট, সাদা ট্রাউজার্সে। ক্লাস টেনের ঝাঁকড়া চুল মালাকে দেখে প্রেমই জাগে না তার, চুল টানে কিংবা মাথায় চাঁটি মারে পেছন থেকে। মালার বয়স কুড়ি, অরুণাভ চলে গেল চাকরির বদলে প্রথমে পাটনা, পরে কলকাতা। যাওয়ার আগে জ্বলন্ত দুটো ঠোঁট অদৃশ্য যে অঙ্গীকার এঁকে দিয়ে গেছিল মালিনীর চোখে, কপালে, ঠোঁটে, তাকেই মালিনী ক্রমাগত মৃন্ময় করে তুলছিল, চিঠির পর চিঠি দিয়ে। না, বিয়ের কোনও প্রতিশ্রুতি আসেনি ওদিক থেকে, তাই বলে হঠাৎ ছ'মাসের স্তব্ধতার পর বিয়ের কার্ড এসে পৌঁছবে, এমন কথাও তো ছিল না মালিনী-অরুণাভর খেলার মধ্যে। অরুণাভ মায়ের সইয়ের মেয়ে রীণা যে কোন অন্তরালে লুকিয়ে বসে আছে তাও বা মালা জানবে কী করে। বুকের অঙ্গার বুকেই চেপে মালিনী বিয়েতে ছুটে এসেছিল। থাকতে পারেনি, আর বিয়েবাড়ির ভাঁড়ার ঘরের গরমে উড়ন্ত

আরশোলাদের তোয়াক্কা না করে চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছিল নতুন বরের পাঞ্জাবির বুক।

খুব আস্তে আস্তে বরফ গলছে। পালঙ্কে অরুণাভ তার শরীরের চারপাশে ফুল, বুকে ফুলের পাষাণ ভার, বরফের বড় বড় স্ল্যাব আনানো হয়েছে। অভি এখন মাঝপথে, এসে পৌঁছতে পারেনি। অভির জন্য অপেক্ষা করা খুব দরকার।

বরফ গলে যাচ্ছে তবুও।

পারল না তো, বোকা মেয়েটা, এ জীবনে অন্য কোনও চন্দন-আঁকা মুখের সামনে নিজের পান-পাতা ঢাকা মুখ তুলে ধরতে। মা-বাবা-রাঙামাসি হার মেনে গেল। বর আর পছন্দ হয় না মালিনীর। কেউ ঢ্যাঙা, কেউ বেঁটে, কারও আঙুল মোটা, কেউ আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজি বলে। অফিসে হার মেনে গেল কত অভিজিৎ, সিদ্ধার্থ, পার্থপ্রতিম। মালিনী একা। তার ও অরুণাভর এই আশ্চর্য লুকোচুরি খেলা কি অদৃশ্য অ্যানটেনায় সঞ্চারিত করেছে এক বিশাল প্রজাপতি, ছায়াপথ জোড়া যার দুই ডানা। এতদিন একই পাড়ায় থেকে কেন বিচ্ছিন্ন হল ওরা, এত প্রেম কেন পথ পেল না, এত বিরহ অথচ গত আড়াই বছর ধরে কে টেনে রেখেছে মালিনীকে বীরপুরে, যদি রেখে দিল তবে কেন কালকের ভোরে কোনও বিদ্যুৎ চমকে দেখালো না আকাশে বিপদ সঙ্কেত, যদি দেখালো না তবে কেন রাতে দরজার কাচ দিয়ে ওই স্তব্ধ মুখ দেখা, ফিরে আসা, তারপর সেই বিক্রমনগর, আর এখন এই... বরফগলা জলে দুই পা, মালা হাতে মালিনী? কী অর্থ হয় এই জীবন-মরণে লিপ্ত লুকোচুরির।

অভি আসছে। ঘনরাত। দূরের পথে ভাড়া করা এক স্টেশনওয়াগনে দুই বন্ধুর সঙ্গে আসছে ছেলেটা। ও আসার আগে যেন বরফ গলে না যায়।

অনেকক্ষণ উপুড় হয়ে ড্রয়িংরুমের মেঝেতে পড়েছিল রীণা, এখন উঠে বসেছে। সোফা চেয়ার যত্রতত্র ঠেলা হয়েছে মানুষের যাতায়াতের জায়গা করার জন্য। ঘরটা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গেছে। তারই মধ্যে হাতে ভর দিয়ে রীণা বসে আছে। ওর চারদিকে ঘিরে বসে নানা বয়সের গৃহিণী, বউ, মেয়েরা।

সেইদিকে একপলক তাকিয়েই হঠাৎ মালিনীর মনে হল, এ যেন সেই বিয়ের বাসর। তরুণী মালিনী দূরে দাঁড়িয়ে বিয়ের কনেকে দেখছিল, একরাশ অভিমান জ্বালা বুকে নিয়ে। সেদিন সখীরা ঘিরে বসেছিল কনেকে, অরুণাভকে নিয়ে নানা কথা, হাসি, লুকিয়ে দেখার বৃত্তান্ত, লজ্জারুণ মুখ রীণার হাসিতে ছলছল করছিল। আজও সখীদের মাঝে বসে রীণা একবারে অস্ফুটে অরুণাভর কথা বলছে, সবাই উদগ্রীব হয়ে শুনছে, রীণার চোখের কোলে জল, সবার চোখের পাতা ভেজা।

...বড় কষ্ট পেয়েছিল জানো...বুকের মধ্যে ছিঁড়ে যাচ্ছিল, ওই ইউনিটের মধ্যে থেকে চিৎকার করে একবার আমাকে, একবার মালাকে একবার অভিকে...

আমি ছুটে ছুটে যাই...আমায় ঢুকতেই দিল না...ভেতরেই কতজন ডাক্তার...

শেষটায় পায়ের শিরা কেটে দিল, যদি রক্ত বেরিয়ে গিয়ে চাপটা কমে...কত রক্ত বেরল, কত কষ্ট দিল ওকে...পারল না তো...কী বুক ফাটা চিৎকার...আঃ, কী কষ্ট!

অরুণাভর অফিসের একজন একটু দ্রুত গিয়ে ফুল দিয়ে এল, ভদ্রলোক বুঝতে পারেনি নীচে বরফজল, মোজা ভিজে উঠেছে, মুখে চোখে অস্বস্তি।

মালিনী এবারে আস্তে করে মালাটা পায়ের ওপর রাখে অরুণাভর। কপালটা ছুঁয়ে দিতে বড় ইচ্ছে হয়, তবু সে নিজেকে সামলায়। বড় দেরি হয়ে গেল এ জীবনে। কীভাবে যেন পেছনে রয়ে গেল সবকিছু।

রাত ভোরের দিকে ঢলে ক্রমশ।

আড়াইটে।

কাল রাতে বীরপুরের হাসপাতালে এই সময় কষ্টে চোখ মেলে চেয়েছিল অরুণাভ।

মালা...আসেনি।

মালা নিজের জানলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিভেজা রাত পৃথিবীকে দেখছে তখন।

আজও আড়াইটের কাছে ঘড়ি। অভি এসে পৌঁছনোর পর শান্ত হয়ে এসেছে গুঞ্জন, ব্যাকুলতা। ওইটুকু তো ছেলে। কীভাবে মায়ের কাঁধে দ্রুত মাথা রাখল, কেবল দু'হাতে জড়িয়ে মা বলে ডাকল। বলল, আমি তো আছি। আমার দিকে তাকাও।

মাসি।

অভির ডাকে মালিনীর জাগরণঘোর ভাঙে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ, তুমি মায়ের কাছে গিয়ে বস বেডরুমে। পারোতো একটু ঘুমিয়ে নাও। আমাদের ফিরতে বেলা হবে।

ট্রাকটা এবার ছাড়বে। ওতে অরুণাভ, অজস্র ফুল, কিছু মানুষ।

অন্য বন্ধুপরিজনরা পিছনের গাড়িতে। সমুদ্রের ধারে শ্মশানে দাহ করে ফিরে আসবে ওরা।

আগামীকাল থেকে অভির শুরু হবে সামাজিক শোক পালন, রীণার বৈধব্য তো শুরু হয়েই গেছে আজ থেকে। মালিনীরও তো গেল সবকিছুই অথচ শোক অব্যক্ত রাখার কলা ছাড়া আয়ত্ত করার কিছু নেই।

ইঞ্জিনের শব্দে কেঁপে ওঠে ট্রাক।

ওদের পুরনো চৌকিদার লোহার গেটটা খুলে দিচ্ছে, এবার অরুণাভ যাবে। অভি গিয়ে ট্রাকে উঠে বসল।

মালিনী একবার নিজের অন্ধকার বাড়ির দিকে তাকাল। পাশের নিঃসঙ্গ বাড়ি। তারপর পেছন ফিরে রীণাকে খুঁজল। ওপরের জানলায় রীণা। চুপ করে গ্রিলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। অরুণাভ কি জানে তার যাওয়ার সময় ওরা দু'জন নিঃশব্দে পথ করে দিয়েছে উর্ধ্বগামী আত্মাকে, যে নারী চেয়েছিল অরুণাভকে সমস্ত জীবন আর যে পেয়েছিল দু'জনেই। এখন তো অরুণাভ নেই, এখন কি মিলে এক হয়ে যেতে পারে না রীণা আর মালিনী, ওপরের জানলার আলো, নিচের দরজার অন্ধকার; এই বাড়ি আর পাশের বাড়ি? অভিটা সারারাত জাগবে আজ। এই তো সাত ঘণ্টা অত রাস্তার ধকল নিয়ে এল। জ্বরজারি না বাধায়। মনে মনে কপালে হাত ঠেকাতে গিয়ে মালিনী বুঝতে পারে সে নিজের অগোচরেই রীণার মধ্যে লীন, নিহিত হয়ে যাচ্ছে।

দুই প্রজন্ম ।। কঙ্কাবতী দত্ত

"তুই কি বিয়েতে পণটন নিচ্ছিস নাকি?"

"না, মানে ওই একটা অ্যাডভান্স্ গোছের।

"অ্যাডভান্স্!"

"না, মানে মেয়েকেই ওরা দিচ্ছে আর কি!"

"কোনো বাবা যে তার মেয়েকে বিয়ের জন্য অ্যাডভান্স দেয়, তা এই শুনলাম!" বলে পারমিতা হাসি চাপতে মুখ ফেরাল। এখনও বাঙালি 'পণ' বলতে সঙ্কোচ বোধ করে। বিহার বা মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে এখনও বাংলার খানিকটা তফাৎ আছে।

"আমি দ্যাখ কিছুই চাই নি। কিন্তু মাল্টিমিডিয়ার যে ব্যবসাটা করবো ভাবছি, তাতে ওর বাবা ইন্‌ভেস্ট করবেন বলছেন। শ্বশুর বলে কি মানুষ না?" দেবজিতের এই রসিকতায় পারমিতা ভুরু তুললো।

বিয়েতে জিনিস নেওয়ার রীতিটা মধ্যবিত্ত বাঙালীদের মধ্যে এখন একটু ঘুরিয়ে, নানা ছলে, ছদ্মবেশে ব্যক্ত হয়।

"আমি তো আমার বাবাকে বলে দিয়েছি, খরচ করার মতো মালকড়ি যদি থাকেই, পাত্র বাবাজীকে মোটেই দেবে না।"

"তাহলে ? কাকে দেবে? তোকে?"

ঠাট্টাচ্ছলে করা দেবজিতের এই রঙ্গসূচক প্রশ্নে পারমিতা মাথা নাড়ল ঃ "আমাকে।"

"তুই টাকা নিয়ে কী করবি?"

"ব্যাংকে রাখব।" বলে পারমিতার গাম্ভীর্যে ভরা উত্তরে দেবজিৎ হেসে ফেলল। "আমাদের ক্লাসের রঘু প্রায়ই বলত কিছু টাকা ধার দিবি? কী করবি জিগেস করলে বলত, 'জমাবো'!"

পারমিতা তার দিকে তাকাল।

"আমি কত কী জমাব বলতে পারি না, তবে আসল টাকাটা তুলব না। ওটা বাবা-মায়ের জন্য রেখে দেব।"

দেবজিৎ মজা করার ভঙ্গীতে বলল, "ওহ্, কী কর্তব্যপরায়ণা!"

পারমিতা বলল, "সুদটা দিয়ে আমার পড়াশুনোর খরচ চলে যাবে। চাকরি পেলে, যাতায়াত খরচ।"

"বাহ, পাকামাথার প্ল্যান!" বলে দেবজিৎ আওয়াজ দেওয়ায় পারমিতা দৃষ্টি ফেরাল। "আমার বিয়ে দিতে হলে আমার বাবার দেড় দুই লাখ টাকা খরচ হত। সেই টাকা ব্যাংকে রাখলে দ্বিগুণ হবে। আর সুদটা..."

পারমিতার এই সব উক্তি কানে আসায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রৌঢ় মুচকি না হেসে পারলেন না। আজকের তরুণ-তরুণী—এরা কী ভাবে, জীবন সম্পর্কে কীরকম দৃষ্টিভঙ্গী

তৈরি করে, এসব নিয়ে ঈষৎ কৌতূহল তাঁর নেই তা নয়। জার্মানরা যাকে বলে, "ওয়েল্ট-অ্যান্ড-শং"—জীবনকে দেখার ভঙ্গী। বইমেলার প্রধান প্রবেশপথের টিকিট কাউণ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের কন্যাটির জন্য অপেক্ষা করতে করতে মনে হল, বাঙালীর জীবনপ্রবাহ বোঝার জন্য এই অনুপযুক্ত জায়গা নয়। দেবজিৎ তার সহপাঠিনীটিকে বলল, "দেড় দুই লাখ! বলিস কি পারমিতা? দেড় দুই লাখ টাকায় আজকাল কিছুই হয় না!"

"কিছুই হয় না?" পারমিতার এই প্রশ্নের উত্তরে দেবজিৎ বলল, "একটা মারুতি গাড়ির দাম কতো বল তো?"

প্রৌঢ় কাঁচা পাকা দাড়িতে হাত বুলোলেন। অধ্যাপক সুবীর রায়চৌধুরীর বন্ধু তিনি। পঁচানব্বই সালে মৃত্যুর আগে সুবীর রায়চৌধুরীকে এক ছাত্রীকে বলতে শুনেছিলেনঃ "আমি যদি ভাবি, তিতির গাড়ি করে এসেছে অথচ আমাদের একটা রিকশাও হল না, সেটা হবে আধুনিক কন্‌জিউমারিজম (consumerism)-এর এক ধরনের নমুনা।" ছাত্রীকে নিজের মতো করে কনজিউমারিজম (consumerism) বা আধুনিক ভোগবাদের প্রায়-হাস্যকর দিকটা বোঝাতে পেরেছিলেন কিনা প্রৌঢ় জানেন না। তবে অবিবাহিত সুবীরের বই-এ ভরা কাগজপত্র ছড়ানো এলোমেলো ঘর, প্যারিস বা নিউয়র্কের মিলিয়নেয়ারদের পেণ্টহাউসের চেয়েও তাঁর কাছে দামী, আরামদায়ক।

প্রৌঢ় দুই জগতেই বিচরণমান। আজও দেখছেন, বাঙালী বই-এর কাছে এসে পড়েছে। বইমেলায় ভিড় বাড়ছে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে। সযত্নে পোশাক পরা, প্রসাধনে দৃষ্টি টেনে নেওয়া নারী-পুরুষদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ়ের এক মুহূর্তের কৌতূহল হল জানতে, এদের মধ্যে ক'জনের বিয়ে একটু অন্য রকম, অগতানুগতিক ভাবে হয়েছে; ক'জনই বা সুবীর রায়চৌধুরী বা সার্ত্রের (Jean Paul Sartre) মতো প্রত্যাখ্যান করেছেন বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে। মনে পড়ে, ক্যারল অ্যান্ডারসন নামে এক মার্কিনী যুবতীর সঙ্গে দীপক মজুমদারের সেই বিয়ে। জ্যোতির্ময় দত্তর বসার ঘরে পানীয়ের পাত্র আদান-প্রদান করে, ফুলের পাঁপড়ি হাওয়ায় উড়িয়ে যে বিয়ের আসর ছিল উপভোগ্য, সুরুচি, রসিকতা বোধ ও বুদ্ধির শ্যাম্পেনসম বুদ্বুদে সফেন। অথচ প্রায় নিখরচা।

"কী কী জিনিস আসল্ যা
সভার করতালির চেয়ে খাঁটি
যা মন ভরায় তা নিখরচা
তলায় দিলাম অতি আংশিক
ব্যক্তিগত রুচির তালিকা
পাঠকজন বাড়াতে পারেন যেমন অভিরুচি
আমার ফর্দে লিখছি প্রথম
বেলাশেষের অম্লমধুর রোদে
উদ্ভাসিত গালের মিহি রোম
কানের লতির স্পর্শকামী ঈষৎ স্বচ্ছতা
খ্যাতির চেয়ে একশোগুণ খাঁটি
খয়ের লাল কেওঞ্জরের মাটি
দীঘল বাঁধে কুয়োর ধারে অবাক বালিকা
আদিত্যপুরে গীতার হাতে চা...

শুধুমাত্র দৃষ্টিবিনিময়ে এই গ্রহে কত বিবাহ ঘটে যায়। বাইরের বস্তুর আয়োজন যত বেশি, মনের অভ্যন্তর যেন ততই শূন্য। হৃদয় ও মনের রাজ্যের দৈন্য ঢাকতেই বুঝি তুচ্ছ খেলনা

দিয়ে ভরিয়ে তোলা। এই প্রজন্মের বাঙালী দেখা যাচ্ছে এ বিষয়ে গতানুগতিক। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পারমিতার মুখ থেকে এমনকি এ মন্তব্যও ভেসে এল ঃ "ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরের মতো পণও হয়তো মধ্যবিত্ত বাঙালীদের মধে স্পষ্টাস্পষ্টি ফিরে আসবে, যদি না একটু সচেতন বা সাবধান থাকা যায়।"

"কিরকম?"

দেবজিৎ নামের ছেলেটির এই প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলল, "দ্যাখ, এই বিয়ের ব্যাপারটার সঙ্গেই কিন্তু মেয়েদের সমস্ত ছোটো-হয়ে-যাওয়া জড়িয়ে আছে। বাবা মা পরিবারের কাছে মেয়েরা এজন্য অসুবিধেজনক চরিত্র হয়ে উঠছে। খুকিকে যতই আদর করুক, তার মধ্যে কোথায় যেন বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা আশঙ্কা সমস্যা মিশে থাকে।"

ছেলেটি হেসে বলল, "তা এর প্রতিকার?"

মেয়েটি বলল, "প্রতিকার হল, বিয়ের সময় খরচের ব্যাপারে আপত্তিটা কন্যার নিজের তরফ থেকে আনানো চাই। মেয়েই বলুক, বাবা, তুমি কিছুতেই খরচ করবে না। দু হাজার খ্রিস্টাব্দ এসে পড়ল। সেই কবে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ শিখিয়ে গেছেন, তারপর একটুও এগুবো না?"

ছেলেটি হেসে ফেলল মেয়েটির এই সব কথায়। এক সময় বলল, "হুঁ।"

প্রৌঢ় ভাবলেন, সত্যি, এ বিষয়টা নিয়ে বাঙালীর সচেতন চিন্তা এখন কতোটা মনস্ক, সজাগ? পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত কিন্তু প্রথা, রীতি, সংস্কার সম্পর্কে বাঙালীর তীব্র সচেনতা ছিল। পণপ্রথা সম্পর্কে অবজ্ঞা অনুভূতিটা খুব জীবন্ত ছিল। আজ মনে হয়, তত তীব্র নেই সেই অনুভূতি। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গগুলো ছাড়া কোন কিছু সম্পর্কেই তীব্রতা তেমনভাবে জেগে নেই।

পারমিতা নামের ওই অচেনা মেয়েটির আরও একটি কথা তাঁর কানে লেগে রইল।

মেয়েটি বলছে ঃ "ছোটবেলা থেকে কন্যাসন্তানদের সামনে তাদের বিয়ে সম্পর্কে নানান অনুষঙ্গ তোলা হয়। পেশার অনুষঙ্গ সেভাবে তোলা হয় না। খুকির পারিপার্শ্বিককে যদি উপলব্ধিতে ভরিয়ে তোলা না যায়, দরকারে আইন করে বিয়েবাড়ির এই ঘটা নিষিদ্ধ করা হোক। যে ভাবে পঁচাত্তর সালে অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন ছিল। বিয়েতে সোনার গয়না, বোতাম দেওয়াটা বাধ্যতামূলক তো হবেই না, আইনগত বারণই থাকবে খুব বেশি গয়না দেবার।"

এতো রকম যার ভাবনা, সেই তরুণীটিকে একবার ভালো করে না দেখে পারলেন না প্রৌঢ়। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। বিয়ের ঘটা বন্ধ হবে? না, বিয়েবাড়িতে শুধু যে পাত্রপাত্রীর বাবাদের বিত্ত, যোগাযোগ, পরিচিতি প্রদর্শনের প্রশ্ন আছে তা নয়, মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত মেয়েদের মনোজগতের পক্ষে বিয়েবাড়ি জরুরি উপলক্ষ্য হিসেবে। কোথায় আর পরবে গয়না, কোথায় শখ মিটিয়ে সাজবে। এও যেমন ঠিক, আবার এই তো একটি বাঙালী মেয়ে, কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে, পুরুষ সহপাঠীকে বলছে ঃ "জানিস রাজীব গান্ধীর মেয়ের বিয়ের কত বছর আগে, আমার জানা একটি বাঙালী মেয়ে ফুলের গয়না পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসার উদ্ভাবনী ও উদাহরণ দেখিয়েছিল।"

"কে রে মেয়েটা?"

"গৌরকিশোর ঘোষের মেয়ে সাহানা।" বলে পারমিতা যোগ করল, "ও হ্যাঁ, আর আরেকজন। সে আমার চোখে লেগে আছে। আমার দাদামশাই-এর মৃত্যুর দিনও তার সব ভুলিয়ে-দেওয়া চেহারা আমার চোখের জল শুকিয়ে দিয়েছিল।"

"ও বাবা, সে আবার কে?"

"সুচিত্রা সেনের মেয়ে মুনমুন সেন। স্কুল-কলেজের খাতায় যার পোষাকী নাম হল

শ্রীমতী—শ্রীমতী সেন। এই শ্রীমতী নামটা সে কেন ব্যবহার করে না জানি না। সে তো আক্ষরিক অর্থেই শ্রী-মতী। কানে দুল হিসেবে পরেছিল বেলফুলের সবুজ পাতা। সুন্দর মুখের পাশে ফর্সা কানটির লতিতে বেলপাতাটি দেখার পর, সেখানে উপস্থিত এক কবি চলে গেলেন কবিতা ভবনের ছাদে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চাঁদ দেখতে দেখতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, 'মুন, মুন'। সেই কবির কবিতা তুই পড়েও থাকবি হয়তো—ওঁর নাম প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।''

প্রৌঢ়টি চোখ সরিয়ে নিলেন। যুবক-যুবতীর এইসব কথোপকথন তাঁর মাথার মধ্যে নানান প্রসঙ্গ উস্কে দিচ্ছে। পৌঁছে যাচ্ছে ভীষণ প্রিয়, দুর্বল, প্রায় যেন ব্যথার কতগুলো বিন্দুতে, যার জন্য তিনি তাঁর লস্ অ্যাঞ্জেলেসের প্রবাস ছেড়ে তিন সপ্তাহের জন্য কলকাতায় এসেছেন। সেই বিন্দুগুলো হল কবিতা, বাংলা ভাষা, বাঙালী বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা, নারী, প্রেম বা বিবাহ, যৌবন, অতীত, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

বইমেলার প্রবেশপথের দিকে অগুন্তি নারীপুরুষের এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এত লোক? ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে অত সুন্দর বাগান থাকা সত্ত্বেও তো এর লক্ষ ভাগের এক ভাগকেও দেখা যায় না। শুধু কলেজে ইউনিভার্সিটিতে প্রত্যেক ব্যাচের প্রেমিক-প্রেমিকারা ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে ঠিক আবিষ্কার করে ফেলে। নাকি মনোমতো যাবার জায়গা নেই বলে বাঙালী এভাবে স্রোতের মতো আসে বইমেলায়? যা নিয়ে গর্ব করি, তা কি আসলে আমাদের অভাবের লক্ষণ? রাস্তার ধারে কাফে নেই, নেই লাক্সেম্বুর্গ গার্ডেন্স বা সেন্ট্রাল পার্কের মতো কোন বৃহৎ বাগান, টেম্স্ বা স্যেন্ নদীর ধারের গাছেভরা বুলেভার্ড, তেমন কোন সঙ্গ, টলস্টয়ের ''ওয়ার অ্যাণ্ড পীস্''-এ বর্ণিত নাতাশার প্রথম 'বল'-এর মতো নাচের আসর, যেখানে শরীরী অনুষঙ্গ না এনেও ভালোলাগা কোন নারীর সামনে নতজানু হয়ে হাতে হাত ছুঁইয়ে আমন্ত্রণ করা যায় অল্পক্ষণের নাচে। বিকল্প হিসেবে কি বিয়েবাড়ির অস্তিত্ব? পর্ব হিসাবে যা মুছে দেওয়া যাচ্ছে না?

একশ বছরের সেরা গল্প

সম্পাদনা সমরেশ মজুমদার

একশ বছরের সেরা ভৌতিক

সম্পাদনা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও বারিদবরণ ঘোষ

সেরা নবীনদের সেরা গল্প

সম্পাদনা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও রামকুমার মুখোপাধ্যায়

সেরা লেখিকাদের সেরা গল্প

সম্পাদনা : বাণী বসু ও অরুণ মুখোপাধ্যায়

বেতার জগতের সেরা গল্প

সম্পাদনা : অমিত চক্রবর্তী ও শোভন পাঠক

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা-৭৩ ফোন : [illegible]

স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, সরোজকুমারী ... রূপা ...
দেবী, পূর্ণশশী দেবী, গিরিবালা দেবী, শান্তা ... বী, শৈল
ঘোষজায়া, সীতা দেবী, রাধারাণী দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, লীলা
মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, আশালতা সিংহ, হাসিরাশি দেবী, প্রতিভা
বসু, সাবিত্রী রায়, বাণী রায়, মহাশ্বেতা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী,
নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়, মীরা বালসুব্রমনিয়ন, গৌরী
আইয়ুব, গৌরী ধর্মপাল, কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন,
বাণী বসু, কণা বসু মিশ্র, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, জয়া মিত্র,
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার, সর্বাণী মুখোপাধ্যায়,
অনিতা অগ্নিহোত্রী, কঙ্কাবতী দত্ত॥